পৌরাণিক গল্পসমগ্র : শিবপুরাণ

পৌরাণিক গল্পসমগ্র : শিবপুরাণ

শতদ্রুশোভন চক্রবর্তী

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

Pouranik Galpasamagra : Siva Purana.

প্রথম প্রকাশ

মহালয়া আশ্বিন ১৩৬৪.

প্রকাশক

লীনা চক্রবর্তী

ইছাপুর ক্যানাল সাইড

পূর্বপাড়া, হাওড়া ৭১১১০৪

প্রচ্ছদ

অজয় গুপ্ত

স্কুল লাইব্রেরি

১৭/১ কেদার মুখার্জী লেন

কদমতলা, হাওড়া

মুদ্রক

নারায়ণচন্দ্র ঘোষ

দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স

৩২ বিডন রো,

কলিকাতা ৭০০০০৬

৺সুবাসিনী দেবী
৺ইন্দুবালা দেবী
৺অঘোর চৌধুরী-র
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

‘ওঁ শম্ভো শিব শিবাকান্ত শান্ত শ্রীকণ্ঠ শূলভৃৎ
শশিভূষণ সর্বেশ শঙ্করেশ্বর ধূর্জটে ॥
পিণাকপাণে গিরিশ শিতিকণ্ঠ সদাশিব।
মহাদেব নমস্তুভ্যং দেবদেব নমোঽস্তুতে ॥
স্তুতিকর্তুং ন জানামি স্তুতিপ্রিয় মহেশ্বর।
তব পদাম্বুজ-দ্বন্দ্বে নির্দ্বন্দ্বা ভক্তিরস্তু মে ॥ ওঁ

‘পুরাণচর্চায় সময় ইতিহাস ও যুক্তিবিচারের দৃষ্টি নিয়ে এসো না। ঐ সব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার মনের ভিতর দিয়ে প্রবাহাকারে চলে যাক। তোমার চোখের সামনে তাকে মশালের মতো ঘোরাও, কে মশালটা ধরে রয়েছে—এ প্রশ্ন করো না, তাহলেই একটা আলোকের চক্র দেখতে পাবে।’—

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রস্তাবনা

শিবপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে চতুর্থ। এর আধ্যাত্মিক গুরুত্ব এবং সাহিত্য-গৌরব বিশাল। শিবপুরাণের সমস্ত গল্প-উপাদান একালীন ভাষা-পরিচ্ছদে এ গ্রন্থে পরিবেশিত। প্রতিটি গল্প যথাসম্ভব মূলানুগত। পুরাণের গণ-চারিত্র্য বজায় রাখার জন্যও চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পগুলির মধ্যে প্রকীর্ণ অজস্র মানবিক উপাদান। আশা করি তা একালের পাঠককেও মুগ্ধ করবে। ভূমিকায় বিশদ হবার চেয়ে সহৃদয়ের হৃদয়-সংবাদের জন্যই আপাতত উৎকর্ণ হয়ে থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে হচ্ছে। আমার অধ্যাপক স্বর্গীয় অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় এবং উদ্বোধন পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী অব্জজানন্দের আশীর্বাদ আমার পাথেয়। দুজনেই পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পড়ে তাঁদের ভাল লাগার কথাটি আমাকে অকপটে জানিয়েছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এর কয়েকটি গল্প প্রকাশিতও হয়েছিল।

গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনেকের সহযোগিতাই লাভ করেছি। শ্রীবাসুদেব গুছাইত ইংরেজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য হলেও পৌরাণিক গল্পগুলির প্রতি খুব অনুরাগ দেখিয়েছেন। গল্পগুলি যে সময় রচিত হয় সে সময় প্রথম পাঠিকা ছিলেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী লীনা। পরবর্তী কালে আমার পুত্র শ্রীমান শর্বকল্পের বাল্যকালের অনেক মুগ্ধ প্রহর কিছু কিছু গল্প নিয়ে কেটেছে। এ গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন, প্রেসকপি মিলিয়ে দেখার ব্যাপারে আমার ছাত্রী শ্রীমতী দেবযানী যথেষ্ট সাহায্য করেছে। স্কুল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী শ্রীস্বপন পাত্র ও তাঁর দুই কর্মী শ্রীসাধন বিশ্বাস ও শ্রীসুজিৎ পাঁজা কলেজ স্ট্রীট থেকে প্রুফ নিয়ে আসা ও দিয়ে আসা ইত্যাদি শ্রমসাধ্য আরো নানা কাজে নিরন্তর সহযোগিতা করে গেছে। এদের কথা অবিস্মরণীয়। এ ব্যাপারে আমার ছাত্র শ্রী পুষ্কর চোঙদারের কাছেও আমি ঋণী। সর্বোপরি আমার কলেজের সহকর্মী অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন দাসের আনুকূল্যও অনেক পেয়েছি। নিয়ত উৎসাহ দিয়ে গেছেন পিতৃকল্প শ্রীপরানচন্দ্র দাস। বন্ধু শ্রীঅজয় গুপ্ত আগের দুখানি বইয়ের মতো এবারেও প্রচ্ছদচিত্র এঁকে দিয়ে বন্ধুর কৃত্য সম্পন্ন করেছে। পুস্তকবিপণির শ্রীঅনুপ মাহিন্দরের তত্ত্বাবধান ছাড়া এ গ্রন্থ আদৌ হয়ত গ্রন্থমূর্তি লাভ করত না। মুদ্রক শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষও বিশদ ভাবে সহযোগিতা করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশের শুভ লগ্নে আমি সকলের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

হরিরুবাচ

ওঁ একাক্ষরায় দেবায় অকারায়াত্মরূপিণে।
উকারাদিদেবায় বিদ্যারূপায় তে নমঃ ॥
তৃতীয়ায় মকারায় শিবায় পরমাত্মনে।
জলায় জলজাপ্যায় নমস্তে জলশায়িনে ॥
চিত্তায় চিত্তিরূপায় স্মৃতিরূপায় তে নমঃ।
জ্ঞানায় জ্ঞানগম্যায় নমস্তে পরমাত্মনে ॥
হিরণ্যবাহবে তুভ্যং নমস্তে হেমরেতসে।
কপর্দিনে নমস্তুভং নাগাঙ্গাভরণায় চ ॥
বৃষাকপয়ে শর্বায় কর্ত্রে হর্ত্রে নমো নমঃ।
শিবায় শিবরূপায় ব্যাপিনে ব্যোমব্যাপিনে ॥
নমো নিধীনাং পতয়ে লিঙ্গিনে লিঙ্গরূপিণে।
তেজসে তেজসাং ভর্তে নমস্তে সর্বরূপিণে ॥
শাশ্বতায় বরিষ্ঠায় বারিগর্ভায় যোগিনে।
স্থিতায় সামগেয়ায় আবয়ো ব্রহ্মবর্চসে ॥
আত্মনে ঋষয়ে তুভ্যং স্বামিনে বিষ্ণবে নমঃ।
ওঙ্কারায় নমস্তুভ্যং সর্বজ্ঞায় নমো নমঃ ॥

সূচীপত্র

(ওঁ) তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং ভর্গোদেবস্য ধীমহি উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ (ওঁ)

পৌরাণিক গল্পসমগ্র ঃ শিবপুরাণ

১· জ্যোতির অন্তরে

এখন কিছু নয়, কিছু নয়। জল স্থল আকাশ বাতাস কিছু নয়, শুধু এক জ্যোতি। জ্যোতির সমুদ্র: ঊর্ধ্বে অধেঃ শুধু জ্যোতি। অবর্ণনীয় আদিঅন্তহীন এক জ্যোতি।

কাল অতিবাহিত হল। জ্যোতির সমুদ্র নিস্তরঙ্গ রইল। কিন্তু এক সময়ে সমুদ্রে দেখা দিল তরঙ্গ। সৃষ্টির বেদনায় জ্যোতির সমুদ্র অস্থির তরঙ্গে উতলা হল।

ছিল শুধু জ্যোতি। এবার জাগল সৃষ্টির ইচ্ছা। ইনিই প্রকৃতি। দেবী প্রকৃতি। অষ্টবাহু। হরেক প্রহরণে সেখানে নিত্য দীপ্ত বিদ্যুৎ। গতির শতেক কৌশলে দেবীর অশেষ রহস্য। বসনে ভূষণে সজ্জিতা দেবী প্রকৃতি। বিচিত্র বসন, বিচিত্র ভূষণ ঃ বিচিত্র প্রকৃতি। সবের মধ্যে একখানি মুখ। সহস্র পূর্ণিমার চাঁদকে যেন নিঙড়ে নেওয়া হয়েছে। অত অত সুন্দরের রস। গাঢ় হয়ে যেন এতটুকুটি হয়েছে। রচিত হয়েছে দেবীর মুখমণ্ডল। এমনতর মুখে আবার দুটি প্রফুল্ল পদ্ম। লাবণ্য ও কমনীয়তার জোয়ার বইছে। কিন্তু তার মধ্য থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে অসম্ভব একরকমের তেজ।

তারপর একসময় জ্যোতির সমুদ্র আলোড়িত করে ভেসে উঠলেন পুরুষ।

পুরুষ তাকালেন প্রকৃতির মুখের পানে, প্রকৃতি তাকালেন পুরুষের মুখের পানে। দুজনের মনের মধ্যেই সমস্যা। দুজনেই বেদনায় অস্থির। কি করে সৃষ্টি করব, কি করে সৃষ্টি করব—ভেবে ভেবে ওঁরা অস্থির হলেন।

প্রকৃতি ভাবলেন ঃ আমরা দুজন, অথচ কি করব ?

পুরুষ ভাবলেন ঃ আমরা দুজন, অথচ কি করব ?

সহসা কোথা থেকে যেন বাণী এল ধেয়ে। সংশয়ে ওঁরা ডুবে যেতে বসেছিলেন। কিন্তু বাণী এল ধেয়ে। সেই নীরব মহাশূন্যের মধ্যে সেই বাণী ধ্বনিত হল। এক ধ্বনি, কিন্তু শতধা হয়ে খানখান হয়ে সেই ধ্বনি এদিকে ওদিকে সেদিকে ছুটে গেল। বায়ুস্তরে স্পন্দন জেগেছে। গমগম করল। পুরুষ ও প্রকৃতি শুনলেন ঃ তপস্যা কর। তপস্যা কর। তপস্যা কর।

ওঁরা ধ্যানে বসলেন। ক্রমে তলিয়ে গেলেন সমাধির গভীরে।

একসময় ওঁরা জেগে উঠলেন। ভাবলেন ঃ আহা কত তপ! কত তপ!

ওঁদের শরীর থেকে হু হু করে বেরিয়ে এল রাশি রাশি জল। যেন ঢল

নামল। পুরুষ ও প্রকৃতি বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। দেখতে দেখতে চরাচর ব্যাপ্ত হল জলে।

তখনো ওঁদের মনে তপস্যার শ্রান্তি। ওঁরা সেই জলে শয়ন করলেন। ওঁদের মনে নেমে এল শতেক স্বস্তি।

জল হল শয্যা। পুরুষ তাই নারায়ণ। প্রকৃতি তাই নারায়ণী।

তখন শুধু জ্যোতি, জল, প্রকৃতি আর পুরুষ। এবার পুরুষ তৎপর হলেন। অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে উপজাত হল মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব থেকে উপজাত হল অহংকার। সৃষ্টির চক্র যেন আবর্তিত হল। একটি উপজাত হয়, সেইটি থেকে হয় আর একটি। এই ভাবে চক্রবৎ। অহংকার। অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চভূত। পঞ্চভূত থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। চক্র আবর্তিত হচ্ছিল। সহসা থেমে গেল। গতি পেল অন্যতর।

জলের শয্যায় নারায়ণ। নাভিমণ্ডলে প্রকাশিত হল দিব্য এক পদ্ম। অনন্ত পত্রে কর্ণিকার অলংকারে সেই পদ্ম যেন সজ্জিত হয়েছে। কমনীয়, অথচ কোটি সূর্যের মত প্রদীপ্ত সেই পদ্ম।

নারায়ণের নাভিমণ্ডলে পদ্ম। পদ্ম প্রসারিত হতে হতে গিয়ে পড়ল অসীমের কূলে। উচ্চ হতে হতে কোথায় গিয়ে উঠল কে জানে!

হিরণ্যগর্ভ সেই পদ্ম। ব্রহ্মা জন্ম নিলেন। জন্মমাত্র ব্রহ্মা দেখলেন শুধু এক পদ্ম, পদ্ম, আর কিছু নয়।

ব্রহ্মা আকুল হলেন। কোথায় ছিলেন, কেনই বা এলেন, কেই বা তিনি? বহুতর প্রশ্নে ব্রহ্মা দিশাহারা হলেন। কোথাও কিছু নয়, শুধু এক পদ্ম। পদ্মের উপর দিশাহারা ব্রহ্মা। কি করবেন তিনি? কে তাঁকে নিয়ে এল এই অদ্ভুত জায়গায়? ব্রহ্মা থই পেলেন না কোন। হাজারো প্রশ্ন। অথচ উত্তর মেলে না কোন।

ভেবে ভেবে অবশেষে ব্রহ্মার মাথায় এক বুদ্ধি এল। পদ্ম আছে। পদ্মের মূলও আছে। সেই মূলেই নিশ্চিত মিলবে তাঁর সাক্ষাৎ। নির্মাণ করে অন্তরালে অজ্ঞাত থাকবেন সেটি হতে ব্রহ্মা দেবেন না।

ব্রহ্মা এলেন পায়ে পায়ে পদ্মের কোষে। সেখান থেকে নাল বেয়ে চললেন মূলে। নালে নালে চলে চলে একশো বছর পেরিয়ে গেল। কিন্তু মূলের সন্ধান মিলল না। ব্রহ্মা অবসন্ন হয়ে আকুল হয়ে প্রত্যাবর্তন শুরু করলেন। কিন্তু কোথায় সেই পদ্মের কোষ? কোথায়? কোথায়ও না। ব্রহ্মা ঘুরে ঘুরে হন্দ হলেন। আরও একশো বছর কেটে গেল। কিন্তু না মিলল মূল, না মিলল কোষ। পথ হারিয়ে চলে চলে অবসন্ন হয়ে ব্রহ্মা বসে পড়লেন। কি করবেন, কোন্ পথে যাবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

অকস্মাৎ ব্রহ্মা শুনলেন ঃ তপস্যা কর। তপস্যা কর। তপস্যা কর।

কোথাও কিছু নয়। কিন্তু কোথা দিয়ে কার কথা যেন ভেসে এল। কানে কানে দিগ্‌ভ্রান্ত ব্রহ্মাকে বলে গেল ঃ তপস্যা কর। তপস্যা কর। তপস্যা কর।

শুরু হল ব্রহ্মার তপস্যা। পরিপাটি করে বারোটি বছর ধরে ব্রহ্মা তপস্যা করলেন। একদিন আবির্ভূত হলেন মেঘবরণ এক পুরুষ। যেন কোটি কন্দর্পের লাবণ্য ছেঁকে প্রলিপ্ত হয়েছে সেই পুরুষের অঙ্গে। চার বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। পরনে পীত বসন, মাথায় মুকুট। অঙ্গে আরো আরো সব ভূষণ। ব্রহ্মা বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলেন লাবণ্যের সেই বন্যার প্রতি।

ব্রহ্মা আনন্দে আপ্লুত হলেন। কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় তিনি বিমুগ্ধ। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে সেই পুরুষকে দুহাতে তুলে রূঢ় স্বরে বললেন ঃ কে তুমি ?

পর মুহূর্তে ঈষৎ কমনীয় করে সুধালেন ঃ ভগবান কি জেগেছেন ?

সম্মুখে সাক্ষাৎ নির্মাতা। আমিই তোমাকে সৃষ্টি করেছি—এমন কথা বললে তিনি বলতে পারতেন। কিন্তু বললেন না। বললেন ঃ বৎস, বিষ্ণু সত্ত্বগুণ দ্বারা তোমাকে নির্মাণ করেছেন।

ব্রহ্মা আহত হলেন। কে না কে অথচ বলছে বৎস, বৎস।

ব্রহ্মা বললেন ঃ বৎস বৎস বলনা।

বিষ্ণু ঈষৎ হাসলেন। হাসিতে গুরু-গুরু ভাব। বললেন ঃ তোমার সম্মুখে স্বয়ং বিশ্বাত্মা বিষ্ণু। তাঁকে অমন করে বলাটা কি ঠিক ? আমি জগতের হর্তা কর্তা বিধাতা। আমার যে অবয়ব দেখছ তার ক্ষয় নেই। তুমি উৎপন্ন হয়েছ এর থেকেই। অথচ আপাতত তুমি সব ভুলে বসে আছ। যাক তোমার কোন দোষ নেই এতে। আমারই মায়া। তাই তোমার ব্যবহারে উপস্থিত হয়েছে এই বিকার।

ব্রহ্মা ফুঁসে উঠলেন। বললেন ঃ কিন্তু তুমি কে ? আমার কর্তা না হয় তুমিই। কিন্তু তোমারটি কে ? একজন নিশ্চয়ই আছেন ?

ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। আর বাক্য ব্যয় না করে সোজা আক্রমণ করে বসলেন বিষ্ণুকে। ঘোরতর যুদ্ধে জগৎ যেতে বসল।

কিন্তু সহসা নেমে এল এক অদ্ভুত আলোর স্তম্ভ। ওঁরা মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোথা থেকে এল এই জ্যোতির পুঞ্জ। কোথায়ই বা এর শেষ ? ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সেই জ্যোতির্লিঙ্গের আদি ও অন্ত কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না। দুজনের মনেই ঘোর নেমেছে বিস্ময়ের, দুজনেই বিমূঢ় চিত্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিষ্ণু বললেন ঃ আমি আছি, তুমি আছ। কিন্তু ইনি কে ? জ্যোতির আকার ধরে কে এলেন নেমে ?

ওঁরা যুদ্ধ ভুললেন। দুজনে মিলে ঠিক করলেন দেখতে হবে কোথায় এর শুরু আর কোথায়ই বা এর শেষ।

ব্রহ্মা নিলেন হংসের রূপ। মনের মত বেগে হুহু করে ব্রহ্মা উপরে উঠে চললেন। বিষ্ণু হলেন শ্বেতবরাহ। বরাহ নয়, যেন সুমেরু পর্বত। দশ যোজন প্রস্থ, শতযোজন দীর্ঘ। সুবিশাল সেই বরাহ তীক্ষ্ণ খুরে ও দাঁতে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে চললেন নীচের দিকে। ঘোরতর শব্দে দিকসমূহ কেঁপে উঠল। অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হল প্রলয়সূর্যের দীপ্তি।

ব্রহ্মা উড়ে উড়ে ঊর্ধ্বে গিয়ে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে হয়েও কোন শেষ পেলেন না সেই জ্যোতির্লিঙ্গের। বিষ্ণু অধোদেশে যেতে যেতে সংগ্রহ করলেন শুধুই শ্রান্তি।

ব্রহ্মা আগেই ক্ষান্ত দিয়েছেন। অশেষ অবসন্নতায় উনি তখন ধুঁকছেন। বিষ্ণুও এলেন ফিরে। বিস্ময়ে শ্রমের আতিশয্যে বিষ্ণু তখন চোখে অন্ধকার দেখছেন। বারবার তিনি শিবকে প্রণাম করছেন। করতে করতে ব্রহ্মার পাশে এসে বসে পড়লেন।

ওঁরা দুজনেই বললেন ঃ কি এ ? নাম নেই, কর্ম নেই, কি এ বস্তু ? লিঙ্গ নয়, কিন্তু লিঙ্গের আকার ? বুঝছি ধ্যানেরও অগম্য ইনি।

ওঁরা দুজনেই ভক্তিতে বিগলিত হয়ে বললেন ঃ তোমার রূপ বুঝতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের নেই। যেই হও, তুমি আমাদের নমস্য। তোমাকে নমস্কার।

একাগ্র মনে একশো বছর ধরে ওঁরা সেই জ্যোতির্লিঙ্গের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন।

একদা সহসা মহানীরবতা ভেঙ্গে খান খান হল। বাতাসে কম্পিত হল ওঁ। বিষ্ণু সচকিত হলেন। ব্রহ্মা সচকিত হলেন। এদিকে তাকালেন, ওদিকে তাকালেন ঃ কোত্থেকে এল এই মহাশব্দ ? দুজনেই বললেন ঃ যাঁর থেকে এই মহাশব্দ উৎপন্ন সেই তাঁকে আমাদের নমস্কার।

ধীরে ধীরে সেই জ্যোতির্লিঙ্গের দক্ষিণভাগে ফুটে উঠল সনাতন আদ্যবর্ণ অ-কার। ধীরে ধীরে অ-কারের উত্তরে ফুটে উঠল আর এক বর্ণ উ-কার। তারপর অ ও উ-এর মধ্যস্থানে নাদধ্বনি সমন্বিত ম-কার। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জ্যোতির সেই মহাস্তম্ভে ওঙ্কার দর্শন করলেন। অ-কারে যেন সূর্যের বর্ণ, উ-কারে যেন আগুনের বর্ণ, ম-কারে চন্দ্রের কমনীয় কান্তি, আর নাদবিন্দু জ্বলজ্বল করল—যেন একখণ্ড স্ফটিক। ওঙ্কার। তুলনা নেই। তবু মনে হয় যেন অমৃত। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অমৃত দর্শন করলেন।

(ধীরে ধীরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মনে ওঙ্কারের অর্থ আভাসিত হল। ওঁদের যেন মনে হল অকারে সৃষ্টিকর্তা, উকারে জগৎপাতা, আর মকারে স্বয়ং

মহাদেব—অনুগ্রহ বিতরণে যিনি পরম বদান্য

সম্মুখে যেন বিস্ময়ের সমুদ্র। ঢেউ উঠছে, কেবলি উঠছে, বেলাভূমি প্লাবিত করে ভেঙ্গে পড়ছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রস্তুত ছিলেন না। সহসা বিস্ময়ের প্রকাণ্ড একটা ঢেউ একেবারে ওঁদের সম্মুখে এসে ভেঙ্গে পড়ল। এক অত্যদ্ভুত অথচ অপরূপ পুরুষ এসে দাঁড়ালেন ওঁদের সম্মুখে। সমস্ত শরীরে কর্পূরের রঙ। অলংকারে অলংকারে লাবণ্যে লাবণ্যে বীর্যে বীর্যে সে রঙে যেন কিসের উচ্ছ্বাস। পঞ্চমুখ, দশভুজ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মনে মনে পঞ্চমুখ হলেন। বুঝলেন পরমতত্ত্ব মূর্তি নিয়েছেন। মহাদেব হয়ে হয়ত আশিসে আশিসে এসেছেন ওঁদের অভিষিক্ত করতে। ওঁরা স্তবে মুখর হলেন।

মহাদেব হেসে উঠলেন। ধারণ করলেন শব্দশরীর। অকার ও আকার। হল তাঁর মাথা ও কপাল। দুই চোখঃ ডাইনে ইকার, বামে ঈকার। দুই কানঃ ডাইনে উ, বামে ঊ। দুই কপোলঃ ডাইনে ঋ, বামে ৠ। দুই ঌকার হল তাঁর দুই নাসিকা। উপরের ঠোঁটে এ, নীচের ঠোঁটে ঐ। দুই পাঁতি দাঁতঃ ও এবং ঔ পেল স্থান। দুই তালুতে বসল অনুস্বার বিসর্গ। ডাইনে বাঁয়ে পাঁচ পাঁচ দশ বাহু। এদিকে ক-বর্গ, ওদিকে চ-বর্গ। ট-বর্গ ও ত-বর্গে হল দুই পা। প-য়ে উদর—ডাইনে ও বাঁয়ে ফ ও ব। ভ-য়ে স্কন্ধ, ম-য়ে হৃদয়। য থেকে ম পর্যন্ত সমস্ত অক্ষরে রচিত হল সেই দেবদেবের সাতপ্রকার ধাতু। হকার হল নাভি, আর ক্ষকার হল নাদ।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু করজোড়ে বললেনঃ কৃপা করুন।

মহাদেব বললেনঃ প্রসন্ন হয়েছি।

ওঁরা দুজনেই বললেনঃ তাহলে বলুন আমাদের সম্পর্কে আপনার কি ইচ্ছা?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল ভেসেঃ ব্রহ্মা সৃষ্টির, আর বিষ্ণু পালনের মালিক। আর সংহারের দায় পালন করবেন আমারই এক অংশ। প্রকৃতিদেবী থেকে সম্ভূত হবেন ব্রহ্মাণী শক্তি। প্রকৃতিদেবী থেকেই আবির্ভূত হবেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মী হবেন বিষ্ণুর আর কালীশক্তি হবেন আমার। তিন দেব হল, তিন দেবী হল। এবার সৃষ্টি কর।

বিষ্ণু বললেনঃ আপনার কথা অবশ্যই পালন কয়ব। কিন্তু একটি প্রার্থনা আছে।

মহাদেব বললেনঃ বল।

বিষ্ণু বললেনঃ আপনার তত্ত্বে আমাদের সমৃদ্ধ করুন। ও থেকেই আমরা অর্জন করব বহুতর সামর্থ্য।

মহাদেব কৃপা করলেন। বিষ্ণু মন্ত্র পেলেন। মন্ত্র দর্শন করলেন। গায়ত্রী মন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র, 'নমঃ শিবায়' মন্ত্র, চিন্তামণি মন্ত্র ও দক্ষিণামূর্তি মন্ত্র—

পাঁচ মহামন্ত্রে বিষ্ণুর হৃদয় ভরে উঠল।

মন্ত্র পেয়েছেন, মন্ত্র দেখেছেন। জপে জপে বিষ্ণু আত্মহারা হলেন। আবার মহাদেব দর্শন দিলেন।

প্রসন্ন মহাদেব বিষ্ণুকে বেদ দান করলেন। তারপর দিলেন উপনিষদ। অতঃপর বিষ্ণুর প্রসন্নতায় বেদ ও উপনিষদের তত্ত্বে ব্রহ্মার হৃদয় উদ্ভাসিত হল।

বিষ্ণু মহাদেবকে সুধালেন ঃ কি করে আপনার ধ্যান করব? কেমন করেই বা আপনাকে লাভ করব? যদি এসেছেনই তবে বলুন।

ঃ(আমি লিঙ্গস্বরূপ। লিঙ্গরূপে আমার ধ্যান কর, পূজা কর। তাহলেই তোমার সব মনোরথ সিদ্ধ হবে। বেশি আর কি বলব। শত দুঃখে পড়েও মানুষ যদি স্মরণ করে, প্রণত হয় এই লিঙ্গের উদ্দেশ্যে, তাহলে সর্ব দুঃখ তার দূর হয়, মনে নেমে আসে প্রসন্ন প্রসাদ।)

মহাদেব ক্ষণকাল মৌন রইলেন। বললেন ঃ আমাতে ভক্তি রেখ। সৃষ্টির কাজে সদাই ব্যস্ত থাকবেন ব্রহ্মা। তুমিই ওঁকে পালন কর।

প্রসন্ন মহাদেব। চূর্ণচূর্ণ হয়ে সেই প্রসন্নতা যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। বিষ্ণু বুক ভরে সেই প্রসন্নতা গ্রহণ করলেন। ভক্তিতে তাঁর হৃদয় অদ্য উদ্বেলিত। তিনি স্তব করলেন। ব্রহ্মাও বিষ্ণুর সঙ্গে সুর মেলালেন।

ওঁরা বললেন ঃ এক অক্ষরের রূপের মধ্যেই আপনি বিরাজ করেন, অকার ও উকারের মধ্যেই আপনি প্রমূর্ত। আপনি আত্মরূপী, আপনি আদিদেব। আমরা আপনাকে নমস্কার করি। আপনি তৃতীয় মকারাত্মক, পরমাত্মা। আপনি জলরূপী—জলেই আপনার পূজা হয়, জলেই রচিত হয় আপনার শয়ন। চিত্ত, অন্তঃকরণ, স্মৃতি, জ্ঞান বলতে যা বুঝি আপনি তা-ই। জ্ঞানের মধ্য দিয়েই আপনাকে ধারণা করা যায়। আপনি হিরণ্যবাহু, হিরণ্যরেতা আপনি কপর্দী, নাগাভরণ। আমরা এই মহান আপনাকে নমস্কার করি আপনি শর্ব, হর্তা, কর্তা। আপনি শিবস্বরূপ, আপনি লিঙ্গস্বরূপ, আপনি তেজঃস্বরূপ। এই সর্বব্যাপী মহান্তপুরুষকে বারবার নমস্কার করেও আমাদের মন তৃপ্তি মানছে না। ওঙ্কাররূপী আপনাকে তাই আমাদের নমস্কার শতকোটি নমস্কার।

মহাদেব বললেন ঃ তোমাদের উপর আমার প্রীতির অন্ত নেই। ভয় ছেড়ে এবার আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর। আমার ইচ্ছাস্বরূপা প্রকৃতি থেকে তোমাদের জন্ম। আমার নির্গুণ রূপকে তিন অংশে আমি ভাগ করেছি। ডাইনে ব্রহ্মা বামে বিষ্ণু, আর হৃদয়ে পরাৎপর পরমাত্মা। প্রীতিতে তাই আমি ভরপুর তাই বলছি, বর নাও।

বলতে বলতে না জানি কত স্নেহে উনি দুই হাত প্রসারিত করলেন

একহাতে বিষ্ণুকে আর হাতে ব্রহ্মাকে উনি স্পর্শ করলেন।

বিষ্ণু প্রণাম করলেন। বললেন: আপনি প্রীত। আপনি বরদানে সম্মত। দিন। আর কিছু নয়। প্রার্থনা শুধু ভক্তির। আপনার উপর আমরা যেন চিরকাল ভক্তিমন্ত থাকতে পারি।

মহাদেব বললেন: তুমি ও ব্রহ্মা দুজনেই আমার কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছ। তোমাদের দিতে পারিনা এমন কিছুই আমার নেই।

বিষ্ণু আরো গদগদ হলেন। মাটিতে হাঁটু গেড়ে আস্তে আস্তে বললেন: ভাগ্যে আমাদের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। তাই আপনি এলেন।

মহাদেব বিষ্ণুর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন: তোমাদের মনে ভক্তি নেমে আসুক। আপাতত উঠ। মাটির মূর্তি গড়ে আমার পূজা কর। সুখী হবে।

বিষ্ণু উঠলেন। মহাদেব আরো বহু বললেন। তাঁর পরম প্রসন্নতা অদ্য যেন প্রকাশের চরিতার্থতায় বারবার বিগলিত হল।

একসময়ে বললেন: ব্রহ্মা, তুমি সৃষ্টি কর। আর বিষ্ণু, তুমি কর পালন। আমি নির্গুণ, কিন্তু সম্প্রতি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণে হয়েছি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর। আমার পরমরূপ একরকমই বটে, কিন্তু এই অঙ্গ থেকেই জন্ম হবে রুদ্রের। রুদ্র হবেন আমার অংশ। রুদ্র পৃথক রূপে সৃষ্ট হবেন, কিন্তু আমাকে ও তাঁকে এক বলেই জেনো। মাটিতে রচিত হয় কত কত পাত্র, কিন্তু মূলে সবই মাটি। সোনায় গড়া হয় কত কত অলংকার। কিন্তু মূলে সবই সোনা।' সমুদ্রের বুকে বিচিত্র তরঙ্গের কত ভঙ্গ, কিন্তু মূলে ঐ এক সমুদ্র। ভেদ নেই কোন। আমি এবং রুদ্রও তেমনি। ভেদ নেই কোন। আসলে যা কিছু দেখা যায় সবেতেই আমি। ভেদ নেই কোন। ভেদ হলেই হত বন্ধন। তাই বলছি, ভেদ করনা। করনা। ঐভাবেই ধ্যান কর। কর, হবে।... তোমরা দুজন প্রকৃতি থেকে জাত। রুদ্রের উৎপত্তির মূলে শুধু আমার আজ্ঞা। ব্রহ্মা ভ্রূকুটি করলেন। আমি করলাম রুদ্রের সৃষ্টি। বলা হয়, রুদ্রের মধ্যে তমোগুণই প্রধান। তাই তিনি বৈকারিক অহংকার। রুদ্র কিন্তু আসলে তামস নন, মাত্র নামেই তিনি তামস। অতএব একে মান্য কর।' প্রকৃতি থেকে এবার উৎপন্ন হবেন লক্ষ্মী, ব্রহ্মাণী ও মহাকালী। লক্ষ্মী বিষ্ণুর, ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার আর আমার কালী। এঁদের আশ্রয়েই আমরা জগতের হিতকাজে মনোনিবেশ করব। তোমরাও কর। দুষ্টের নিগ্রহ করে শিষ্টের পালন করে তোমরা জগতের ভাল কর। ওতেই সুখ। বিষ্ণু ও আমি এক। আমি আমার হৃদয়ে যেমন থাকি, বিষ্ণুর হৃদয়েও তেমন থাকি। ভেদ নেই কোন। রূপো দিয়ে কি রত্ন দিয়ে, কিংবা সোনা বা মাটি দিয়ে আমার এই লিঙ্গের পূজায় তোমরা তদগত হও। কল্যাণের আলোয় উদ্ভাসিত হবে সমুদয় পথ।

সহসা বিষ্ণু ও ব্রহ্মার দুচোখে নেমে এল অনেক অন্ধকার। ওঁরা এতক্ষণ জ্যোতির মহাসমুদ্রে যেন নিমগ্ন হয়েছিলেন। মহাদেব অন্তর্হিত হলেন। ওঁদের চোখে নেমে এল পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। অন্ধকার, অন্ধকার, কিন্তু অন্তরে যে জ্যোতির বন্যা।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিহরিত হতে হতে অনুভব করলেন: ভাগ্যে আমাদের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল!

২. ব্রহ্মা ও বিষ্ণু

(মহাদেব বিষ্ণুকে বললেন: তুমি হও গুণের রাজা। এই যে এত এত গুণ সত্ত্ব, অথচ সবই জড়। তুমি হও চৈতন্যস্বরূপ। লোকে লোকে তুমি অনুস্যূত থেকে লাভ করবে বহুতর অর্ঘ্য। ব্রহ্মা সৃষ্টি করবেন। এই সৃষ্টির অন্তরে পুঞ্জীভূত হবে অশেষ দুঃখ। তুমি সেই দুঃখের ভার থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা কর। দিশাহারা মানুষ পথ খুঁজবে। ত্রাণের জন্য আকুল হবে। তাদের দিশা দেখিয়ে দেবে। চিত্তে চিত্তে বিস্তার করবে স্বস্তি, চিত্তে চিত্তে বিস্তার করবে শান্তি। রুদ্ররূপে আমি প্রকটিত হব। আমিও বিস্তার করব কল্যাণ। লোকে ধ্যান করবে তোমাকে, তুমি করবে আমার। তুমি ও আমি। বাইরের দিক থেকে পৃথক। কিন্তু ভেদ নেই কোন। আমাকে ভক্তি করে, করতে করতে নিন্দা করে তোমার: বুঝব সত্যের শিখা তার চিত্তে তখনো প্রজ্বলিত হয়নি। তাই তার সমুদয় পুণ্য বিনষ্ট হবে, গতি পাবে নরকে। তুমি ভুক্তি ও মুক্তি দেবার কর্তা হও। লোকের অনুগ্রহ করতে হয়, তুমিই কর। লোকের নিগ্রহ করতে হয়, তুমিই কর।)

মহাদেব ব্রহ্মার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। দুহাতে তুলে ধরলেন ব্রহ্মাকে। বিষ্ণুকে বললেন: দুঃখের দিনে তুমি থেকো সবার পাশে পাশে। দেবসমাজে তুমিই সর্বাধ্যক্ষ। ভুক্তি দিতে হয় দিও, মুক্তি দিতে হয় দিও। কেউ যদি তোমার শরণ নেয়, বুঝব সে আমারই শরণ নিয়েছে। ব্রহ্মার বয়স শতবর্ষ পুরবে। অদ্য হতে সেই পর্যন্ত তুমিও এইরূপেই আমাকে বুঝবে, দর্শনও করবে। সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চার যুগ। এরা হাজার বার ঘুরে এলে ব্রহ্মার হবে এক দিন। চার হাজার যুগ ঘুরে এলে হবে এক রাত্রি। মাস ও বছরের হিসেবও হবে এই মত। এই ভাবে একশো বছর পর্যন্ত সৃষ্টির কাজে তুমিই থাকবে প্রধান।

বিষ্ণু বললেন: যা বলছেন তার অন্যথা হবে না। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে। আপনার কাছ থেকেই আমার সবকিছু পাওয়া। আপনার

ধ্যানে আমার মন কখনো শ্রান্ত হবে না। আপনি করুন, যেন তাই হয়। তবে এও বলছি, আমার ভক্ত হয়ে আপনার নিন্দায় কেউ রত হলে তাকে আমি ক্ষমা করব না। কারণ আপনি ও আমি এক ও অভিন্ন। এই পরমতত্ত্ব যে জানবে মুক্তিও তার কাছে হবে সুলভ। আপনার কল্যাণে আমার সম্মান বেড়েছে। কিন্তু ভয় হয়, ত্রুটি ঘটবে, হয়ত ঠিক ঠিক ভাবে আপনার আরাধনা করতে পারব না। সে রকম হবে না, কিন্তু যদিই হয়, যেন ক্ষমা পাই।

মহাদেব বললেন ঃ তুমি তেমন করবে না। কিন্তু যদিই করে ফেল আমি তবে ক্ষমা করতে ভুলব না।

মহাদেব অন্তর্হিত হলেন।

ব্রহ্মা এগিয়ে এলেন। বিষ্ণুকে নমস্কার করে সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। মহাদেবের আদেশ পালন করতে হবে। মহাদেবের মনের মত কাজে তৎপর হতে হবে। এবার চাই জ্ঞান। ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছ থেকে জ্ঞান নিলেন।

বিষ্ণু জ্ঞান দিলেন। অন্তর্হিত হলেন।

ব্রহ্মা বসে রইলেন না। সৃষ্টি করলেন জল। অঞ্জলি করে বীর্য ধরলেন। ফেললেন সেই জলে।

বীর্য পড়ল জলে। সৃষ্টি হল মহৎ এক অণ্ডের। চব্বিশ তত্ত্বে সমাচ্ছন্ন সেই অণ্ড ঘনীভূত হল।

ব্রহ্মা দেখলেন তত্ত্বে তত্ত্বে ঘনীভূত সেই অণ্ড। কিন্তু স্বস্তি পেলেন না। কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেছে। ব্রহ্মার মনে সংশয়ের মেঘ জমল। স্থির করলেন, এবার আবার তপস্যা।

ব্রহ্মার মনের মধ্যে অকম্পিত শিখা হয়ে বিষ্ণু জ্বললেন। বারো বছর কেটে গেল। ধ্যানের জগৎ থেকে বিষ্ণু এলেন নেমে। বললেন ঃ কি চাও? তোমাকে তো সবই দিতে পারি। কিছু তো এমন নেই যা তোমাকে দেবার নয়। বল। চাও।

ব্রহ্মা বললেন ঃ শিব আমাকে আপনার হাতে সঁপে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। সংশয়ে পড়েছি। হাবুডুবু খেয়ে মরছি। তাই স্মরণ করেছি। শিব বলেছিলেন সৃষ্টি কর। কিন্তু জগতে যা দেখছি তার সবই জড়, প্রাণের ছোঁয়া কোথাও নেই। আপনি কৃপা করুন। চৈতন্যের ছোঁয়া দিয়ে এই জগতে স্পন্দন জাগিয়ে তুলুন।

বিষ্ণু অনন্তরূপ ধারণ করে সেই বৃহৎ অণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লেন সেই অণ্ডের সর্বপ্রান্তে। ধীরে ধীরে অণ্ডমধ্যে সর্বদিকে জাগরণের সাড়া জেগে উঠল।

সংশয় গেল দূরে। এবার সৃষ্টির পালা। এবার বেদনার প্রকাশ। এবার সময় হয়েছে। এবার নবতর আনন্দে মেতে উঠে নবতর এক লীলায় ব্রহ্মার

অভিনিবিষ্ট হবার সময় হয়েছে। আর থেমে থাকা নয়। এবার লাবণ্য ছড়িয়ে শুধু চলা, চলা এবং চলা।

৩. সৃষ্টিস্রোত

নব আনন্দে ব্রহ্মা যেন জাগ্রত হলেন। পুত্র উৎপন্ন হল। পুত্র, কিন্তু মানসপুত্র। ওঁরা সবাই হলেন ঊর্ধ্বরেতা। সৃষ্টির প্রবাহে আসি-আসি করল স্তব্ধতা। কিন্তু এল না। ব্রহ্মা ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এঁরাও হলেন যেন কেমন সৃষ্টিছাড়া। সংসারে এলেন, কিন্তু সংসারী হলেন না। ওঁদের বৈরাগ্যে সৃষ্টি যেন দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পড়ল না। ব্রহ্মা রাগে ফুলতে থাকলেন। ফুলতে ফুলতে রোদন করে উঠলেন।

রোদনভরা চরাচর। মহাদেব বেরিয়ে এলেন। নাম পেলেন রুদ্র।

মহাদেব বললেন ঃ কি হয়েছে ? কোথায় দুঃখ ? কি দুঃখ ? বল। নাশ করি।

ব্রহ্মা বললেন ঃ গতিক বড় মন্দ। সৃষ্টিতে বাধা পড়ছে। আরো বাধায় সৃষ্টির স্রোত হয়ত বা থেমেও যেতে পারে। আপনি যা হয় একটা প্রতিবিধান করুন।

মহাদেব বললেন ঃ সৃষ্টির স্রোত বইবে। চিরকালের জন্য বইবে। ছেদ পড়বে না কোন। আমি সহায়।

গণ-পরিবৃত হয়ে মহাদেব কৈলাসধামে প্রস্থান করলেন।

আবার ব্রহ্মা তৎপর হলেন। নবতর আনন্দ। নবতর সৃষ্টি। সৃষ্ট হলেন ভৃগু প্রভৃতি সাতজন ঋষি। কোল থেকে নারদকে, ছায়া হতে কর্দমকে, অঙ্গুষ্ঠ হতে দক্ষকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন। দশজন ঋষিকে পেয়ে ব্রহ্মার উৎসাহ বৃদ্ধি পেল।

মরীচির জন্ম হল। মরীচি থেকে কশ্যপ। কশ্যপ ধন্য। কশ্যপ যোগ্য পাত্র। ভরিয়ে তুললেন জগৎ।

দক্ষ বৈরাগ্য নিয়ে চলে গেলেন না। ষাটটি কন্যার পিতা হয়ে জগতে বিতরণ করলেন অশেষ কল্যাণ। কশ্যপ এঁরই তেরটি কন্যাকে বিবাহ করলেন। ভরিয়ে তুললেন পৃথিবী।

দক্ষ কৃতী পুরুষ। ষাট কন্যার পিতা তিনি। আর এই ষাট কন্যা থেকেই দেব, দৈত্য, দানব, বৃক্ষ, পক্ষী, সর্প, পর্বত ও লতার উৎপত্তি। পাতালতল থেকে সত্যলোক পর্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে শূন্যস্থান রইল না। ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হল।

দক্ষ কৃতী পুরুষ। ষাটকন্যার একতমা সতী। রুদ্রের হাতে সমর্পিত হলেন সতী। মহাকালী নামে পেলেন খ্যাতি। নতুন জন্ম নিলেন। হলেন পার্বতী। শিবকে আশ্রয় করে এই পার্বতীই বিস্তার করেছিলেন লীলামাহাত্ম্য। লোকে জানল তিনি কালিকা, চণ্ডিকা, তিনি ভদ্রা, চামুণ্ডা, বিজয়া এবং জয়া।

সূত বর্ণনা করছিলেন। ঋষিরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। বলতে বলতে সূত একটু থেমে পড়লেন। ঋষিরা ব্যাকুল হয়ে বললেনঃ থামলেন কেন? বলুন, বলুন। আহা, যেন অমৃত, অমৃত।

৪. তারকাসুরের তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি

তপস্যায় কত কষ্ট! তারক তপস্যা করেছিল। কষ্টের চরম করেছিল।

প্রজ্বলিত সূর্য। চোখ মেলে তাকানো যায় না! কিন্তু মধুরবনে অসুর তারক সেই সূর্যের দিকে একভাবে চেয়ে থেকে মাথার উপর দুহাত তুলে একপায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেছিল।

মাত্র পায়ের বুড়ো আঙুল। তারই উপরে সারা শরীরের ভর রেখে একশো বছর ধরে সে তপস্যা করেছিল।

শুধু জলপানঃ একশো বছর। শুধু বায়ুভক্ষণঃ একশো বছর। তারক কৃচ্ছ্রের চরম করেছিল।

জলে দাঁড়িয়ে সে তপস্যা করল। একশো বছর কেটে গেল। স্থণ্ডিলে অবস্থান করল। একশো বছর কেটে গেল। আগুনের মধ্যেঃ সেও একশো বছর। মাটির দিকে মাথা রেখে একশো বছর, হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে একশো বছর। শুয়ে শুয়ে বছর কেটে গেল। প্রাণ প্রায় পাত করে তারকাসুর তপস্যা করল। মাথা ফেটে যেন তেজ ফেটে পড়ল। অসুরের তপস্যার তেজে দেবসমাজে বিস্তারিত হল দাহ আর দাহ।

ইন্দ্র রীতিমত মুষড়ে পড়লেন। ইন্দ্রত্ব বুঝি যায়। ইন্দ্রের মনে একখণ্ড মেঘ জমা হলঃ সিঁদুরে মেঘ। দেবসমাজ ভয়ে নিস্তব্ধ হলেন। ওঁরা ভাবলেন ঈশ্বর হয়ত এবার সংহারের বোল ছড়িয়ে নৃত্যে মেতে উঠবেন।

কিন্তু খবর এল। দেবতারা শুনলেনঃ তারকাসুরের তপস্যা ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে। ওঁরা নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করলেন। ব্রহ্মা যদি বর দেন, অথচ মনোমত না হয়, তাহলে জগতের নিশ্চিত বিনাশ। ব্রহ্মা যদি আদপেই বর না দেন, হাত গুটিয়ে উদাসীন হয়ে বসে থাকেন, তাহলেও দুঃখে দুঃখে জগতের নাভিশ্বাস উঠবে। আবার বর দিলেও রক্ষা থাকবে না কোন। তবে না দিলে এই মুহূর্তেই ঘনিয়ে

আসবে বিনাশ, দিলেও বিনাশ আসবে, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে। দেবতারা ঠিক করলেন ঃ তারকাসুরকে বর দেওয়াই আপাতত বুদ্ধির। জগৎ যাবেই, তবু কিছুটা সময় হাতে থাকবে।

দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এলেন। সমুদয় বললেন। বললেন ঃ বরই দিন। তবু কিছুটা সময় হাতে পাওয়া যাবে।

ব্রহ্মা হাঁসের পিঠে চড়ে রওনা হলেন। তারকের সামনে এসে বললেন ঃ যা তপস্যা করেছ তাতে না দেবার মত কিছুই নেই। এবার বর নাও।

তারকাসুর বর চাইল। বরের মত বরই চাইল। বলল ঃ দুটি বর চাইই। বলে হতে চাই অতুল। কারোর কোন অস্ত্রই যেন আমার কাল না হয়। শিবের পুত্র হবে, সে পুত্র সেনাপতি হবেন, নিক্ষেপ করবেন অস্ত্র, তবেই হবে আমার বিনাশ।

ব্রহ্মা বর দিয়ে ফিরে এলেন। চরাচরে ছড়িয়ে পড়েছিল দাহ। ব্রহ্মা বর দিলেন। দাহের শান্তি হল।

কৃতকৃতার্থ তারকাসুর এল শোণিতপুরে।

দৈত্যসমাজে সাড়া পড়ে গেল। তারকাসুর ফিরে এসেছেন, আশ্চর্য শক্তি আহরণ করে তিনি ফিরে এসেছেন।

দৈত্যরা বলল ঃ তুমি আমাদের রাজা হও।

তারকাসুর রাজা হল। তারক বর পেয়েছে। উদ্দাম হয়ে প্রকাশ পেল তার বীর্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, দেবতা, যক্ষ সবাই ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকলেন। যেখানে যা কিছু সুন্দর ছিল সমস্তই এল তারকের অধিকারে। অত্যাচারে অত্যাচারে কাতর হয়ে ভাল ভাল সমস্ত কিছু তারকের পদমূলে উপহার দিয়ে দেবতারাও স্বস্তি পেতে চাইলেন। ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা উপহার দিলেন, ধর্ম দিলেন রত্ন খচিত দণ্ড। কুবের এলেন। গদা ও নয় নিধি দিয়ে মন পেতে চাইলেন তারকের। বরুণ দিলেন কত কত অশ্ব, ঋষিরা দিলেন কতকত কামধেনু। সমুদ্রও মন জোগাল তারকের। পায়ে ঢেলে দিল তাবৎ রত্ন। সূর্য শাসিত হলেন, চন্দ্র শাসিত হলেন, বায়ুও শাসিত হলেন। রোদ হল স্নিগ্ধ, চাঁদেব কিরণে সর্বদা ভাসল তারকের রাজ্য, বায়ুও বইলেন মন্দ-মন্দ লয়ে। দেবতারা হব্য দিতেন, পিতৃগণ কব্য দিতেন। তারকাসুর গ্রহণ করত। দেবতা ঋষি তারকের সেবায় মনোরঞ্জনে সর্বদা রইলেন অতন্দ্র। মানুষের তো কথাই নেই।

স্বর্গে কোন উদ্যান রইল না, মর্ত্যেও কোন তীর্থ রইল না। তারক সমস্ত কিছু আনয়ন করল নিজের পুরে।

বহু বছর বহু সয়ে কেটে গেল। দেবতারা অবশেষে ব্রহ্মার কাছে এলেন। বিষণ্ণ মলিন দেবগণ। ব্রহ্মা বললেন ঃ কিসের দুঃখ?

দেবগণ বললেন ঃ আপনার অজানা তো কিছুই নেই। আপনি তারককে নাশ করুন। আমরা আর পারি না।

ব্রহ্মা বললেন ঃ তারকের বাড় আমারই বরে। আমি নিরুপায়। একমাত্র শিবের পুত্র থেকেই ওর নাশ হতে পারে। হিমালয়ে শিব তপস্যায় ডুবে আছেন। উমাদেবী নিযুক্ত আছেন তাঁর সেবায়। যদি কোন মতে এঁদের যোগ ঘটাতে পার তাহলেই ঘুচতে পারে তোমাদের দুঃখ। অন্যথায় যেমন চলছে তেমনই চলবে। আমার বীর্য ধারণ করতে পারেন একমাত্র জলরূপী মহাদেব। আর শিবের বীর্য ধরতে পারেন একমাত্র উমা।

দেবতারা পথ পেলেন। অন্ধকারে পড়ে পড়ে শুধু মার খাচ্ছিলেন। কোথা থেকে অন্ধকার চিরে এক চিলতে আলো এসে পড়ল। ওঁরা অবসাদে ডুবে যাচ্ছিলেন। ডুবে যেতে যেতে হাতে পেলেন একগুচ্ছ তৃণ। দেবতারা সব ভুলে তৎপর হয়ে উঠলেন। ওঁদের মনে দৃঢ় ইচ্ছা ঃ উদ্ধার পেতে হবে। অন্ধকার থেকে ফিরতে হবে আলোয়।

প্রাণের সমুদ্রে অকস্মাৎ যেন জোয়ার এল।

৫. মদন ভস্ম

ব্রহ্মা পথ বলেছেন। এবার চলতে হবে। ব্রহ্মা গন্তব্যের কথা বলেছেন। এবার চলতে হবে। কিন্তু পথ বড় কঠিন।

দেবগণ সংশয়ে দুললেন ঃ পারবেন কি ? শিব। তপস্যায় ডুবে আছেন। ওঁরা পারবেন কি তাঁকে চঞ্চল করতে ? ওঁরা পারবেন কি তাঁকে মুগ্ধ করতে ? দেবগণ চিন্তায় ক্লিষ্ট হলেন।

ব্রহ্মার কাছ থেকে ফিরে এসে সবাই ধরে পড়লেন ইন্দ্রকে। ওঁরা বললেন ঃ যে করে হোক করুন। একাজ আপনার।

ইন্দ্র কথা বললেন না। দেবতারা আপাতত প্রস্থান করলেন।

দেবরাজের মনে চিন্তা ঘনীভূত হল। ওঁর মনে পড়ল কন্দর্পের কথা।

দেবরাজ ডেকে পাঠিয়েছেন। মুহূর্তও বিলম্ব হল না। কন্দর্প সস্ত্রীক ইন্দ্রের সম্মুখে আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন। বললেন ঃ কি করব বলুন।

কন্দর্পকে দেখে ইন্দ্র খুশি হলেন। এমনিতে তাঁকে স্মরণ করেননি। কন্দর্প সেটি বুঝেছেন। তাঁর চোখেমুখে সেটি প্রকট। ইন্দ্র এটি বুঝে মনে মনে আরো হৃষ্ট হলেন।

ইন্দ্র বললেন ঃ আমার মিত্র আছে বহু, কিন্তু তোমার মত কেউ নয়। আমার জয় চেয়েই পরমেশ্বর তৈরি করেছিলেন দুটি অস্ত্র। এক বজ্র, দুই

তুমি। বজ্র নামে, ঝরে হিংসা। তুমি নামো, আনো সুখের আবেশ। তুমিই তাই শ্রেষ্ঠ। বজ্রও কখনো সখনো ফিরে আসে। লজ্জায় ম্লান হয়ে বজ্র এসে আমার হাতে মুখ লুকায়। কিন্তু তুমি ফিরে আসো জয়ে উচ্চকিত হয়ে। পরাহত হতে হয়ত তুমি জানই না। তাই তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমিও অস্ত্র, আরো রয়েছে কত কত অস্ত্র। কিন্তু অস্ত্রে ঝরে বেদনা, কিন্তু তুমি ঝরাও সুখের সৌরভ। তাই বলছিলাম, আমার মিত্র আছে বহু, কিন্তু তোমার মত কেউ নয়। আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি, অনেকদিন থেকে ক্রমাগত পাচ্ছি, কাতর হচ্ছি। অথচ কুলিয়ে উঠতে পারছিনে সাধ্যে। বারবারই পরাহত হয়ে আমি দিশেহারা হয়েছি। আজ বুঝছি, আমার সাধ্য নয়, কারো নয়, কারো নয়। নিতান্ত যদি কেউ পারেই তাহলে সে একমাত্র তুমিই।… আজ তোমার পরীক্ষা। দুর্ভিক্ষ আসে, পরীক্ষা হয় দাতার। যুদ্ধ বাধে, পরীক্ষা হয় বীরের। আপৎকাল ঘনায়, পরীক্ষা হয় মিত্রের। তেমনি অশক্তির সময় স্ত্রীর আর বিপত্তির সময় পরীক্ষা হয় সুকুলের। এমনি পরোক্ষে স্নেহের, সংকটে সত্যের। ঠিক এমনি আজ পরীক্ষা তোমার।… অবশ্য একাজ একা আমার নয়। একাজ দেবসমাজের। যদি কর, শুধু আমি নই, সুখী হবেন তাবৎ দেবতা। তাই দেবতাদের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে নিবেদন করছি। কর, তাপিত দেবসমাজকে স্নিগ্ধ কর।

মদন যেন বিগলিত হলেন। লজ্জায় যেন ঈষৎ লাল হলেন। তবু বললেন ঃ এত কেন বলছেন ? আমি ও আপনি—ভেদ নেই কোন। আপনার কাজ আমারও কাজ। বজ্রে কি কাজ ? আমি আছি, একবারটি শুধু আদেশ করুন। আপাতত রচিত হোক বজ্রের বিশ্রাম।

একটু থেমে মদন আবার বললেন ঃ যারা কাজের নয় তেমন তারাই কথায় আড়ম্বর করে। হয়ত বলবেন, মদনও কাজের নয় তেমন, নইলে সম্প্রতি কথায় তার এত উৎসাহ কেন ? তা ভাবুন। আপনি অত বললেন, কিছু যদি আমি না বলি তাহলে সেটিও তো আপনার মন্দ লাগবার কথা। তাই বলছি। দেবতা, ঋষি, দানব—কেউ কি ইন্দ্রত্ব পাবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে ? যদি হয়, বলুন। মুহূর্তে তার সে সাধ চিরতরে পূরণ করি। ত্রিভুবনে এমন কাউকেই তো দেখিনা যাকে আমি কাতর করতে না পারি। স্বয়ং দেবাদিদেব। তাঁর মনও টলে উঠে আমার ফুলের শরে।

ইন্দ্র যেন কথা কেড়ে নিলেন। মদনের পাশে রতি। ইন্দ্র উৎসাহে নেচে উঠলেন। রতির দিকে তাকিয়ে যেন তাঁকে খুশি করবার জন্যই সুন্দর করে বললেন ঃ মনে মনে যেমন ভাবছিলাম তেমনটিই তুমি বললে। ঐ জন্যই তো তোমাকে স্মরণ করেছি। তারকের দৌরাত্ম্যে সবাই ত্রাহি ত্রাহি করছি। ব্রহ্মার বরে ব্যাটা দৈত্য মহাশক্তি লাভ করে বসে আছে। কারো সাধ্য নেই তাকে বধ

করে, কোন অস্ত্র নেই তাকে বিদ্ধ করে। একমাত্র পারেন মহাদেবের পুত্র। মহাদেব পার্বতীতে উপগত হবেন, পুত্রের জন্ম হবে, তবে ত্রাণ আসতে পারে দেবতা ও ঋষিদের। কিন্তু মহাদেব এখন হিমালয়ে। কঠোর তপস্যায় তিনি মগ্ন। পার্বতী আছেন পাশে পাশে। সখীকে নিয়ে পার্বতী মহাদেবের সেবায় মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন। একাজ তোমারই সাধ্য। মহাদেবের মনে প্রেমের সঞ্চার করে পার্বতীর প্রতি তাঁকে বিচলিত করতে পারলেই জগতের মহামঙ্গল। একাজ একমাত্র তুমিই পার। কর, করে অতুল খ্যাতি লাভ কর।

যত শুনছেন ততই মদনের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। গদগদ স্বরে বললেন ঃ নিশ্চয়ই পারব। মহাদেবের হৃদয় প্রেমে অবশ করতে অবশ্যই পারব।

মদন প্রস্থান করলেন। এলেন হিমালয়ে। সঙ্গে রতি ও বসন্ত। হিমালয়ের তপঃক্ষেত্র সহসা কেঁপে উঠল, কিসের আবেগে কে জানে। পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে মুকুলে মুকুলে কি এক বেদনা দুলে দুলে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ল। হিমালয়ের রিক্ত তপঃক্ষেত্র ফুলে ফুলে ভরে উঠল। ফুলে ফুলে ভ্রমর, শাখায় শাখায় কোকিল। গুঞ্জনে ও কুহুতে বিজন পর্বতপ্রদেশ যেন জেগে উঠেছে। সেখানে রাত নামে, চন্দ্রের সুধা ঝরে, সঙ্গে মন্দ মন্দ আমোদিত বায়ু।

তপঃক্ষেত্র হিমালয়ের বুক বেদনায় টনটন করে উঠল। ধ্যানমগ্ন মুনিরা সচকিত হলেন। ভাবলেন, একি! একি!

মহাদেবও বিস্ময় মানলেন। এখন সময় নয়, কিন্তু বসন্ত এসেছে। এখন সময় নয়, কিন্তু মন উতলা হয়েছে। মহাদেব আরো দৃঢ় হয়ে বসলেন।

মহাদেবের বামে প্রচ্ছন্ন হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন কন্দর্প, সঙ্গে রতি। হাতে ফুলধনু।

পার্বতী এলেন। বনে বনে অযুত ফুল। বাতাসে বাতাসে সৌরভ। পার্বতী ফুলসাজে সেজে এলেন। সঙ্গে দুই সখী। হাতে ফুলের ভার। ওঁরা শিবের পূজা করবেন।

পার্বতীর অঙ্গে নিত্য বসন্ত। তদুপরি এই বসন্ত।

কন্দর্প ধনু আকর্ষণ করলেন। হাত থেকে তাঁর ধনু খসে পড়ল।

এদিকে পার্বতী এসেছেন। তিনি শিবকে দর্শন করলেন, প্রণাম করলেন, পূজা করলেন। শিব চোখ চেয়ে দেখলেন। চকিতে চোখ বিস্ফারিত হয়ে স্থির হল। শিব চোখ ফেরাতে পারলেন না। মনে মনে বিস্ময়ের ঢেউ উঠল। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দুলল যেন এক একটি বিস্মিত জিজ্ঞাসা ঃ একি মুখ না চন্দ্র? এ কি চোখ না পদ্ম? শিবের মনে হল, তিনি যেন পার্বতীর অধর দেখছেন না, দেখছেন পক্কবিম্ব। শিবের মনে হল, তিনি যেন পার্বতীর নাসিকা দেখছেন না, দেখছেন শুকপাখির চঞ্চু। পার্বতী কথা বললেন। শিব

শুনলেন কোকিলের গান। শিবের মনে ঘোর নামল। জগতের সমুদয় লালিত্য যেন সংহৃত হয়েছে পার্বতীর অবয়বে। শিব মুগ্ধ হলেন। চকিতে হাত বাড়ালেন। পার্বতীর আঁচল ধরি ধরি করেও শিব ধরতে পারলেন না। পার্বতী ঈষৎ সরে দাঁড়ালেন।

পার্বতী লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু চলে যেতেও তাঁর পা উঠছে না। বারবার চকিত চোখে চেয়ে চেয়ে শিবকে তিনি দেখলেন।

শিব বুঝলেন, পার্বতীর এই লজ্জা স্বাভাবিক। পার্বতীর মুখে লজ্জার রঙ, মনে রঙ অনুরাগের। শিবের মনে কামনা জাগ্রত হল। অমন রূপ, তাকে চরিতার্থ করার আবেগে শিব চঞ্চল হলেন।

শিব নিজেকে শাসন করলেন। ভাবলেন: তিনি ঈশ্বর। খুশিমত তিনি যদি এরকম কর্মে লিপ্ত হন তাহলে তো জগৎ দুদিনেই তলিয়ে যাবে তমে। শিব সংযত হয়ে দৃঢ় রূপে আসন করে বসলেন। তাঁর কপালে চিন্তা ঘনাল। কি এমন ঘটেছে যার ফলে তাঁর এই চঞ্চলতা। এদিক ওদিক সবদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। কি এমন ঘটেছে যার ফলে স্বয়ং শিবের এই স্খলন?

সহসা শিবের মুখ ক্রোধে আরক্ত হল। বাম পাশে দাঁড়িয়ে মদন। হাতে ফুলশর। শিবের তৃতীয় নয়নে বহ্নি জ্বলে উঠল। বহ্নি ছুটে গেল মদন শাসনে।

শিবনয়নের বহ্নি। মদন মুহূর্তে শাসিত হলেন। পরিণত হলেন ভস্মে। দেবগণ ছুটে এলেন। ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন—বলতে বলতে দেবতারা ছুটে এলেন।

কিন্তু কোন কিছুতেই শিব ভ্রূক্ষেপ করলেন না। শিব অন্যত্র প্রস্থান করলেন। পার্বতীও অপ্রস্তুত হয়েছেন। তিনিও প্রায় ছুটে পালিয়ে গেলেন।

রতি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান হতেই তাঁর বিলাপে বিলাপে সেই বিজন পার্বত্য প্রদেশ হতে বসন্তের বর্ণ ধীবে ধীবে ধৌত হয়ে গেল। নেমে এল শোকের ছায়া। ভ্রমর গুঞ্জন ত্যাগ করল, পাখিরা ত্যাগ করল কাকলি। নৃত্য বন্ধ কবল। বাতাসও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধ্বনিময় প্রকৃতিতে নেমে এল এক মহা নীরবতা।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। দেবতারা ব্যথিত। তাঁদের জন্যই আজ রতির এই দশা। দেবতারা বিচলিত হলেন। রতির বিলাপে দেবগণের প্রতি অনুযোগও ধ্বনিত হল। দেবতারা আরো বিচলিত হলেন।

নিরুপায় দেবমণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে রইলেন। বিলাপে বিলাপে রতি ক্লান্ত হয়েছেন। শেষমেষ নিজের অদৃষ্টকেই দুষতে থাকলেন। বললেন কর্মের ফলেই আজ তাঁর এই দুর্গতি! দেবতারা হয়ত নিতান্তই নিমিত্তমাত্র।

দেবতারা কিঞ্চিৎ স্বস্তি পেলেন। তবু তাঁরা সদলে গমন করলেন শিবের সমীপে। স্তবে স্তবে শিবকে তাঁরা তুষ্ট করলেন। বললেনঃ কন্দর্প দেবসমাজের জন্যই এই কাজ করেছেন। তারকাসুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই ইন্দ্রের পরামর্শে তাঁর এই কাজ। নতুবা কন্দর্প তেমন মন্দ নয়। তার উপর ক্রোধ করবেন না। রতির দশা দেখুন, কিঞ্চিৎ অন্তত প্রসন্ন হোন। আপনি সদয় না হলে দেবসমাজ ধুলোয় লীন হবে।

মহাদেব বললেনঃ যা হয়েছে তা আর অন্যথা হবার নয়। যতদিন না শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিচ্ছেন, রুক্মিণীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করছেন ততদিন কন্দর্প অনঙ্গ হয়েই থাকবেন। কৃষ্ণ জন্ম নেবেন, কন্দর্প অঙ্গ পাবেন, হবেন প্রদ্যুম্ন। জন্ম হবে, প্রদ্যুম্ন অপহৃত হবেন। শম্বরাসুর তাঁকে অপহরণ করবে, নিয়ে রাখবে সমুদ্রের মধ্যে এক নগরে। সেখানেই রতির সঙ্গে হবে কন্দর্পের মিলন। ক্রমে শম্বরকে নিহত করে ওঁরা ফিরে আসবেন দ্বারকায়।

দেবতারা রতিকে এসে বললেনঃ উপায় নেই কোন। তবে উনি বলেছেন, অপেক্ষা কর। আমরাও তাই বলছি, অপেক্ষা কর। কৃষ্ণ জন্ম নেবেন, শম্বর হরণ করবে, তোমার সঙ্গে কন্দর্প মিলিত হবেন।

দেবতাদের সন্তাপ গেল না। পথ করতে না পেবে সন্তাপিত হতে হতে ওঁরা হাহাকার করতে লাগলেন॥

৬. পার্বতীর তপস্যা

পার্বতী গৃহে ফিরে এসেছেন। এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। একটু ধীরস্থির হতেই উপসর্গ জুটল নতুন।

মহাদেবের লুব্ধ দুটি চোখ, লুব্ধ দুখানি হাত পার্বতীর তাবৎ শান্তি হরণ করল। শয়নে স্বপনে পানে ভোজনে একই দৃশ্য বারবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

দেহে রূপ আছে, মহাদেবের চোখেও ঘোর নেমেছিল, চিত্তে জেগেছিল তরঙ্গ। পার্বতী লজ্জায় ক্রমেই যেন এতটুকুটি হয়ে যেতে লাগলেন। রূপই হল তাঁর শত্রু। অমন পোড়ারূপ না থাকলেই যেন ছিল ভাল। মনে মনে ক্রমেই যেন ছড়িয়ে পড়ল কিসের দহন। পার্বতী অন্যমনা হতে চাইলেন, সব ভুলতে চাইলেন, অহরহ বলতে লাগলেন 'শিব শিব'।

এই সময়েই নারদ এলেন হিমালয়ের গৃহে। নারদ আপ্যায়িত হলেন। উনি আরামে সবে বসেছেন, পার্বতী সুধালেনঃ মহাদেবকে পাওয়া যায় কি প্রকারে?

নারদ বললেন ঃ তপস্যা। ও ছাড়া অন্য কোন উপায়েই তাঁকে পাওয়া সম্ভব নয়।

নারদ আর বসলেন না। বসতে বসতেই যেন তিনি উঠে পড়লেন। হরির নাম গাইতে গাইতে তিনি প্রস্থান করলেন।

পার্বতী মনে মনে ঠিক করলেন, তপস্যা করবেন। নারদ বলেছেন। নারদের কথা তাঁর মনে ধরেছে।

পার্বতী তপস্যা করবেন। পিতার অনুমতি চাই। মাতার অনুমতি চাই। তপস্যা, শিবের জন্য তপস্যা। পিতার কাছে বা মাতার কাছে মুখ ফুটে অনুমতি চাওয়া কন্যার পক্ষে কঠিন। লজ্জা এসে আগলে দাঁড়ায় পথ।

পার্বতী তপস্যা করবেন। সখীদ্বয়কে বললেন ঃ আমার হয়ে তোমরা সুধাও।

সখীদ্বয় হিমালয়কে বললেন ঃ আপনার কন্যা শিবকে পেতে চান। কিন্তু শিবকে পেতে হলে যেতে হবে তপস্যার পথে। শিবকে পেলে সফল হবে আপনার কন্যার জীবন ও যৌবন। ধন্য হবে আপনার কুল। কিন্তু সবই নির্ভর করছে আপনার অনুমতির উপর।

হিমালয় বললেন ঃ ভাল কাজ। অতএব আমার মনোমত। কিন্তু মেনকাকে কি মত করাতে পারবে ?

সখীদ্বয় মেনকাকে গিয়ে সব খুলে বললেন। বললেন ঃ হিমালয় সম্মত। আপনি সম্মতি দিলেই আমাদেব সখী তপস্যায় বসতে পারেন।

মেনকা খুশি হলেন না। প্রাণপ্রিয় কন্যা। দুলালী। সে করবে তপস্যা ! মেনকা দুঃখে বিহ্বল হলেন। পার্বতীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন ঃ পূর্বজন্মে তপ করেছিলে বলেই তো এমন ঘরে জন্মেছ। এখানে সব দেবতাই বিরাজ করেন, এখানেই অবস্থিত সর্বতীর্থ। তোমার অভাবও নেই কোন। তবু তুমি তপস্যার কথা ভাবছ। কিন্তু কেন ? কোথায়ই বা যাবে ? যদি করতেই হয়, এখানে থেকেই কর। ওতেই সিদ্ধ হবে। শিবের কাছে তো গিয়েই ছিলে। কিন্তু কিছু কি পেয়েছ ? তপস্যা করলে বেশি কিছু যে পাবেই এমন আশা কর না। তাছাড়া তপস্যা সহজ নয়। তোমার শরীরে ওসব সইবে না। শরীর পাত করে তপস্যায় কাজ নেই। এখানে থাক, এখানে থেকে যা সম্ভব তা-ই কর।

পার্বতী মাতার অনুমতি পেলেন না। তিনি গৃহেই রইলেন। কিন্তু পার্বতীর অঙ্গ দুঃখে দুঃখে ক্রমেই যেন কালি হতে লাগল। শিবের চিন্তা, শিবের আরাধনা নিয়েই তিনি ডুবে রইলেন। ও ছাড়া যেন তাঁর সুখ নেই একতিলও।

মেনকা কন্যার বেদনা বুঝলেন। অনুমতি দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ

তিনি খুঁজে পেলেন না।

পার্বতী পিতা ও মাতাকে প্রণাম করে প্রস্থান করলেন। সঙ্গে রইলেন দুই সখী। সোনার শরীরে কত আভরণ, সোনার শরীরে দিব্য বস্ত্র। আভরণ গেল, বস্ত্র গেল। পার্বতী অঙ্গ থেকে ওসব ভার নামিয়ে যেন লঘু হলেন। বল্কলের ভাগ্য, মৌঞ্জী মেখলার ভাগ্য, মৃগচর্মের ভাগ্য—পার্বতীর অঙ্গে উঠে ওরা সুষমা পেল নব নব।

পার্বত্য পথে অনন্ত সুষমা বিস্তার করতে করতে পার্বতী চললেন গৌরী-শিখরের পথে। সেখানেই তিনি তপস্যা করবেন। গৌরীশিখরের ফলাঢ্য সুন্দর বৃক্ষগুলির জন্ম ও জীবন সার্থক হল। পার্বতী এসেছেন। এদিক ওদিক গুছিয়ে বেদিকা নির্মাণ করে পার্বতী তপস্যায় বসলেন। জ্বলন্ত পাবকশিখা প্রশান্ত হল। তাবৎ চঞ্চলতা লোপ পেল। ধীর স্থির অচঞ্চল স্নিগ্ধ একটি আগুনের শিখা গৌরীশিখরের পার্বত্যভূমিকে উদ্ভাসিত করে অতন্দ্র হয়ে জেগে রইল।

গ্রীষ্মের দুরন্ত তাপে সমগ্র জীবজগৎ আকুল। সেই সময় পার্বতী বসে আছেন প্রজ্বলিত অগ্নিতে বেষ্টিত হয়ে। তাকিয়ে আছেন বিশ্বের তাবৎ তাপের উৎসের দিকে। গ্রীষ্ম যায়। বর্ষা আসে। তপস্বিনী বাস করেন সিক্ত মৃত্তিকার উপর। শীত আসে। তপস্বিনী হিমশীতল জলে রচনা করেন আসন। দুশ্চর তপে ক্লিষ্ট হতে হতেও পার্বতী ক্লেশ মানলেন না। সব শিবে সঁপে তিনি তখন উত্তীর্ণ হয়েছেন সর্বক্লেশের ঊর্ধ্বে।

তপের ফাঁকে ফাঁকেই তিনি কয়েকটি বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। নিত্য জলসেচে সেগুলি বড় হয়ে উঠছিল। পার্বতী তপস্যায় মগ্ন। অতিথি আসত। কিন্তু কখনো ফিরত না। অতিথিসেবায় শিবচিন্তায় পার্বতীর দিন কাটত।

ক্রমে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল ওঁর তপস্যার কথা। বড় বড় ঋষি এলেন দূর থেকে। দেখলেন। বললেন, হ্যাঁ একেই বলে তপস্যা। তপস্যার মত তপস্যা। আমরাও তপস্যা করি, কিন্তু এ তপের কাছে সে তপ তপই নয়। হিংস্র জন্তুজানোয়ারও এখানে হিংসা ছেড়ে পরম প্রীতিভরে বাস করছে। বৃক্ষে বৃক্ষে পরিপক্ক ফল। এদিকে ওদিকে ভারে ভারে ফুল। এতো গৌরী-শিখর নয়, কৈলাস।

দেবতারাও এলেন। দেখলেন। বললেনঃ হ্যাঁ তপস্যাই বটে। ওঁরা গেলেন শিবের সমীপে। আগে আগে গেলেন নারদ। তারপর গেলেন দেবগণ। ওঁরা স্তব করে নিবেদন করলেন পার্বতীর কথা। বললেনঃ এমন তপস্যা কেউ কোনদিন দেখেনি, কেউ কোনদিন করতেও পারবে না। অথচ তপস্যার তেজে লোকসমূহ সন্তাপিত হচ্ছে। এখনো যদি আপনি সদয় না হন তাহলে হয়ত সব যায়।

মহাদেব বললেন ঃ তোমরাও তপস্যা কর, কিন্তু আমাকে দেখতে পর্যন্ত পাও না। অথচ হিমালয়ের কন্যা তপস্যার প্রভাবে আমাকে কিনে নিয়েছেন। আমি ওঁর ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছি। অতএব আর চিন্তা কেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। সুখে নিদ্রা যাও।

শিব এবার আসন ছেড়ে উঠলেন। যেতে হয়। ফল দিতে হয় তপস্যার।

শিব পার্বতীর তপোবনের দিকে পা বাড়ালেন। শিব এলেন, কিন্তু শিববেশে নয়।

জটিল বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণের বেশে শিব পার্বতীর তপোবনে প্রবেশ করলেন।

পার্বতী বৃদ্ধকে স্বাগত জানালেন। ফুলে ফলে নানাভাবে জরাগ্রস্ত সেই ব্রাহ্মণকে তিনি আপ্যায়ন করলেন। ব্রাহ্মণের শরীরে জবার ভার। জেগে থাকা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন। চোখের পাতায় সর্বক্ষণ জড়ানো নিদ্রার আবেশ।

কিন্তু তিনি অতিথি। পার্বতী শত আপ্যায়নে তাঁকে তুষ্ট করলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে জানতে চাইলেন তাঁর পরিচয়।

মহাদেব ছল করে নিজের পরিচয় দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ জায়গাটি কেমন ? জলটল ফলটল ঠিকমত মেলে তো ? তপস্যা করছ। কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে করছ তো ?

পার্বতী কিছু বললেন না। বৃদ্ধ আবার বললেন ঃ যাহোক এই কাঁচা বয়সেই যে দারুণ তপস্যা করেছ তা বুঝতে পারছি। আমাকে যা যত্ন করেছ তাতেই বুঝতে পারছি তোমার তপ অসামান্য। মৈত্রী স্থাপন করতে যদি হয় তাহলে তোমার সঙ্গে করাই যুক্তিযুক্ত।

শিব একটু থামলেন। পার্বতী নিরুত্তরই রইলেন। শিব বললেন ঃ তোমার সঙ্গে আমার মৈত্রী। তাই জিজ্ঞাসা করছি। এত যে তপস্যা করছ কি বর তোমার কাম্য ? যদি মনোমত পতির জন্য হয় তাহলে তপস্যায় ক্ষান্ত দেওয়াই ভাল। কারণ রত্ন কখনো গ্রহীতার কামনা করে না। গ্রহীতাই রত্ন খুঁজে নেয়। তবু তপ করছ, যাহোক কি এমন কারণ ? জানতে বড় সাধ যায়। বল, শুনি, শ্রবণ সার্থক করি।

পার্বতী নিজ মুখে কিছু বললেন না। সখীকে ইঙ্গিত করলেন। সখী বললেন ঃ যাঁর জন্য আমার সখীর তপ তিনি ইন্দ্রটিন্দ্র নন, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। মহাদেবকে তিনি পতিরূপে পেতে চান। তপস্যার শুরুতে এই সব বৃক্ষ উনি রোপণ করেছিলেন। দেখুন সে বৃক্ষ এখন ফলভারে অবনত। অথচ আমার সখীর মনোরথ এখনো অপূর্ণই রয়ে গেছে। রূপে তো তাঁকে ভোলানো যায় না, চাই তপ। নারদ বলেছিলেন, তপস্যা কর। তপস্যাবিনা শিব মেলে না। তাই আমাদের সখী প্রাণপাত করে তপ করে যাচ্ছেন।

ব্রাহ্মণ পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ যা শুনছি এ কি সত্য না পরিহাস ? নিজের মুখেই না হয় বললে।

পার্বতী বললেন ঃ সত্য। মনে মনে তাঁকেই আমি পতি বলে মেনেছি। তবে জানি যে সহজে তাঁকে পাওয়া যায় না। তপস্যায় তাঁকে পাওয়া যায়। তাই তপস্যা করছি।

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ আর কেন, এবার আমি চলি। ভেবেছিলাম কিনা কি কামনা করে তপ করছ, সেটি শুনব, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে চলে যাব। কিন্তু যা শুনছি তাতে আমার চলে যাওয়াই ভাল। তোমার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলাম। তাতেও আর কাজ নেই। চলি।

পার্বতী বললেন ঃ কেন যাচ্ছেন ? কি এমন হয়েছে ?

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ তপস্যা দেখে তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা হয়েছিল। কাম্যবস্তুর কথা শুনে শ্রদ্ধা রক্ষা করাই এখন দায় হয়ে উঠেছে। কেউ যদি সোনা ফেলে কাচ নিতে চায়, চন্দন ফেলে গায়ে কাদা লেপে বা হাতি ছেড়ে ষাঁড়ে চড়ে তাহলে তাকে কি শ্রদ্ধা করা যায় ? গঙ্গার জল ফেলে কূয়োর জলে যদি তোমার রুচি হয়, সূর্যের জ্যোতি থেকে জোনাকির আলোই যদি তোমার ভাল বলে মনে হয়, রেশমের জায়গায় যদি চামড়ার কাপড় পরতেই তোমার বেশি ভাল লাগে তো লাগুক। আমি কি করতে পারি বল। শ্রদ্ধা তো জোর করে আনার জিনিস নয়। ঘর ছেড়ে বনেই যে থাকতে চায়, দেবতাদের ছেড়ে অসুরদেরই যার ভাল লাগে, তাকে আর যাই হোক শ্রদ্ধা করা চলে না। তবে তোমার ভাল লাগে, তুমি অবশ্যই করবে। আমার লাগে না, আমি তাই চলছি। হায় হায় ! কোথায় তোমার ঐ পদ্মপলাশের মত চোখ, আর কোথায় ঐ তিন চোখ ! তোমার চাঁদের মত মুখ, শিবের পাঁচমুখ। তোমার মাথায় কি সুন্দর ও কমনীয় চুলের রাশি আর শিবের মাথায় জটার ভার। তোমার অঙ্গে চন্দন, ওঁর ভস্ম। তোমার পরণে দিব্যবস্ত্র, ওঁর পরণে অশুভ পশুচর্ম। তোমার অঙ্গে কত কত আভরণ আর ওঁর অঙ্গে রাশি রাশি সর্প। দেবতারা তোমার আত্মীয়, ওঁর প্রিয় ভূতগণ। তোমার পিতার গৃহে মৃদঙ্গের মিষ্টি বোল, আর শিবের ডমরু। তোমার দুন্দুভি, শিবের শিঙা। তোমাদের পটহ, শিবের গালবাদ্য। এত দেখেও কি বলব তোমার ও শিবের মিলন যুক্তিযুক্ত ? শিবের না আছে জাতজন্মের ঠিক, না আছে পয়সাকড়ি। ষাঁড়ে চড়ে শ্মশানে-মশানে দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কণ্ঠে বিষ, সঙ্গীসাথী সব পিশাচ। আচার নেই বিচার নেই, জ্ঞান নেই গম্যি নেই এমন যে শিব তার সঙ্গে মনের যোগ ক'র না। ঠকবে। পস্তাবে। শিবের সঙ্গে তোমার কোন মিলই নেই। যতরাজ্যের অসৎ তার প্রতিই ও ব্যাটার আসক্তি। অতএব শিবশিব কর না। ওকে ছাড়, নয় আমার সামনে থেকে চলে যাও।

পার্বতী আর মৌন থাকতে পারলেন না। শিবের নিন্দায় তিনি ক্রমেই ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। এবার বলে বসলেন ঃ ভেবেছিলাম অন্য কারো সম্বন্ধে বলছ, কিন্তু দেখছি বলছ শিবের সম্বন্ধে। আসলে শিবের কথা তুমি কিছুই জাননা। তাই পাগলের মত উলটোপালটা সব বলছ। শিব নির্গুণ। কখনোসখনো সগুণ হন। যিনি সগুণ এবং নির্গুণ দুইই তাঁর আবার জাত কি? সর্ব-বিদ্যার আধার তিনি। বিষ্ণুকে উনিই বেদ দান করেছিলেন। তিনিই আদি, তিনিই পরম। তাঁর আবার বয়স কি? শিবের দর্শন পাবার জন্য দেবরাজের নিত্য আকুলতা। তিনি যান। শিবের দ্বারপালের দণ্ডের আঘাতে খণ্ডবিখণ্ড হয় তাঁর মুকুট। শিব ভূত পিশাচে পরিবৃত। শিবের দ্বারপালও নিশ্চয় কেউ না কেউ একজন ভূত বা পিশাচ। শিবের সেবায় সব অভাবই ঘোচে। তিনি যদি নিঃস্বই হবেন তাহলে এত ঐশ্বর্য আসে কোত্থেকে? অষ্টসিদ্ধি যে তাঁর সম্মুখে লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিত্য নৃত্য করে। অথচ তোমার মুখে শুনছি যতসব সৃষ্টিছাড়া কথা। তিনি নাকি অশুভ বস্তুর সেবা করেন। অথচ তাঁর নামেই সংসারে নামে মঙ্গল। তিনি ভস্মভূষণ। তুমি বলছ ভস্ম পবিত্র নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই, শিবের নৃত্য শেষ হলে মাটিতে-ঝরে-পড়া ভস্ম কুড়িয়ে দেবতারা মাথায় মাখেন। ওতেই নাকি ওঁরা পবিত্র হন। শিবকে জানতে কি যে-কেউ পারে? বিশেষ করে দুরাত্মারা তো নয়ই। যারা শিবের নিন্দা করে তাদের আজন্ম সঞ্চিত পুণ্য মুহূর্তে বিনষ্ট হয়। আমার দুর্ভাগ্য এতক্ষণ ধরে একজন দুরাত্মার মুখ থেকে শিবনিন্দা শুনতে হল। এবার সম্যক প্রায়শ্চিত্ত করে আমাকে শুচি হতে হবে।

পার্বতী আর বলতে পারলেন না। সখীকে ইঙ্গিতে বললেন ঃ চলে যেতে বল, ওকে চলে যেতে বল, নইলে পরিপাটি করে আবার শিবের নিন্দা শোনাতে বসবে। কিংবা চল আমরাই চলে যাই। চলে যাই অন্য কোথাও।

পার্বতী যেতে উদ্যত হলেন। সহসা সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ খসে পড়ল। প্রকটিত হলেন দেবাদিদেব মহাদেব।

পার্বতী বিস্ময়ে দেখলেন ঃ সেই মূর্তি, পরিচিত পরম প্রিয় সেই মূর্তি যে মূর্তির ধ্যানেই এতদিন তিনি মগ্ন ছিলেন।

পার্বতীর ঘোর কাটল। তিনি লজ্জায় মুখ নামিয়ে রইলেন।

শিব বললেন ঃ কোথায় যাবে? আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে? যেখানেই যাও, আমিও যাব, সঙ্গে সঙ্গে ফিরব। তপস্যা করেছ, প্রসন্ন হয়েছি। এবার বর দেব। প্রার্থনা কর। প্রার্থনা কর। তোমাকে দেওয়া যায় না এমন কিছুই আর আমার নেই। অতএব প্রার্থনা কর। আর লজ্জা কেন? আমি তোমার ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছি। এস, গৃহে গমন করি। তোমাকে ছেড়ে একটি ক্ষণও এখন আমার কাছে একযুগ বলে মনে হচ্ছে'

এতদিনের শ্রান্তি, এতদিনের দুঃখ সব যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। পরম শান্তিতে পার্বতীর সর্বাঙ্গে যেন কেমন শিথিলতার স্রোত বয়ে গেল।

নিজের মুখে পার্বতী কিছু বলতে পারলেন না। লজ্জায় আনন্দে তাঁর কণ্ঠ অদ্য রুদ্ধ। সখীকে ইশারা করতে সখী বললেনঃ আপনি প্রসন্ন হয়েছেন। কৃপা করবেন বলে এসেছেন। আজ আমি ধন্য। আপনি বলছেন সঙ্গে যেতে এবং এখনই। অথচ ওটি প্রচলিত রীতি নয়। আপাতত অনুমতি করুন, আমি পিতৃ গৃহে যাই। পিতার কাছে আপনি প্রস্তাব করুন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আমাদের বিবাহ নিষ্পন্ন হোক।

শিব সম্মত হলেন।

মুহূর্তের মধ্যে সেই পরমপুরুষ অন্তর্হিত হলেন। পার্বতীও পা বাড়ালেন। তাঁর মনে পড়ল পিতার কথা। তাঁর মনে পড়ল মাতার কথা। কতদিন ছেড়ে আছেন। কতদিন হল চোখের দেখাও একবার হয়নি। পার্বতীর শরীরে অবসন্নতা এসেছিল। সে অবসন্নতা অপসৃত হল। ব্যাকুল দুখানি চরণে সঞ্চারিত হল মনোরথের বেগ।

৭· শিবের বিবাহ

পার্বতী এসেছেন। হিমালয়ের গৃহে আলোর বন্যা বয়ে গেল।

কতদিন। কত যুগ। পার্বতী এসেছেন যেন কতশত বছর পরে। ঘর আঁধার হয়েছিল। মন আঁধার হয়েছিল। আজ ঘরে আলো, মনে আলো, মনে মনে আলো।

পিতা এলেন। মাতা এলেন। আরো এলেন কতকত আত্মীয়, কতকত পরিজন। আদরের দুলালী ফিরেছে। ফিরেছে সবকিছু উজ্জ্বল করে। পার্বতীকে ওঁরা বুকে জড়িয়ে ধরে কত প্রকারে আদর করলেন। এতদিনের বিরহ। পুঞ্জে পুঞ্জে করে জমেছে অযুত আবেগ। সব আবেগ যেন এক মুহূর্তের আলিঙ্গনে ওঁরা উজাড় করে দিতে চাইলেন।

চন্দনে চর্চিত হল। পুষ্পে শোভিত হল। পার্বতীর তপঃক্লিষ্ট নিরাভরণ শরীরে ফুলের সাজ, চন্দনের সাজ। স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ওঁদের নয়নে নেমে এল শান্তি।

হিমালয় উচ্ছ্বাসে আবেগে ধন্য ধন্য করলেন। বারবার বললেনঃ আমার জন্ম সফল। আমার জীবন ধন্য। কুপুত্র থেকে এমন কন্যা শতগুণে ভাল। আহা, পার্বতী আমার কন্যার মত কন্যা।

ওদিকে কাশীতে এসে শিবের মন উতলা হয়ে উঠল। মন দিয়েছেন,

অথচ যাকে দিয়েছেন সে-ই নেই পাশে। শিব আকুল হলেন। আর দেরি নয়, দেরি নয়।

শিব সপ্তর্ষিদের ডেকে পাঠালেন। সপ্তর্ষিরা সচকিত হয়ে ছুটে এলেন। শিব ডেকেছেন। একি স্বপ্ন! একি ভ্রম! বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সপ্তর্ষি এসে শিবসমীপে উপনীত হলেন। ওঁদের পরিধানে সুবর্ণ বল্কল, অঙ্গে বিচিত্র মুক্তাফল ও অন্য অন্য নানা ভূষণ। সঙ্গে সিদ্ধিস্বরূপা অরুন্ধতী। শিব দেখলেন : সম্মুখে সপ্তসূর্য।

সপ্তর্ষিরা শিবকে নমস্কার করলেন। ওঁদের নয়নে অবিশ্বাস। সত্যই কি তাঁরা দাঁড়িয়ে শিবের সম্মুখে? সত্যই কি তাঁদের সম্মুখে প্রকটিত হয়েছেন শিব? হয়ত সত্য। হয়ত উনি আছেন—এইটেই প্রমাণ করার জন্য উনি দেখা দিয়েছেন। নতুবা কোথায় সেই দেবাদিদেব মহাদেব, আর কোথায় তাঁরা, সামান্য ঋষি।

সপ্তর্ষিরা শিবকে নমস্কার করলেন। নয়নে বিস্ময়ের ঘোর, মনে আনন্দ, সংশয়, বেদনা। ওঁরা শিবের স্তব করলেন। বললেন : এ যে কি ভাগ্য এ যে কি আনন্দ আমরা ব্যক্ত করতে পারছিনে। এ এক অবর্ণনীয় মহালগ্ন। হয়ত আমাদের তপস্যার ফল। পূর্বে বারবার আমরা তিন প্রকার তপস্যা করেছি। বেদ অধ্যয়ন করেছি, অগ্নিতে আহুতি দিয়েছি, যজ্ঞ করেছি বহুতর। পর্ব-দিবসে দান করেছি, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেছি। সমস্ত পুণ্য একত্র হয়েছে, একত্রে ফলদানে বুঝিবা অদ্য বিধি অকৃপণ। নইলে আপনি স্মরণ করবেন কেন?

অদ্য আমরা আপনার দর্শন পেলাম। জন্মান্ধ, অন্ধকার দূর হল, আলোয় আলোয় ভরল তার ভুবন। এ যেন তাই। মূক, অথচ সহসা অবরুদ্ধ কণ্ঠপথে আজ যেন উচ্চারিত হচ্ছে শত শত নিপুণ বাক্য। পঙ্গু, কার বরে কে জানে লঙ্ঘন করে বসল গিরি। বন্ধ্যা, কার বরে কে জানে পুত্রে পুত্রে ভরল তার ঘর। এ যেন তাই। আমরা সামান্য জীব, কিন্তু সম্মুখে প্রমূর্ত দেবাদিদেব মহাদেব। আপনার অনুগ্রহের সীমা নেই। কিঞ্চিৎ প্রকাশ করেছেন। আমরা ত্রিভুবনে মান্য হলাম, বরেণ্য হলাম। এবার আদেশ করুন।

মহাদেবের মনে লজ্জা এসেছিল। কিন্তু সে লজ্জা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। উনি বললেন : ঋষিরা সর্বদাই পূজ্য। তাই স্মরণ করেছি। আমি আমার নই, পরের। পরের জন্যই আমি। তোমাদের যে স্মরণ করেছি সেও পরের জন্য। আমার আটপ্রকার মূর্তি, তিন প্রকারও। সব মূর্তিই পরের জন্য। সম্প্রতি আমি বিবাহ করবার ইচ্ছা করেছি। শুধু ইচ্ছাই নয়, ঠিকও করে ফেলেছি। পার্বতী তপ করেছিলেন, বর চেয়েছিলেন, আমি দিয়েছি। সে বর বিবাহের। দেবতারা তারকাসুরের তাড়নায় অবিরত ব্যতিব্যস্ত। দেবতাদের

মঙ্গলের জন্যই আমার এই বিবাহ। তোমরা যাও, হিমালয়ের গৃহে গিয়ে তাঁকে আমার অভিলাষের কথা জ্ঞাপন কর। তাঁর পুত্রীকে প্রার্থনা কর। হিমালয়কে বলবে, মেনকাকেও বলবে। বুঝিয়ে বললে ওঁরা বুঝবেন। তোমরা বললে ওঁরা শুনবেন।

কি কৃপা! কি কৃপা! সপ্তর্ষির হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হল। ব্রহ্মাবিষ্ণুও যাঁর আরাধনা করে কূল পান না সেই দেবাদিদেব অবশেষে কৃপা করেছেন। ওঁরা আকাশপথে যাত্রা করলেন।

হিমালয়ের রাজধানী। সপ্তর্ষির নগরদর্শন হল। নগর, নগরের মত নগর। অলকা, অমরাবতী, ভোগবতী। ওঁরা জানেন শোভার সার ওখানে। কিন্তু তাঁরা একি দেখছেন! তাবৎ স্বর্গশোভাও এখানে ম্লান।

শিবের কৃপায় সপ্তর্ষির মন ভরপুর। হিমালয়নগরের শোভা সন্দর্শনে ওঁদের মনে ডেকে গেল থৈ থৈ বান।

গৃহের পর গৃহ। স্ফটিকে মণিমাণিক্যে সুরম্য গৃহ: স্ফটিকের গৃহ, এখানে সূর্যকান্তমণি, ওখানে চন্দ্রকান্ত। এখানে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ, ওখানেও তাই। স্বর্গে জন্মে, অথচ এখানে এই হিমালয়ে সেই সব বৃক্ষ অযুত সৌন্দর্য ছড়িয়ে নিয়ত রৌদ্রস্নান করছে। গৃহে গৃহে তোরণের সজ্জা। বিতানে বিতানে বস্ত্র পল্লব ও তোরণের সমারোহ। উদ্যান, উদ্যানের মধ্যে দীঘি, দীঘির বুকে হংস। গাছে গাছে কত কত ফুল, কত কত পাখি, গান। নর, কিন্তু নর নয়—দেবতা। স্ত্রী, কিন্তু স্ত্রী নয়—দেবী। এ এক নতুন স্বর্গ, স্বর্গের থেকে রম্য আর এক স্বর্গ। যারা স্বর্গ কামনা করে তারা হিমালযের এই নগর দেখেনি। দেখলে স্বর্গ তাদের কাম্য হত না।

হিমালয়ের গৃহের দিকে এগিয়ে আসছেন সপ্তর্ষি। হিমালয় মেনকাকে বললেন: দেখ দেখ, এই দিকেই আসছেন, এ যে সাতটি সূর্য!

সপ্তর্ষি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এলেন। হিমালয় এগিযে গেলেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। সপ্তর্ষি হিমালয়ের হাতে ধরে তুললেন। বললেন: ধন্য, ধন্য।

হিমালয় বললেন: কি ভাগ্য, আমার কি ভাগ্য। আসুন, আমাব গৃহকে তীর্থে পরিণত করুন।

সপ্তর্ষি আসন গ্রহণ করলেন। হিমালয় ওঁদের অনুমতি নিলেন। বসলেন।

হিমালয়ের উচ্ছ্বাস তখনও কমেনি। উনি বলেই চললেন: আপনারা বিষ্ণুস্বরূপ। সেই আপনারা এসেছেন। এসেছেন এই দীনাতিদীনের কুটিরে। এবার আদেশ করুন। মহতের আদেশ পালন করে আমিও মান্য হয়ে উঠি।

সপ্তর্ষি গদগদ হয়েই ছিলেন। আরো গদগদ হলেন। মনে মনে মহাদেবকে

ওঁরা স্মরণ করলেন। বললেনঃ সত্যিই তুমি ধন্য। কত যে ভাগ্য করেছ তার আর কি বলব।

হিমালয় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

সপ্তর্ষি বললেনঃ স্বয়ং দেবাদিদেব তোমার কন্যাকে প্রার্থনা করেছেন। জগতের হিতের জন্য তিনি বিবাহ করবেন। তাই পার্বতীকে তাঁর চাই। তিনি জগতের ঈশ্বর। তুমি হবে সেই তাঁরও গুরু।

হিমালয় যেন পাথরে পরিণত হয়েছেন। কয়েকটি মুহূর্ত। তাঁর চিন্তাশক্তি লোপ পেল। স্নায়ুর মধ্য দিয়ে শীতলতার একটি প্রবাহ ধীরে ধীরে উপরে উঠতে উঠতে তাঁর মস্তিষ্কে এসে পেঁছিল। হিমালয়ের মস্তিষ্ক অবশ হয়েছে। বড় বড় করে তিনি তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে চোখে প্রাণ এল। কথারা ভেসে উঠল। হিমালয় ভাবলেনঃ নির্ঘাৎ স্বপ্ন। কিন্তু দেখলেন, স্বপ্ন নয়—সত্য। হর্ষে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ওঁর ভেঙ্গে পড়তে ইচ্ছে হল। অন্তরাত্মা চীৎকার করে উঠলঃ স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়, সত্য। কন্যা হবে জগতের ঈশ্বরী!

হিমালয় সংযত হলেন। ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। পার্বতীকে সাজালেন। ধীরে ধীরে এনে ঋষিদের কোলে বসালেন। বললেনঃ অদ্য একে আমি ভিক্ষা দেব।

ঋষিরা বললেনঃ আমরা ভিক্ষুক, তুমি দাতা, পার্বতী ভিক্ষার বস্তু। এর থেকে ভাল কল্পনা আর কি হতে পারে? আজ বুঝছি তোমার মনও তোমার শিখরের মতই সমুন্নত।

ঋষিরা পার্বতীর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেনঃ কল্যাণ হোক। ঋষিরা পার্বতীকে আশীর্বাদ করলেনঃ শিবকে সুখী কর।

হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ কলায় কলায় তোমার সমৃদ্ধি হোক।

হিমালয় ফলযুক্ত ফুল ওঁদের হাতে দিলেন। ওঁরাও দিলেন হিমালয়ের হাতে।

মেনকার চোখে জল। অরুন্ধতী বললেনঃ তোমার কন্যার গুণের শেষ নেই। মহাদেবের মন হরণ করেছে সে! আহা এই না হলে কন্যা!

অরুন্ধতী হরিদ্রা ও কুঙ্কুম দিয়ে মুছিয়ে দিলেন মেনকার চোখের জল।

স্থির হল চতুর্থ দিনই প্রশস্ত। ঐ দিনেই আছে ভাল লগ্ন।

একদিকে হিমালয় মেনকা, অন্যদিকে সাত ঋষি অরুন্ধতী। হাস্য পরিহাসে রচিত হল উদ্বেলিত একটি প্রহর।

সপ্তর্ষি এলেন মহাকাশীতে। শিব খবর পেয়ে খুশি হলেন। বললেনঃ এখন যাও। বিবাহের দিন এসো। পৌরোহিত্য কিন্তু তোমাদেরই করতে হবে।

বিবাহ। উদ্যোগ করতে হয়, অয়োজন করতে হয়। শিব এলেন কৈলাসে। এসেই স্মরণ করলেন নারদকে। নারদ এলেন। সব শুনলেন। শিব বারবার বললেন ঃ আমি তার তপস্যায় বশীভূত হয়েছি।

নারদ বললেন ঃ ভক্তের বশীভূত হওয়াই তো আপনার ব্রত। পার্বতীকে বর দিয়ে আপনি ব্রত পালন করেছেন মাত্র। এবার আমার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হোন। আমি পারি, এমন কিছু আদেশ করুন।

মহাদেব বললেন ঃ খুব মনে করিয়ে দিয়েছ। দেবসমাজকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। ও ভার তোমার। সবাইকে বলবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঋষি, যক্ষগন্ধর্ব কাউকে বাদ দেবে না। যাঁরা আসবেন না, বুঝব তাঁরা আমার আত্মীয় নন।

কটি মাত্র দিন। দেখতে দেখতেই কেটে গেল।

কৈলাস পর্বত মুখরিত। দেবতারা তখনও এসে পৌঁছোননি। তবে তাঁদের দ্রব্যসম্ভার এসে পৌঁছেছে। শিবের বিবাহ। তাঁর প্রীত্যর্থে দেবসমাজ বহু উপকরণ পাঠিয়েছেন।

তাবৎ গন্ধর্ব ও অপ্সরা এসে গেছেন। নৃত্য। গীত। বাদ্য। শিবের পুরী মুখরিত। শিবের আনন্দকে আরো ঘনীভূত করতে ওঁরা যেন বদ্ধপরিকর।

শিব পরিপূর্ণ, তাঁর বেশভূষা স্বতঃসিদ্ধ। ও সবের দরকার নেই কোন। তবু অদ্য তাঁর বিবাহ। তিনি খুশি। সবাই খুশি। নিজের নিজের খুশি জানিয়ে ওঁকে খুশি করতে সবাই তৎপর। তাই সাজ চাই, শিবের সাজ চাই।

শিবকে সাজানো হচ্ছে। সাতজন মাতৃদেবতা শিবকে সাজিয়ে দিচ্ছেন।

চন্দ্র স্থাপিত হল শিবের শিরে। ললাটে তৃতীয় নয়ন, কিন্তু অদ্য হল তিলক। শিবের কানে আভরণ। যে আভরণ ছিল তাই রইল, হল সুন্দরতর। অঙ্গের ভস্ম হল চন্দন, পরণের চর্ম হল দুকূল, সর্প হল রত্নময় অলংকার। সুন্দর শিব সাজের বাহারে আরও সুন্দর হয়ে উঠলেন। গণেরা ঘটা করে নানা বাদ্য নিয়ে মেতে উঠল।

দেবতারা এসে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা এলেন। তাঁকে ঘিরে ঋষিরাও এসেছেন। হাঁসের পিঠ থেকে নেমে ব্রহ্মা এগিয়ে গেলেন। প্রবল আভিজাত্য প্রকটিত করে তিনি এগিয়ে গেলেন। ব্রহ্মা শিবকে প্রণাম করলেন। পরপরই এলেন বিষ্ণু। গরুড়ে চেপে ভক্তপরিবৃত হয়ে বিষ্ণু এসে শিবকে প্রণাম করলেন। ধীরে ধীরে ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ—এঁরাও এসে পড়লেন। সবার সঙ্গেই প্রচুর দ্রব্যসম্ভার। বসু, সূর্য, বড় বড় সব ঋষি, গঙ্গা প্রভৃতি নদী, তাবৎ সমুদ্র—সবাই ধীরে ধীরে এসে পড়লেন। সাজে সজ্জায় হাসিতে খুশিতে কৈলাস ঝলমল করে উঠল।

সময় হয়ে এসেছে। বর যাত্রা করবেন। দেবতারা নিজেদের মধ্যে এক

একটি ব্যূহ রচনা করলেন। ধীরে ধীরে ও‍ঁরা কৈলাস থেকে যাত্রা শুরু করলেন। দেবতারা আগে আগে চললেন। ও‍ঁরা চললেন, বাদ্যকারেরাও চলল। ধীরে ধীরে বিবাহমিছিল অগ্রসর হল। কত জনে কত সুন্দর সুন্দর কথা বলল। শিবের কানেও এসব কথা পৌঁছোচ্ছিল। শিব অদ্য যথেষ্ট হৃষ্ট। তবু সুন্দর সুন্দর কথায় আরো হৃষ্ট হচ্ছিলেন।

হিমালয়ও ত্রুটি রাখেননি। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। বর আসবে। পথে পথে তাই কত কত তোরণ, কত কত ধ্বজা। বরযাত্রীরা, নিমন্ত্রিত অভ্যাগত, আত্মীয়-কুটুম্ব এঁরা সব বসবেন। রচিত হয়েছে মণ্ডপ।

হিমালয়ের গৃহে আজ কত হাসি কত গান, কত রঙ কত ছবি।

হিমালয়ের ব্যস্ততার শেষ নেই। কন্যাকে সাজাতে হবে। সব ব্যবস্থা করতে হবে। হিমালয় কন্যাকে স্নান করিয়ে গয়নাগাঁটি পরিয়ে বিয়ের কনেটি করে সাজিয়ে দিলেন। অনুষ্ঠানের সমস্ত উপকরণই গোছানো হয়েছে। সব প্রস্তুত।

গন্ধমাদন ও আর একজন ভৃত্য শিবকে আনতে এগিয়ে চলল। হিমালয় উৎকণ্ঠিত হয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর রুদ্র এলেন। হিমালয় যৎপরোনাস্তি সৌজন্য প্রকাশ করলেন। মনে মনে ধন্য মানলেন। মেনকা বিরাট দেবসেনা দেখে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। দেবগণও বিস্মিত হয়েছেন। হিমালয়ের বিরাট সেনাবাহিনী ও‍ঁদের হতবাক করেছে। এদিকেও সাগর, ওদিকেও সাগর। পর্বতগণ দেবতাদের আপ্যায়ন করে কৃতার্থ হলেন।

হিমালয় তাড়াতাড়ি বিবাহবেদীর দিকে অগ্রসর হলেন। তোরণ-সমন্বিত চতুষ্কোণ একটি মণ্ডপ রচিত হল। তিনি নিজেও স্নান করে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। এবার শুধু অপেক্ষা বর আসার।

মেনকা আজ আনন্দে আত্মহারা। ও‍ঁর কৌতূহলেরও অন্ত নেই। জামাতাকে উনি এখনও দেখেননি। অথচ জানেন তিনি দেবতাদের অধিনায়ক। তাঁর কন্যা অতি উগ্র তপস্যা করে তাঁকে লাভ করেছে। না জানি সেই শিব কি নিদারুণ সুন্দরই না হবেন। মেনকা গৃহের শীর্ষে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে আছেন নারদ। তিনিই চিনিয়ে দেবেন।

বিবাহমিছিল ক্রমশই এগিয়ে আসছে। মেনকা ভাবলেন সারির প্রথমেই তিনি থাকবেন। দেখলেন সাজেসজ্জায় অলংকারে আভরণে সেজে সুন্দর সুন্দর অনেক পুরুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। কত রকম বাহন! তাঁরা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। কেউ বাদ্য বাজাচ্ছেন, কেউ পতাকা হাতে, কেউ সুন্দর রমণীসঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। ঐ তো ও‍ঁদের অধিপতি। মেনকা দেখে খুব উৎফুল্ল হলেন। ভাবলেন ইনিই হয়ত শিব। নারদ বললেন: উনি বিশ্বাবসু। গন্ধর্বদের অধিপতি। উনি দেবসভার একজন গায়কমাত্র।

মেনকা খুশিই হলেন ঃ শিব এঁর থেকেও তাহলে সুন্দর ! না জানি কত সুন্দর !

দ্বিতীয় দল এলেন। আগের থেকে এঁরা দ্বিগুণ সুন্দর। বিশ্বাবসু থেকে এঁদের অধিপতি দ্বিগুণ সুন্দর। মেনকা ভাবলেন, ইনিই শিব। কিন্তু নারদ বললেন ঃ উনি কুবের।

বরুণ এগিয়ে এলেন। ইনি আরও সুন্দর। কিন্তু মেনকা এবারও হতাশ হলেন। ধর্মরাজ এগিয়ে এলেন। রূপের ছটায় ইনি যেন সবাইকে ছাপিয়ে যান। মেনকা বড় আশা করে নারদের মুখের দিকে তাকালেন। নারদ বললেন ঃ ইনি ধর্মরাজ।

মেনকা দেখলেন যাঁরা যত পিছনে তাঁরা তত সুন্দর। সৌন্দর্য যেন ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। এদিকে মেনকার মনে বিস্ময় বাড়ছে, শ্রান্তিও জমা হচ্ছে। ক্রমে ইন্দ্র এলেন। এলেন কত দেবতা। বারবারই মেনকা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন, বারবারই ভ্রান্তি বুঝে হতাশার গভীরে নিক্ষিপ্ত হন।

ক্রমে সূর্য এলেন, চন্দ্র এলেন। প্রতিবারই মেনকার মনে হয় ইনিই নিশ্চিত শিব। পার্বতী ধন্য। এমন স্বামী হবে তার। পার্বতী ভাগ্য করেছিল। কিন্তু নারদ বললেন ঃ ইনি নন, ইনি নন।

ব্রহ্মা এলেন। মেনকা মুগ্ধ। বিষ্ণু এলেন। মেনকা মুগ্ধ, বিস্মিত। কোটি কন্দর্পের রূপ ও অঙ্গে। বুকে শ্রীবৎসচিহ্ন। পরনে পীতবসন। চতুর্বাহু অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত ! মেনকা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নারদকে সুধোলেন ঃ ইনিই তো শিব ? নারদ বললেন ঃ শিব এঁর থেকেও বড়।

মহামুনি ভৃগু। সঙ্গে অন্যান্য বহু বহু ঋষি। সঙ্গে গঙ্গাদি তীর্থগণ। মেনকার মনে হল যেন কল্পবৃক্ষ চলে চলে আসছেন। সবার মুখে বেদধ্বনি। বৃহস্পতিকে দেখে মেনকা মুগ্ধ হলেন। ইনি নিশ্চয়ই সেই শিব। জগতের সার যেন এতেই মূর্তি নিয়েছে। মেনকা মনে মনে হর্ষে আপ্লুত হলেন। তাঁর ভাগ্য, তাঁর কন্যার ভাগ্য। নারদ বললেন ঃ ইনি শিব নন।

মেনকা ধারণা করতে পারলেন না। এঁর থেকেও শিব প্রশস্য ! মেনকা অথৈ জলে পড়লেন।

নারদের কথায় মেনকার আবেশ কাটল। নারদ বললেন ঃ শিব আসছেন। দেখ।

মেনকা চকিত হয়ে দুচোখ বিস্ফারিত করে দেখতে থাকলেন। কিন্তু সুন্দরের বন্যার পর এ কিসের প্রবাহ ! ভূত, প্রেত, পিশাচ। কদাকার সমস্ত প্রাণী ! এ কারা ? গায়ে পশুর মত রোম, হাতে দণ্ড, মুদগর। কেউ খোঁড়া, কেউ কুঁজো। মেনকার সর্বাঙ্গ ভয়ে শিউরে উঠল। কারও মুখে শত কুকথা, কারও মুখে বিলবিল শব্দ, কারও মুখে ডমরু, কারও মুখে শিঙা। মেনকা

ভয়ে বিমূঢ় হলেন। এঁদের মধ্যেই একজনকে দেখিয়ে নারদ বললেনঃ শিব, উনিই শিব।

পাঁচ মুখ, তিন চোখ, দশ হাত। গায়ে ভষ্ম, শিরে চন্দ্র, হাতে পিণাক, পরনে ব্যাঘ্রচর্ম। বৃষে চড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। নারদ বললেনঃ শিব, ইনিই শিব।

মেনকা ভয়ে দুঃখে আর দাঁড়াতে পারলেন না। বাতাসে একটি লতা ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ল। মেনকা লুটিয়ে পড়লেন।

পার্বতী অবশেষে একে পতি করে বসল! পার্বতী কি তাঁর মেয়ে! তাঁর মেয়ে এত নীচে নামতে পারে! মেনকার সংজ্ঞা লুপ্ত হল।

অনেক করে মেনকার জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান হতেই মেনকার অন্যরূপ। শিব নারদ পার্বতী—কেউই বাদ গেলেন না। তিরস্কারের গরল উঠল। গরলের বন্যা বইল। মেনকা নারদকে বললেনঃ তুমিই নষ্টের মূল। তুমিই বলেছিলে শিব বিয়ে করবেন। সেই শুনে হিমালয় নেচে উঠলেন। মেয়েকে পাঠালেন শিবের সেবায়। ফল হল ঘণ্টা। মেয়ে তপ করল। তারই তাপে আমার সংসার জ্বলে যেতে বসেছে। তুমিই যত নষ্টের মূল। তোমার আর কি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছ। আমার ঘর পুড়ছে, তুমি দুচোখ ভরে দেখছ। আমারই হাতে আলো, অথচ কুয়োতে পড়তে পড়লাম আমিই। সবই অদৃষ্ট…বড় বড় ঋষিরা সব এসেছিলেন বিয়ের কথা পাড়তে। তাঁরা সব কোথায় গেলেন! দাড়ি দুলিয়ে কত ঢঙ করলেন, কোথায় তাঁরা? কাছে পেলে দাড়ি উপড়ে ঋষিগিরি বার করে দেওয়া যেত। সাধ্বী-শিরোমণি অরুন্ধতীই বা কোথায়?

মেনকা একটু কি যেন ভাবলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেনঃ কাকেই বা দোষ দেই। মুখপোড়া মেয়েটাই তো সব ডোবাল। অত দেবতা থাকতে শেষে কিনা শিব! সোনা ফেলে কাচ নিতে সাধ হয়েছে, নিক, পস্তাক। চন্দন থাকতে সাধ কাদা মাখার, হাঁস উড়িয়ে দিয়ে কাক ধরে আদর দেখাচ্ছেন। বলিহারি রুচি! গঙ্গাজল গেল কুয়োর জল এল, সূর্য গেল জোনাকি এল। মেয়ের মাথায় ভূতের ভর হয়েছে। নইলে এমন হয়? এত দেবতা থাকতে শিব? শিবকে বিবাহ! মাগো এ যেন ঘি ছেড়ে রেড়ীর তেল খাওয়ার ইচ্ছা, যজ্ঞের ছাই ছেড়ে চিতার ছাই গায়ে মাখা। অমন মেয়ে আমিই পেটে ধরেছিলাম। আমার মৃত্যু হোক, সমস্ত জ্বলেপুড়ে খাক হোক। হে ঈশ্বর, আমাকে বন্ধ্যা করলে না কেন, আমার গর্ভ গলিত হল না কেন, যদি জন্মালই মরল না কেন? রাক্ষস ছিল, বাঘ ছিল, সিংহ ছিলঃ তবু তার মরণ হল না!……আমিই খুন করব। তোকে মারব, তারপর নিজে মরব।

মেনকা উত্তেজনায় অধীর হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

গোলযোগ শুনে ব্রহ্মা এলেন।

নারদ মেনকাকে বললেনঃ শিবের আসল রূপ অতি সুন্দর। আসলে তুমিই দেখতে পাওনি।

মেনকা ধমকে বলে উঠলেনঃ থামো, তোমাকে আর বলতে হবে না।

ব্রহ্মা বললেনঃ শোন মেনকা, আমার কথা অন্তত তোমার শোনা উচিৎ। নারদ মিথ্যে কিছু বলছেন না। শিবের প্রকৃত রূপ তুমি সত্যই জানলে এরকম ভাবে কখনই ভেঙ্গে পড়তে না।

মেনকা বললেনঃ আপনারা সকলে মিলে পার্বতীকে জলে ভাসিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু কেন? শিবের হাতে দেওয়ার চেয়ে ওকে বরং হত্যা করুন।

ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা এসেও চারিদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছেন। সবাই বললেনঃ কি বলছ তুমি! উনিই যে পরম ভগবান। পার্বতীর সঙ্গে ওঁকে আজ আমরা দেখব। আমাদের জীবন সার্থক হবে। উনি মঙ্গলময়। কৃপা করেছেন, তাই আজ এই মিলন হতে চলেছে। আর তুমি একি সব বলছ?

মেনকা বললেনঃ পার্বতীকে বরং হত্যা করুন।

সপ্তর্ষি এলেন। বললেনঃ আমরা মধ্যস্থতা করেছি তথাপি তুমি এরকম বলছ! সেরকম হলে আমরা কখনও করতে বলি, না আগ বাড়িযে এখানে ছুটে আসি? শান্ত হও। তিনি এসেছেন। এর চেয়ে যে আর ভাল ভাগ্য হয় না।

মেনকার মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। দারুণ ঘৃণায় তিনি বললেনঃ শিবের হাতে দেবার আগে ওকে আমি কেটে টুকরো টুকরো করব।

হিমালয় ছুটতে ছুটতে এসে বললেনঃ কি সব বলছ? তুমি কি সব বিস্মৃত হয়েছ? এঁরা এসেছেন। আজ আমার পরম দিন। আর তুমি কি সব বলছ! শোন, শান্ত হও। শিবই সব, উনিই জগতের হর্তাকর্তাবিধাতা। অতএব শান্ত হও।

মেনকা বললেনঃ আমার কথা শোন, তারপর যা ভাল বিবেচনা হয় কর। মেয়ের গলায় দড়ি দিয়ে এই পর্বত থেকে ঐ সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। আমি সুখী হব। শিবকে দিলে আমি দেহত্যাগ করব।

পার্বতী এসে অনুনয় করে বললেনঃ মা, তুমি তো এতদিন ধর্মপথেই চলে এসেছ। কিন্তু আজ একি বলছ! যিনি পরমেশ্বর তাঁর থেকে উত্তম আর কি হতে পারে? অথচ তুমি এমন করছ কেন? শান্ত হও। আমাদের জন্ম-জন্মান্তরেয় ভাগ্য। তাই শিব এসেছেন। উঠ, শান্ত হও। ওঁকে ছাড়া অন্য কাউকে যে আমি কখনই বরণ করে নিতে পারব না। যা সিংহের ভোজ্য তা কি শৃগালে ভোগ করতে পারে?

মুহূর্তে সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে শক্ত হাতে মেয়েকে তিনি ধরলেন। কিলে চড়ে পার্বতী চোখে অন্ধকার দেখলেন।

নারদ ছুটে এলেন ঃ আহা, করকি ! করকি !

ঋষিরা ছুটে এলেন ঃ আহা, কি কাণ্ড ! কি কাণ্ড !

ওঁরা জোর করে পার্বতীকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। মেনকার ক্রোধ আরও বাড়ল। পাগলের মত তিনি চিৎকার করতে লাগলেন। তিরস্কারের বিষে হিমালয়ের গৃহ ভেসে যাবার উপক্রম হল।

মেনকা আর কন্যাকে চান না। অমন কন্যার মৃত্যুই সুখের। কিন্তু পার্বতী বেঁচে আছেন। মেনকা তাকে বিষ খাওয়াতে চাইলেন, কুয়োর মধ্যে ফেলে দিতে চাইলেন, সাগরে ডুবিয়ে দিতে চাইলেন। মেনকা দিশাহারা। কন্যাকে তিনি চান না। তবু সে বেঁচে আছে, শিবকে বরণ করেছে। মেনকা কন্যাকে কেটে ফেলতে চাইলেন। স্থিরই করতে পারলেন না কিভাবে কন্যার কাল ঘটাবেন। মেনকা আত্মঘাতী হতে চাইলেন।

মেনকা দিশাহারা। তিরস্কাবের হলাহল উঠতেই থাকল। মেনকা মনকে কিছুতেই মানাতে পারলেন না। বাপমা ভাইবন্ধু কেউ নেই। রূপ নেই, গুণ নেই, সহায় নেই, সম্বল নেই। বয়সেরও গাছপাথর নেই, পবিত্রতারও বালাই নেই। এমন যে শিব, তার হাতে দিতে হবে কন্যাকে ! এমন যে শিব, তাবই পায়ে তাঁর আদরের দুলালী খুইয়ে বসে আছে মন !

মেনকা কি কববেন কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। কথায়-বার্তায় আচরণে শুধু অন্ধ ক্রোধ ফেটে পড়তে থাকল।

এমন সময় বিষ্ণু এলেন। বললেন ঃ পিতৃগণ ! তুমি তাঁদের মানসকন্যা। হিমালয় ! ব্রহ্মকুলে জন্ম। তুমি এই হিমালয়ের পত্নী। তোমার মত ধন্য আর কে আছে ? নিযত ধর্মকাজ কর, ধর্মকথা বল। অথচ সেই তুমি এসব কি করছ ? এসব কি বলছ ? আমি বলছি, ব্রহ্মা বলছেন, দেবতারা বলছেন, ঋষিরাও বলছেন। সবাই আমরা বলছি, এবং বলছি যতসব মন্দকথা ? আর তুমি বলছ যতসব শুভকথা। এ তোমার বুদ্ধি নয়, বিকার। তাই শিবকে বুঝছ না। এতবার আমরা বলছি যে শিবের গুণ যেমন নেই, আবার আছেও। তাঁর থেকেই এই প্রকৃতি, প্রকৃতির পাশে পুরুষোত্তম প্রকৃতি ও পুরুষ থেকেই আমি সত্ত্বময়, ব্রহ্মা রজোময়। পরে উনিই নেমে এসেছেন তমোময় হয়ে। ওঁর থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্ট। জগৎ শিবময়, শিব সর্বময়। অথচ এই সত্য-কথাটি তুমি বুঝছ না। তোমার তো জ্ঞান ছিল, কিন্তু এখন দেখছি অজ্ঞানে তুমি পরিপূর্ণ। একজন নটের কথা চিন্তা কর। কত কত বেশে নট সজ্জিত হয। মনে হয় এক নয়, সব আলাদা আলাদা লোক। কিন্তু আসলে ও তফাৎ সত্য নয়। বেশের তফাতেই উৎপন্ন হয় এই ভ্রম। বেশ অনেক, মূলে সেই এক নট। তেমনি মূলে শুধু শিব, আর কিছু নয়। যদি মনে হয় আর কিছু সে আমাদের অজ্ঞানতা। অতএব সুস্থ হও, যা বলেছ বলেছ যা যা করেছ

করেছ, এই বেলা শিবকে সমাদর কর।

মেনকা একটু নরম হলেন। ওদিকে নারদ অনেক বলে কয়ে শিবকে সম্মত করালেন। শিব মনোহর রূপ ধরলেন।

মেনকার সম্মুখে এক অনিন্দ্য পুরুষ। পুরুষের অঙ্গে কান্তির ঢল নেমেছে। মেনকা চেয়ে চেয়ে বিহ্বল হলেন। কে ইনি! কে ইনি!

মেনকা সব বিস্মৃত হলেন।

নারদ মেনকাকে বললেনঃ শিব, দেখ।

মেনকা নিষ্পলক চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মেনকার চিন্তা স্তব্ধ, অনুভব স্তব্ধ। সব স্তব্ধ। মেনকা দাঁড়িয়ে রইলেন, একটি মর্মরমূর্তি দাঁড়িয়ে রইল।

সম্মুখে শিব। মুখে মৃদু মৃদু হাসি। অপরূপ দুটি চোখ। শিব। গা দিয়ে কোটি সূর্য ফেটে পড়ছে, গড়িয়ে পড়ছে। মাথায় মুকুট। অলংকারে সাজে-পোষাকে, বাহনের বাহারে সে এক অনির্বচনীয় সুন্দর।

মেনকা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। শিবের মাথায় ছত্র। ধরে রয়েছেন সূর্য। পাশে চন্দ্র। তিনি ব্যজন করছেন। সম্মুখে অষ্টসিদ্ধি। তাঁরা নৃত্য করছেন। গঙ্গা ও যমুনা। তাঁদের হাতে চামর। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা। ওরা রয়েছেন, বলছেনঃ জয় শিব, জয় শিব। ঋষিরা রয়েছেন, বলছেনঃ পরম ব্রহ্ম, পরম ব্রহ্ম। গন্ধর্বরা গান করছেন। অপ্সরারাও গান করছেন। বাদ্য বাজাচ্ছেন প্রমথরা। কত শত ভক্ত। তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন, ইতস্তত বিচরণ করছেন।

মেনকা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। মনের মধ্যে বারবার একটি শব্দই ঘুরে ঘুরে এল এবং গেল এবং এলঃ অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয়!

এই শিব! অথচ,··· মেনকা মনে মনে লজ্জায় মরে গেলেন। এই শিব! এঁকে বশ করেছে পার্বতী! পার্বতী কি মেনকার কন্যা! মেনকা লজ্জা পেলেন। মেনকা গৌরববোধ করলেন। মনে মনে ধন্য ধন্য করলেন।

লজ্জা এসে মেনকার মুখে আবির মাখিয়ে দিয়ে গেছে। শিবের মুখেও সেই আবির। মেনকা যথাবিধি পুজো করলেন।

শিব এসেছেন। বিবাহবাড়িতে কোলাহল পড়ে গিয়েছিল। অন্তঃপুর থেকে মেয়েরা সব ছুটে এসেছেন। কেউ প্রসাধন করছিলেন। সারা না হতেই কোলাহল। তর সইল না। ঐ ভাবেই ছুটে এলেন। আর একজনঃ এক হাতে দর্পণ, অন্যহাতে কাজলকাঠি। চোখে টেনে দেবেন দেবেন। সহসা কোলাহল। তিনি ছুটে এলেন। আর একজনঃ হাতে চামর, মগ্ন ছিলেন স্বামীর সেবায়। সহসা কোলাহল। চকিতে ছুটে এলেন। হাতের চামর হাতেই রইল। আর একজনঃ কাপড় পরছিলেন। সহসা কোলাহল। উলটো করে কোনমতে

জড়িয়েই তিনি চলে এলেন। হাতে ভাত। স্বামী খেতে বসেছেন, হাত গুটিয়ে বসে আছেন। উনি যাচ্ছিলেন বাটিতে ভাত নিয়ে। কিন্তু মাঝপথে এই অঘটন।

সবাই শিবকে দেখলেন। দেখে তাঁরা সব ভুললেন। ওঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিবকে দেখছেন। দেবতারা ভাবলেন ঃ হিমালয়ের ভবনে এত এত মর্মরমূর্তিও ছিল! আহা কি সুন্দর।

সহসা মর্মরমূর্তিগুলি প্রাণ পেল। নড়েচড়ে উঠল। পাগল হল পূজায়।

মর্মরমূর্তিগুলি মুখরিত হল। বিমুগ্ধ উচ্ছ্বাসে উতলা হল ঃ পার্বতী তপস্যা করেছিলেন! তাঁর তপস্যা সার্থক! লক্ষ্মীনারায়ণ! মণি আর কাঞ্চন! তেমনি হরপার্বতী।

সম্মুখে অন্তঃপুর। শিব ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবগণ। বিষ্ণু রয়েছেন পাশেই। অদ্য তিনি অতিশয় সতর্ক। তাঁর চিন্তা ঃ শিবকে নিয়ে যদি কেউ কৌতুক করে বসে! দেবতাদেরও ঐ ভয়, ভাবনা। ওঁরা সাবধানে শিবের পাশে পাশেই রইলেন।

এর মধ্যেই মেনকা দিব্যি সাজগোজ করে ফেলেছেন। তিনি এলেন। শিবকে পূজা করলেন। পূজা, পর পরই কৌতুকের উচ্ছ্বাস। মেনকার ভিন্নতর মূর্তি। শিবের গলায় লম্বা এক ফালি বস্ত্র। চকিতে পিছন থেকে বাধিয়ে দিয়েছেন মেনকা। দিয়েই হিড়হিড় করে আকর্ষণ আর হাসি। হিমালয়ে কত কত নির্ঝর। মেনকার হাস্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

একটি নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। আশে পাশে বিষ্ণু ব্রহ্মার আরক্ত মুখ, আরক্ত চোখ। মেনকা ভরসা পেলেন না। ক্ষান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলেন। নির্ঝরের ধ্বনি আস্তে আস্তে দূরে লীন হল।

ধীরে ধীরে শিব বিবাহবেদীর সমীপস্থ হলেন। ব্রহ্মা প্রস্তুত, ঋষিগণও প্রস্তুত। হিমালয় এসে দাঁড়িয়েছেন, মেনকাও। ব্রহ্মা তাঁর কাজ করলেন, ঋষিরা সব সমাপন করলেন। তার পরই ধ্বনিত হল বেদমন্ত্র, পার্বতী-পরমেশ্বরের নামগান।

হিমালয় শিবকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এলেন। পাদ্য দিলেন, দুকূল দিলেন, তিলক দিলেন, দিলেন সোনার ফুলের হার।

আবার বিবাহবেদী। সেখানে জ্বলছে হোমের আগুন। ধীরে ধীরে অনুষ্ঠিত হল একের পর এক কর্তব্যকর্ম।

ব্রহ্মা ইঙ্গিত করলেন। মেয়েরা এগিয়ে এল। অক্ষত দান করল শিব ও পার্বতীর ললাটে।

এবার প্রদক্ষিণ। দম্পতি প্রদক্ষিণ করছেন। পার্বতীর অঙ্গুষ্ঠ দেখে ব্রহ্মা মনে মনে বিমুগ্ধ হলেন। সংযম হারালেন। গোপন করতে গিয়েও গোপন

করতে পারলেন না। মুহূর্তে জন্ম হল অসংখ্য বটুকের, বালকঋষির। ওরা এগিয়ে এসে ব্রহ্মাকে নমস্কার করল।

শিবের ললাট কুঞ্চিত হয়ে এল। ব্রহ্মার অসংযমে রোষ ঘনিয়ে এল তাঁর চোখে।

ব্রহ্মা ভয়ে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ। দেবতারাও ম্লান। ওঁরা সবাই মিলে যুক্ত করে স্তব করলেন। বললেনঃ ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

শিব ক্রোধ সংবরণ করলেন। গঙ্গার জলে ব্রহ্মা শুচি হলেন। অধিকার পেলেন শুভ কাজ সম্পাদনের।

বটুকদের দেওয়া হল সূর্যের শিষ্য করে। সূর্যের সেবা করেই দিনে দিনে ওরা বেড়ে উঠল।

বিবাহের কাজ তখনও বাকি। পার্বতীকে ধ্রুব দর্শন করানো হল। তারপর শুভ স্বস্ত্যয়ন। সকলে আশীর্বাদ করলেনঃ তোমাদের বৃদ্ধি হোক, শুভ হোক, কল্যাণ হোক।

দেবতারা বললেনঃ আপনি জগতের পিতা। আজ থেকে ইনি হলেন জগতের মাতা।

অপ্সরা ও গন্ধর্বরা প্রমোদে ভ'রে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে উতলা হলেন।

শিব এবার ফিরবেন কৈলাসে। হিমালয় সকলকে মান দিলেন, যথাবিহিত পূজা করলেন। দেবতারা মনে মনে লজ্জা মানলেন। শিবের গুরুজন হিমালয়। তিনি পূজা করছেন দেবগণের। দেবগণ মাথা নত করে রইলেন।

মেনকা বললেনঃ শিবের নিন্দা করে অপরাধ করেছি। আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন।

হিমালয় ও মেনকা বারবার নিজেদের ধন্য মনে করলেন। কতবার কতভাবে ওঁরা বললেনঃ আজ আমরা কৃতকৃতার্থ, ধন্য।

দেবতা ও ঋষিগণ ধন্যধন্য করলেন। শত আশিসে ভরিয়ে তুললেন মেনকা ও হিমালয়ের জীবন।

শিব ফিরে এলেন। কৈলাসের মন্দিরে ওঁরা সুখে অধিষ্ঠিত হলেন।

দেবতারা ফিরে চললেন। শত প্রশংসা, শত হর্ষ বিগলিত হয়ে হয়ে ওঁদের প্রত্যাবর্তনের পথকে যেন স্নিগ্ধতায় মার্জিত করল।

৮• স্কন্দের জন্ম

কৈলাসে আনন্দ। শিবের আনন্দ, প্রমথদের আনন্দ। স্বর্গে আনন্দ। স্বর্গের আকাশে নতুন আশার সূর্যোদয়।

শিব চিন্তা করলেন ঃ একটা কিছু করতে হয়। দেবতারা পীড়িত। শুধু আর লীলা নয়, একটা কিছু করতে হয়।

দেবতারা চিন্তা করলেন ঃ এবার শিব একটা কিছু করবেন। পীড়ার অবসান হবে। তারকাসুর বধ হবে।

কাল বয়ে যায়। দেবতারা উতলা হলেন। শিব কি বিস্মৃত হলেন? মুগ্ধ প্রহরগুলিতে তাঁর কি দেবতাদের কথা মনে পড়ে? হয়ত পড়ে না। নইলে এত বিলম্ব হবার তো কথা নয়।

দেবতারা অগ্নিকে প্রেরণ করলেন। বললেন ঃ দেখে এস উনি কি করছেন।

কপোতের বেশে অগ্নি এলেন কৈলাসে। শিব তখন লীলারসে মগ্ন। অগ্নি দেখলেন।

শিব বুঝলেন, কেউ না কেউ এসেছে। চকিতে তিনি বিরত হলেন। দেখলেন এক কপোত। বললেন ঃ দেখছি বটে কপোত। কিন্তু আসলে তোমার ও রূপ কপট। কিন্তু কে তুমি? যখন এসেছই তখন গ্রহণ কর এই মহাবীর্য।

কপোতের চঞ্চুপুটে শিববীর্য। অগ্নি যেন দগ্ধ হতে থাকলেন। ত্বরিতে এসে গঙ্গাতে নিক্ষেপ করে ত্রাণ পেলেন।

গঙ্গা সইতে পারলেন না। দুঃসহ দহনে তিনি দিশা হারিয়ে বসলেন। নিক্ষেপ করলেন শরবনে।

শরবনে এক কুমার। রূপে শরবন উজ্জ্বল হল।

ছজন রাজকন্যা এসেছেন স্নানে। ওরা দেখলেন শরবনে আলোর ফুল। ওরা ছুটে গেলেন। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ছজনে। সবাই বললেন ঃ আমার, আমার, আমার। ছজনই কোল বাড়িয়ে নিতে গেলেন সেই স্বর্গীয় শিশুকে।

স্বর্গীয় শিশু। ছয় মুখ। ছয় রাজকন্যার স্তন্য পান করলেন ছয় মুখে। কুমারের নাম হল ষন্মাতুর।

আদরের কুমার। নাম পেলেন অনেক। উনি পার্বতীনন্দন, অগ্নিভূ। উনি স্কন্ধ, গঙ্গাপুত্র। উনি শরজন্মা, ষন্মাতুর।

রাজকন্যাদের অবসর ভরে উঠল। আলোর কুমার আলোর ফুল ফুটিয়ে হাসে, তাকায়, কথা কয়।

দেবতারা শুনলেন ঃ হয়েছে, হয়েছে। কুমারের জন্ম হয়েছে। এবার সাজো রণে।

নারদ এসে স্বর্গে শুভসংবাদটি দিয়ে লাভ করলেন অশেষ আপ্যায়ন।

দেবতারা রণসাজে সজ্জিত হলেন। স্কন্ধ তাঁদের সেনাপতি। শোণিতপুর শোণিতে প্লাবিত হল। দশদিন ধরে অতি ঘোর যুদ্ধ হল। কাতারে কাতারে অসুরসৈন্য নিহত হল। পালিয়ে কেউ আশ্রয় নিল পাতালে। তারকাসুর

নিহত হল।

কতদিনের পীড়ার শান্তি ঘটেছে। দেবমনে ছড়িয়ে পড়ল মহা স্বস্তি। যাঁর প্রসাদে ওঁরা আজ প্রাণ পেলেন সেই দেবাদিদেবের পূজা এখনো বাকি। দেবতারা এলেন কৈলাসে।

শিবের হাতে দেবতারা স্কন্দকে সমর্পণ করলেন। স্তবেব ধ্বনিতে মুখরিত হল শিবালয়। দেবতাদের মুখাবয়বে শ্বেতপদ্মের কমনীয় কান্তি ফুটে উঠেছে। ওঁরা মলিন হয়েছিলেন, এখন হয়েছেন শিশির ধোয়া পদ্ম।

স্তবের ধ্বনিতে শিব যেন গদ গদ হলেন। বললেন: যদি দুঃখ আসে, এসো, দুঃখ যাবে দূরে।

দেবতারা ও ঋষিরা সমস্বরে উচ্চাবণ করলেন: ওঁ, ওঁ, ওঁ॥

৯. অভিশপ্ত কেতকী

ঋষিরা সুধোলেন: শিবের পূজায় কেতকীফুল অচল। এর কারণ কি?

সূত বললেন: নিতান্তই মোহ। মিথ্যে বলল, অভিশপ্ত হল।

ফল্গুনদী। তারই তীরে রামচন্দ্র। পিতার আদেশ ছিল। তাই আসা, কিছুকাল থাকা। সঙ্গে ছিলেন সীতা, লক্ষ্মণ।

পিতার শ্রাদ্ধের দিন সমাগত হল। রাম চিন্তায় পড়লেন। শ্রাদ্ধ করতে হবে। কিন্তু উপকরণ নেই। অবশেষে লক্ষ্মণকে বললেন: কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়ে দেখ, যদি পাও।

লজ্জা লজ্জা লাগছিল। তবু যেতে হবে। পিতার শ্রাদ্ধ, রামের আদেশ: যেতে হবে। একটি পাত্র হাতে লক্ষ্মণ বেরিয়ে পড়লেন।

লক্ষ্মণ গেছেন। ফেরার সময় হয়েছে। অথচ ফিরছেন না। রাম ভাবনায় পড়লেন। শেষে কি উত্তীর্ণ হবে শ্রাদ্ধেব সময়?

আর বসে থাকা নয়। রাম নিজেই বেরিয়ে পড়লেন।

কুটিরে একা সীতা। পথ চেয়ে চেয়ে তিনি ক্লান্ত। অবশেষে ঘনাল দুশ্চিন্তা। দুপুর গড়িয়ে যায় যায়। অথচ না ফিরছেন লক্ষ্মণ না বাম। এব পরই পড়ে যাবে রাক্ষসী বেলা। কি করে হবে শ্রাদ্ধ?

সীতা নদীতে স্নান করলেন। ইঙ্গুদী তেলের প্রদীপ জেবলে বসে রইলেন। রামও আসছেন না, লক্ষ্মণও না। সীতা মনে মনে মরিয়া হয়ে উঠলেন। ওঁরা আসছেন না, এদিকে বেলা এল গড়িয়ে। সীতা নিজেই পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করবেন বলে স্থির করলেন। যা ছিল ঘরে তাই নিয়েই তিনি পিণ্ড দিলেন।

পিতৃপুরুষ হাত বাড়িয়ে পিণ্ড গ্রহণ করলেন। সীতা দেখলেন ঃ কতক-গুলি সুন্দরহাত। হাতে হাতে নানা আভরণ। সীতা শুনলেন ঃ আমরা পরিতৃপ্ত। তুমি করেছ, তুমি ধন্য।

সীতা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনারা কাঁরা এসেছেন ?

বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঃ আমি তোমার শ্বশুর, দশরথ। তোমার শ্রাদ্ধ সফল, আমরা পরিতৃপ্ত।

ঃ আপনারা পরিতৃপ্ত, হাত বাড়িয়ে পিণ্ড গ্রহণ করেছেন এসব কথা আপনার পুত্র বিশ্বাস করবেন না।

ঃ সাক্ষী রাখ।

ঃ ফল্গু নদী, এই ধেনু, অগ্নি আর কেতকী আমার সাক্ষী।

রাম এলেন। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সীতাকে বললেন ঃ শিগগীর স্নানটান করে শুচি হও। পাক করতে হবে। সময় যায় যায়।

ঃ ... ...।

ঃ অবাক হয়ে দেখছ কি ? শিগগীর যাও। গুছিয়ে নাও।

সীতা রামমচন্দ্রকে সমস্ত বিবৃত করলেন। রাম হেসে লক্ষ্মণকে বললেন ঃ শুনলে তো কাণ্ড। আমরা শাস্ত্রমতো ডেকেও দেখা পাইনে, আর উনি কোন রকমে ডাকতেই ওঁরা দেখা দিয়ে গেলেন।·····আসলে আলস্যেরই কিঞ্চিৎ প্রসাদ পেয়েছেন।···ঠিক করে বল, আমরাই না হয় করেকম্মে নেব।

সীতার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সীতা বললেন ঃ ফল্গু নদী, এই ধেনু, অগ্নি আর এই কেতকীকে জিজ্ঞাসা করুন। ওরা সাক্ষী আছে।

রাম বললেন ঃ ওরা তাহলে বলুক।

ঃ ওদের জিজ্ঞাসা করুন।

ঃ সীতা যা বলছেন সে সব কি সত্যি ?

সাক্ষীরা বলল ঃ কৈ, আমরা তো কিছু জানিনে।

রাম ও লক্ষ্মণ খুব হাসাহাসি করলেন।

রাম বললেন ঃ তুমি এখনো অভুক্ত, সীতাও বড় শ্রান্ত। অথচ শ্রাদ্ধ তো না করলেও নয়। বেলা তো যায় যায়।

সীতা বললেন ঃ আমি পাক করে দিচ্ছি।

রাম শ্রাদ্ধে বসলেন। পিতৃগণকে আহ্বান করলেন। সূর্যমণ্ডল থেকে বাক্ ঝরে পড়ল ঃ আবার কেন ? সীতা তো করেছেন।

রাম বললেন ঃ আমি একথা বিশ্বাস করি না।

আবার আকাশ থেকে কথা পড়ল ঃ সীতা করেছেন। আর কর না।

রামের বিশ্বাস হল না। উনি শ্রাদ্ধ করবেনই। স্বয়ং সূর্য বললেন ঃ কেন আবার শ্রাদ্ধ করছ ? সীতা করেছেন।

রাম ও লক্ষ্মণ বড় লজ্জা পেলেন। সীতা বলেছিলেন। অথচ ওঁরা বিশ্বাস করেননি, বরং হাসাহাসি করেছেন। ওঁরা দুজনেই সীতার প্রশংসা করলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর রাম লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ওরা সাক্ষী ছিল, অথচ মিথ্যে বলল। কেন বলতে পার ?

এমন সময় ওঁদের দুজনেরই কানে এল সীতার কথা। সীতা বলছেনঃ ফল্গু নদী, জেনেশুনেও তুমি সত্য বলনি, তুমি পাতালে প্রবাহিত হও। কেতকী, শিবের প্রিয় ছিলে, কিন্তু আর থাকবে না। ওঁর পূজায় তুমি অযোগ্য। অগ্নি, তুমি না দেবগণের মুখ! আজ থেকে তুমি সর্বভক্ষক হও। ধেনু, তুমি মুখে মিথ্যে বলেছ, আজ থেকে তুমি মুখে অশুচি, পবিত্র মাত্র পুচ্ছদেশে।

শিবের পূজায় কেতকী প্রিয় ছিল। সীতার শাপে অপ্রিয় হল। একেবারে অচল হল।

ঋষিরা স্তব্ধ হয়ে শুধু বসে রইলেন।

১০. চম্পকের দুর্গতি

আন মনে নারদ চলেছেন। গোকর্ণ দেশের বাতাস এত সুন্দর! বাতাসে এত আহ্লাদ! আহ্লাদ সৌরভ হয়ে বাতাস ভরিয়ে রেখেছে।

আন মনে মনে মনে আমোদিত হতে হতে নারদ চলেছেন। গোকর্ণেশকে তিনি দর্শন করবেন। শতেক আহ্লাদে ভরবে মন। কত কত দূর থেকে কত কত মানুষ আসে, গোকর্ণেশ দর্শন করে, প্রসাদ পায়, বিধৌত হয় তাদের তাবৎ পাপ। নারদ চলেছেন নিত্য জাগ্রত সেই পরমেশ্বরের প্রসাদ পেতে।

পথের এধারে ওধারে চাঁপা ফুলের গাছ। ফুলের ভারে ডালগুলি নুয়ে পড়েছে। গন্ধের ভারে বাতাস হয়েছে মন্থর।

একজন ব্রাহ্মণ ঐ পথে আসছিল। দেখলঃ আনমনা নারদ, বীণায় মৃদু মৃদু ঝংকার তুলে মৃদু পদে এগিয়ে আসছেন।

ব্রাহ্মণ ফুল তুলতে এসেছিল। কিন্তু তুলল না। ভাবলঃ উনি চলে গেলেই তুলব, দেখে ফেলবেন, শতকথা জিজ্ঞাসা করবেন।

কিন্তু নারদ জিজ্ঞাসা করলেন। বললেনঃ কেন এসেছ ?

হাতের সাজি দেখিয়ে বললেনঃ ওটা কি ?

ব্রাহ্মণ বানিয়ে বানিয়ে বললঃ ভিক্ষায় বেরিয়েছি।

আনমনা নারদ বীণা বাজিয়ে গুনগুন করতে করতে চলে গেলেন। শিবকে প্রণাম জানিয়ে আবার নামলেন পথে।

নারদ চলে গেলেন। কাছে পিঠে কেউ নেই। চাঁপা ফুলে সাজি ভরে

উঠল। ব্রাহ্মণ যত্ন করে সাজি ঢেকে চলছিলেন। কিন্তু আবার দেখা হয়ে গেল।

নারদ সুধোলেন ঃ কোথায় যাচ্ছ ?

ঃ এই ফিরছি। কিছুই মিলল না।

নারদের কেমন যেন মনে হল। চাঁপা গাছের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্রাহ্মণ ফুল নিল, কটি বলতে পার ? কোথায়ই বা ও যাচ্ছে ?

চাঁপাকে ব্রাহ্মণ শিখিয়ে রেখেছিল ঃ কাউকে যেন কিছু বল না।

চাঁপা বলল ঃ ফুল ! ব্রাহ্মণ ! কিছু তো বুঝতে পারছিনে। কি বলছ তুমি ?

নারদ মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর বিভোর দুটি চোখ চকচক করে উঠল। নীরব নারদ নীরবে হেঁটে গেলেন।

এক এক করে গুনলেন। একশো এক। পাশে ভক্তিতে ভেসে অন্য এক ব্রাহ্মণ শিবকে পূজা করছিল। নারদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কে বল তো, অমন করে কি প্রার্থনাই বা করছ ? কি সুন্দর এই ফুলগুলি ! এত চাঁপা ! কোত্থেকে পেলে ? আহা, চাঁপা ফুল শিবের বড় প্রিয়।

সরল জিজ্ঞাসা। সরল উত্তর ঃ মুক্তি চাইছি। কিন্তু মেলে কৈ ? অথচ এক ব্রাহ্মণ নিত্য চাঁপা ফুলে শিবকে ভজে। শিব মুগ্ধ, প্রসাদ বিতরণে অকুণ্ঠ। আর শিবের প্রসাদে সেই ব্রাহ্মণ রাজাকেও মুগ্ধ করেছেন। রাজার দানের হাত বড় দরাজ। আর সেই দানবিভাগের কর্তা ঐ ব্রাহ্মণ। দুহাতে অর্থ লুটছে। রাজা মুগ্ধ, দেখেও দেখেন না। অথচ কত ব্রাহ্মণ ওর অত্যাচারে পথে বসেছে।

চম্পকের অমেয় মহিমা। নারদ মনে মনে কথাটি কয়েকবার আওড়ালেন। শিবের প্রিয় চম্পক। চম্পক দিয়ে ঐ ব্রাহ্মণ হয়েছে শিবের প্রিয়। তাই ওর অত ক্ষমতা। অথচ ক্ষমতার অপব্যবহারেই ওর পরিতোষ। দুর্জন, তথাপি পেয়েছে শিবের আশীর্বাদ। চম্পকের মহিমা যথার্থই অপার।

নারদ শিবকে বললেন ঃ এ ব্যক্তি এত মন্দ, অথচ কৃপা বিতরণে আপনি এত অকুণ্ঠ ?

শিব বললেন ঃ চম্পকে জিতে নিয়েছে। যে ভজে চম্পকে চরাচর যায় তার বশে। আমি নিরুপায়।

সহসা মন্দির প্রাঙ্গণের বায়ু অবমথিত হল। নারদ ফিরে তাকালেন।

এক ব্রাহ্মণী বিলাপ করছে। সবই নাকি তার যায় যায়। ঐ ব্রাহ্মণই নাকি তার সর্বস্ব অপহরণ করতে উদ্যত হয়েছে।

নারদ বললেন ঃ খুলে বল।

ব্রাহ্মণী সব বর্ণনা করল। স্বামী পঙ্গু। ঘরে সোমত্থ মেয়ে। বিয়ে দেয়

এমন সঙ্গতি নেই। রাজার কাছে অনেক দরবার করে কিছু পাওয়া গেছে। ঐ ব্রাহ্মণই পাইয়ে দিয়েছে। এবার যদি মেয়েটার একটা গতি হয়। পাইয়ে দিয়েছে, অতএব ব্রাহ্মণ জোর করে অর্ধেক দাবী করছে। রাজাকে বশ করেছে। রাজা কিছু বলেন না। দিনদিন তাই ওর দাপট বেড়েই চলেছে।

নারদ সুধালেন ঃ রাজা কি দিয়েছেন ?

ব্রাহ্মণী বলল ঃ একটি গাই, প্রসব হবে হবে। আর দিয়েছেন অনেক টাকা। ব্রাহ্মণ পাইয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাই বলে অর্ধেক দাবী করবে। টাকার অর্ধেক দিয়েওছি। কিন্তু এখন বলছে, গাইটা কি ফাউ, ওটার ভাগ চাই। আপনিই বলুন গাই ভাগ করি কি করে ?

নারদ শিবকে বললেন ঃ হে প্রভু, আপনি সবই শুনেছেন। সবই সম্যক জানেন। তথাপি এমন দুর্জনের পূজা আপনি নেবেন ? মহা পাষণ্ড হলেই গো-বিভাগের কথা ভাবতে পারে। গোরু কত পবিত্র, কত তার মহিমা! গোরুর ডানশিঙে গঙ্গা, বামে যমুনা, মধ্যে সরস্বতী। গোরুর কাঁধে ব্রহ্মা, কটিতে বিষ্ণু, আর মধ্যে ভগবান রুদ্র—সঙ্গে নন্দীর মত শত শত অনুচর। গোরুর মহিমার কি শেষ আছে! এ মহিমা কি বর্ণনার! পিঠে সর্বতীর্থ, কুক্ষিতে—ডাইনে ঋষিগণ বামে দেবগণ, নীচে তাবৎ নদী, খুরে বেদ, দুধের আধারে সমুদ্র। ত্রিজগৎ গোরুতে। অথচ এই গোরুকে একজন বিভাগ করতে চাইছে। আর সে ব্যক্তি আপনার ভক্ত, তারই উপর আপনার অশেষ অনুগ্রহ। প্রভু, এ কি করে সম্ভব! প্রদক্ষিণে পুণ্য, দানেও পুণ্য, আর দুধ—সে তো দুধ নয়—গঙ্গার জল, অমৃত। বিষ্ঠা, মূত্র—সেও পরম পবিত্র। এমন যে গো তার বিভাগের কথা বলে আপনারই এক ভক্ত!

শিব নারদকে বললেন ঃ তুমি আমার প্রিয়তম। সেই তুমি এমন করে বলছ! তুমিই এর বিহিত কর। পাপের ফল তুমিই ওকে দাও।

নারদ মন্দির থেকে বেরিয়ে পথে পা দিলেন। চাঁপা গাছের তলায় এসে বললেন ঃ ওহে এখনো সত্য বল, রোজ রোজ তোমার ফুল তোলে—ও কে ?

চাঁপা আগের মতই নানারকম ঢঙ করল, সত্যকে সযত্নে গোপন করল।

নারদ অভিশাপ দিলেন ঃ তুমি শিবের প্রিয়, কিন্তু আজ থেকে তুমি হবে তাঁর অপ্রিয়। যে মিথ্যে বলে তার ফুলে কি কখনো শিবের পূজা হয় ?

নারদ সবে মুখ ঘুরিয়েছেন। সামনে পড়ে গেলেন সেই ব্রাহ্মণ।

নারদ বললেন ঃ তুই রাক্ষস হ, দেবতার প্রসাদকে করেছিস পেষণযন্ত্র! তুই রাক্ষস হ।

ঃ অমন শাপ দেবেন না, দেবেন না, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।

ব্রাহ্মণ কাতর স্বরে নারদের পায়ে ভেঙ্গে পড়লেন।

নারদ বললেন ঃ আমি বলেছি, রাক্ষস তুমি হবেই। তবে মুক্তি পাবে।

শ্রীরামের হাতে তোমার মৃত্যু হবে, শঙ্করের করুণায় পাবে নতুন জন্ম।

অভিশাপ উচ্চারিত হল। পলকও পড়তে পেল না, নারদ দেখলেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ নেই, তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এক প্রকাণ্ড রাক্ষস, বিরাধ রাক্ষস।

নারদ মনে মনে শঙ্করের নাম নিলেন। তারপর ধীরেধীরে মন্থর পায়ে আনমনে যেমন এসেছিলেন তেমন চলে গেলেন। ওঁর বীণার তারে তারে বাতাস কেঁপে কেঁপে আনন্দের জলতরঙ্গ বাজিয়ে কত কথাই না বলতে চাইল।

১১· গণেশ

জয়া বলেছিল। বিজয়াও বলেছিল। হাজার হলেও সখী। তারা পার্বতীর সুবিধের কথাই বড় করে দেখেছিল। পার্বতী মনে মনে ভেবেছিলেন, ওরা ভালকথাই বলছে। একটা কিছু করতে হয়।

কিন্তু তখন-তখনই কিছু আর করা হয়নি। দ্বারে কখনো নন্দী থাকে, কখনো ভৃঙ্গী থাকে। ওরা শিবেরই অনুচর। তাহলেও মাঝে মাঝে বড় অসুবিধেয় পড়তে হয়। এমন একজন দ্বারপাল কি পার্বতী ঠিক করতে পারেন না যে একান্ত তাঁরই, শুধু তাঁরই কথা শুনবে। সখীরা বলেছিল। পার্বতীর মনে কথাটা ধরেছিল। কিন্তু গা করেননি।

অবশেষে গা করতেই হল। সখীদের কথা কিঞ্চিৎ বাসি হলে তবে মান পেল।

পার্বতী স্নান করছেন। দ্বারে নন্দী। নন্দীকে দেবী বলে রেখেছিলেন ঃ কাউকে ঢুকতে দিও না, শিবকেও না।

দেবী স্নান করছেন। শিব এলেন। নন্দী তাঁকে দেবীর কথা বললেন। শিব চটেমটে নন্দীকে একচোট ভৎর্সনা করলেন। তারপর গটগট করে চলে গেলেন ভিতরে। পার্বতী খুব অপ্রস্তুত হলেন। স্নান তাঁর মাথায় উঠল। ভাল করে না নেয়েই তিনি উঠে পড়লেন।

পার্বতী বুঝলেন, সখীরা যা বলেছিল সে রকম একটা কিছু আর না করলেই নয়।

জল থেকে পার্বতী একতাল কাদা তুললেন। টিপেটুপে ধীরে ধীরে নির্মাণ করলেন এক অপরূপ কুমার। সুন্দর করে বেশ রচনা করে সুন্দর সুন্দর আভরণে তাকে সাজিয়ে দিলেন। তারপর প্রাণসঞ্চার, আশীর্বাদ। বললেন ঃ তুমি আমার পুত্র। দ্বারে থাকবে, আমার ঘরে কাউকে কখনো ঢুকতে দিও না। মনে রেখ তুমি শুধু আমারই পুত্র। তুমিই আমার সব।

গণেশের হাতে একখানি লাঠি দিয়ে দেবী তাকে দরজায় দাঁড় করিয়ে

দিলেন। দেবী একবার গণেশের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। আহা কি সুন্দর! দেবী আনন্দে উদ্বেল হলেন। এগিয়ে এসে গণেশকে খুব আদর করলেন। বললেন ঃ দেখো কেউ যেন না ঢোকে।

পার্বতী নিশ্চিন্ত। সখীরাও খুব খুশি। এবার সবাই মিলে সাধ মিটিয়ে নাওয়া যাবে।

একদিন পার্বতী সখীদের নিয়ে স্নান করছেন। এমন সময় শিব এলেন, সঙ্গে প্রমথের দল।

শিব ভিতরে প্রবেশ করতে গিয়েই বাধা পেলেন। গণেশ বললেন ঃ মা স্নান করছেন। ভিতরে যেও না।

শিব বললেন ঃ আমি শিব। তাই যাচ্ছি।

শিব প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। গণেশ লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন। পথ আগলে বললেন ঃ শিবটিব বাপু বুঝি না। মায়ের মানা আছে। ঢুকো না।

শিব বললেন ঃ তুমি একটি আস্ত গাধা। পার্বতীর স্বামী আমি, আর আমিই ঢুকব না!

শিব প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। গণেশ আবার তাড়না করলেন।

বললেন ঃ ও সব কথা রাখ। এখন ঢুকবার চেষ্টা কর না। যাও।

শিব এবার রেগে গেলেন। প্রমথদের বললেন ঃ এটি আবার কোত্থেকে জুটল! কি করছে দেখ।

শিব এক পাশে গিয়ে বসে পড়লেন। তিনি বড়ই রেগে গেছেন।

প্রমথরাও রেগেমেগে গিয়ে দরজায় দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল ঃ কে হে তুমি? কোত্থেকে জুটলে? ভাবটা কি শুনি!

গণেশ বললেন ঃ তোমরাই বা কারা? আসছই বা কোত্থেকে? চেহারার তো দেখছি দারুণ বাহার। এখন ভালোয় ভালোয় ভাগো।

প্রমথরা আর হাসি আটকাতে পারল না। ওরা খুব হাসল। বলাবলি করল ঃ কে রে বাপু? কথাবার্তা তো রীতিমত শত্তুরের মত বলছে।

ওরা গণেশকে বলল ঃ ওহে, আমরা শিবের অনুচর। পার্বতীর পুত্র ভেবেই তোমাকে কিছু বলছি না, নইলে এতক্ষণ ধুলোয় মিশে যেতে। ভালোয় ভালোয় এখন দরজা ছাড়। মিছি মিছি মরণ ডেকে আনাটা কি ভাল?

গণেশ কিছু বললেন না। গ্যাঁট হয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রমথরা শিবকে এসে বলল ঃ ছোঁড়া নিতান্তই নাছোড়।

শিব বললেন ঃ তোমরা আছ কি করতে? ওটিকে দূর করতে পারছ না!

প্রমথরা এসে তর্জন শুরু করল ঃ কে তোকে এখানে থাকতে বলেছে? ভালোয় ভালোয় বিদেয় না হলে একদম গুঁড়িয়ে দেব। দ্বারপাল তো আমরা। তুই কে? তাও আবার শিবের সঙ্গে স্পর্ধা! ছোঁড়া শিয়াল হয়ে লড়তে চায়

সিংহের সঙ্গে! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।

গণেশ লাঠি নিয়ে ধেয়ে এলেন। বললেনঃ এখান থেকে ভাগো, নইলে এমন শিক্ষা দেব যে.... .।

প্রমথরা পালাতে লাগল। পালাতে পালাতে বললঃ এতো জ্বালালে দেখছি। কোথায় যাই, কিই বা করি। লোকেই বা কি বলবে? কিছু একটা করতে হয়।

ক্রোশখানেক দূরে শিব অবস্থান করছিলেন। ওরা এসে সব বলল। শিব তিক্ত হাসি হেসে বললেনঃ তোমরা কি এক একটা শুয়োর সব। লোকে যে ছি ছি করবে। যাও, যাহোক ও দরজা থেকে ওকে হটিয়ে দাও।

প্রমথরা আবার ছুটে এল। তেড়ে বললঃ এখুনি যদি এখান থেকে বিদেয় না হোস তাহলে তোকে একেবারে শেষ করে দেব।

গণেশ কি করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিছুটা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওদিকে পার্বতী সখীদের বললেনঃ দ্যাখ্ তো বাইরে অত গোল কিসের?

সখী এসে সব দেখে মনে মনে খুব খুশি হল। গিয়ে দেবীকে বললঃ ভাগ্যে গণেশ ছিল, নইলে শিব ও প্রমথরা সবাই বাড়ির ভিতরে চলে আসত। প্রমথরা খুব গালমন্দ করছে। কিন্তু আমাদের গণেশ কিছুতেই ওদের ঢুকতে দেয়নি। এখনো কথা কাটাকাটি চলছে। ওরা যদি হার স্বীকার করে, বিনয় করে বলে তবে না হয় ভিতরে আসতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখনও তর্জন করছে।

ঃ ... .।

ঃ গণেশকে গালমন্দ করা যা আমাদের করাও তা। তুমি কিন্তু সখী ছেড়ো না। মান কর। শিব কি আর দুদণ্ড বাইরে অপেক্ষা করতে পারতেন না! একেবারে বল প্রকাশ করতে উদ্যত হলেন?

পার্বতী সখীকে বললেনঃ গণেশ বেশ করেছে। ওকে আমার হয়ে বলে আয় যে আমি খুব খুশি। কিন্তু ও পারুতে ওরা এখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গর্জন করছে! হাত গুটিয়ে বসে আছে কেন?

গণেশ জননীর কথায় কবচ পরলেন, উষ্ণীষ বাঁধলেন। দুহাতে উরু চাপড়ে বললেনঃ আমি শিবার পুত্র। তোমরাও শিবের অনুচর। আমি দ্বারপাল, তোমরাও। তোমাদের উচিত শিবের আদেশ পালন করা। মায়ের আদেশ পালন করতে আমিও প্রস্তুত। যুদ্ধে আমাকে পরাজিত কর, পথ পাবে। কিংবা নত হও, পথ পাবে। নইলে নয়।

প্রমথরা শিবের কাছে এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে

সব বর্ণনা করল।

শিব বললেন ঃ একদিকে আমি ও তোমরা, অন্যদিকে গৌরী ও গণেশ। এক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্তব্য নয়। কিন্তু না করলেও মান যায়। বিনয় করলে লোকে বলবে শিব স্ত্রীর বশ্য। তাই একমাত্র পথ যুদ্ধ। যাও! গণেশ একা কি করবে? তোমরা যুদ্ধে দক্ষ, আমার আত্মীয়—তথাপি বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছ? পার্বতী স্ত্রীলোক। যুদ্ধ তিনি জানেন না।

যুদ্ধসাজে সেজে প্রমথরা এল ধেয়ে। গণেশও তৈরি হলেন। গণেশ বললেন ঃ তোমরা যুদ্ধে ধুরন্ধর, কিন্তু আমি আজই সর্বপ্রথম যুদ্ধ করব। তাই হারলেও আমার কোনরূপ লজ্জা নেই, কিন্তু হারলে তোমাদের মুখ রাখাই হবে দায়। মায়ের আজ্ঞায় অদ্য আমি যুদ্ধ করব, এ যুদ্ধ মায়ের যুদ্ধ। তোমরাও করছ শিবের আজ্ঞায়, এ যুদ্ধ শিবের যুদ্ধ। ন্যায় অন্যায় তাঁরাই বিচার করবেন।

প্রমথরা রাগে গরগর করল। অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনঝন করল। দাঁতে দাঁতে কড়মড় করল। অবশেষে ফেটে পড়ল হুংকারে।

নন্দী অগ্রসর হল, ভৃঙ্গীও অগ্রসর হল। একজন এদিক থেকে, একজন ওদিক থেকে। দুজন দুদিক থেকে গণেশের দুই পা ধরে আকর্ষণ করল। গণেশ দুই হাতে দুজনকে খুব প্রহার করে পা ছাড়িয়ে নিলেন। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তুলে নিলেন অর্গল। তারপর প্রকাশ পেল তাঁর পরাক্রম। কারও মাথা ফাটল, কারও হাত ভাঙল, কারও পা, কারও পিঠ, কারও পাঁজর। প্রমথরা বাপ বাপ বলে এদিকে ওদিকে সেদিকে ছুটে পালাতে থাকল। একদল মৃগ যেন সিংহ দেখেছে।

ওদিকে নারদ গিয়ে স্বর্গে সব রটিয়ে দিলেন ঃ গণেশের সঙ্গে শিবের যুদ্ধ, শিব এঁটে উঠছেন না।

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র সবাই ছুটে এলেন। শিবকে বললেন ঃ প্রভু, আজ্ঞা করুন।

শিব দুর্গত প্রমথদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে এলেন। ব্রহ্মাকে বললেন ঃ তুমি গিয়ে গণেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত কর। নতুবা নির্ঘাৎ প্রলয় ঘটবে।

ব্রহ্মা অগ্রসর হলেন। সঙ্গে সঙ্গে চললেন ঋষিগণ, তুন্দিল প্রমুখ শিবের সব অনুচর।

গণেশ বৃথা কালক্ষেপ করলেন না। ত্বরিতে এসে ব্রহ্মার দাড়ি উৎপাটন করলেন। ব্রহ্মা কাতর স্বরে বলে উঠলেন ঃ আমি নই আমি নই, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি। ক্ষমা কর ক্ষমা কর, শান্ত হও।

গণেশ এসব কথা কানে তুললেন না। অর্গল ধারণ করে ব্রহ্মাকে মারতে

উঠলেন। সবাই প্রাণভয়ে পলায়ন শুরু করল। গণেশ ছুটে এলেন। হাতে উদ্যত অর্গল। কেউ আহত হলেন, মাটিতে পড়ে গেলেন। কেউ শুধু ভয়েই পায়ে পায়ে জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

নিদারুণ ক্রোধে শিবের বাক্যস্ফূর্তি হল না। ওঁকে ঘিরে দেবগণ, ভূতপ্রেত পিশাচগণ। চতুর্দিক থমথম করতে থাকল।

সহসা শিবের কণ্ঠস্বরে বাতাস খান খান হল: যাও, যুদ্ধ কর।

চকিতে চঞ্চলতা বিস্তারিত হল। দেবতা ভূত প্রেত পিশাচ, ষন্মুখ প্রমুখ প্রমথ সবাই একসঙ্গে নড়েচড়ে উঠল। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব। চতুর্দিকে অস্ত্রের ঝনৎকার।

মাত্র কয়েক পলের ব্যবধান। কৈলাসের আকাশে বাতাসের গতি পরিবর্তিত হল। দেবতারা ধাবিত হলেন। ভূত, প্রেত, পিশাচ, প্রমথ—সবাই ধাবিত হল। অস্ত্র বিমোচন করতে করতে শিববাহিনী অগ্রসর হল। ধরাদেবী ব্যাকুল হলেন, সংশয়ে কম্পিত হলেন: হয়ত তলিয়ে যাবেন রসাতলে। সংহারের কাল এখনো ঘনায়নি, তবু বুঝি ঘটে সংহার। শিব হয়ত অকালে উন্মত্ত হয়েছেন।

পার্বতী শক্তি সৃষ্টি করলেন। গণেশ তাঁরই পুত্র। মাতার জন্যই অদ্য গণেশ পবাক্রম প্রকাশ করেছেন। পুত্রের জন্য এবার মাতার শক্তিবিস্তার।

শিবসৈন্যের তাবৎ অস্ত্র বিফল হতে লাগল। বিস্ময়ের পর বিস্ময়, বিহ্বলতা। শিবসৈন্য দেখল: কালো পর্বতের ন্যায় কে এসে দাঁড়িয়েছেন সমর ক্ষেত্রে। প্রকাণ্ড হাঁ বিস্তাব করে সমস্ত অস্ত্র নিঃশেষে গলাধঃকরণ করছেন। ওদিকে আর এক শক্তি: অসংখ্য বাহু, শরীরে বন্ধ যেন বিদ্যুৎ।

যুদ্ধক্ষেত্র। দেবগণ: কে কেথায়? ভূতপ্রেতপিশাচ: কে কোথায়? চতুর্দিকে শুধু গণেশের পরিঘ। পরিঘে পরিঘে ব্যাপ্ত যুদ্ধক্ষেত্র।

একদিকে একা গণেশ, অন্যদিকে বিশাল শিববাহিনী। অদ্য গণেশ যেন একাই লক্ষকোটি। একদা মন্দব পর্বত সমুদ্র আলোড়িত করেছিল। অদ্য গণেশ শিবের সৈন্যসাগর সংমথিত করলেন।

শিববাহিনী চোখে অন্ধকার দেখল। তারা হয় হত আহত, নয় ভীত পলায়নপর।

আকাশে রম্ভা, মেনকা, উর্বশী, তিলোত্তমা। ওঁরা যুদ্ধ দেখছেন। ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন। ওঁদের হাতে ফুল চন্দন। নারদ ও আরো অনেকে যুদ্ধ দেখে বিমুগ্ধ হলেন। মনে মনে বারবার ঘুরে ঘুরে একটি কথাই ওঁদের মুখে আবৃত্ত হল: গণেশের এতরূপ, এত গুণ, এত বীর্য!

পৃথিবী থরথর করে কাঁপতে থাকল, সমগ্র পার্বত্যভূমি জুড়ে ভয়ংকর গমগম ধ্বনি উঠল। অন্তরীক্ষে চঞ্চল হল গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাচয়।

মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেল ষন্মুখ। অস্ত্রের পর অস্ত্র। কত শত অস্ত্র। কিন্তু সমস্ত অস্ত্র নিস্ফল হল।

শিববাহিনী রণে ভঙ্গ দিল। সকলে শিবকে এসে বলল : পূর্বে কত যুদ্ধ দেখেছি, কত যুদ্ধ করেছি, কত সুন্দর কথা শুনেছি—কিন্তু এমন ভীষণ যুদ্ধ কখনও দেখিনি, যুদ্ধ যে এমন হতে পারে তাও শুনিনি। এবার আপনি স্বয়ং অবতীর্ণ হোন। মনে হচ্ছে মহাপ্রলয়ের কূলে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এবার একমাত্র গতি আপনি।

শিব প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন। ছুটে এলেন সমরক্ষেত্রে। দেবগণ প্রমথগণও ছুটলেন শিবের পশ্চাতে।

যুদ্ধক্ষেত্র। সহসা নারদ এসে নমস্কার করে দাঁড়ালেন। শিবকে বললেন : বেঁচে থাকলে জগৎ জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। যেমন করে হোক ওকে বধ করুন।

আবার যুদ্ধ শুরু হল। শিব নিজেও কেমন যেন বিমূঢ় বনে গেছেন। এ তো মহাশক্তি, অবিনাশী। একমাত্র উপায় ছল, কৌশল—অন্য পথে শুধু পরাজয়, শুধু গ্লানি।

দেবতা ও প্রমথদের মধ্যে নতুন উৎসাহ জাগ্রত হল। শিব এসেছেন, বিষ্ণু এসেছেন। যুদ্ধে স্বয়ং ওঁরা দুজন অবতীর্ণ।

বিষ্ণু শিবকে বললেন : গণেশ তমোগুণে আচ্ছন্ন। কপটতা ছাড়া ওঁকে এঁটে উঠা দুঃসাধ্য। আমি মায়া বিছিয়ে মুগ্ধ করছি, আপনি বিনাশ করুন।

বিষ্ণুর মায়ায় গণেশের দুই মহাশক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ল। গণেশ গদা নিক্ষেপ করলেন। বিষ্ণু পশ্চাদপসরণ করলেন।

ক্রোধে দিশাহারা হয়ে শিব ত্রিশূল নিক্ষেপ করলেন। ত্রিশূল ব্যর্থ হল। শিব পিনাক ধারণ করলেন। গণেশের গদার আঘাতে পিনাক ছিটকে মাটিতে পড়ল। পঞ্চ অস্ত্রে কাটা পড়ল শিবের পঞ্চ বাহু।

প্রমথরা হাহাকার করে উঠল। দেবতারা এদিকে ওদিকে সেদিকে পাগলের মত ছুটে পলায়ন করলেন। বিষ্ণু মনে মনে তারিফ করলেন। তিনি বহু যুদ্ধ করেছেন, বহু বীর্য দেখেছেন, কিন্তু এমন আশ্চর্য শৌর্য তিনি কোনদিন অবলোকন করেননি। বিষ্ণু বিমুগ্ধ চিত্তে ভাবছেন : আহা কি রূপ! কি গুণ! কি বল!

সহসা গণেশের গদা এসে বিষ্ণুর চক্রের উপর আছড়ে পড়ল। গদা চূর্ণ হল। সুদর্শন চক্র নিয়ে বিষ্ণু আত্মরক্ষা করতে থাকলেন। চূর্ণিত গদা নিয়েই গণেশ আবার আক্রমণ করলেন। গরুড় সেই গদা ধরে ফেললেন।

গদার পর গদা। গণেশ নিক্ষেপ করছেন। গদাবৃষ্টি। বিষ্ণু বারবারই সেই গদা দূরে নিক্ষেপ করেন। জয়, বিষ্ণুর জয়। বারবারই বিষ্ণুর জয়।

ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হল। কিন্তু যত যাই হোক বিষ্ণু কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছেন না। মহাদেব পিছন থেকে ত্রিশূলের আঘাত হানলেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল গণেশের শির।

ওদিকে নারদ ছুটে গেছেন পার্বতীর পাশে। বললেন: গণেশের শির মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। শিবই এই অনর্থের কারণ। আপনি যেন নিতান্ত সহজেই ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবেন না।

গণেশের পতন সংবাদে দেবী দারুণ ব্যথিত হলেন। ক্ষণকাল কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। তারপর সহসা যেন দেবী জেগে উঠলেন। গণেশ নিহত। এবার সংহার। জগতের অন্তকাল।

সহস্র সহস্র শক্তি নির্মিত হল। সহস্র সহস্র শক্তি করজোড়ে দেবীর আজ্ঞা প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেবী বললেন: জগৎ সংহার কর। দ্বিধা নয়, সংকোচ নয়। কেউই আমার আত্মীয় নয়। জগৎ সংহার কর।

আকাশে রক্তের তরঙ্গ। সমগ্র প্রকৃতি ভয়ংকর কুম্ভকে যেন স্তব্ধ হয়ে বসেছেন। এবার রেচন: মহাবিক্ষোভ, মহাধ্বংস।

চতুর্দিক থেকে ধেয়ে এল শতসহস্র শক্তি। সম্মুখের সমস্ত মানুষ, যক্ষ গন্ধর্ব, পিশাচ, প্রমথ সব পলকে বিলীন হতে লাগল তাদের মুখবিবরে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলেন: দেবতারা বিলীন হচ্ছেন। শুধু একবার ধরা, তারপরই মুহূর্তে বদনবিবরে সূর্যচন্দ্রইন্দ্র বিলীন হচ্ছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ভয়ে সংশয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুঝলেন, পার্বতীর রোষে আজ সৃষ্টি নিশ্চিহ্ন হবে। ওঁর প্রসন্নতাই একমাত্র পথ।

শিব অশক্ত। ওঁর কোমর ভগ্ন হয়েছে। যন্ত্রণায় উনি কাতর। তদুপরি পার্বতী এখন রোষাবিষ্ট। ওঁর সম্মুখে এখন এ অবস্থায় যেতে শিব ভরসা পান না। ব্রহ্মা বিষ্ণু, দেবতা, যক্ষ কিন্নর কেউই সাহস করতে পারলেন না। সবাই দূরে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

চতুর্দিকে শুধু উত্তাপ, উত্তাপ। চতুর্দিকে ভারাক্রান্ত বায়ু। সহসা কোথা দিয়ে কে জানে এক ঝলক শীতল বায়ু এসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে যেন কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত করল। নারদ এসে দাঁড়ালেন। বললেন: একটা কিছু উপায় করুন। দেবীকে প্রসন্ন করুন। সব যে গেল।

নারদ শিবমন্দিরে গমন করলেন। ঋষিগণ ওঁর অনুগমন করলেন।

স্তবের ধ্বনিতে ভরল মন্দির। একধ্বনি, বহুধ্বনি—প্রতিধ্বনিত হয়ে বহু বহু হয়ে নিস্তব্ধ বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল। দেবী নীরব নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁরা প্রণত হয়ে বললেন: ক্ষমা করুন, নইলে জগৎ যে একেবারে যায়। শিব আপনার স্বামী, দেবগণ ও আমরা আপনার পরমাত্মীয়। আত্মীয়কে ক্ষমা করুন।

দেবী বললেন ঃ যদি গণেশ জীবিত হয়ে তোমাদের মধ্যে পূজনীয় হয়, কলের শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলেই চরাচরে নেমে আসবে শান্তি।

নারদ এসে শিবকে সমস্ত নিবেদন করলেন। শিব সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হলেন। ন্তু কোথায় গণেশের সেই শির? অপ্সরারা ধরেছিল, কিন্তু এখন সে াথায়? এই লণ্ডভণ্ডের মধ্যে কোথায় সেই শির?

শিব বললেন ঃ ধড়টা তো আছে, ধৌত কর, ধৌত কর। পূজা কর। মরা উত্তর দিকে গমন কর। প্রথমেই যাকে পাবে তারই শির ছেদন করবে। ই দেহের উপর সংস্থাপিত হবে সেই শির।

কেউ গণেশের দেহ ধৌত করলেন, কেউ ধাবিত হলেন উত্তরে।

কোথায় কে? কোথায় কে? অকস্মাৎ ওঁরা যেন প্রাণ পেলেন। একটি হস্তী, কটি মাত্র তার দাঁত।

গণেশের দেহে হস্তীর মস্তক সংস্থাপিত হল। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ার্থনা করলেন ঃ যে তেজ থেকে আমরা উৎপন্ন গণেশের দেহে সেই তেজ দমন্ত্র বলে সঞ্চারিত হোক।

গণেশ গাত্রোত্থান করলেন। যেন সুখে নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, নিদ্রাভঙ্গে ঠে দাঁড়িয়েছেন।

গণেশ এলেন। কমণীয় খুশিরা পার্বতীর কমনীয় মুখে যেন খেলা করে বল। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, সুন্দব বস্ত্রে আভরণে পুত্রকে সাজিয়ে য়ে মাতা বললেন ঃ খুব কষ্ট হয়েছে? তা হোক। তবু তুমি ধন্য। আজ কে সকলের পূজ্য হলে। মুখে দেখছি তোমার সিঁদুর। এই ভাল, এই িঁদুরেই হবে তোমার পূজা। তোমার পূজায় সবার সব অভীষ্টই হবে দ্ধ।

দেবী সমস্ত শক্তি সংহার করলেন। শক্তিরা দেবীর শরীর মধ্যে বিলীন ন। উদ্বেগের মেঘে দেবতাদের মন আচ্ছাদিত হয়েছিল। কোথা দিয়ে কি ন, সমস্ত মেঘ গেল দূরে, নির্মল আকাশ বিস্তার করল অযুত হাস্য।

দেবতারা শতরকমে দেবীর স্তুতি করলেন। আদর করে গণেশকে এনে সয়ে দিলেন শিবের কোলে। শিব গণেশের মাথায় হাত রাখলেন। দেবতাদের লেন ঃ আমার পুত্র।

গণেশ পিতামাতাকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু নারদ ও অন্যান্য ঋষিদের াম করলেন। বললেন ঃ জীবের স্বভাব নিজের পক্ষ সমর্থন করা। তাই রছি। আপনারা পীড়িত হয়েছেন। আমাকে ক্ষমা করবেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর সমস্বরে বললেন ঃ তুমি আমাদের মতই পূজ্য। মাদের পূজায় তোমার পূজাই হবে অগ্রে। তোমার পূজা না হলে আমাদের জার ফল হবে নামমাত্র।

পার্বতী ও অন্যান্য দেবগণ বললেন ঃ গণেশ আজ থেকে গণপতি।

শিবও ওঁকে ভরিয়ে তুললেন বরে বরে।

চতুর্দিকে তখন কত নৃত্যগীত, কত বাদ্যঘটা। শিব বললেন ঃ কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীর প্রথম প্রহরে পার্বতী তোমাকে নির্মাণ করেছেন। ঐ চতুর্থীতেই পালিত হবে তোমার ব্রত। যারা ব্রত করবে, সুখ হবে তাদের নিত্য সহচর।

পার্বতী চরমভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবার পরম আনন্দে ভাসলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। আনন্দ যেন ফেটে পড়তে চাইল। অথচ পথ পেল না।

ওদিকে স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠল, ফুলের বৃষ্টি হতে লাগল। পার্বতীর আনন্দ এদিকে পথ পেল না, পেল ওদিকে ঐ স্বর্গে। হাজারো দেবতায় ছড়িয়ে পড়ে হাজারো পথে যেন পার্বতীর পরম আনন্দ গলে ঝরে পড়ে পড়েও কিছুতেই ফুরোতে চাইল না।

১২. গণেশের বিবাহ ও কার্তিকের রোষ

শুক্লপক্ষের চাঁদ। কলায় কলায় বাড়ে। বেড়ে বেড়ে অবশেষে পূর্ণিমা শিব ও পার্বতীর পুত্রস্নেহ কলায় কলায় বাড়ল। অবশেষে এল পূর্ণিমা।

কার্তিক ও গণেশ। দুই পুত্র। মাতা ও পিতার মনে স্নেহের সুখ কার্তিক সেবা করেন, গণেশও সেবা করেন। শিব ও শিবা ওঁদের সেবায় বিগলিত হলেন।

কার্তিকে গণেশে বড় প্রীতি। কিন্তু রাত দিন ওঁদের বিবাদ। কার্তিক বলেন ঃ আমার বিবাহ হবে আগে। গণেশ বলেন ঃ আমার আগে।

শিব ও শিবা মাঝে মাঝেই ভাবনায় পড়েন। দুজন, বিবাহ দিতে গেলে আগে পরে করতেই হবে। কিন্তু কি করবেন ? একে দিলে ও ক্ষুব্ধ হবে, ওকে দিলে এ ক্ষুব্ধ হবে।

মাতায় পিতায় মিলে যুক্তি আঁটলেন। গণেশকে ডাকা হল। কার্তিকও এসে দাঁড়ালেন।

ওঁরা বললেন ঃ তোমরা দুজনই আমাদের পুত্র। দুজনই আমাদের পরম প্রিয়। দুজনেই আমাদের কাছে এক। তোমাদের বিবাহ দেব, কিন্তু সমস্যা কার বিবাহ আগে হবে। আমরা স্থির করেছি, যে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আগে এসে আমাদের কাছে উপস্থিত হবে তারই বিবাহ প্রথমে হবে।

কার্তিক আর বাক্য ব্যয় করলেন না। এক পলও আর দাঁড়ালেন না। ত্বরা করে বেরুলেন। আগে ফিরতে হবে। আগে ফিরলে আগে বিবাহ ঃ সুখ আনন্দ।

গণেশ তেমন গরজ দেখালেন না। বসে বসে উনি ভাবনার সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন।

গণেশ নিজেকে জানেন। পৃথিবী প্রদক্ষিণ দূরের কথা, ক্রোশ খানেক গেলেই উনি হাঁপিয়ে উঠেন। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসে বিবাহ করতে হলে এ জন্মে আর তাঁর সাধ পূর্ণ হবার নয়। গণেশ অন্য পথ সন্ধান করলেন।

গণেশ চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে গেছেন। গভীরে, আরো গভীরে। যেতে যেতে তল পেলেন। অবশেষে মিলল মুক্তা।

গণেশ নিশ্চিন্ত আরামে ধীরে সুস্থে স্নান সমাপন করলেন। দুখানি আসন বিছিয়ে পিতা ও মাতাকে বললেন ঃ এসে একটু বসুন। পূজা করব।

পার্বতী ও পরমেশ্বর গণেশের কথায় খুশি হয়ে আসনে এসে উপবেশন করলেন। গণেশ তাঁদের পূজা করলেন। প্রদক্ষিণ করলেন ঃ একবার, দুবার, সাতবার।

গণেশ বললেন ঃ এবাব দিন।

ঃ কি ?

ঃ বিবাহ।

ঃ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলে না, অথচ বিবাহ চাইছ, সে কি করে হয় ? কার্তিক গেছে, তুমিও যাও। না বেরিয়ে ঘরে বসে বসেই বিয়ে বিয়ে করছ ?

ঃ আমি সাত-সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলাম। তথাপি বলছেন করিনি।

ঃ কখন করলে ? বাড়িতেই তো বসে রয়েছ।

ঃ আপনাদের পূজা করে সাতবার প্রদক্ষিণ করলাম। এতেই তো হয় পৃথিবী প্রদক্ষিণ। বেদে তো এই রকমই বলে। বেদ কি তাহলে মিথ্যে ? বেদ মিথ্যে হলে আপনার স্বরূপকেও যে মিথ্যে বলতে হয়। হয় বিবাহের ব্যবস্থা করুন নইলে স্পষ্ট করে বলুন যে বেদ মিথ্যে।

শিব ও পার্বতী খুবই অবাক হলেন। গণেশ বলে কি! গণেশেব এত বুদ্ধি!

ওঁরা বললেন ঃ বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ, ঠিকই করেছ। তুমি নিশ্চিন্ত হও। বিবাহ যখন দেব বলেছি তখন নিশ্চয়ই দেব।

বিশ্বরূপের দুই কন্যা ঃ সিদ্ধি ও বুদ্ধি। গণেশের সঙ্গে সিদ্ধি ও বুদ্ধির বিবাহ হল। গণেশের বিবাহে অনেক ঘটা হল। দেবতারা খুবই আনন্দ করলেন। গণেশও সুখে একেবারে মগ্ন হয়ে গেলেন। দুই পত্নী। সিদ্ধি ও বুদ্ধি। গণেশ লাভ করলেন দুই পুত্র ঃ লক্ষ ও লাভ।

কার্তিক ফিরে এসেছেন। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে তিনি সবে কৈলাসে পা দিয়েছেন। আশায় ভরপুর হয়ে দ্রুত পা ফেলে উনি এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাধা পড়ল।

নারদ এসে চুপি চুপি বললেন ঃ ওহে কার্তিক, জানো তো না। অথচ কি ঠকাটাই না ঠকলে। ছি ছি, বাপ মা হয়ে কি ছেলের সঙ্গে এমন ছল করে? ছি ছি। তুমি তো ছিলে না। বাপ মা বললেন, অমনি ভাল ছেলের মত বেরিয়ে পড়লে। যেই বেরুলে অমনি লেগে গেল গণেশের বিয়ে।

কার্তিকের খুব রাগ হল। কৈলাসে যখন এসেছেন তখন একেবারে ফিরে যাওয়াটা ঠিক নয়। পিতা ও মাতাকে একবার প্রণাম করেই কার্তিক হন হন করে বেরিয়ে পড়লেন।

ওঁরা পিছু ডেকে বললেন ঃ কোথায় যাও? এলে অমনি দৌড়। দাঁড়াও বসো। তোমার যে এবার বিয়ে।

ঃ আমি আর থাকব না। আমার সঙ্গে ছল করেছেন। এখানে আর নয়।

কার্তিক চলে এলেন ক্রৌঞ্চ পর্বতে। সেখানেই রয়ে গেলেন। বিবাহও করলেন না।

শিব ও পার্বতী পুত্রকে না দেখে থাকতে পারলেন না। ছুটে এলেন। ওঁরাও রয়ে গেলেন ক্রৌঞ্চ পর্বতে। ক্রৌঞ্চ পর্বতে মল্লিকার্জুন নামে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকাশিত হল।

শিব ও পার্বতী এসেছেন এখানেও। কার্তিক অন্যত্র গমনে উদ্যত হলেন। দেবতারা হাত জোড় করে এসে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ যেও না, যেও না।

কার্তিক রইলেন, তবু তিন ক্রোশ দূরে। প্রতি অমাবস্যায় সেখানে শিব আসেন। প্রতি পূর্ণিমায় সেখানে পার্বতী আসেন ॥

১৩. মহাতীর্থে মহাগতি

রোগে রোগে উনি কাতর হয়ে পড়েছেন। মরণ হয়ত শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ তাঁর কত কাজ বাকি। এত তাড়াতাড়ি যে ডাক আসবে তা তিনি ভাবেননি।

মায়ের শয্যাপার্শ্বে উপযুক্ত দুই পুত্র। মায়ের কষ্ট দেখতে ওদেরও বুক ফাটছিল। ওরা বুঝল ঃ শেষ সময় ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। ওরা বলল ঃ কোন কাজ বাকি থাকলে এই বেলা বল। আমরা করব।

মা কোনমতে বললেন ঃ অনেক কাজ বাকি। যদি কর, সুখে মরতে পাই।

বড় ছেলে বলল ঃ বল। নিশ্চয়ই করব।

মা বললেন ঃ বড় সাধ ছিল কাশী যাবার। কিন্তু হল না। সময় হয়ে এল।...আমার অস্থি গঙ্গায় দিও। তোমাদের ভাল হবে।

ঃ দেব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও।

মাতার মৃত্যু হল।

রেবা নদীর পশ্চিমতীরে কর্ণকীপুর। সেখানেই এরা বাস করত। বাবা ছিলেন। ছেলে দুটি বড় হতেই উনি কাশীবাসী হলেন। সেখানেই উনি দেহ রাখেন।

বাবা ছিলেন না। মা ছিলেন মাথার উপর। মাই তাদের বিয়ে-থাওয়া দিয়ে সংসারী করেছেন। সেই মাও আজ চলে গেলেন।

শ্রাদ্ধ হল। সব হল। বড় ছেলে সুবাদী কিন্তু বিমনা। মায়ের শেষ ইচ্ছা, তার কথা দেওয়া—সুবাদী ভোলেনি। শ্রাদ্ধ শেষ হতেই সে বেরিয়ে পড়ল। স্ত্রী ও পুত্রদের নানাভাবে আশ্বস্ত করে একজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে সুবাদী যাত্রা করল।

সারাদিনে যোজনপথ পেরিয়ে ওরা এসে পৌঁছুল শুভ গ্রামে। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আর চলা নয়। এই গ্রামেই এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে সুবাদী অতিথি হল।

সুবাদী আহ্নিক সেরে হরির স্তবে একাগ্র হল। সুবাদীর একাগ্রতায় বাধা পড়ল। গৃহস্বামী ফিরেছেন। এসেই হেঁকে বললেনঃ ওগো, গোরুটা যে দেখছি দোয়া হয়নি।

তাড়াতাড়ি বাছুরটা এনে স্ত্রীকে ডাকলেনঃ কই এসো। আর দেরি ক'র না।

বাছুর ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কষে টেনে ধরলেন। কোনমতে খুঁটিটায় বেঁধে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। দুরন্ত বাছুর ব্রাহ্মণকে সজোরে এক চাঁট কষিয়ে দিল। ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে হাঁটু দিয়ে বাছুরটিকে খুব এক চোট গুঁতিয়ে দিলেন। গুঁতো খেয়ে বাছুরটি শান্ত হল।

দোয়া শেষ হল। কিন্তু ব্রাহ্মণ বাছুরটিকে ছাড়লেন না। বললেনঃ থাক, ব্যাটা বাঁধাই থাক।

সামনেই উপবাসী সন্তান। গোরুটির দুচোখ গড়িয়ে জল পড়ল।

বাছুর বললঃ কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?

গোরু বললঃ ব্রাহ্মণ তোমাকে যেভাবে মারল, যেভাবে বেঁধে রেখেছে তাতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি খিদেয় মরছ। অথচ আমি মা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।

বাছুর বললঃ কি আর করব বল? কর্মের ফলে এখানে এসে বাঁধা পড়েছি। ফল ভুগতেই হবে। মারা বা রাখা ওদেরই হাতে। কাজ করা সহজ। কি করছি কাজের সময় সে কথা আমরা ভাবিনে। ভাবলে হয়ত এমন কিছু করতাম যাতে সুখ হত। ভাবিনি। কাঁদতে তো হবেই। কর্মফল ভোগ

সবাইকেই করতে হয়। আমার জন্য মিছিমিছিই তুমি কেঁদে মরছ। কাজ করেছিলাম, ফল ভুগছি।

গোরু বলল ঃ সবই জানি। কেঁদে মরলেও কোন ফল হবে না, জানি, তবু কাঁদছি। মায়ার বশে এমনটিই হয়।

ঃ এত যদি বোঝ তবে কাঁদ কেন? সব ভুলে যাও।

ঃ ব্রাহ্মণকে এই দুঃখ পেতে দেখলেই আমার দুঃখ যাবে। তবেই আমার মনে শান্তি আসবে। সন্তানের কষ্টে মা বাবার বুকটা যে কেমন করে উঠে তা ওকে কালই হাড়ে হাড়ে আমি বুঝিয়ে দেব। সকাল হোক। দুইতে আসুক। এমন গুঁতিয়ে দেব ওর ছেলেকে যে বুঝবে।

ঃ সবই আমার পাওনা। কাজ করেছি, এখন ফল ভোগ করছি। ব্রাহ্মণের ছেলের কপালে যদি মরণ থাকেই তাহলে সে মরবেই। তুমি যে গুঁতিয়ে দেবে সেটি হবে বৃথা। পাপের বোঝাই শুধু ভারি হবে। ভাল কর্মে স্বর্গ, মন্দ কর্মে অনিবার্য পতন, আর কর্ম ক্ষয় হলে তবে মুক্তি। তুমি আপাতত আমার মা, আমি সন্তান। কিন্তু আসলে কেউ কারও নয়। সবাই নিজের নিজের কর্মফল ভোগ করতে এসেছি, ভোগ করে চলে যাব। মিথ্যে তুমি গুঁতিয়ে মরবে। ওসব ক'রনা। বরং সবার মঙ্গল চিন্তা কর। ওতেই মন জুড়িয়ে যাবে।

ঃ ভগবানের মায়া বড় প্রবল। মায়া ত্যাগ করতেই তো চাই। কিন্তু পারি কৈ! আমি ছাড়লেও মায়া আমাকে ছাড়ে না। তোমার কষ্ট দেখে তাই আমি স্থির থাকতে পারছিনে। পাপ হবে জানি। তবে কোথায় গেলে পাপ নাশ হবে তাও আমার জানা। হত্যা করব। সেখানে যাব। হত্যা করব। পাপ হবে। আমার রঙ হয়ে যাবে কালো। সেখানে যাব। পাপ ধুয়ে যাবে। হব সাদা।

সুবাদী এসব শুনে বিস্ময়ে হাঁ করে রইল। তার প্রবল কৌতূহল হল। মনে মনে ঠিক করল ঃ দেখতে হয় কতদূর গড়ায়।

সকাল হল। সুবাদী শুয়েই রইল। গৃহস্বামী এসে ডেকে দিলেন ঃ উঠুন, এখানেই অনেক বেলা হয়ে গেল, কখন যাবেন?

সুবাদী বলল ঃ চাকরটির গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে। একটু বেলাতেই বরং যাত্রা করব।

গৃহস্বামী কাজে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেকে বলে গেলেন ঃ ওরে, দুইবার সময় হল, বাছুরটা একটু ধরিস।

ছেলে বাছুর খুলে দিল। পানানো হলে ঘা-কতক দিয়ে বাছুরটিকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে নিল। খুঁটিটার সঙ্গে উবু হয়ে সে বাছুরটিকে বাঁধছিল। ঠিক এই সময়েই গোরুটি দারুণ ভাবে তার পাঁজরে গুঁতিয়ে দিল।

ব্রাহ্মণের ছেলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। হৈ হৈ পড়ে গেল।

লোক জমে গেল প্রচুর। কেউ বাতাস করতে লাগল, কেউ জল নিয়ে ছুটে এল। কিন্তু ব্রাহ্মণ পুত্রের জ্ঞান ফিরল না।

বাড়িতে কান্নার রোল। পাড়াপড়শীরা বিমূঢ়। সবাই বলাবলি করল ঃ গোরুতে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে! এমন তো কোনদিন শুনিনি বাপু।

ব্রাহ্মণের চাকর গোরুটিকে খুব একচোট পিটিয়ে গায়ের ঝাল ঝাড়ল। তারপর দূর করে দিল তাড়িয়ে।

সুবাদীও বেরিয়ে পড়ল। আশ্চর্য হয়ে সে দেখল গোরুটির সাদারঙ আস্তে আস্তে কেমন যেন কালচে কালচে হয়ে আসছে। গোরুটি ছুটল। সুবাদীও তার পিছু নিল।

লেজ তুলে গোরুটি ছুটছে। ছুটতে ছুটতে এল নর্মদা নদীতে। সেখানে নন্দীকেশতীর্থ। সুবাদী অবাক হয়ে দেখল ঃ গোরুটি সোজা নেমে গেল ঐ তীর্থের জলে। উঠল, আবার নামল। তিনবার স্নান করল। সুবাদী আরো অবাক হল। যেমন শুনেছিল তেমনটিই যে হল! কালো হয়েছিল। স্নানের পর সত্যিসত্যিই যে সাদা হল!

সুবাদী ভৃত্যকে বলল ঃ কি তীর্থরে বাবা! ব্রহ্মহত্যার পাপ, তাও ধুয়ে নিলে!

ওরা দুজনেই পরম ভক্তিতে সেই জলে স্নান করল। ওদের মুখে এককথা ঃ মহাতীর্থ, মহাপাপ করেছিল, অথচ ধুয়ে গেল।

সুবাদী স্নান সেরে চলে আসছিল। এক মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোথায় যাচ্ছ?

মহিলাটি সুন্দরী। তার উপর গায়ে গয়নাগাঁটিও বিস্তর। জানা নেই, চেনা নেই। অথচ সুবাদীকে জিজ্ঞেস করে বসলেন ঃ কোথায় যাচ্ছ?

সুবাদী কেমন যেন বোকা ব'নে গেল। গড়গড় করে আদ্যোপান্ত সব বলে গেল।

মহিলাটি বললেন ঃ যাও কোথায়? দাঁড়াও।

ঃ দাঁড়িয়েছি, বলুন।

ঃ যেও না, ফেরো। যেখানে স্নান করেছ ফিরে গিয়ে সেখানে অস্থি দিয়ে এসো। তোমার মায়ের সদ্গতি হবে। এখন বৈশাখ মাস। আজ শুক্লা সপ্তমী। এমন দিনেই ওখানে গঙ্গা আসেন।......আমিই গঙ্গা। যাও। অস্থি দিয়ে এসো।

গঙ্গা অন্তর্হিত হলেন। সুবাদী যেন কি শুভক্ষণে যাত্রা করে বেরিয়েছিল!

সুবাদী দেবীর নির্দেশমত ঐ জলেই অস্থি বিসর্জন দিল।

দেখতে দেখতে দিব্য দেহ ধারণ করে সুবাদীর মাতা এলেন নেমে।

বললেন ঃ ছেলের মত ছেলে তুমি। আমি আশীবাদ করছি ধনেধান্যে মানে প্রতিপত্তিতে তুমি ভরে উঠবে। তোমার মত ছেলে পেয়েছিলাম, তাই আমার গতি হল।

সূত ঋষিদের বললেন ঃ সেই থেকেই এ তীর্থ উত্তমতীর্থ। সেই থেকেই সবাই জানে এখানে স্নানে মোক্ষফল। নর্মদা, কিন্তু একদিনের জন্য এখানে গঙ্গা আসেন। সেও প্রায় এক গল্প ঃ

ঋষিকা। ব্রহ্মণের ঘরের বালবিধবা। নর্মদার তীরে পার্থিব শিবের পূজায় ঋষিকা তন্ময় হয়ে গেল। মূঢ় দৈত্য এল ঋষিকার তপস্যা মাটি করতে। কিন্তু ঋষিকা তপস্যা করে চলল। মূঢ় কত ভয় দেখাল। ঋষিকা ভয় পেল। কিন্তু তপ ত্যাগ করল না। অবিরত বলতে লাগল ঃ শিব, শিব, শিব।

স্বয়ং শঙ্কর আবির্ভূত হলেন। ঋষিকাকে করুণা করলেন। গঙ্গাও প্রসন্ন হলেন। বললেন ঃ বর দেব। চেয়ে নাও।

ঋষিকা বলল ঃ বৈশাখ মাসে একদিনের জন্য যদি এখানে আসেন তাহলেই আমি কৃতার্থ হব।

গঙ্গা স্বীকার করলেন। সেই থেকেই এ তীর্থ উত্তম।

সুবাদী পুণ্যবান। তাই এমন দিনে সে এসেছিল এই তীর্থে। দুহাত ভরে মায়ের আশিস্ মাথায় তুলে নিয়ে সুবাদী ফিরে এল গৃহে।

সুবাদী ভাগ্য করেছিল। তাই পথে যেতে যেতে অত অত অলৌকিকের অভিজ্ঞতা। মুহূর্তে মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হতে হতে সে কেবলই ভেবেছে ঃ একি! একি! একি! অবশেষে মনে মনে কেবলই বলেছে ঃ কিভাগ্য! কি ভাগ্য! কি ভাগ্য!

১৪. অত্রীশ্বর

গাছের পাতা শুকিয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ল। ডালপালা শুকিয়ে কাঠ হল। মাটি ফেটে ফুটিফাটা হল। কামদবনের নিবিড় শ্রী যেন পলকে উবে গেল। বৃষ্টি নেই, কোথাও জল নেই এক ফোঁটা।

ঋষিরা জানতেন বড় শান্তির জায়গা এই বন। ফলে ফুলে, শোভায় সৌন্দর্যে কামদবন উচ্ছ্বসিত। এমন বনেই তপস্যা জমে উঠে। অথচ বৃষ্টি নেই। একবছর নয়, দুবছর নয়, শত বছর ধরে এ বনে বৃষ্টি নেই। ক্রুদ্ধ আকাশ থেকে শত বছর ধরে বর্ষিত হচ্ছে শুধু রোষ।

কামদবনে একদিন শান্তি ছিল, আজ নেই। কামদবন একদিন প্রাণীদের প্রিয় স্থান ছিল, আজ নেই। অদ্য কামদবন যেন মরুরাক্ষসের মুখবিবরে।

চারিদিক থেকে শুধু হা-হা করতে করতে ছুটে আসছে রাক্ষসের রোষ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে কেউ চায় নি। সময় থাকতে চলে গেছে অন্যত্র। আকাশের দিকে বাহু বাড়িয়ে শুধু গাছের কঙ্কালগুলিই দাঁড়িয়ে আছে। আর এক কোণে ছোট্ট কুটিরে এখনও রয়ে গেছেন ঋষি অত্রি ও তাঁর পত্নী অনসূয়া। কয়েকটি শিষ্য ছিল। কিন্তু শেষে পালিয়ে বেঁচেছে।

অনসূয়া বিরস মুখে বললেন: আর পারি না।

অত্রি কিছু বললেন না। তিনবার প্রাণায়াম কবে ডুবে গেলেন ধ্যানের গভীরে।

অনসূয়া সাধ্বী স্ত্রী। স্বামী সমাধির জগতে। এ জগতে তিনি একা। স্বামীর সেবায় তিনি সব ভুললেন।

ধীরে ধীরে অনসূয়া মাটি দিয়ে শিব গড়লেন। স্বামী সমাধিস্থ। তাঁর সম্মুখে সেই শিব অনসূয়া বাখলেন। অনসূয়া স্বামীর সেবা করেন আর কবেন মানস উপচারে সেই শিবের পূজা। পূজা সারা হয়। অনসূয়া স্বামীকে প্রদক্ষিণ কবেন, প্রণাম করেন।

দৈত্য দানবরা দূর থেকে অনসূয়ার লাবণ্যে প্রলুব্ধ হল। কিন্তু ধারে-কাছে ঘেঁসতে পারল না। অত তেজ! সইবে কেন! ওরা দূরে রইল। আগুন থেকে যেমন প্রাণীরা দূরে থাকে ওবাও তেমনি দূরে রইল।

অত্রি ডুবে আছেন। অনসূয়াও বিভোর হয়ে রইলেন।

ওদিকে দেবতা ঋষি ও গঙ্গা প্রভৃতি নদী ক্রমেই বিস্ময়ে আবিষ্ট হতে লাগলেন। ওঁরা সমবেত হয়ে অত্রি ও অনসূয়ার তপ মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করে চললেন। পরস্পর বলাবলি করলেন: তপস্যা দেখেছি বহু, কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি।

কেউ বললেন: সত্যই অদ্ভুত। এখনকার দিনে এমন তপ কেউ বড় একটা করে না।

: এরা ধন্য।

: কিন্তু কার ক্লেশ বেশি?

: সে সব ভাবলে বলতে হয় অনসূয়ার তপেই উৎকর্ষ সমধিক।

দেবদেবতা ঋষি যাঁরা এসেছিলেন সবাই দেখে মুগ্ধ হয়ে শতমুখে বলতে বলতে চলে গেলেন। গেলেন না শুধু শিব আর গঙ্গা।

গঙ্গা ভাবলেন: সাধ্বীর মত সাধ্বী বটে। উপকার করতে হলে এরই কবা উচিত।

শিবও ভাবলেন: আহা এত তপ! কৃপা যে করতেই হয়।

ধীরে ধীরে চুয়ান্ন বছর পেরিয়ে গেল। অত্রি তখনও সমাধিস্থ। কিন্তু আকাশের মুখে প্রসন্নতার হাসি ফুটল না। অত্রি আহার করেননি, অনসূয়ারও

গেছে অনাহার।

সমাধি থেকে একদা অত্রি জেগে উঠলেন। বললেন ঃ একটু জল।

অনসূয়া কমণ্ডলু নিয়ে বনের পথে বেরুলেন। কিন্তু জল কোথায়! আসবে কোত্থেকে? অনসূয়া ভাবলেন ঃ উনি বললেন, অথচ জল কোথা পাই?

গঙ্গাদেবী দেখলেন অনসূয়ার প্রশান্ত মুখশ্রীতে কিসের যেন কালো ছায়া। উনি এসে বললেন ঃ আমাকে বলুন, আমি যদি আপনার ভাবনা দূর করতে পারি।

অনসূয়া এই বিজন মরুতে এমন রূপ দেখে অবাক হলেন। বললেন ঃ তুমি কে? কোথা থেকে পথ ভুলে এসে পড়েছ এই পোড়া বনে?

গঙ্গা বললেন ঃ পথ হারিয়ে আসিনি। আমি গঙ্গা। তোমাদের তপস্যা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাই দেখতে এসেছি। কি চাও বল, পাবে।

অনসূয়া প্রণাম করে বললেন ঃ একটু জল দান করুন।

গঙ্গা বললেন ঃ একটি গর্ত খোঁড়।

গঙ্গা গর্তে প্রবেশ করে জলময়ী হলেন। অনসূয়া যত দেখছিলেন ততই বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন।

কমণ্ডলু ভর্তি করে অনসূয়া বললেন ঃ আমার ভাগ্য। তাই আপনি প্রসন্ন হয়েছেন। কৃপাও করলেন, কিন্তু আরও একটু কৃপা আপনাকে করতে হবে।

ঃ কি, বল।

ঃ আমার স্বামীর আসা পর্যন্ত যদি এখানে অপেক্ষা করেন তবে কৃতার্থ হব।

ঃ থাকব, কিন্তু বিনিময়ে তোমার তপস্যার এক মাসের ফল আমাকে দিতে হবে।

ঃ দেব।

অনসূয়ার হাত থেকে অত্রি জল গ্রহণ করলেন, পানও করলেন। জলের স্বাদে অত্রি বিস্মিত হলেন। এ জল তো এ বনে নেই। চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, যেন জ্বলন্ত মরুভূমি।

বললেন ঃ বৃষ্টি হয়েছিল?

ঃ না।

ঃ তাহলে এ জল পেলে কোথা থেকে?

অনসূয়া মুস্কিলে পড়ে গেলেন। সত্য বললে নিজের গুণের কথা বলা হয়। মিথ্যে বললে ব্রত নষ্ট হয়। দুই কূল বজায় রাখা যায় এমন উত্তরই অনসূয়া অনুসন্ধান করলেন।

অনসূয়া তখনও ভাবছেন। অত্রি আরো আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বল, চুপ করে রইলে কেন ?···কৈ বল।

ঃ শঙ্করের পূজা করেছি, আপনার সেবা করেছি। তাই গঙ্গা স্বয়ং এখানে এসেছেন। এ জল তাঁর।

ঃ সত্য বলছ কি মিথ্যা বলছ এমন সন্দেহ করছি না। কিন্তু ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, যা যোগীর অসাধ্য, দেবতারাও যা পারেন না, তা কি করে সম্ভব হল ? তাই না দেখলে যেন প্রত্যয় হচ্ছে না। তুমি আমাকে দেখাতে পার!

ঃ যদি দেখতে চান তাহলে আসুন।

সেই ছোট্ট গর্তে গঙ্গাকে দেখে অত্রির আনন্দের সীমা রইল না। বললেন ঃ কত লোকই তো তপস্যা করে, আমিও করেছি। কিন্তু সে সব যেন তপস্যাই নয়। তপস্যা বলতে গেলে তোমার তপস্যা।

অত্রি পরম উচ্ছ্বাসে সেই জলে স্নান করলেন, আচমন করলেন। পরে উভয়ে মিলে নিত্যকর্ম সম্পন্ন করলেন।

গঙ্গা বললেন ঃ আমি তাহলে চললাম।

অনসূয়া করজোড়ে কাকুতিমিনতি করলেন। বললেন ঃ আমাকে দয়া করুন। এই তপোবন ছেড়ে আপনি যাবেন না।

অত্রিও স্তবেস্তুতিতে ভেঙ্গে পড়ে বারবার করে গঙ্গাকে বললেন ঃ যাবেন না, যাবেন না। এখানেই থাকুন। দয়া করুন।

গঙ্গা অনসূয়াকে বললেন ঃ লোকের হিতের জন্য না হয় থাকব এই বনে। কিন্তু বিনিময়ে তোমাকে দিতে হবে এক বছরের ফল। শঙ্করকে আরাধনা করেছ, স্বামীকে সেবা করেছ, বহু পুণ্য তোমার সঞ্চিত হয়েছে। আমাকে একবছরের ফল দাও, থাকব। আর পতিব্রতা দর্শনে আমারও পাপ নাশ হয়। থাকব, পাপ নাশ হবে।

সূত বললেন ঃ গঙ্গার মাহাত্ম্যের শেষ নেই। উনি মাত্র এক বছরের পুণ্য ফলেই ওখানে থেকে গেলেন। পরের হিত্যের জন্য মহৎরা ত্যাগ স্বীকার করতে বরাবরই অকুণ্ঠিত। স্বর্ণ, চন্দন ও ইক্ষুর কথা চিন্তা কর। নিজেকে পীড়িত করে ওরা অন্যের উপকার করে।

এরপর শিবও দেখা দিলেন। মাটির মূর্তিতে শিব প্রকটিত হলেন। বললেন ঃ তোমাকে খুব ভাল লেগেছে। বল, কি চাই ?

অনসূয়া বিস্ফারিত নয়ন মেলে তাকিয়ে রইলেন দেবাদিদেবের প্রতি। বললেন ঃ গঙ্গা প্রসন্ন হয়েছেন। আপনিও হয়েছেন। যদি হয়েই থাকেন তাহলে এই বনে বাস করুন। লোকের দুঃখ দূর হোক।

কামদ বনে মহাদেব রয়ে গেলেন, সঙ্গে গঙ্গাও। এমনকি পার্বতীও রইলেন দেবদেবের পাশে।

অত্রির ঈশ্বর কামদবনে বাস করলেন। লোকে বলল ঃ অত্রীশ্বর। ধীরে ধীরে কামদবনে পূর্বের শ্রী ফিরে এল। অনাবৃষ্টির রাক্ষস ভয়ে যেন পলায়ন করল।

কামদবনের পাতায় পাতায় স্তবের আনতি ভেঙ্গে পড়ল, পাখিদের কুজনে কুজনে রচিত হল যেন পূজোর মন্ত্র, ঋষিদের ক্রিয়া কলাপেও জাগল যেন তারই প্রতিধ্বনি।

১৫. পরীক্ষায় বিপর্যয়

দারুবনের আকাশে বাতাসে সদা শিব, শিব। ওখানে শিবভক্ত ঋষিরা বাস করেন। শিবের স্তবে, পূজায়, ধ্যানে ওঁবা একাগ্র।

শিব জানেন দারুবনে তাঁর ভক্তরা থাকেন। কিন্তু কেমন ভক্ত? শিবের ইচ্ছে হল পরীক্ষা করে একবারটি সেটি জানেন।

ঋষিরা সমিৎ আহরণে বনের পথে বেরিয়েছেন। কিন্তু বিকারগ্রস্ত এক পুরুষকে দেখে ওঁরা বিরক্ত হলেন।

শিব এসেছেন দারুবনে। এসেছেন বিকৃতরূপে। তাঁর সমস্ত শরীরে মাত্র ভস্মের আবরণ। হাবেভাবে চাউনিতে কামের প্রশ্রয়। ঋষিপত্নীবা এই বিকৃত পুরুষকে দেখে ত্রস্ত হলেন। কেউ আবার মুগ্ধ হলেন। আতুর হয়ে ছুটে এলেন। নানাভাবে শিবকে আলিঙ্গন কবে করে ওঁবা যেন আকুলতা দূর করতে চাইলেন।

ঋষিরা এ অনাচার দেখলেন। রেগে ছুটে এলেন। বলাবলি করলেন ঃ লোকটা কে?

শিবকে সুধোলেন ঃ কে তুমি? কি হচ্ছে এসব। ছিঃ!

শিব নিরুত্তর রইলেন। ঋষিরা ভাবলেন ঃ ব্যাটা মহা বদ। বললেন ঃ তোমার লিঙ্গ পতিত হোক।

জ্যোতির্লিঙ্গ পতিত হল পৃথিবীতলে। চতুর্দিক থেকে জেগে উঠল হাহাকার। যেদিকে গেল সেই জ্যোতির্লিঙ্গ সেইদিকই জ্বলেপুড়ে খাক হল। চতুর্দিক জ্বলছে, অথচ জ্যোতির্লিঙ্গও চলছে, যেন থামবে না কোন কালে।

দেবতা ও ঋষিরা উদ্বাস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেরা কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। কি কর্তব্য তাও ওঁবা স্থির করতে পারলেন না। ওঁরা ব্রহ্মার কাছে ছুটে এলেন।

ব্রহ্মা বললেন ঃ তোমরা জ্ঞানী হয়ে এসব করেছ! অজ্ঞানীরা করলে তাদের কি বলব? শিবের সঙ্গে বিরোধ করে কারও কি কখনো ভাল হয়।

অতিথিকে অপমান করলে অতিথি চলে যায়। কিন্তু যায় আমাদের পুণ্যটুকু নিয়ে, যা রেখে যায় তার নাম পাপ। আর তোমরা শিবকে অপমান করেছ! কি যে হবে তা বাপু আমি বুঝতে পারছিনে। যাও, শীঘ্র ব্যবস্থা কর। জ্যোতির্লিঙ্গ শান্ত না হলে নাভিশ্বাস উঠবে ত্রৈলোক্যের।

দেবতা ও ঋষিরা বললেন ঃ কিন্তু কি কাজ করলে স্থির হবে ঐ লিঙ্গ ?

ঃ গিরিজার আরাধনা কর। উনি যদি করুণা করেন, ধারণ করেন যোনির রূপ তাহলেই লিঙ্গ সুস্থ হবে। আগে শিবকে পূজা কর। অষ্টদল পদ্ম এঁকে তার উপর দূর্বা, যবাঙ্কুর ও ওষধি দিয়ে তীর্থনীরে ভরে একটি ঘট রাখবে। তারপর বেদের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করবে ঐ ঘট। আর ঐ জলেই করাবে লিঙ্গকে স্নান, উচ্চারণ করবে শতরুদ্রীয় মন্ত্র। যোনির প্রতীকরূপে রাখবে এক বাণ। তার উপর লিঙ্গ রেখে অভিমন্ত্রিত ক'র। ফুল চন্দন, ধূপদীপ দিয়ে কর। সঙ্গে স্তবগান তো করবেই। শেষে স্বস্ত্যয়ন করে জয়ধ্বনি করবে। যাও গিয়ে এইরকম কর। শিব তুষ্ট হবেন।

দেবতা ও ঋষিরা শিবের পূজায় উতলা হলেন। শিব প্রসন্ন হলেন।

ওদিকে পার্বতীকেও প্রসন্ন করা চাই। ব্রহ্মা চললেন আগে আগে। পিছনে দেবতা ও ঋষিরা।

পার্বতী ওঁদের প্রার্থনা শুনে সম্মত হলেন।

দেবতা ও ঋষিরা যথাবিধি তৎপর হলেন।

শিব বললেন ঃ হয়েছে, হয়েছে। সর্বলোকে সুখ নেমে আসুক।

দেবতা ও ঋষিরা কৃতজ্ঞতায় বারবার করে শিবকে প্রণাম করতে থাকলেন। শতমুখে স্তব করে করে বায়ুমণ্ডল ভরিয়ে তুললেন।

জগৎ যেতে বসেছিল। কিন্তু রক্ষা পেল। রক্ষা পেল সেই পরমপুরুষের কৃপায়। রুষ্ট হয়েছিলেন, যেতে বসেছিল জগৎ। তুষ্ট হলেন, মঙ্গল-আলোয় উদ্ভাসিত হল সর্বচরাচর।

১৬. অন্ধকেশ্বর

ব্রহ্মা বর দিলেন। অন্ধক হল পরমপরাক্রান্ত।

পূজায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা এলেন বর দিতে। অন্ধক বলল ঃ বিবেকের উদয় হলে আমি যদি কখনো ব্রহ্মের মত হয়ে উঠি তাহলেই যেন আমার মৃত্যু হয়। অন্যথায় মৃত্যু হবে আমার পায়ের ভৃত্য।

ব্রহ্মা বললেন ঃ তথাস্তু।

মরণের ভয় রইল না। অন্ধক স্ফীত হয়ে উঠল। বহির্গত হল দিগ্বিজয়ে।

দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে পালিয়ে মন্দরে এসে আশ্রয় নিলেন। দিকপালেরাও হল অন্ধকের বশ্য।

স্বর্গ এল মুঠোয। কিন্তু দেবগণকে বিনষ্ট করতে না পেরে অন্ধক ভয়ানক ক্ষুব্ধ হল। শুনল দেবগণ মন্দরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

অন্ধক ধেয়ে এল। মন্দরে দেবতাদের সঙ্গে অন্ধকের সৈন্যদের দারুণ যুদ্ধ হল। কিন্তু অন্ধক পরাজিত হল।

অন্ধক হঠে এল। নৈঋত কোণে সমুদ্রের কাছে এক গর্ত খুঁড়ল। সেখানেই লুকিয়ে রইল অন্ধক। মাঝে মাঝেই সে বেরিয়ে আসত। আশেপাশে যারা থাকত তারা মার খেত, তাদের ঘরবাড়ি পুড়ত। অন্ধক মারত, পোড়াত, তারপর লুকিয়ে পড়ত নিরাপদ গর্তে। ধীরে ধীরে সেই গর্তটিই দানবপুরী হয়ে দাঁড়ল। তিন যোজন আয়ত সেই গর্তেই অন্ধকের তাবৎ অনুচর বাস গাড়ল।

অন্ধকের অত্যাচার বাড়ল। ক্রমে ক্রমে আরও বাড়ল। দেবতারা চিন্তায় পড়লেন। খুব চিন্তা। শেষ পর্যন্ত খেই হারিয়ে নিরুপায় হয়ে শিবকে ধরে পড়লেন ঃ বড়ই বাড় হয়েছে। আপনি সহায়তা করুন। নইলে আমরা একেবারে ভেসে যাব।

শিব বললেন ঃ প্রস্তুত হও।

দেবসৈন্যবা সেই গর্তের চতুর্দিক বেষ্টন করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। শিব এলেন। গণেরা এল।

অন্ধক বেরিয়ে এল। দেবসৈন্যে ও দানবসৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম হল। অন্ধক এঁটে উঠতে না পেরে গর্তে প্রবেশের জন্য উদ্যত হল। কিন্তু ত্রাণ পেল না। শিব শূল নিয়ে তাড়া করলেন।

বিপদ আসন্ন। মরণ বুঝি ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধক মনে মনে মহাদেবকে স্মরণ করে বলল ঃ শুনেছি, মৃত্যুর সময় তোমাকে দর্শন করলে তোমার মতই হওয়া যায়।

মহাদেব কিন্তু এতেই বিগলিত হয়ে গেলেন। ছুটে এলেন। স্মরণ করেছে, অতএব বর যে দিতেই হয়। মহাদেব ছুটে এলেন। বললেন ঃ কি বর নেবে নাও।

অন্ধক বলল ঃ আপনাতে যেন আমার ভক্তি থাকে। এ জন্মে যেমন প্রসন্ন হয়ে বর দিতে উদ্যত হয়েছেন পরজন্মেও যেন এমনটিই হয়।

মহাদেব বললেন ঃ তাইই হবে।

অন্ধক সেই গর্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত হলেন। শিবও রয়ে গেলেন সেই গর্তে।

জগতে স্বাস্থ্য ও শ্রী যেন ফিরে এল। দেবতারা বিভোর হলেন সুখে।

শিব রইলেন এই গর্তে। দানবপুরী হল তীর্থক্ষেত্র। সবাই নাম দিল

অন্ধকেশ্বর।

অন্ধকেশ্বর অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। নিত্য পূজো। মাত্র ছমাস। দুঃখ যায় দূরে, চিরতরে। নিত্য পূজো। মাত্র ছমাস। যে করে শান্তি ও সুখের সরোবরে সে ফুটে থাকে নিটোল একটি পদ্ম হয়ে ॥

১৭. বটুক মহিমা

দধীচি বাড়ি ছিলেন না। মাত্র কয়েকটি দিন। মাঝে ছিল শিবরাত্রি। ঐ রাত্তিরই হল কালরাত্রি।

দধীচি ধর্মপরায়ণ। প্রত্যহ শিবপূজা ঃ তাঁর তৃপ্তি। নিজে করেন, পরকে করতে বলেন, শেখান। পুত্র সুদর্শন। তাকেও শিখিয়েছেন।

সুদর্শনের তখন বিবাহ হয়েছে। পুত্রও হয়েছে। চারটি পুত্র। সুদর্শনের গুণ ছিল অনেক। কিন্তু তার পত্নী দুষ্কল্পা ছিল অন্য প্রকারের। সুদর্শনের গুণ ছিল অনেক, কিন্তু পত্নীর সম্মুখে সে আর সে থাকত না। থাকতে জানত না। হয়ত এটি তার পিতা শেখাননি।

দধীচি অন্যগ্রামে যাবেন। পুত্রকে বলে গেলেন ঃ শিবের সেবার কোন ত্রুটি ক'র না।

দধীচি গেলেন। ফিরতে তাঁর দেরি হল। জ্ঞাতির সঙ্গে দেখা। দধীচি আটকা পড়ে গেলেন।

শিবরাত্রি। পিতা বাড়ি নেই। সুদর্শনকেই করতে হবে শিবের সেবা। রাত্রি হল। সুদর্শন পত্নীর সাহচর্য উপভোগ করলেন। তারপর পুজো করলেন শিবের।

রাত্রি প্রভাত হল। সুদর্শন হতচকিত হয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্মুখে শিব। রোষে ঘৃণায় শিব বললেন ঃ জেনে শুনে স্নান না করে আমার পুজো করেছ। এর শাস্তি জড়ত্ব।

সুদর্শনের শরীরে ও মনে নেমে এল জড়ত্বের অভিশাপ।

দধীচি ফিরলেন। দেখলেন। শুনলেন। শুধু খেদ করা ছাড়া আর গতি নেই। শিব দধীচিকেও তিরস্কার করলেন।

এরই মধ্যে একদিন দুষ্কল্পার মৃত্যু হল। হয়ত সে মরে বেঁচেছিল। সুদর্শন নিজের জড়ত্বের জন্য দুষ্কল্পাকেই দায়ী করলেন। শান্তি পেলেন। মৃত দুষ্কল্পাকে অভিশাপ দিলেন ঃ পরজন্মে তোকে যেন অসতী হতে হয়। সুদর্শন আরও শান্তি পেলেন।

দধীচি ক্ষুণ্ণ হয়ে বসে রইলেন। অবশেষে পুজো করে প্রসন্ন করতে

চাইলেন রুষ্ট দেবতাকে। শিবের পূজায় তিনি তদ্গত হলেন। পার্বতীরও পূজা করলেন। সুদর্শনও পার্বতীর পূজো করলেন। জড়ত্বের গ্লানি কি তাঁর ঘুচবে না! পূজারত সুদর্শনের মন অনুশোচনায় দগ্ধ হল, ভক্তিতে উদ্বেল হল। সুদর্শন দেবীর আশিস্ চাইলেন।

সুদর্শনের আকুল আহ্বানে দেবীর মন সিক্ত হল। উনি সুদর্শনকে পুত্র বলে স্বীকার করলেন।

এবার পুত্রের জন্য মাতার তপস্যা। শিবের একটু প্রসাদ তাঁর চাই। পার্বতী অশেষ চেষ্টা করলেন।

পুত্রকে মাতা ঘৃতে স্নান করালেন। গলায় পরিয়ে দিলেন উপবীত। দান করলেন শিবগায়ত্রী মন্ত্র। মাতা বললেন পুত্রকে ঃ পূজা কর। এবার পূজায় ওঁকে প্রসন্ন কর।

পাশে থেকে মাতা পুত্রকে সব দেখিয়ে দিলেন। সুদর্শন শিবের সংকল্প করলেন। 'ওঁ নমঃ শ্রীশিবায়' মন্ত্র জপ করলেন। একবার একবার করে ষোল-বার। পাদ্য অর্ঘ্য সাজিয়ে ষোড়শ উপচারে পূজা করলেন দেবাদিদেব মহাদেবের। পূজা শেষ হল। পার্বতী বললেন ঃ নামমন্ত্র জপ কর।

শিবের পূজায় উৎসর্গ করা হয়েছে ঘি, তেল, ফল, ধান, বস্ত্র। পার্বতী সুদর্শনকে বললেন ঃ এসব তুমি নাও। দোষ হবে না কোন। নাও।

শিবের মন বিগলিত হল। বললেন ঃ আমার পূজায় তুমিই প্রধান। বিশেষ করে দেবীর পূজায় তোমার পূজা না হলে সব নিষ্ফল হবে। আমার পূজায় তুমি থাকবে। পূজা হবে সম্পূর্ণ। নইলে নয়। গোল করে তিলক পরবে, স্নান করে আমার সন্ধ্যা করবে, জপবে আমার গায়ত্রী। বেদমন্ত্র তোমার নয়। তোমার যা যোগ্য সেই মন্ত্রই তুমি জপবে।

সুদর্শন হলেন শিব ও শিবার পুত্র।

সুদর্শনের চার পুত্র। ওরা পথে বসল না, জলে ভাসল না। শিব মুখ তুলেছেন। বর দিলেন অনেক।

চার বটুক। শিবের বরে ওরা মান পেল। শিব বললেন ঃ যুদ্ধ। তোমাদের যে কেউ এ পক্ষে থাক, জয় এ পক্ষের। ও পক্ষে থাক, জয় ও পক্ষের। তোমাদের পূজাতেই আমার সন্তোষ। তোমাদের পূজাতে আমার পূজায় পূর্ণতা।

শিবপূজায় প্রথমেই বটুকের পূজা। বটুকের পূজা, পরে শিব ও শিবার পূজা। ওতেই শিবশিবা অকৃপণ হন প্রসাদবিতরণে।

ভদ্রনামে এক রাজা ছিলেন। ভদ্র প্রাজাপত্য ব্রত করেছেন। ব্রাহ্মণরা ভোজনে বসেছেন। সহসা একটি ঘটনা। সবাই বুঝল, বটুকের মহিমা।

শিব ভদ্রকে একটি ধ্বজ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ সকালে এটিকে দাঁড়

করিয়ে রেখো। প্রাজাপত্য ব্রত সম্পূর্ণ হলে রাত্রিতে এটি ভূঁয়ে পড়বে। নইলে যেমন তেমনই থাকবে।

সেই থেকে রাজা রোজ প্রাজাপত্য ব্রত করতেন। রোজ সকালে ধ্বজটিকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিতেন। ব্রত শেষ হলে ধ্বজটি পড়ে যেত। কিছু বাকি থাকলে পড়ত না।

একদিন তখনো ব্রাহ্মণ ভোজন বাকি। কিন্তু দেখা গেল ধ্বজ পতিত হয়েছে। রাজা বিস্ময় মানলেন। শেষ হয়নি, অথচ শেষ হয়েছের ইঙ্গিত!

ব্রাহ্মণরা তখন ভোজনে বসেছেন। রাজা এসে সমাধান চাইলেন। ব্রাহ্মণরা বললেন: বটুকমাহিমা। আগে ওদের ভোজন করিয়েছেন। ব্রত সম্পূর্ণ হয়েছে। ধ্বজ পড়েছে।

রাজা কিছুটা যেন ক্ষুণ্ণ হলেন। এতবড় একটা সমস্যা। অথচ জলবৎ সহজ তার সমাধান। রাজা এতটা সহজ চাননি।

১৮. সোমেশ্বর

সোনা সুন্দর। মণি সুন্দর। মণি বাঁধানো হল সোনায়। মণি হল সুন্দরতর। সোনাও হল আরও সুন্দর। চন্দ্র। যেন চন্দ্র নন, মণি। দক্ষের সাতাশটি কন্যার সঙ্গে চন্দ্রের বিবাহ হল। যেন সোনামণির মিলন।

চন্দ্র সুখী। সাতাশ মনের ভালবাসায় তিনি ধন্য। হয়ত কিছুটা বিব্রতও। দিন দিন চন্দ্র যেন কেমন হয়ে গেলেন। সাতাশে যেন আর প্রাণ পান না। একেই আসে উল্লাস। চন্দ্র রোহিণীকে নিয়ে ডুবে রইলেন।

একা রোহিণীর মনে সুখ, ছাব্বিশ জনের মনে দুঃখ। একার সুখ ছাব্বিশ জনের দীর্ঘশ্বাসে যেন বাষ্প হয়ে উবে গেল।

কন্যারা এল পিত্রালয়ে। দক্ষের কাছে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করল বেদনার কথা। দক্ষ এমনটি আশা করেননি। চন্দ্রের ব্যবহার এমন হবে এ তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর।

দক্ষ এলেন চন্দ্রের কাছে। বললেন: আশ্রিতদের প্রতি সমান ব্যবহারই শ্রেয়। তুমি তা করছ না। একের মান দিতে গিয়ে দশের মনে বেদনা দিচ্ছ। এমনটি আর ক'রনা।

দক্ষ নিশ্চিন্ত হলেন। জামাতাকে তিনি বলেছেন। এমন সারবান কথা কি আর চন্দ্র বুঝবেন না। ক্ষণকালের জন্যই তাঁর ভ্রান্তি এসেছিল। দক্ষ তা ভাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। এবার জামাতা শ্রেয়ের পথেই চলবে।

চন্দ্র শ্বশুরের কথা শুনলেন। কথাগুলি মধুর। এক কান দিয়ে ঢুকল,

অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনের মধ্যে দন্দণ্ড যেন দাঁড়াতেই পেল না। অমন সব সারকথা। অথচ ব্যর্থ হল। রোহিণীতেই চন্দ্র ডুবে রইলেন। অন্যরা আগের মতই প্রচুর অবহেলা পেলেন। দক্ষের বলাতে অবহেলা বরং আরো বাড়ল।

বিধির বিধান রোধ করে কার সাধ্য। যখন যার ভাল হবার তখন তার হবেই। আবার মন্দ যখন হবেই তখন হবেই। কারও সাধ্য নেই তা রোধ করে। দক্ষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভুল করেছিলেন।

চন্দ্রের মন রোহিণীতেই পড়ে রইল। দক্ষ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি শ্বশুর। ভাল কথা বলে এলেন। অথচ চন্দ্র তা কানেই তুলল না। অপমানে দক্ষ ক্রুদ্ধ হলেন। চন্দ্রকে এসে বললেনঃ আমি অত করে তোমাকে অনুরোধ করলাম। অথচ তুমি সব পায়ে ঠেলেছ। এ অপমান সইবার নয়। এর শাস্তি ক্ষয়রোগ। তোমার হোক। ঐ রোগে ভুগে ভুগে তুমি সারা হও।

দক্ষের শাপ বিফলে যাবার নয়। সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্র পড়ে গেলেন রোগের কবলে। দিন যায়, চন্দ্র ক্ষয় পেতে থাকলেন। দিন যায়, চন্দ্র ক্ষয় পেতে থাকলেন।

এতদিনে চন্দ্রের হুঁশ হল। রোগ, রাজরোগ। কি করলে সারে, কোথায় গেল কমে—ভেবে ভেবে চন্দ্র দিশেহারা হলেন। যাকে পান তারই কাছে অনেক করে খেদ করেন। আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ কিছু কি করার নেই?

যাঁরা শুনলেন তাঁরাই হাহাকার করে উঠলেন। দেবতা ঋষি গন্ধর্ব অপ্সরা সবাই খুব মনমরা হয়ে পড়লেন। চন্দ্রের দুঃখ বাড়ল, বেড়েই চলল।

চন্দ্র দেবতা ও ঋষিদের ধরে পড়লেন। বললেনঃ ব্রহ্মার কাছে গেলে হয়ত কিছু হয়। আমার হয়ে যদি ব্রহ্মাকে একটু বলেন।

দেবতা ও ঋষিরা সম্মত হলেন। ব্রহ্মাকে বলা তো আর কঠিন নয়। বিশেষ করে চন্দ্রের জন্য। ওঁরা এটুকু আনন্দের সঙ্গেই করবেন।

ব্রহ্মা সব শুনে খুব বিরক্ত হলেন। বললেনঃ চন্দ্র এরকম খারাপ কাজ করল কেন? ওর স্বভাব দেখছি বড়ই মন্দ। কিন্তু দক্ষ ঐভাবে শাপ দিলেন কোন্ আক্কেলে? ছিঃ।··· ··চন্দ্রের স্বভাবটাই যেন কেমন। মন্দ কাজ করতে পারলে আর কিছু যেন চায় না। গুরুপত্নী! একবার তো তাকেই হরণ করে বসল। বৃহস্পতি পত্নী-উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করলেন। দেবতারা তাঁকে সাহায্য করলেন। কিন্তু চন্দ্র বেঁকে বসল। দৈত্যদের সাহায্য নিয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে এল যুদ্ধ করতে। তখন আমি ও অত্রি দুজনে মিলে চন্দ্রকে বোঝাই, নিষেধ করি, তবে চন্দ্র তারাকে ফিরিয়ে দেয়। মুস্কিল হল বৃহস্পতিকে নিয়ে। তারাকে তিনি ঘরে নেবেন না। কারণ তারার শরীরে চন্দ্রের সন্তান। উনি বললেন, সন্তান ত্যাগ করলেই উনি তারাকে নিতে পারেন, নচেৎ নয়। আমি

তখন সেই সন্তান ত্যাগ করিয়ে তবে একটা মিটমাট করি। তারাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে সন্তান চন্দ্রের। বৃহস্পতি যে বেঁকে বসেছিলেন সে স্বাভাবিক। শেষমেষ আমাদের অনুরোধে বৃহস্পতি তারাকে নিলেন। এই রকম বহু অপকর্ম চন্দ্র করেছে। সে সব বলে অবশ্য লাভ নেই। যাহোক এখন কি করা যায় ?······ যা হবার তা অবশ্য হবেই। তবে চন্দ্র একবার প্রভাসক্ষেত্রে গিয়ে শিবের আরাধনা করে দেখতে পারে।

ওদিকে দক্ষও চুপিচুপি দেবতাদের ধরেছেন। শাপ দিয়ে ফেলা অবধি ওঁর শান্তি নেই। যাহোক ছিল, চন্দ্রের মতি একদিন ফিরতই। কিন্তু এ যে বড় সাংঘাতিক হল। অতগুলি মেয়ের মুখ চেয়ে দক্ষের বুকটা টনটন করে উঠল।

দক্ষ দেবতাদের কাছে চন্দ্রের খবর জিজ্ঞাসা করেন : কিছু কি উপায় হল ?

দেবতারা ওঁকে বললেন : ব্রহ্মা শিবের আরাধনা করতে বললেন। যা হোক একটা কিছু হবেই। আপনি মিছি মিছি উতলা হবেন না।

দেবতা ও ঋষিরা চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রভাসে এলেন। সরস্বতী নদীর তীরে একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে সব তীর্থকে আবাহন করা হল। প্রতিষ্ঠিত হল পার্থিব লিঙ্গ। চন্দ্র সেই লিঙ্গের পূজায় তনুমন সঁপে দিলেন।

দেবতা ও ঋষিরা এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। ওঁরা বলাবলি করলেন : এবার চন্দ্রের নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পরীক্ষা।

নিরন্তর তপস্যা চলল। মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দ্বারা চন্দ্র শিবকে পূজো করলেন। জপ করলেন দশকোটি মন্ত্র।

শিবের মন টলল। উনি ফিরে চাইলেন। শিব চন্দ্রকে বললেন : কি চাও ?

চন্দ্র বললেন : আমার শরীরের ক্ষয় নিবারণ করুন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমার ভাল করুন।

শিব বললেন : কৃষ্ণপক্ষে কলায় কলায় তোমার ক্ষয় হবে। শুক্লপক্ষ আসবে, কলায় কলায় ক্ষয় পূরণ হবে।

দেবতা ও ঋষিরা অন্তরীক্ষ থেকে নেমে এলেন। ওঁরা হর্ষে উদ্বেল। এতদিনের উদ্বেগের অদ্য শান্তি। চন্দ্রকে সবাই আশীর্বাদ করলেন।

দেবতা ও ঋষিরা সম্মিলিত ভাবে শিবের স্তব করলেন। বললেন : উমার সঙ্গে আপনি এস্থানে অবস্থান করুন।

শিব অসম্মত হতে পারলেন না। চন্দ্র ওঁকে মন্ত্রদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করলেন। শিব বললেন : এ স্থান যজ্ঞের পক্ষে খুবই প্রশস্ত হবে। চন্দ্রের জন্য অবতীর্ণ হয়েছি, অতএব এ স্থান চন্দ্রের নামেই বিখ্যাত হোক।

সবাই বললেন : সোমেশ্বর। সোমেশ্বর। আপনার নাম হোক সোমেশ্বর।

চন্দ্রের নামে স্বয়ং পরমেশ্বরের অবস্থান। চন্দ্র ধন্য। চন্দ্র কুণ্ড স্থাপন করেছিলেন। সে কুণ্ডের জল হল এক অপূর্ব অমৃত। সে জলে স্নানে বিধৌত

হয় মন। সে জলে স্নানে বিধৌত হয় তাবৎ ব্যাধি।

মন্দ কাজ করেছিলেন। শাপ পেয়েছিলেন। ভাগ্যে করেছিলেন, ভাগ্যে পেয়েছিলেন। তাই অনন্ত কাল ধরে কৃপা বিতরণের জন্য সোমেশ্বর জেগে রইলেন।

১৯. মহাকালেশ্বর

বনে অনেক শশক ছিল। শেষমেষ একটিও রইল না। কোথা থেকে এক সিংহ এল। অরণ্য হল শশকশূন্য। পৃথিবীতে ধর্ম ছিল। সুখ ছিল। শান্তি ছিল। রত্নমাল পর্বত থেকে নেমে এল অসুর দূষণ। ব্রহ্মা বর দিয়েছেন। দূষণের বল তাই অসামান্য। দূষণ ধর্ম মানল না। ধর্মকে দ্বেষ করল। পৃথিবী হল অরণ্য।

অবন্তী নগরী। বিজন অরণ্য, মধ্যে যেন সুরম্য এক দেবালয়। অবন্তীতে তখনো ধর্ম ছিল।

জনৈক ব্রাহ্মণ। নাম বেদপ্রিয়। বেদপ্রিয় নিত্য বেদ পাঠ করেন, বেদের নীতি মেনে কাজ করেন। বেদপ্রিয় শিবভক্ত। নিত্য উনি মাটির শিবলিঙ্গ পূজা করেন। একদা চার পুত্র রেখে উনি সদ্‌গতি লাভ করলেন।

পুত্রের মত পুত্র। চার পুত্র। দেবপ্রিয়, প্রিয়মেধ, সুব্রত, ধর্মবাদী। চার পুত্র। ওঁরাও পিতার মত। যেন বেদপ্রিয়েরই চার ছায়া। ধর্মকর্ম করে করে ওঁরা অবন্তীতে পুণ্য বিস্তার করলেন। অবন্তীর আলোয় হাওয়ায় ফেটে পড়ল ব্রহ্মতেজ।

দূষণ দেখল অবন্তীই যেন সৃষ্টিছাড়া। ওখানেই শুধু আছে ধর্ম, শান্তি এবং সুখ।

রণসাজে সেজে দূষণ এল অবন্তীতে। তাবৎ দেবতা, তাবৎ রাজা দূষণের বশ মেনেছে। অবন্তীতে তো সামান্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ!

দূষণ সৈন্যদের বলল: এ তো সামান্য ব্রাহ্মণ। কত জিতে এলাম। বড় বড় রাজা, বড় বড় দেবতা। এরা তো ছার ব্রাহ্মণ।

দূষণ হুংকার দিয়ে ব্রাহ্মণদের বলল: ওহে ওসব শিবটিব এবার ফেলে দাও। বেদিটেদি গুলোও ভেঙ্গে ফেল। সুখী হবে। নইলে প্রত্যেকের শির গড়িয়ে পড়বে ধুলোয়।

ব্রাহ্মণরা ভয় পেলেন না। ওঁদের মনে তখন শিব। শিবচিন্তায় ওঁদের অকম্পিত মন।

ধীরে ধীরে দৈত্যে দৈত্যে অবন্তী পরিব্যাপ্ত হল। অবন্তীর সাধারণ

মানুষ কাতর হয়ে পড়ল। দৈত্যদের অত্যাচারে তারা ত্রস্ত হল। সদলবলে ছুটে এল ব্রাহ্মণদের কাছে।

বলল ঃ ওরা মানুষ মেরে খেলা করছে। কাতারে কাতারে মরছে। আমরা যে কি করে এখনো বেঁচে আছি তাই ভাবছি। আপনারা কিছু একটা উপায় বলুন।

ব্রাহ্মণরা বললেন ঃ আমাদের সৈন্যসামন্ত নেই, অস্ত্রশস্ত্রও নেই। ওদের ওভাবে হটিয়ে দেবার কথা আমরা স্বপ্নেও আনতে পারিনা। ভরসা একমাত্র শিব। শুনেছি আশ্রিত যদি পীড়িত হয় তাহলে রক্ষকের মনে অভিমান উপজাত হয়। অতি সামান্য ব্যক্তিরও হয়। শিবের কি আর হবে না? কাজেই ওঁকে স্মরণ কর।

ব্রাহ্মণরা একাগ্র হয়ে শিবকে ডাকতে লাগলেন। ধ্যানাসনে বসে ওঁরা প্রাণায়ামে রত হলেন। ওঁদের মনে অকম্পিত প্রদীপশিখার মত জেগে রইলেন শুধু শিব।

ক্রমে দৈত্যরা এগিয়ে এল। দূষণের আদেশ হাওয়ায় ফেটে পড়ে গমগম করল ঃ বাঁধো, নয় বধ কর।

ব্রাহ্মণরা তখন বধির হয়েছেন। ওঁদের ইন্দ্রিয়ের দ্বার তখন রুদ্ধ।

দৈত্যরা এগিয়ে এল। বাঁধতে উদ্যত হল। সহসা যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। যেখানে ছিল মাটির শিবলিঙ্গ সেখানে একটি গর্ত হল। বেরিয়ে এলেন মহাকাল।

হুংকার দিয়ে বললেন ঃ স্তব্ধ হও।

এক হুংকার। যেন আকাশ ফেটে দুখানা হল। পলক ফেলতেও সময় পেল না দূষণ। ভস্ম হয়ে মুহূর্তে হাওয়ায় মিলালো।

অন্ধকার রাজত্ব করছিল। প্রতাপ ছড়িয়ে চারিদিকে টেনে দিয়েছিল কালো অন্তরাল। সূর্য উঠল আকাশে। মুহূর্তে অন্ধকার যেন বাষ্পীভূত হল। শিব প্রকটিত হলেন। পলকে দৈত্যসৈন্যরা পরিণত হল ভস্মে।

স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠল। দেবতারা ফুলের বৃষ্টি করলেন।

ব্রাহ্মণরা দুচোখ মেলে দেখলেন সম্মুখে প্রসন্ন শিব। শিব বললেন ঃ মাভৈঃ?।

ব্রাহ্মণরা বললেন ঃ প্রভু আমাদের মুক্তি দিন। আর লোকরক্ষার জন্য আপনি এখানে থাকুন।

শিব ব্রাহ্মণদের কথা ফেলতে পারলেন না। ওদের মুক্তি দিলেন। রয়ে গেলেন সেই সুন্দর গর্তে। পৃথিবীতে অবতীর্ণ এই শিবই নাম পেলেন মহাকালেশ্বর।

মরলোকে দুঃখ এবং দুঃখ। মহাকালেশ্বরকে শুধু একবার দর্শন।

তাহলেই কালো পৃথিবী হয় আলোয় উদ্ভাসিত। দুঃখের পৃথিবী হয় সুখের পৃথিবী।

২০. অমরেশ্বর

বিন্ধ্য পর্বতে সাড়া জেগেছে। বিন্ধ্য ব্যতিব্যস্ত, কৃতকৃতার্থ। নারদ এসেছেন। আপ্যায়নের জন্য বিন্ধ্যের ছুটোছুটির অন্ত নেই। বিন্ধ্য ব্যতিব্যস্ত। ভগবান নারদ এসেছেন বিন্ধ্যের আলয়ে। বিন্ধ্যের মহাভাগ্য। উনি অদ্য কৃতকৃতার্থ।

এখন বিন্ধ্য একটু স্থির হয়ে বসেছেন। নারদের সঙ্গে তিনি নানা কথা বলছেন। নারদ শুনেছেন, বলছেনও। একসময় বিন্ধ্য বললেন ঃ আমার এখানে সবই আছে। অভাব নেই কিছুর। সবসময়ে সবকিছুই এখানে ঠিক ঠিক মেলে।

নারদের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিন্ধ্য বললেন ঃ কেন কিসের অভাব দেখলেন এখানে? অভাব নেই শুনে যে আপনার দীর্ঘশ্বাস পড়ল?

নারদ বললেন ঃ তোমার এখানে সব বস্তুই আছে। এ বিষয়ে কোনই সংশয় নেই। তবু সুমেরুই শ্রেষ্ঠ। কারণ সুমেরুকে দেবতাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। কিন্তু তোমাকে তা মনে করা হয় না।

নারদ আর বসলেন না। তিনি অন্যত্র গমন করলেন।

নারদ চলে গেলেন। কিন্তু বিন্ধ্যর সমস্ত শান্তিও যেন তাঁকেই অনুসরণ করল। বিন্ধ্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলেন। নারদ সত্যই বলেছেন। বিন্ধ্য সত্যই মানে মর্যাদায় সুমেরুর চেয়ে অনেক খাটো। অথচ এতদিন তিনি ভুলের স্বর্গে স্বপ্নে ভোর ছিলেন।

বিন্ধ্যের মনের শান্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হল। যত দিন যেতে থাকল ততই নিজের উপর তাঁর ঘৃণা বাড়তে থাকল। যত ঘৃণা বাড়তে থাকল ততই সংকল্পে বিন্ধ্য কঠোর হতে লাগলেন। সুমেরুকে অতিক্রম করতে হবে। তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করতে হবে। শিব তুষ্ট হবেন। বিন্ধ্যের মান বাড়বে। সুমেরুর মহিমা খর্ব হবে।

ওঙ্কারযন্ত্রে স্থাপিত হল পার্থিব শিবমূর্তি। বিন্ধ্যের তপস্যা শুরু হল। শিবধ্যানে বিন্ধ্য যেন পাষাণ হলেন। অচল অনড় মনে বিন্ধ্য শিবের ধ্যান করতে লাগলেন। দিন গেল, মাস গেল, মাসের পর মাস গেল। ছয়মাস পরে শিব এলেন বিন্ধ্যে। বেদের বর্ণনায় শিব যেমন ঠিক তেমন মূর্তিতে তিনি বিন্ধ্যের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। বললেন ঃ কি এমন চাও যে এমন তপ জুড়েছ?

বিন্ধ্য বললেন ঃ আমি আরো বেড়ে উঠি এই বর দিন।

শিব বুঝলেন এ প্রার্থনা শুভ নয়। অপরের দুঃখ উৎপন্ন হবে। প্রার্থনা পূরণ করা তাই উচিত নয়। তবু শিব বললেন ঃ তাই হবে।

দেবতা ও ঋষিরাও বিপদ বুঝলেন। ওঁরা দেখলেন দুঃখের মেঘ ধীরে ধীরে যেন ঘনীভূত হচ্ছে। দেবতা ও ঋষিরা এক সঙ্গে মিলে শিবকে ধরে পড়লেন। বললেন ঃ আপনাকে এখানে থাকতে হবে।

মহাদেব ওঁদের প্রার্থনায় কান না দিয়ে পারলেন না। সম্মত হলেন। শিব দুই লিঙ্গে উদ্ভূত হলেন! ওঙ্কারযন্ত্রে এক লিঙ্গ। ইনিই ওঙ্কার। পার্থিব মূর্তিতে আর এক লিঙ্গ। ইনিই অমরেশ্বর।

অমরেশ্বরের পূজায় ওঙ্কারের আরাধনায় অশেষ ভাগ্য। যারা এখানে প্রণত হবে পূজায়, জন্মের চক্রে বাঁধা পড়ে গর্ভবাসের যন্ত্রণায় আর তাদের কাতর হতে হবে না। সিদ্ধ হবে তাদের তাবৎ মনোরথ ॥

২১· কেদারেশ্বর

বিষ্ণু হলেন নরনারায়ণ। লোকরক্ষা করতে হবে, কল্যাণের কিরণে লোক-সমূহ প্লাবিত করতে হবে। বিষ্ণু অতন্দ্র তপস্যায় মগ্ন হলেন।

বদরিকাশ্রম। নরনারায়ণ এখানে তাপ নাশ করতে তপোপরায়ণ হয়েছেন।

নরনারায়ণ পূজো করেন। পূজো করেন শিবের। পার্থিব লিঙ্গে শিবপূজো, বিষ্ণুর শিবপূজো।

শিব বৎসল হলেন। অমন ভক্ত। করুণা করতেই হয়। শিব আবির্ভূত হলেন।

একদা কেদারশৃঙ্গে জ্যোতির বন্যা নেমে এল। ভক্ত বিষ্ণু পরমেশ্বরকে দর্শন করলেন।

জ্যোতির মধ্য থেকে বাক্য নির্গত হল ঃ তুমি পূর্ণ, তপস্যায় তোমার কি কাজ? তবু করেছ, তাই জানতে চাই কি তোমার প্রার্থনা?

বিষ্ণু বললেন ঃ জ্যোতির মূর্তিতে নিত্য এখানে অবস্থান করুন।

কেদারশৃঙ্গে পরমেশ্বর প্রকটিত হলেন। কেদারশৃঙ্গ জ্যোতির সমুদ্রে যেন ডুবে রইল। ভক্তরা তাঁকে দর্শন করবেন, দূর করতে সক্ষম হবেন সমস্ত তাপ, তাই শিব সেখানে বিরাজ করলেন।

ভক্তের ভগবান। ভগবানের ভক্ত। শিব ভক্তের জন্য কেদারেশ্বর হলেন। ভক্তেরা কেদারেশ্বরের নামে পেল অখণ্ড শান্তি।

লোকে লোকে প্রচারিত হল : কেদারেশ্বরের দর্শনে সর্বদুঃখের নাশ হয়। যদি কর কেদারে শিবদর্শন, জাগরণে এমনকি নিশিস্বপনেও দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না ॥

২২. ভীমশঙ্কর

একটি বালকের দীর্ঘশ্বাসে বিজন পার্বত্যপ্রদেশ আকুলিত হয়ে উঠল। সহ্য পর্বত। পাষাণ, পাষাণ এবং পাষাণ। পাষাণের বুকেও হয়ত সাড়া জাগল। নইলে বায়ু এত মন্থর কেন? নইলে গাছে গাছে পাতায় পাতায় কেনই বা এত বিষণ্ণতা?

সহ্যপর্বতে একটি বালকের দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হতে হতে জমাট বেঁধে ক্রমে কঠোর সংকল্পে পরিণত হল।

কর্কটী ও ভীম। মাতা এবং পুত্র। ভীম বালকমাত্র। ভীম উতলা হয় : কে তার পিতা? পর্বতের গাত্রে প্রতিধ্বনিত হয় : কে? কে? কে?

ভীম সংশয়ে কাতর হয় : শুধু মা আর সে? আর কেউ নয়? কেউ কি তাব নেই?

ভীম কর্কটীকে সুধালো : আমার পিতা কে? একা রয়েছি এই পর্বতে। কেউ কি কোথাও আমাদের নেই?

কর্কটী অন্যমনা হয়। ছবির পর ছবি। আসে, যায়। তার চোখের তারায় কত ছায়া, কত ছবি।

রাক্ষস কর্কট, রাক্ষসী পুষ্কসী। তাদেরই কন্যা কর্কটী। নিতান্তই সে অনাথা নয়। রাক্ষস বিরাধ। তারই পত্নী কর্কটী। কিন্তু বিধি বাম। সুখ সইল না। রামচন্দ্রের হাতে বিরাধ নিহত হল। স্বামীহারা কর্কটী চলে এল পিতার কাছে।

সামান্য কদিন। তারপরই এল সেই দিন। কর্কট এবং পুষ্কসী দুজনেই পরিণত হল ভস্মে। মুনি সুতীক্ষ্ণ। তপস্যায় পরাক্রান্ত। কর্কট ও পুষ্কসীর লোলুপ হস্ত প্রসারিত হল সুতীক্ষ্ণের দিকে। তারপরই নেমে এল মহাশান্তি। মুনির ক্রোধে কর্কটী সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ল। স্বামী নেই, পিতা নেই, মাতা নেই। সহ্য পর্বতে সে চলে এল। পর্বত বুক পেতে তার দুঃখ গ্রহণ করল।

সহসা একদা আর এক দুঃখ এল। সঙ্গে কিছুটা শান্তিও।

বিখ্যাত রাবণ। বিখ্যাত তার ভাই কুম্ভকর্ণ। সেই পরাক্রান্ত কুম্ভকর্ণ এল সহ্য পর্বতে। কর্কটী নারী, তদুপরি একান্তই একা। কুম্ভকর্ণের লালসার

অগ্নিতে কর্কটী দগ্ধ হল। জন্ম হল ভীমের। একজন এসেছিল। দগ্ধ করে গেল। কিন্তু রেখে গেল কিছু শান্তি। সন্তান এল বুকে। দুঃখ গেল দূরে।

কর্কটীর চোখে ছায়া, ছবি। কর্কটী বর্ণনা করল। ভীম বড় হয়েছে। সে মাতার দুঃখ বুঝল।

কিন্তু ঃ কোথায় পিতা ?

কর্কটী নতমুখে উত্তর দিল ঃ রামচন্দ্রের হাতে তাঁরও কাল হয়েছে।

পাষাণের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ভীমও পাষাণ হল। একা সেই হরিই তাদের তাবৎ দুঃখের কারণ। মাতামহ নেই, বিরাধ নেই, কুম্ভকর্ণও নেই। কিন্তু ভীম আছে। এখনো সহ্য পর্বতের পাষাণবক্ষ তার পদপাতে কেঁপে উঠে। ভীমের সংকল্প কঠোর হল ঃ হরির অনিষ্ট চাই। যে করেই হোক সে তা করবে।

শক্তি চাই। হরিকে ক্লিষ্ট করতে হবে। অতএব শক্তি চাই। আর শক্তির জন্য চাই তপস্যা।

ভীম ব্রহ্মার তপস্যায় একাগ্র হল। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভীম ব্রহ্মার ধ্যান করতে লাগল। তপস্যায় তপস্যায় ভীমের মধ্যে উপজাত হল অনন্ত তেজ। দেবসমাজেও ছড়িয়ে পড়ল সেই তেজ। দেবতারা ছুটে এলেন। ব্রহ্মাকে বললেন ঃ তপস্যার তেজে সব পুড়তে বসেছে। এবার যা হয় একটা বর তাকে দিন।

ব্রহ্মা এলেন। হাঁসের পিঠ থেকে নেমে ভক্তসমীপে এসে মধুর স্বরে ব্রহ্মা বললেন ঃ কি চাও ? আমি এসেছি। বর দেব। নাও।

ভীম বলল ঃ এত যদি প্রসন্ন তাহলে অতুল বল দান করুন।

ব্রহ্মা ভক্তকে চরিতার্থ করে ফিরে এলেন।

ভীম এল মাতার কাছে। বলল ঃ আজ থেকেই দেবতাদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ। একে একে দেখো কিভাবে উৎসাদিত হয় দেবকুল।

নিকটেই কামরূপ। কামরূপই হল ভীমের প্রথম শিকার। রাজা বন্দী হলেন।

রাজা পরম বৈষ্ণব। অদ্য বিধাতার ইচ্ছা কি নিদারুণ। সহসা শত্রু এল, সর্বস্ব জিতে নিল। এখন তিনি বন্দী। ভক্ত রাজা ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন। নির্জন বন্দীশালায় মাটি দিয়ে শিব গড়লেন, পূজা করলেন।

মনে মনেই তিনিই গঙ্গায় স্নান করলেন, গঙ্গাস্তব করলেন, আর পূজা করলেন শিবের। পূজাশেষে জপতে লাগলেন ঃ নমঃ শিবায় ! নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়। রাণী দক্ষিণা। তিনিও রাজাকে অনুসরণ করলেন। ওঁরা দুজনেই পূজায় অনন্যমনা হলেন।

ওদিকে ভীমের বিজয় অভিযান অব্যাহতই রইল। সমগ্র পৃথিবীই ক্রমে

তার পদানত হল। বেদ উপনিষদের কথা আবার সব লোপ পেল। ঋষি ও দেবতারাও বাদ গেলেন না। তাঁদের জীবনেও দুঃখ নেমে এল।

ক্লিষ্ট দেবসমাজ। ক্লিষ্ট ঋষিসমাজ। মহাকোশী নদীর তীরে ওঁরা শঙ্করের শরণ নিলেন। পূজায় স্তবে শঙ্কর প্রসন্ন হলেন। বললেনঃ কি চাও বল।

দেবতারা বললেনঃ সবই আপনি জানেন, তবু সুধিয়েছেন, বলছি। ভীমের পরাক্রমে আমরা নিয়ত ত্রাহি ত্রাহি করছি। আপনি অগতির গতি। রাক্ষসের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করুন।

শিব বললেনঃ তোমাদের করেছে, আমার প্রিয় ভক্ত কামরূপেশ্বরকেও করেছে। কাজেই আমি যাহোক একটা কিছু অবিলম্বেই করছি।

শিব প্রমথদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

রাক্ষস ভীম অদ্য অতিশয় উত্তেজিত। অনুচরেরা এসে নিবেদন করলঃ কামরূপেশ্বর মাটির শিব পূজো করছে। আপনার অভিচার করছে।

ভীম উত্তেজিত হল। এতদূর স্পর্ধাকে পরাক্রান্ত রাক্ষসের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। ভীম তরবারি হাতে ছুটে গেল বন্দীশালায়।

মাটির শিব, নানাবিধ পূজার উপকরণ। ভীম ক্ষণকাল তাকিয়ে রইল। দাঁতে দাঁত ঘষল। গুঁড়িয়ে দিতে চাইল সব। কিন্তু রাজা এসব কি করছে। এ কি অভিচার? ভীম যেন কিছুটা ভীতও হল। জিজ্ঞেস করলঃ কি করছ, কেনই বা করছ? সত্যি করে বল। নইলে তোমার অবধারিত মৃত্যু।

রাজা মুহূর্তে মনকে দৃঢ় করে ফেললেন। যা হবার তা হবে। রাজা মরিয়া হয়ে সত্য কথাই বললেন। রাজা বললেনঃ মাটির এই শিবলিঙ্গ নিছক মাটিরই নয়। এর মধ্যেই আছেন শঙ্কর। তাঁর ভক্তকে কেউ পীড়ন করলে তিনি নেমে আসেন, বিহিত করেন। আমি নিতান্তই দীনহীন। তাই হয়ত তিনি এখনো মুখ ফিরিয়ে আছেন। আমি সেই শঙ্করেরই পূজা করছিলাম।

ভীম বললঃ ওহো শিব, তাকে আমি সম্যক জানি। আমারই খুড়ো রাবণ, নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। শিবকে খুড়োমশাই নিতান্তই দাস বানিয়ে রেখেছিলেন। সেই শিবের কাছে তুমি বিহিত আশা কর! হাসালে। যাহোক ডাকো তাকে। যত খুশি ডাকো। আসুক, বিহিত করুক। আমার সঙ্গে তার একবার দেখা হলেই সব বুঝবে। যতক্ষণ দেখা না হয় ততক্ষণ মনে মনে জয়ের আশা পুষে তাকে ডাকো। যত পার ডাকো। কিন্তু এই শিবলিঙ্গ এখান থেকে দূর করবে, নইলে আমার শরীরে যে কি বল তার কিঞ্চিৎ পরিচয় তোমাকে দিতে আমি বাধ্য হব।

ঃ আমি নিতান্তই হয়ত অধম। ভয়ে তাঁকে দূরেও হয়ত করব। কিন্তু তিনি আমায় ত্যাগ করবেন না। ভক্তকে তিনি দেখেন।

ভীম বলল ঃ ব্যাটা নিজে ভিক্ষে করে খায়। তাকে কে দেখে তার নেই ঠিক। সে দেখবে ভক্তকে। একবার এলে তো হত। একটু যুদ্ধটুদ্ধ করবার না হয় চেষ্টা করা যেত।

রাজা বললেন ঃ তোমার শক্তি আছে। আমিও আপাতত তোমার বন্দী। তুমি যা খুশি করতে পার, বলতেও পার।

ভীম হঠাৎ রেগে গেল। 'তোমার শিব নাকি ভক্তের ভগবান, দেখি কেমন তার বল।'

করাল এক করবাল নিক্ষিপ্ত হল রাজার প্রতি। পলকমধ্যে মাটির সেই লিঙ্গ থেকে শিব বেরিয়ে এলেন। বললেন, ভীমেশ্বর রূপে আমি আবির্ভূত হলাম। আমি ভক্তকে রাখি। এবং সে ক্ষমতা প্রত্যক্ষ কর।

পিনাকের ঘায়ে সেই করবাল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এবার ত্রিশূল, তারপর শক্তি অস্ত্র। কিন্তু সমস্তই মিশে গেল ধুলোয়। ক্রমে ভীমের অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে এল। রাক্ষসবাহিনী এল এগিয়ে। প্রমথগণের সঙ্গে তাঁদের ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হল। সমুদ্র, পর্বত, আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র চঞ্চল হল। দেবতারা ঋষিরাও চঞ্চল হলেন। পীড়া ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র।

নারদ এসে নিবেদন করলেন ঃ প্রভু সব যে যায়, এবার ঐ রাক্ষসকে বধ করুন।

সহসা যেন দাবানল ছড়িয়ে পড়ল। শিব হুংকার দিলেন। পলকমধ্যে রাক্ষসগণ ভস্ম হল। ভীমের ভস্ম কোথায় যে পড়ল, কেউ নিরূপণই করতে পারল না। শিবের ক্রোধ শান্ত হল না। বনে বনে ছড়িয়ে পড়ল জ্বালা। রাক্ষসের ভস্মে ভস্মে সমস্ত বন পরিব্যাপ্ত। যেসব ওষধি কাজে লাগত না সে সব ভস্মের প্রভাবে হল কার্যকারী।

শিবের ক্রোধ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকল। দেবতারা এসে মিনতি করে বললেন ঃ প্রভু, প্রশমিত হোন। এদেশে বহুতর দুঃখ, বহুতর জ্বালা। আপনি এখানে অবস্থান করুন, কল্যাণ বিতরণ করুন। এখানে আপনি আছেন, লোকে জানবে আছেন ভীমশঙ্কর। ভক্তের ভগবান মুহূর্তে শান্ত হলেন। প্রসন্ন হাস্যে বিস্তার করলেন অদ্ভুত মহিমা।

২৩. বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য

আশেপাশে সম্মুখে বিমুগ্ধ ঋষিমণ্ডলী। ওঁরা শুনছিলেন। সূত বলছিলেন। অমৃতকথা অমৃত করে বলছিলেন। ঋষিরা শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হতে হতে হর্ষে আপ্লুত হয়ে মাঝে মাঝে সুধিয়ে বসছিলেন আরো আরো কত কথা।

সূত বললেনঃ কাশীতে বিশ্বেশ্বর। বিশ্বেশ্বরের মহিমা কথা দিয়ে বোঝাবার নয়। কাশীর মহিমাও তাই। কথার সাধ্য কি যে প্রকাশ করে।

যখন সৃষ্টি ছিল অন্ধকার তখনও কাশী ছিল। যখন সৃষ্টি তলিয়ে গেল তখনও কাশী ছিল।

সৃষ্টির একেবারে গোড়াকার কথা। তখন কেউ নয়, কিছু নয়, শুধু তেজঃ স্বরূপ পরমাত্মা। দিন গেল। সেই পরমাত্মা থেকে জন্ম নিল প্রকৃতি ও পুরুষ। জন্ম নিয়েই ওঁরা কি করি-কি করি কোথা যাই-কোথা যাই করে আঁকুপাঁকু করতে লাগলেন। পরমাত্মা বললেনঃ তপস্যা কর।

প্রকৃতি ও পুরুষ বললেনঃ কিন্তু ঠাঁই কৈ? কোথায়ই বা থাকি, কোথায়ই বা তপস্যা করি?

সেই সময় পরমাত্মা এই কাশী গড়লেন। প্রাসাদে অট্টালিকায় দিব্য পঞ্চক্রোশব্যাপী এক নগর গড়লেন। বললেনঃ এখানে তপস্যা কর।

অন্তরীক্ষে অবস্থিত রইল কাশী। পুরুষ ও প্রকৃতি সেখানে বহুদিন ধরে বহু তপস্যা করলেন। শ্রম হল। গাত্র হতে নিঃসৃত হল বন্যা। চরাচর জলময় হল। বিষ্ণু চারিদিকে তাকালেন, আশ্চর্য হলেন। যত তাকালেন, তত আশ্চর্য হলেন। বিস্ময়ে ওঁর মস্তক কম্পিত হল। কম্পন, কর্ণ থেকে মণিপতন, মণিকর্ণিক তীর্থের সৃষ্টি।

জলের তলায় তলিয়ে ছিল জগৎ। কিন্তু কাশী ছিল ঊর্ধ্বে, শিবের ত্রিশূলের অগ্রে। ওখানেই বিষ্ণু নিদ্রাগত হলেন। প্রকৃতিও নিদ্রাগত হলেন। ধীরে ধীরে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে জন্ম নিলেন ব্রহ্মা। শিব ব্রহ্মাকে বললেনঃ সৃষ্টি কর।

ব্রহ্মা দেখলেন, শিবতেজে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সমুদয় পদার্থই শিবতেজে পরিপূর্ণ। এবার উনি সৃষ্টির কাজে অভিনিবিষ্ট হলেন। সৃষ্টি হল পঞ্চাশ কোটি যোজন পরিমিত চতুর্দশ ভুবন।

জলের উপর ব্রহ্মাণ্ড। যেন একখানি নৌকা, যেন ঘোলে নবনীত পিণ্ড! জলের উপর ব্রহ্মাণ্ড। ধরে রইল ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজ। জলের উপর স্থির ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগে ভূর্লোক, তার অধোভাগে তল, অতল, সুতল, বিতল, মহাতল, পাতাল, রসাতল। ঊর্ধ্বভাগে ভূর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক। নিম্নে সপ্ত ভুবন, ঊর্ধ্বে সপ্তভুবন। ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হল সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, সুমেরু পর্বত, আরো কত পর্বত, নদনদী, বন-উপবন।

ব্রহ্মা চিন্তায় পড়লেন। জীব সৃষ্ট হয়েছে। কর্মের বন্ধনে জীব বদ্ধ। তারা কি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ আর পাবে না। ব্রহ্মা এমনটি চাইলেন না। বন্ধন

ছিঁড়ে পড়বে, সাক্ষাৎকার হবে। ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন পঞ্চক্রোশী। শিব সেখানে অবস্থান করলেন। বললেন ঃ এ স্থান কখনোই পরিত্যাগ করব না।

পঞ্চক্রোশীতে স্থাপিত হল অবিমুক্ত লিঙ্গ। ত্রিশূলে ধরা ছিল। ছিল শূন্যে। শিব ত্রিশূল সরিয়ে নিলেন। পুণ্যক্ষেত্রকে স্থাপন করলেন মরলোকে।

ব্রহ্মার কাল শেষ হয়। ধ্বংস হয় জগৎ। তখন শিবই এই পুণ্যক্ষেত্রকে আবার তুলে ধরেন শূন্যে ত্রিশূলের ডগায়। আবার সৃষ্টি, আবার মরলোকে নেমে আসে কাশী। কাশী—কর্মের বন্ধন নাশ করে, তাই কাশী। কাশীতে শ্রেষ্ঠ মুক্তি—সাযুজ্য মুক্তি। পাপী-মহাপাপীর একমাত্র গতি এই কাশী।

সূত থেমে গেলেন। দূর আকাশে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। ঋষিরা থেমে রইলেন। নিস্পন্দ শরীরে নিষ্পলক চোখে ওঁরা সূতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মাত্র কয়েকটি পল। মনে হল কয়েক যুগ। সূত আবার শুরু করলেন। সামনে বসে সূত কথা বলছিলেন। মনে হল, বহু দূর থেকে কোন মহাশূন্য থেকে বাণী আসে ভেসে।

ঃ একদা শঙ্কর এলেন কাশীতে। অবিমুক্ত লিঙ্গ দর্শন করলেন। অবিমুক্ত লিঙ্গের মনে ঘনীভূত হল পরম আনন্দ। স্তবে মন্ত্রে তিনি শিব ও পার্বতীর পূজা করলেন। অবশেষে প্রার্থনা করলেন ঃ আমি আপনারই। আমি আছি, লোকের হচ্ছে হিত। আপনিও এখানে থাকুন। লোকের হিত হবে অশেষ।

বারবার প্রার্থনা করলেন সেই অবিমুক্ত লিঙ্গ। তাঁর চোখে জল। শিবের পা ধরে তিনি বললেন ঃ আপনি এই কাশী নিন, আমি নিরত হই ধ্যানে।

কাশীর মাহাত্ম্য বড় মাহাত্ম্য। শিব বুঝলেন। কপালও মোচিত হল। বড় মাহাত্ম্য এই কাশীর। অবিমুক্ত লিঙ্গের প্রার্থনারও শেষ নেই। শিব কাশীতে রয়ে গেলেন।

ঋষিরা সহসা সমস্বরে বললেন ঃ কপালমোচনের বৃত্তান্ত কিন্তু আমরা জানিনে।

সূত বললেন ঃ শিব ও পার্বতী ভ্রমণ করতে করতে একবার ব্রহ্মলোকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা সমাদর প্রকাশ করলেন। ভক্তিতে গদগদ হয়ে ব্রহ্মা স্তব শুরু করলেন। শিবও খুশিতে ভরে উঠলেন। কিন্তু একটু গোল দেখা গেল। সুন্দর সুন্দর কথার মালা। মাঝখানে অপভ্রংশ শব্দ। ব্রহ্মার এক মুখে উচ্চারিত হল অপভ্রংশ শব্দ। শত সুন্দরের পাশে এক অসুন্দর। সুন্দর চন্দ্রে এক বিন্দু কলঙ্ক! শিবের অনেক খুশির সঙ্গে মিশল স্বল্প একটু রোষ। শিব ঠিক করলেন, ব্রহ্মার এই মুখকে শাস্তি দেওয়া দরকার। নইলে সমূহ অকল্যাণ। শিবের তৃতীয় নয়নে বহ্নি জ্বলে উঠল। ব্রহ্মার একটি মস্তক স্খলিত হল। মস্তক স্খলিত হল, কিন্তু ভূমিতে নয়। ব্রহ্মা হত্যার পাপ শিবকে স্পর্শ

করবে। তাই ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তক সংলগ্ন হল শিবের পৃষ্ঠে।

শিবের পৃষ্ঠে ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তক। যেখানে যান সেখানেই ঐ মস্তকের ভার শিবকে বহন করে করে নিয়ে যেতে হয়।

শিব সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করলেন। তাঁর পৃষ্ঠে ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তক। শিব সমস্ত লোককে সেই মস্তক দেখালেন। পৃথিবীর লোকের লাভ হল মূল্যবান শিক্ষা।

অবশেষে শিব কাশীতে প্রবেশ করলেন। উনি নিজেও অতটা ভাবেননি। অহ্ বিস্মিত হয়ে উপলব্ধি করলেনঃ কাশী এক মহা পুণ্যস্থানের নাম। কাশীতে এলেন, পিঠ থেকেও নেমে গেল সেই ভার।

শিব বুঝলেনঃ কাশী সাধারণ স্থান নয়। শিব ভাবলেনঃ এমন স্থান, তদুপরি অবিমুক্ত লিঙ্গের অনুরোধ।

শিব কাশীতে রয়ে গেলেন।

ঋষিদের মনে আবার প্রশ্নঃ ব্রহ্মার মুখে সহসা খারাপ কথা উচ্চারিত হল কেন? কি এমন কারণ?

ঋষিরা জিজ্ঞেসও করলেনঃ এমনটি কেন হল?

সূত বললেনঃ ব্রহ্মা পিতা, সরস্বতী কন্যা। অথচ পিতা হয়ে তিনি সরস্বতীর রূপে একদা বিমুগ্ধ হলেন। সরস্বতী চলেছেন। পিছন পিছন বিমুগ্ধ ব্রহ্মা। ব্রহ্মা বিহ্বল সুরে বললেনঃ যেও না যেও না, ক্ষণকাল দাঁড়াও।

ব্রহ্মার কণ্ঠস্বরে সরস্বতীর বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। বুঝলেন, এ স্বর তো পিতার মত নয়। বললেনঃ তুমি পিতা, অথচ কন্যার প্রতি দুষ্ট মনোভাব পোষণ করছ, এমনকি মুখেও তা প্রকাশ করেছ। তোমার ঐ মুখে যেন দুষ্ট কথাই উচ্চারিত হয়।

সেই থেকে ব্রহ্মার পঞ্চম মুখে সর্বদা বিরুদ্ধ কথা।

বলতে বলতে সূত আবার থেমে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললেনঃ পাপ কখনো এমনি এমনি যায় না। শিবকেও তার জন্য পরব্রহ্মের আরাধনা করতে হয়। অবশ্য এমনটি যে হয় তাও অকারণে নয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা করেন, যেমন ভাবে করেন, সাধারণ মানুষও সেই মত করে। ঈশ্বর যা করেন লোকে তারই অনুসরণ করে। তাই তিনিও ভাল হয়ে চলেন। নইলে জগৎ অনাচারে নিমজ্জিত হত। সেই ঈশ্বরেও পাপ লাগল এবং সেই পাপ দূর হল কাশীতে এসে। কাশীর কি নিদারুণ মহিমা। ঈশ্বরের পাপ, তাও দূর করে!

তবে বলতে পার, ঈশ্বর লীলাময়। তাঁর আচরণ বোঝে কার সাধ্য। যিনি মদনকে ভস্ম করেন তিনিই আবার অঙ্গে ধরেন যুবতী। নিজে দিগম্বর, অথচ ভক্তদের দেবার বেলায় কত তাঁর ঐশ্বর্য। নিজের গলায় নরমুণ্ডের মালা,

ভক্তদের গলায় মুক্তামালা। নিজে মাখেন ভস্ম, ভক্তদের দেন চন্দন। পরমেশ্বরের আচরণ বোঝে কার সাধ্য। মাথায় ওঁর জটা, অথচ ওঁরই দৌলতে ভক্তদের মাথায় উঠছে মুকুট। সেই লীলাময় পরমেশ্বর কাশীতে রয়ে গেলেন। একেই কাশী, মহাস্থান, তারও পর স্বয়ং তিনি এলেন। বাস গাড়লেন। তাই তো বারবার বলছিলাম, কথা তো ছার। কি সাধ্য তার! এমন স্থানের মহিমা কি কথায় প্রকাশিত হয়?

২৪. ত্র্যম্বকেশ্বর

তপস্যায় তপস্যায় ব্রহ্ম পর্বতে এতকাল কেটে গেল। কিন্তু আকাশের চোখে এত রোষ কোনদিন দেখেননি। ব্রহ্ম পর্বতে দশ হাজার বছর তো উনি কাটিয়েছেন। কিন্তু এই একশো বছর কি এক অভিশাপের বেদনায় যেন মূর্চ্ছিত।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গৌতমের মন ক্রমশই বিষণ্ণ হল। অহল্যার দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। বললেনঃ একশো বছর কেটে গেল, অথচ দেবতা কি অকরুণ!

অহল্যা বললেনঃ জল, কোথাও নেই, ছিটেফোঁটাও নেই। চারিদিক শুধু ধু ধু।

ব্রহ্ম পর্বতের কোথাও এক কণা সবুজও নেই। বিধাতা ঘষে ঘষে প্রকৃতির বুক থেকে যেন সমস্ত সবুজ তুলে ফেলেছেন। ব্রহ্ম পর্বতের কোথাও এক বিন্দু জল নেই। বিধাতা রোষ ছড়িয়ে সমস্ত জল যেন শুষে নিয়েছেন। কাতারে কাতারে জীবজন্তু মরে শুকিয়ে ধুলোয় মিশে গেল। কত ঋষি মানুষ জল জল করে বুক ফেটে মরে গেল। তবু বিধাতার মন আর্দ্র হল না।

ব্রহ্ম পর্বত এখন খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। যারা ছিল তারা পালিয়ে প্রাণ পেয়েছে। আছেন মাত্র জনকয়েক ঋষি। যোগবলে ওঁরা এখনো বেঁচে আছেন।

গৌতম আবার তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। একটু জল, তপস্যা একটু জলের জন্য। নিরন্তর ছয় মাস ধরে গৌতম বরুণের ধ্যান করলেন। দেবতার মন টলল। তিনি এলেন। বললেনঃ বর প্রার্থনা কর।

গৌতম বললেনঃ বৃষ্টি চাই। বৃষ্টি।

বরুণ বললেঃ ব্রহ্মাও যাঁর আজ্ঞা পালন করে চলেন এ অনাবৃষ্টি ঘটিয়েছেন সেই তিনি। তাঁকে অন্যথা করে কার সাধ্য! আমি বৃষ্টি করব— এ তো স্বপ্নেরও অগোচর। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।

গৌতম বললেন ঃ আপাতত এ ছাড়া অন্য কোন প্রার্থনা আমার নেই। যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে ঐ বরই দান করুন। আপনি মহাত্মা ব্যক্তি। আর্তের উপকার তো মহাত্মারই ধর্ম। মহতেরাই তো পরের দুঃখ বোঝেন। আপনি একবারটি শুধু আমাদের দুঃখ অনুধাবন করুন।

ঃ ... ... ।

ঃ সজ্জনের সেবায় মন্দ ব্যক্তিদেরও কপাল ফেরে। সূর্যের কিরণ, তমের নাশ ঃ সজ্জন সেবা, দুঃখের নাশ। পৃথিবীতে কারো কারো শোকদুঃখ, কারো বা হর্ষ, কারো আহ্লাদ। যেমন লোকসেবা তেমন ফল। পণ্ডিতেরা বলেন, মন্দিরের সেবায় সিংহ লাভ করে মুক্তাফল, আর শৃগাল অস্থি। যিনি সজ্জন পরের দুঃখ দেখে তিনি বিগলিত হন, এগিয়ে আসেন হাত বাড়িয়ে। যে তাঁকে কষ্ট দেয় তারও তিনি উপকার করেন। বস্তুত সজ্জন যেন কল্পবৃক্ষ। সামান্য বৃক্ষ, স্বর্ণ, চন্দন, ইক্ষু—এরাও পরের জন্য উৎসর্গ করে তাদের তনু, মন, প্রাণ। সজ্জনদের তো কথাই নেই। পরোপকারের সুযোগ পেলে তাঁরা ভাগ্য বলে গণ্য করেন। নিতান্ত পাপিষ্ঠও যদি পরোপকারে রত হয় তবে তাকেও গণ্য করা হয় পুণ্যবান বলে। তাকে দেখে পাপিষ্ঠ বলে অবহেলা ভরে যারা দূরে যায় তারা পাপেরই ভাগী হয়। শুধু যে অনন্তদেবই পৃথিবীকে ধরে আছেন তা নয়। যাঁরা দীনকে দয়া করেন, যাঁদের বিদ্যা বা শৌর্যের অভিমান নেই, যাঁরা জিতেন্দ্রিয় ও পরোপকারী তাঁরাও পৃথিবীকে ধরে আছেন। তাই বলছি যদি প্রসন্ন হয়েই থাকেন তাহলে আমাকে মেঘজল দান করুন।

বরুণ বললেন ঃ একটি গর্ত খনন কর।

গর্ত খনিত হল। বরুণ সেটিকে জলে ভরে দিলেন। বললেন ঃ অক্ষয় হয়ে এ জল এই গর্তেই রইবে। এ স্থানও হবে তীর্থ। তোমার নামেই খ্যাত হবে এই তীর্থ।

জল ছিল না, জল হল। ছিল শুধু দাহ। দাহ গেল, এল স্নিগ্ধ প্রশান্তি। মরুর বুকে শস্য ফলল। ফলল ধান, যব, আরো কত কি। মরুর বুকে বৃক্ষ জন্মাল। ফলে ফুলে ভরে উঠল। পাখি ছিল না, প্রাণী ছিল না—ওরা এল। মানুষ ছিল না, মানুষ এল। মরুর বুকে একখণ্ড মরূদ্যান। সেখানে মনে মনে শতদল শত শত দল মেলে চাঁদের হাসি গায়ে মেখে ঝলমল করল।

ঋষিরা এসেছেন। শিষ্যরা এসেছে। রচিত হল তপোবন। নিশ্চিন্ত তপে তপোবনে ফুটে উঠল প্রশান্ত শ্রী। সুখী গৌতম, সুখী অহল্যা।

শিষ্যরা নিত্য জল আনয়ন করে, গৌতম নিত্যকর্ম করেন। সেদিনও কতিপয় শিষ্য জলের জন্য গিয়ে দাঁড়াল সেই জলাশয়ের ধারে। ঋষিপত্নীরা তখন জল নিচ্ছিলেন। ওঁরা রুষ্ট স্বরে বললেন ঃ এখন দূরে গিয়ে দাঁড়াও।

আগে আমাদের হোক, তারপর তোমরা এসো।

ঋষিপত্নীরা আরো আরো অনেক কটু কটু কথায় ওদের গালমন্দ করলেন। শিষ্যরা খামোখা গাল খেয়ে ফিরে এল। অহল্যাকে বলল। অহল্যা বললেনঃ আহা! আচ্ছা আমিই না হয় যাই।

অহল্যা ঋষিপত্নীদের বুঝিয়ে বললেনঃ ওরা তো কিছু করেনি। অমন করে ওদের আর বল না।

তথাপি অহল্যাই নিত্য আনতেন, সাঙ্গ হত গৌতমের নিত্যকর্ম।

ঋষিপত্নীরা ঈর্যায় সদাই কাতর। মহর্ষি গৌতম, এ জল তাঁরই তপস্যার ফল। অহল্যা তাঁরই পত্নী। ঋষিপত্নীরা অহল্যাকে ঈর্ষা করতেন। একদিন সেই ঈর্যার বিষ উদ্গীর্ণ হল।

অহল্যা মিষ্টি কথায় ওঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেন। মনে জ্বালা, মধুর বাক্য ওঁদের বোধ হত তিক্ত।

ঋষিপত্নীরা বাড়িতে এসে নিজের নিজের স্বামীকে বললেনঃ অত আর সহ্য হয় না বাপু। একদিন নয়, দুদিন নয়, রোজ। রোজ অমন করে অহল্যা যা নয় তাই বলবে! হয়েছি না হয় মেয়েমানুষ, তাই বলে কি সইতে হবে? আমাদের কি কেউ নেই?

ঃ ... .।

ঃ তোমাদের সব ঘণ্টার তপস্যা। রোজ রোজ একজনের মুখ নাড়া খাব তবে জল আনব। স্বামীদেবতা বসে বসে ঘরে তপিস্যে করছেন। এমন ক্ষমতা নেই যে এর একটা বিহিত করেন। ঘেন্না ঘেন্না! মরণও হয় না গা!

ঋষিরা নিত্য উত্যক্ত হন। কিন্তু কিছু বলেন না। অহল্যাকে তাঁরা সম্যক চেনেন। তিনি কখনই গালমন্দ করার মেয়ে নন। আর যদি কিছু বলেই থাকেন তাহলেও তাঁকে গিয়ে দুটো কটু কথা বলে আসা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্মে সইবে না। যিনি জীবন দান করছেন তাঁকে কটু কিছু বলা কখনোই উচিত নয়।

ঋষিপত্নীরা দিনের পর দিন মাত্রা বাড়িয়ে বাড়িয়ে অবশেষে চরমে উঠলেন। অহল্যার ক্লেশের সীমা রইল না। ঋষিরাও নিত্য নানাবিধ ভর্ৎসনায় অবশেষে একদিন সত্যিই পত্নীদের কথায় বিশ্বাস করলেন। ওঁরা একদিন সবাই মিলে বেড়াতে বেড়াতে গৌতমের আশ্রমে এলেন। গৌতমকে ওঁরা সব বললেন। গৌতম খুবই দুঃখিত হলেন।

ঋষিরা তাঁদের পত্নীদের সঙ্গে যুক্তি করতে লাগলেনঃ কেমন করে একটা কিছু বিহিত করা যায়?

একদা সব ঋষি মিলিত হলেন। একদল বললেনঃ এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে গৌতম আহত হতে পারেন। বরং এমন কিছু ছল বের করুন যাতে

উনি আমাদের প্রীতি রুষ্টও না হন অথচ আশ্রম ছেড়েও চলে যেতে বাধ্য হন।

কথাটি মন্দ নয়। কিন্তু ছল বের করাও সহজ নয়। ওঁরা গণেশের পূজো করলেন। উনিই বিঘ্নরাজ, বিঘ্নের শান্তি উনিই করতে পারেন।

ঋষিদের পূজায় গণেশ প্রসন্ন হয়ে বর দিতে চাইলেন। ওঁরা বললেন ঃ এমন বর দিন যাতে গৌতমকে আশ্রম থেকে বিদায় করতে পারি।

গণেশ বললেন ঃ গৌতম কোন দোষ করেননি, অথচ তোমরা তাঁর প্রতি রোষ করছ। এতে তোমাদেরই ক্ষতি। উপকারীকে দুঃখ দিলে সর্বনাশই ঘনিয়ে আসে। তোমরা তপস্যা করেছ, ভাল ফলই পেতে পার। কিন্তু নিচ্ছ মন্দ ফল। সোনা ফেলে নিচ্ছ কাচ।

ঋষিরা বললেন ঃ যা চেয়েছি তাই আমরা চাই।

গণেশ বললেন ঃ অধম কখনো উত্তম হয় না, আবার উত্তমও কখনো অধম হন না। অধম উত্তমকে দুঃখ দেয়, প্রতিদানে উত্তম দেন সুখ। কারণ এতে পরিণামে তাঁরই সুখের বৃদ্ধি হয়। নিদারুণ দুঃখের দিনে এই গৌতমই তোমাদের সুখী করেছিলেন। আজ তাঁকেই তোমরা দুঃখ দিতে উদ্যত হয়েছ। দুষ্ট পত্নীর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তোমরা যা করতে চলেছ তাতে শেষ পর্যন্ত গৌতমেরই ভাল হবে।

ঋষিরা গণেশের হিতকথায় কান দিলেন না। গণেশ বললেন ঃ পরে যা হবার হবে, আপাতত তোমাদের অভীষ্টই সিদ্ধ হোক।

গৌতমের আশ্রমের সম্মুখেই তাঁর ক্ষেত। ক্ষেতভর্তি ধান যব। গণেশ মায়াবলে এক রোগা গোরুর রূপ ধরে সেই ক্ষেতের ধান ও যব খেতে লাগলেন। গৌতম কোত্থেকে যেন ফিরছিলেন। দেখলেন ক্ষেতে গোরু ঢুকেছে শস্য নষ্ট করছে। হাতের কাছে পেলেন একটি খড়। সেটি তুলে নিয়েই তিনি হেই হেই করে এগিয়ে গেলেন। খড়গাছি পিঠে লাগতে না লাগতেই গোরুটি মাটিতে পড়ে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল।

ধারেকাছেই ঋষিরা সব ছিলেন। তাঁরা এসে বললেন ঃ একি করলে? ছি ছি শেষে গোবধ!

গৌতম খুব অবাক হয়েছেন। চুপচাপ অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ঋষিরা প্রচুর ভর্ৎসনা করলেন। ঋষিপত্নীরা অহল্যাকে যা নয় তাই বলে গাল দিলেন।

গৌতমও বাদ গেলেন না। মুখরা ঋষিপত্নীরা শুধু অহল্যাকে বলেই শান্ত হলেন না। গৌতমকে ধিক্কারে ধিক্কারে ওঁরা ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। ঋষিরা বললেন ঃ গো-হত্যা করেছে, ওর মুখ দেখাও পাপ।

ব্যাপারটি এখানেই শেষ হল না। একটু পরেই ঋষিরা ছেলে মেয়ে শিষ্যদের নিয়ে জোট পাকিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন ঃ তোর মুখ দেখাও পাপ।

আশ্রম ছেড়ে দূর হ !

মুখে বলে হল না। ওঁরা চারিদিক থেকে ঢিল ছুঁড়ে গৌতমকে প্রচণ্ড প্রহার করলেন।

গৌতম হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে লাগলেন। বললেন ঃ তোমরা ঠিকই বলেছ। আজই আমি চলে যাচ্ছি।

এক ক্রোশ দূরে আশ্রম বানিয়ে গৌতম বাস করতে লাগলেন। গৌতমের নিত্যকর্ম একেবারে বন্ধ হল। ভয়ানক বিমর্ষ হয়ে আনমনে উনি সর্বক্ষণ যেন কি ভাবেন।

কেউই তাঁর আশ্রমে আসত না। পথে দৈবাৎ দেখা হলে কাপড়ে মুখ ঢেকে দশহাত দূর দিয়ে সবাই চলে যেত।

পনেরো দিন এই ভাবে কেটে গেল। অবশেষে গৌতম সেই ঋষিদেরই কাছে গিয়ে বললেন ঃ আপনারা আমাকে কৃপা করুন। প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিন। উপদেশ ছাড়া এসব কাজ সিদ্ধ হয় না। অতএব উপদেশ করুন।

ঋষিরা চুপ করে রইলেন। কিছুই বললেন না। গৌতম বিষণ্ণ বদনে ফিরে এলেন।

ঋষিদের মন গলল। গৌতমের সেবায় ওঁরা কেমন লজ্জিত হলেন। ঠিক করলেন, কিছু একটা বলতেই হয়।

সব ঋষি একদা একত্র হলেন। গৌতম দূরে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঋষিরা বললেন ঃ প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া পথ নেই। প্রথমে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে নিজের পাপের কথা বলে বেড়াও। ফিরে এসে একমাস ব্রত কর। তারপর একশো একবার প্রদক্ষিণ কর এই ব্রহ্মগিরি। অথবা আর এক উপায় আছে ঃ গঙ্গায় স্নান এবং এক কোটি শিবলিঙ্গের পূজা। তবে এর আগে এগারো বার করতে হবে ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ এবং একশো কলস জলে স্নান।

গৌতম সরল মনে ব্যবস্থা মেনে নিলেন। গিরি প্রদক্ষিণ করলেন, ধ্যান করলেন, তারপর করলেন দেবাদিদেবের পূজা। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। পতির পাপে সতীর পাপ। অহল্যা স্বামীর অনুগমন করলেন।

শিষ্য-প্রশিষ্যরা গুরুকে ত্যাগ করেনি। দুঃখের দিনেও তারা রইল পাশে পাশে। সেবায় পরিচর্যায় ওরা নিজেদের সার্থক করে তুলল।

গৌতমের পূজায় শিব প্রসন্ন হলেন। পার্বতী ও প্রমথদের সঙ্গে স্বয়ং শিব গৌতমের সম্মুখে প্রকটিত হলেন। বললেন ঃ হে গৌতম, বর গ্রহণ কর।

গৌতম আনন্দে থৈ থৈ করলেন। রচনা করলেন স্তবের মালা ঃ হে দেব শঙ্কর, তুমি নির্গুণ, তুমি প্রকৃতি এবং পুরুষ, তুমিই বিষ্ণু ও ব্রহ্মা। তুমি আমার প্রণিপাত গ্রহণ কর। তুমি ব্যাপ্য ও ব্যাপক, তুমি পরমাত্মা। আমার

প্রণিপাত গ্রহণ কর। আমার বহুজন্মের ভাগ্য, তাই তুমি আজ প্রসন্ন হয়েছ, প্রকটিত হয়েছ। হে দেব, তুমি আমাকে নিষ্পাপ কর, নির্মল কর।

শিব বললেন: তুমি নিত্য নির্মল। পত্নীপরায়ণ ঋষিরা তোমার সঙ্গে খলের মত ব্যবহার করেছে। তাই নিজেকে পাপী বলে তুমি ভাবছ। আসলে তুমি এত নির্মল যে তোমাকে শুধু দেখলেই সর্ববিধ পাপ বিধৌত হয়। ঋষিরা তোমাকে দুঃখ দিয়েছে, পাপ করেছে ঘোরতর। ও পাপ প্রায়শ্চিত্তেও যাবার নয়।

গৌতম চুপ করে করজোড়ে বিমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

শিব বললেন: নিশ্চিন্ত হও। যদি পাপ পাপ বলে মনে কোন অশান্তি তোমার থাকেই তাহলে আমার দর্শনেই তা বিদূরিত হয়েছে।

শিব ধীরে ধীরে ঋষিদের সমস্ত ছলনার কথা ব্যক্ত করলেন।

এবার গৌতমের মুখে কথা এল। উনি বললেন: ওঁরা আমার উপকারই করেছেন, আমি তোমার দর্শন পেয়েছি।

শিব বললেন: তুমি ধন্য। তোমার কথাও সেইমত। এবার বর প্রার্থনা কর।

গৌতম বললেন: আমি যাই হই, পৃথিবীর লোকে জেনেছে আমি পাপী। পাপ বিদূরিত হয়েছে এও তাদের জানা প্রয়োজন। তাই আমাকে গঙ্গা দান কর।

স্বর্গ ও পৃথিবীর সার শিবের কমণ্ডলুতে ধরা ছিল। নিজের বিবাহের সময় ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন। বাকিটুকু গৌতমকে দান করলেন।

জলময়ী গঙ্গা শরীর ধারণ করলেন। গৌতম তাঁকে স্তব করে বললেন: তুমি এই অধম পাপীকে উদ্ধার কর।

শিবও গঙ্গাকে বললেন: ঋষিকে পবিত্র কর।

গঙ্গা বললেন: পবিত্র করব, কিন্তু দাঁড়াব না, লীন হব শিবে।

শিব বললেন: হে দেবি, তা হয় না। অন্তত কলির শেষ অবধি এখানে থাক।

: আমি কাশীতে আছি, এখানেও কি থাকতে হবে?

: হবে।

গৌতমও মিনতি করলেন।

গঙ্গা কিছুক্ষণ কিছু বললেন না। বেশ ভেবেচিন্তে বললেন: থাকতে পারি। থাকবও। কিন্তু মহিমায় এ তীর্থ যদি তাবৎ তীর্থের সেরা হয়, শিব ও পার্বতীও যদি থাকেন কাছে কাছে তাহলে আমি থাকব।

শিব বললেন: আমি থাকব। পার্বতীও থাকবেন। তুমিও থাক।

গঙ্গা বললেন: খল ঋষিদের পবিত্র-টবিত্র করতে যেন আবার বল না।

আমি পারব না। ওদের মুখও আমি দেখব না।

দেখতে দেখতে সেখানে দেবতারা, পুরাণ ঋষিরা এসে উপস্থিত হলেন। দেখতে দেখতে পুষ্কর, কাশী একে একে সমস্ত তীর্থ এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। কণ্ঠে কণ্ঠে জেগে উঠল জয় জয় রব। কণ্ঠে কণ্ঠে লীলায়িত হল স্তব। গঙ্গার জয়, শিবের জয়, গৌতমের জয়। গঙ্গার স্তব, শিবের স্তব, গৌতমের স্তব।

গঙ্গা ও শিব হর্ষান্বিত হয়ে বললেন ঃ কি বর তোমাদের অভীষ্ট?

ঋষিরা তীর্থেরা একজোট হয়ে বললেন ঃ সৎ মানুষের মুখ চেয়ে আপনারা এখানে থাকুন।

গঙ্গা বললেন ঃ তোমরা আছ, সর্বচরাচর পবিত্র করছ। আমি থাকব, সে তো হবে বাহুল্য।

ওঁরা বললেন ঃ আপনি থাকবেন, আমাদের পবিত্র করবেন। আপনি চলে যাবেন, অপবিত্র হলে আমরা হয়ে পড়ব নিরুপায়। আপনি থাকবেন, আমরা এসে দাঁড়াব শুদ্ধির মুক্তদ্বারে।

ঃ তোমাদের থেকে আমার এই বিশেষত্ব কিরূপে বোঝা যাবে?

ঃ লোকের পাপ ধৌত করে এগারো বছর পর আমরাও মলিন হই। আপনার কাছে আসব। নির্মল হব। বৃহস্পতি সিংহরাশিতে যাবেন, আমরাও আসব। বৃহস্পতি সিংহে যতদিন থাকবেন আমরাও ততদিন রইব, স্নান করব, শঙ্করকে দর্শন করব। তারপর শুদ্ধ হয়ে ফিরে যাব।

ব্রহ্মগিরি থেকে গঙ্গা অবতীর্ণ হলেন। লোকে বলল ঃ এই স্থান গঙ্গাদ্বার। গৌতমীতটে জ্যোতির্ময় লিঙ্গ হয়ে শিব রইলেন। লোকে জানল, ইনিই ত্র্যম্বকেশ্বর।

গঙ্গা প্রবাহিত হলেন। গৌতম স্নান করলেন। স্নান করল আরো অনেকে। খল সেই ঋষিরা শুনলেন, গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছেন। ওঁরা স্নান করতে এলেন। গঙ্গা অন্তর্হিত হলেন।

গৌতম বিনীত করে বললেন ঃ যাবেন না, যাবেন না। ওরা যত মন্দই হোক, আমি যে আপনার প্রসাদ পেয়েছি সে ওদেরই পুণ্যে।

অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত থেকে গঙ্গা বললেন ঃ ওরা দুর্বৃত্ত ; ওরা কৃতঘ্ন, বৃথাই ওদের তাপসের বেশ। ওদের মুখ দেখাও পাপ। আমি দেখব না।

গৌতম বললেন ঃ মহৎ চিরকালই অপকারীর উপকার করেন। এই তাঁদের রীতি। শিব আপনাকে এখানে থেকে সকলকে পবিত্র করতে বললেন, অথচ তাঁর কথাও আপনি রক্ষা করছেন না।

বাতাসে ভেসে এল গঙ্গার কথা ঃ তোমার কথা সত্য। কিন্তু তোমার সঙ্গে ওরা অতিশয় দুর্ব্যবহার করেছে। একশো এক বার ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ না

করলে ওদের প্রায়শ্চিত্ত হবে না, আমিও থাকব ওদের থেকে দূরে।

ঋষিরাও গঙ্গার কথা শুনলেন। প্রায়শ্চিত্তে ওঁরা প্রস্তুত। ওঁরা প্রায়শ্চিত্ত করলেন। গঙ্গার জলে স্নান করে বিধৌত করলেন সমস্ত পাপ।

ঋষিরা এখন অনুতপ্ত, ওঁদের পত্নীরাও পরিতপ্ত। ওঁরা গৌতম ও অহল্যার স্তবস্তুতি করে শান্তি পেলেন। গঙ্গা নন শিব নন, গৌতম-অহল্যাই এখন ওঁদের কাছে প্রিয়, পূজ্য। গঙ্গাপ্রসাদ নয়, শিবপ্রসাদ নয়, এখন ওঁদের কাম্য গৌতমপ্রসাদ, অহল্যাপ্রসাদ।

রাত্রি। অন্ধকারে অন্ধকারে অন্ধকারকেই মনে হয় সত্য। সহসা আসে প্রভাত, মোহ কাটে, আলোর একটি কণিকা পাবার জন্য তখন জীব উৎসর্গ করে বসে সর্বস্ব।

[গৌতম যে গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন তা এখন গোদাবরী নামে প্রসিদ্ধ।]

২৫. বৈদ্যনাথেশ্বর

ধন-দৌলতের যেন শেষ নেই। রাশি রাশি ভারাভারা। ঐশ্বর্যের স্তূপের উপর বিষণ্ণ অন্তঃকরণে বসে রাক্ষসরাজ রাবণ কেবলই দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে থাকলেন। তাঁর আরও চাই, আরও চাই—ঐশ্বর্য নয়, বলপ্রতাপ।

রাবণ কৈলাস পর্বতে এলেন তপস্যা করতে। শিবের আরাধনায় মিলবে অমিত বল অমেয় প্রতাপ। কৈলাসে রাবণ। কৈলাসে তপস্বী রাক্ষস।

দিন গেল। বুকে কত আশা। ফল দেবেন। বলে ভরবে বাহু। কিন্তু শিব হয়ত পাষাণ হয়েছেন।

রাবণ এলেন হিমালয়ের দক্ষিণে বৃক্ষখণ্ডকে। গর্ত খনিত হল, অগ্নি প্রজ্বলিত হল, শিবলিঙ্গ স্থাপিত হল। শুরু হল রাবণের হোম। শিব হয়ত পাষাণ হয়েছেন।

কিন্তু রাবণের ধারণা অন্য, শিব আশুতোষ। রাবণ শিবকে বিগলিত করবেনই। প্রাণ তাঁর পণ। শির ছিন্ন করে শিবকে রাবণ অঞ্জলি দিলেন। একে একে নটি শিব ছিন্ন হল। একে একে নটি রক্তপদ্ম হোমের আগুনে উৎসর্গিত হল।

শিব পাষাণ হয়ে ছিলেন। এবার পাষাণের বুকে জাগল করুণায় প্রস্রবণ।

শিব দেখা দিয়ে বললেন: কি তোমার কাম্য?

রাবণ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন প্রসন্ন দেবাদিদেবের কমনীয় মুখের দিকে। কিয়ৎক্ষণ পরে বললেন: বল চাই, প্রতাপ চাই। বলে প্রতাপে ভুবনে আমি

হব অতুল। আমাকে এই বর দিন। আর এই ছিন্ন মস্তকগুলি বিন্যস্ত করে দিন যথাস্থানে।

ভক্তের প্রতি শিবের অপার বাৎসল্য। বললেনঃ তাই হোক। যাও।

রাবণ আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে চাইলেন। এবার মুঠোয় পুরে তিনি একবার বিশ্বভুবনকে দেখে নেবেন।

দেবতা ও ঋষিদের প্রাণবায়ু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবাব নির্ঘাৎ তাঁদের পরাজয়, লাঞ্ছনা এবং পরিশেষে মৃত্যু।

দেবতারা সতর্ক রইলেন। বুকে সদা সংশয়, ভয়।

একদা দেবর্ষি নারদকে পেয়ে দেবতারা ধরে পড়লেনঃ আমাদের জন্য আপনি কিনা পারেন! তাহলে বলুন আমরা কি করব? রাবণের অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা কি একেবারে ভেসে যাব? এক গুচ্ছ তৃণও কি আমরা আশ্রয় করতে পারব না? বলুন, চুপ করে থাকবেন না।

নারদ বললেনঃ আপাতত স্থির হও। উপায় আছে। আমি করছি।

নারদ প্রস্থান করলেন। রাবণ কৃতার্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। নারদ রাবণের পথে চললেন। বীণা বাজিয়ে বাজিয়ে আনমনে নারদ চলছিলেন। লক্ষ্যঃ কখন আসেন রাবণ। এ পথে যে তাকে যেতে হবেই।

বলতে না বলতেই চিন্তা করতে না করতেই নারদ রাবণকে দেখতে পেলেন। কৃতার্থ রাবণ। হৃষ্ট রাবণ। মনে মনে তাঁরও সুরের লহরী।

নারদ বললেনঃ এভাবে সহসা তোমাকে দেখব ভাবিনি। কী যে আহ্লাদ হচ্ছে কী বলব! কোথায় গিয়েছিলে? খুশিতে তো চোখমুখ টলমল করছে। কি এমন মহার্ঘ রতন পেলে? একেবারে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছ! কোথায় যাবে?

বাবণ বললেনঃ শিবকে পেয়েছি। বর দিয়েছেন। অতুল বল লাভ করেছি। এখন গৃহে ফিরছি।

নারদ বললেনঃ কি করে তুষ্ট করলে শিবকে? আমি তোমার আত্মীয়. তাই জিজ্ঞেস করছি।

রাবণ বললেনঃ উঃ, সে আর বল না। তুষ্ট কি হন, কিছুতেই না। কৈলাসে তপ করলাম। কিছু হল না। গেলাম বৃক্ষখণ্ডকে। গ্রীষ্মকালে আগুনে, বর্ষায় স্থণ্ডিলে, শীতে জলে থেকে কত তপ করলাম। কিছু হল না। খুব রাগ হল। মাটিতে গর্ত খুড়ে আগুন জেবলে মাটি দিয়ে শিবের লিঙ্গ গড়ে সেই আগুনে প্রতিষ্ঠিত করলাম। গন্ধচন্দন, ধূপনৈবেদ্য, আরাত্রিক দিয়ে স্তব, প্রণাম, নৃত্যগীত, বাদ্য গালবাদ্য কত উপচারে পূজা করলাম। কিছু হল না। নিজের উপর ঘেন্না হল। হোম শুরু করলাম। কিন্তু কিছু হল না। শিব এলেন না। মনে হল ব্যর্থ জীবন, ব্যর্থ ধনমান। চন্দনে চর্চিত

করে মাথাগুলি একে একে ছিন্ন করে আহুতি দিলাম সেই অগ্নিতে। নটি মাথা কাটা হয়ে গেল। শেষটি কাটতে উদ্যত হয়েছি এমন সময় উনি এলেন, কৃপা করলেন, বল দিলেন অতুল, প্রসন্ন দৃষ্টির আলোয় মাথাগুলিও দিলেন একে একে জুড়ে। এখনও উনি ওখানেই আছেন। থাকবেনও। উনি বৈদ্যনাথেশ্বর। ওঁকে শেষ প্রণাম করে বেরিয়ে পড়েছি। এবার আমি ত্রিভুবন জয় করব।

নারদ হেসে বললেন : শিব তোমায় বর দিয়েছেন, তোমার ভাল করবেন—তুমি এসব বিশ্বাস করেছ নাকি ?

না করার কি আছে ? তিনি দিয়েছেন, বলেছেন।

: শিব পাগল। পাগলে কি না বলে। তুমি আমার পরম আত্মীয়, পরম প্রিয়। তাই আমার কথা বিশ্বাস কর। ভাল হবে।

: কি করতে বলছ ?

: যাও, একবার কৈলাস পর্বত উত্তোলন করে তাকে আবার যথাস্থানে রেখে এখানে এসো। কত যে বল পেয়েছ তা নিজেই বুঝতে পারবে।

নারদের কথায় রাবণ খুব খুশি হল। ছুটতে ছুটতে রাবণ এলেন কৈলাসে। অতবড় পর্বত তিনি উঁচু করে দুহাতে তুলে ধরলেন।

কৈলাস পর্বত ভয়ংকর ভাবে টলে উঠল। গাছগাছালি ঘরবাড়ি বিপর্যস্ত হল। শিব লাফিয়ে উঠে বললেন : এ কি হল ? একি হল ?

পার্বতী সুমধুর হাস্য করে বললেন : আপনারই এক ভক্ত শিষ্যের কীর্তি। ভাল শিষ্য করেছেন, ভাল ফলও হাতে হাতে লাভ করছেন !

শিব ক্রোধে অভিশম্পাত দিলেন : তোর বলগর্ব খর্ব করবার জন্য শীঘ্রই এক পুরুষ জন্ম নেবেন।

রাবণ কৈলাস যথাস্থানে স্থাপন করে খুশিতে ফেটে পড়ে ছুটে চললেন। এবার দিগ্বিজয় ! এবার দিগ্বিজয় ! ত্রৈলোক্য আসবে মুঠোয়। রাবণ প্রচণ্ড গতিতে নেচে নেচে যেন ছুটতে লাগলেন।

নারদ এসে সাহাস্য বদনে দেবতাদের বললেন : বর দিয়েছিলেন, শাপও এই দিলেন।

২৬. নাগেশ

দারুকা এক রাক্ষসীর নাম। দেবী পার্বতী দারুকাকে কৃপা করেছিলেন। দারুকার তাই বলের বড়ই বড়াই। দারুকার স্বামীর নাম দারুক। সেও এক প্রচণ্ড রাক্ষস। যেখানে যত যজ্ঞ যত ধর্ম সব ঐ দারুক ধ্বংস করে বেড়ায়। ঐ যেন তার ব্রত। পরের পীড়নেই তার পরিতোষ। পশ্চিম সাগরের তীরে

যোড়শ যোজন ব্যাপী এক মনোরম বনে দারুক থাকে, দারুকা থাকে। বাইরে গিয়ে ভাঙ্গে, তছনছ করে, অত্যাচার করে, উৎপীড়ন করে। বনে ফিরে আসে, স্ফূর্তি করে, নাচে গায়, উন্মত্ত হয় পানে ভোজনে।

পার্বতী একদা কৃপা করেছিলেন। দারুকাকে বল দিয়েছিলেন, বলেছিলেন ঃ এ বন নিয়ে যেখানে খুশি সেখানে তুমি যেতে পারবে। তুমি যাবে, ইচ্ছা করবে—গোটা বনটা উঠে যাবে তোমারই সঙ্গে।

মানুষেরা দিনের পর দিন সয়ে সয়ে দিশেহারা হল। কি করি, কোথায় যাই, কোথায় গেলে কি করলে রেহাই মেলে এই ভয়ানক পীড়ন থেকে—নাওয়া নয়, খাওয়া নয়, এই হল তাদের সর্বক্ষণের চিন্তা।

অবশেষে ঔর্ব ঋষির আশ্রমে এসে সবাই তাঁকে ধরে বসল ঃ একমাত্র আপনিই পারেন। পৃথিবীতে আপনিই একমাত্র ব্যক্তি আছেন যাঁর তেজে রাক্ষসেরা দূর থেকেই পলায়ন করে। অতএব রক্ষা করুন। আপনার শৈবতেজের আবরণে আচ্ছাদিত করে আমাদের রক্ষা করুন।

ঔর্ব বললেন ঃ করব। আমি অভয় দিচ্ছি।

ঔর্ব সেই ক্ষণেই শাপ উচ্চারণ করলেন ঃ পৃথিবীতে হিংসা করলেই যেন তোদের মৃত্যু হয়। যজ্ঞ ধ্বংস করলেও যেন তোদের মৃত্যু হয়।

দেবতারা শুনলেন ঔর্ব রাক্ষসদের মারাত্মক শাপ দিয়েছেন। পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে ওরা এখন শিশুর মত অসহায়।

আনন্দে দেবতারা বলে উঠলেন ঃ এই তো সময়। সাজো রণে।

দেবতারা রাক্ষসদের আক্রমণ করলেন। রাক্ষসদের সম্মুখে সমূহ সংকট। যুদ্ধ, অথচ আত্মরক্ষার জন্য কাউকে মারা চলবে না। মারলে অবধারিত মৃত্যু। যুদ্ধ, অথচ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে। পলায়নের পথ হয়ত প্রশস্ত। কিন্তু পালিয়ে কোথায় তারা আশ্রয় নেবে?

দারুকা এল এগিয়ে। বলল ঃ যেখানে খুশি বনশুদ্ধ তুলে নিয়ে যেতে পারি। পার্বতীর বর তো মিথ্যে হবার নয়। অতএব দুঃখ কিসের। চল জলে। বনও চলুক সেই জলে।

রাক্ষসেরা দারুকাকে মাথায় তুলে নৃত্য করতে শুধু বাকি রাখল। বলল ঃ ঔর্ব তো আমাদের মেরেই ফেলেছিলেন, কিন্তু আমাদের আছে রাণীর মত রাণী।

রাক্ষসেরা দারুকাকে বলল ঃ আর কেন? এবার ত্বরা করে চলুন। জলে গিয়ে পড়ব, কিন্তু থাকব বড় সুখে।

ওদিকে দেবতারা এসে গেছেন। রাক্ষসেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে। দারুকা পার্বতীর নাম স্মরণ করে বন শুদ্ধ উঠিয়ে নিয়ে চলল। যেন একটি পর্বত পাখা মেলে উড়ে চলল। গিয়ে মগ্ন হল জলে।

দেবতারা দারুক-দারুকার নাগাল পেলেন না। সাগরজলে তলিয়ে রইল সেই বন। রাক্ষসেরা সেই বনে দিব্য সুখে আরামে আয়াসে কাটিয়ে দিল দিনের পর দিন।

স্থলে তারা গেল না। কিন্তু জলেও তো রোমাঞ্চ কম নয়। নৌকায় করে কত মানুষ সাগরের বুকের উপর দিয়ে যায় আসে। ওরা জলেই তাদের বধ করল, বন্দী করল।

মনের সাধে লুঠতরাজ অত্যাচার উৎপীড়ন করে রাক্ষসদের বেশই কাটছিল।

যারা সাগরের বুকে পাল তোলে তারা আর ফেরে না। কোথায় যায়? কেনই বা ফেরে না? মানুষের মনে ভয়ানক ভয় ঢুকে গেল। যারা যায় তারা ফেরে না।

একদা রাক্ষসরা জলপথ আটকে লুকিয়ে রইল। ওরা মানুষ ধরার ফাঁদ পেতেছে। সহসা এক বিরাট নৌকা ওদের হাতের মুঠোব মধ্যে এসে গেল।

রাক্ষসদের সেদিন উৎসব। কত কত মানুষ আজ তারা শিকাব করেছে। আজ ওদের উৎসব।

জলের তলায় রাক্ষসদের কারাগারে মানুষগুলি পচে মরতে লাগল। শত দুঃখের মধ্যেও সুপ্রিয় এক বৈশ্যের মুখে সর্বসময় লেগে থাকত শিবনাম। সবসময় শিব, শিব। নিজে শিবপুজো না করে জল ছোঁন না। বিপদের দিনে পাশাপাশি অনেকগুলি মানুষ পেয়ে তিনি শিবের মন্ত্র বিতরণ করলেন। বললেন ঃ পুজো কর, ধ্যান কর, জপ কব।

দিনরাত্রি। সুপ্রিয় বিভোর পুজোয়। মানস উপচারে শিবের পুজো।

কারাগারের প্রহরীরা একদিন সবিস্ময়ে দেখল ঃ সুপ্রিয়র সম্মুখে এক মোহন মূর্তি।

প্রহরীরা ছুটতে ছুটতে এসে দারুককে সব নিবেদন করল ঃ একি রহস্য! একি রহস্য!

দারুক এল কারাগারে। কারাগারে আজ চাপা উত্তেজনা। স্বয়ং রাক্ষসরাজ দারুক অদ্য কারাগারে এসেছেন। নীরব কারাগারের দেওয়ালে দেওয়ালে রাক্ষসরাজের গম্ভীর কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে ধ্বনিত হল ঃ কার ধ্যান কর? সত্য বল।

ঃ তুমি তো জান।

দারুক আর দাঁড়াল না। বারেক ঘূর্ণিত হল তার আরক্ত নয়ন! ধীরে অথচ গম্ভীর সুরে আদেশ করল ঃ সকলে একে বধ কর।

প্রহরীরা অস্ত্র নিয়ে ধেয়ে এল। সুপ্রিয় ভয়ে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলেন ঃ হে শিব, রক্ষা কর। হে শিব, রক্ষা কর। হে শিব, রক্ষা কর।

দেখতে দেখতে কারাগারের মধ্যে একটি মন্দির যেন গজিয়ে উঠল। মন্দিরে অত্যাশ্চর্য এক জ্যোতির্লিঙ্গ। সুপ্রিয় আত্মহারা হলেন পুজোয়।

শিব পাশুপত অস্ত্র দিলেন, দিলেন সমূহ সহায়। রাক্ষসের দল নির্মূল হল।

শিব সুপ্রিয়কে বললেনঃ এখানেও থাকবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। এখানেও থাকবে তাদের ধর্ম। এখানেও তপে তপে অনেকেই হয়ে উঠবেন মুনি, মুনিবর। তামসভাব হবে সম্পূর্ণ বিদূরিত।

রাক্ষসেরা সব মরেছে। দারুকা কাতরচিত্তে পার্বতীর শরণ নিলেন।

পার্বতী সুধালেনঃ কি করব ?

দারুকা প্রার্থনা করলঃ আমার বংশ রক্ষা করুন।

পার্বতী কথা দিলেন।

ওদিকে শিব। সব নাশ করেছেন। অথচ পার্বতীকেও শিবেরই বিরুদ্ধে দিতে হবে কৃপা। পার্বতী শিবের সঙ্গে কলহ করলেন।

শিব রেগেমেগে বললেনঃ যা তোমার ইচ্ছা তাই কর, তাই কর।

পার্বতী বললেনঃ আপনার কথাও বিফল হবে না। যুগের শেষে আপনার কথা সফল হবে। ততদিন চলুক তামসসৃষ্টি। ততদিন চলুক দারুকার শাসন।

শিব বললেনঃ আমিও ভক্তকে রক্ষা করব। ঐ বনে আমি অবস্থান করব। কলিযুগের শেষে সত্যযুগের শুরুতে মহাসেনের পুত্র বীরসেন আমাকে দর্শন করবে, হবে চক্রবর্তী।

শিব ও পার্বতীর কলহ শেষ হল। দুজনেই স্মিত হাস্য বিকীর্ণ করে ওখানে রয়ে গেলেন। ত্রিভুবনে এই শিবই নাগেশ নাম নিয়ে বিখ্যাত হলেন।

সূত বলছিলেন। ঋষিরা শুনছিলেন। এখনো কথা বাকি। অথচ সূত চুপ করলেন। ঋষিরা অধৈর্য হয়ে বললেনঃ কিন্তু বীরসেন ঐ দারুক বনে কেমন করে যাবেন ?

সূত বললেনঃ সেইটেই তো বলব বলব করছি।

বীরসেন বারো বছর তপস্যা করে একদা সাক্ষাৎ পেলেন শিবের।

শিব বীরসেনকে একটি কাঠের মাছ দিলেন। মাছের সর্বাঙ্গে লেপন করা সীসা।

শিব বললেনঃ এ মাছ মাছ নয়, কাঠের পুতুলও নয়—সাক্ষাৎ যোগমায়া। নৌকা করে যাত্রা কর। সঙ্গে নিও এই মাছ। আমি বিবর তৈরি করে রাখব। তুমি যাবে, পুজো করবে নাগেশের। তারপর পাশুপত অস্ত্র পাবে, বধ করবে রাক্ষসীদের। পার্বতীর বর আছে। কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণপ্রায়। যাও। আর দেরি কর না। ভয়ও রেখো না মনে। মনে রেখো নাগেশকে দর্শন করলেই বলে

বীর্যে তুমি হবে অতুল।

সূত বললেনঃ এখানেই শেষ। নাগেশের মহিমার কথা এখানেই সমাপ্ত। নাগেশের দর্শন তো মহাভাগ্যের, একথা শোনা বা পড়াও পুণ্যের। তোমরা সেই পুণ্য আজ অর্জন করলে।

২৭. রামেশ্বর

রামচন্দ্র পিপাসায় কাতর হয়েছেন। রাম পান করবেন। বানরবাহিনী চঞ্চল হল। জল জল করে যে যেদিকে পারল ছুটল। রাম জল পান করবেন।

ম্লান একখানি চন্দ্র—রামচন্দ্র। সীতা অপহৃত। শোকে কাতর, কিন্তু অনুসন্ধানে অক্লান্ত। রাম-লক্ষ্মণ, সঙ্গে সুগ্রীব দোসর, সঙ্গে অষ্টাদশ পদ্ম সংখ্যক বানর। অনুসন্ধানে ক্ষান্তি নেই। বহু পথ অতিক্রম করে অবশেষে দক্ষিণের লবণসমুদ্রের তীরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। সম্মুখে সমুদ্র—অতল অগাধ। এর ওপারে হয়ত আছেন সীতা। নইলে কোথায়ই বা যাবেন? কবে যে গ্রহণ ছাড়বে, অম্লান আলো ফুটবে!

রাম চিন্তায় চিন্তায় পথশ্রমে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছেন। লক্ষ্মণকে বললেনঃ একটু জল আনো।

সম্মুখে সমুদ্র। তীরে আর এক সমুদ্র। রাম জল পান করবেন। তীর-সমুদ্র উদ্বেল হল। সমুদ্রে জাগল জলের জন্য আকুতি। বানরেরা এদিক ওদিক দশদিকে জল জল করে ছুটল। শ্রীরাম জল পান করবেন।

জল এল। রামের সম্মুখে জল। সেবকরা বারবার বললঃ প্রভু গ্রহণ করুন।

পিপাসায় বুক ফাটছে। মুহূর্ত বিলম্ব সইল না। রাম জল পান করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সহসা রাম পাত্র নামিয়ে রাখলেন। বুকের পিপাসা বুকেই রইল। এখনো মেলেনি শিবের প্রসাদ। আগে শিবের পূজা, পরে অন্য যা কিছু। পিপাসা শুকিয়ে মরতে থাকল। সম্মুখে জল, যেন করুণ চোখে চেয়ে রইল। আর বানরেরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখল, পিপাসার্ত রাম জল ছেড়ে মাটি নিয়ে ব্যস্ত।

মাটির শিব নির্মিত হল। গন্ধ পুষ্প সংগৃহীত হল। আরো এল অনেক উপচার। রাম শিবের পুজো করলেন, স্তব করলেন, অবশেষে প্রার্থনা করলেনঃ হে প্রভু তুমি আমার সহায় হও। সম্মুখে অগাধ সমুদ্র। পরপারে মহা বলবান রাক্ষস। এপারে আমি ও লক্ষ্মণ। সঙ্গে এই চপল বানরবাহিনী।

ওপারে রাবণ, তোমার ভক্ত—অজেয়। তুমি সহায় হও। ধর্মকে রক্ষা কর।

বানররা অবাক হয়ে দেখল, রাম বারবার মাটির ছোট্ট সেই লিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করছেন, নমস্কার করছেন। ওরা দেখল, ওরা শুনলঃ রামের দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, জয় জয় শঙ্কর শঙ্কর। ওরা ভাবল হয়ত শেষ হল। এবার হয়ত উনি জল পান করবেন। কিন্তু তখনও বাকি। রাম আবার স্তব করলেন, মন্ত্র ধ্যান করলেন। রাম গালবাদ্য করলেন। সাগরতীরে এসে দাঁড়াল জ্যোতির সাগর। সাগর সংহত হল। শিব আবির্ভূত হলেন। পাশে তাঁর আর এক জ্যোতির পুঞ্জ—পার্বতী।

শিব বললেনঃ তোমার মঙ্গল হবে।

রাম আবার পুজো করলেন। অশেষ প্রকারে সাজালেন স্তবের নৈবেদ্য। প্রার্থনা করলেন জয়।

শিব বললেনঃ তোমারই হোক জয়।

রাম বললেনঃ আর এক প্রার্থনা আছে।

শিব বললেনঃ নিবেদন কর।

সমুদ্রতীরের বাতাসে রামের প্রার্থনা ভাসতে থাকল, দুলতে থাকল, ধরা রইল চিরতরে।

রাম বললেনঃ জগৎ পবিত্র হবে, লোকের হিত হবে, তুমি অবস্থান কর এই সমুদ্রতীরে।

মহাদেব লিঙ্গের রূপ ধারণ করে রামের প্রার্থনা সম্পূরণ করলেন।

সমুদ্রের তীরে কয়েক মুহূর্ত পূর্বে জ্যোতির সাগর সংহত হয়েছিল। সংহত জ্যোতির পুঞ্জ আরো সংহত হয়ে রামেশ্বর হয়ে বিস্তার করলেন অমেয় মহিমা।

২৮. ঘুশ্মেশ্বর

ঃ কেই বা মাতা, কেই বা পিতা, কেই বা পুত্র, কেই বা কন্যা। কেউ কারও নয়। স্বার্থই একমাত্র কাম্য। দেখছ না স্বার্থের সন্ধানে সবাই কেমন হন্যে হয়ে ছুটে চলেছে। দুঃখ কর না, দুঃখ কর না।

সুধর্মা কত বোঝান। কিন্তু সুদেহা বোঝেন না। পুত্র পুত্র করে তিনি উতলা। সুদেহা বলেনঃ তুমি ইচ্ছে করলেই হয়। সুধর্মা বলেনঃ তা নয়। এ হবার নয়। যা হবে না তা নিয়ে শোক করা কি সাজে। শোক ত্যাগ কর। পুত্র দিয়ে কি করবে? পুত্র দিয়ে কিছু হয় না। আত্মাই আত্মার উদ্ধারক। শান্ত হও। একটু তলিয়ে বুঝে দেখ। শান্তি পাবে।

সুধর্মা ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হলেন।

সুদেহার মনে ঐ এক চিন্তা। বারবার আসে যায়, উঠে পড়ে। ঘুরে ঘুরে বারবার সুধর্মাকে তিনি বলেন ঃ তুমি যেন কেমন! পুত্র নেই, জীবন তো ছার। অথচ তুমি বল, পুত্র-পুত্র কর না।

সুধর্মা স্ত্রীকে বললেন ঃ বারবার ঐ এক কথা নিয়ে আমাকে উত্যক্ত কর না। যা হবার নয়, যা পাবার নয়, তা নিয়ে দুঃখে ভরে থাকার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কিছুতে নয়।

সন্তোষের দুর্গে সুধর্মা পুনরায় অধিষ্ঠিত হলেন।

নীরব বুকে একা সুদেহা অনেক ব্যথা বহন করছিলেন। একদা ব্যথার ভারে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

সুদেহা গেছেন পাশের বাড়ি বেড়াতে। সেখানে এসেছেন আরো অনেকে— এ-বাড়ি ও-বাড়ির সব বধূ। কথার পর কথা হাসি গল্প। মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। সহসা বায়ুমণ্ডলে রচিত হল ঘূর্ণি।

কি দিয়ে যে ঝগড়ার শুরু কেউ জানে না। কিন্তু সবাই শুনল, সুদেহার সঙ্গে এ বাড়ির বধূর আলাপে ক্রমেই মাধুর্য কমে আসছে। ঠেসের পর ঠেস, খোঁটার পর খোঁটা, অতঃপর সম্মুখ সমর। ঝাঁকে ঝাঁকে তিরস্কার এল, ঝাঁকে ঝাঁকে গেল। অবশেষে সুদেহার মুখ কালি হল। প্রতিপক্ষ বলল ঃ তোর আবার অত ঠেকার কিসের লা। জন্মেছিস তো বাঁজা হয়ে। যমের বাড়ি গিয়েও তো পার পাবিনা। জ্বলে পুড়ে মরবি আর দেখবি তোর ঘরবাড়ি-বিষয় সম্পত্তি বারোভূতে সব লুটেপুটে খাচ্ছে। সাপ ফণা ধরে উগ্র হয়ে উঠেছে। সম্মুখে ধরে দেওয়া হল একটি শিকড়। সাপ নিস্তেজ হয়ে পড়ল। সহসা সুদেহা অতিশয় দুর্বল বোধ করল। মুখ ঢেকে ত্বরিতে পালিয়ে এল। বিরস মুখে স্বামীর কাছে এসে সুদেহা ভেঙ্গে পড়ল। বলল ঃ সবাই যখন শুনিয়ে দেয় তখন মুখ থাকে কোথায় বল।

সুধর্মার মুখখানিও বেদনায় পাণ্ডুর হল। বললেন ঃ যারা বলবার তারা চিরকালই বলবে। ওরা বলবে, তুমি শুনবে। উপায় তো নেই। বিধির ইচ্ছা অন্যপ্রকার। ও নিয়ে বিলাপ করলে শুধু বিলাপই হবে সার।

সুদেহা অধৈর্য হলেন ঃ যত্ন না করলে কখনো পুত্র হয় না। তুমি যা বলছ তা তুমিই বসে বসে বোঝ। আমি পুত্র চাই, না পেলে দেহত্যাগ করব।

সুধর্মা কোন কথা বললেন না। চুপ করে বসে অনেক চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে এলেন। সাজি থেকে দুটো ফুল নিলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, এটিতে পুত্র হবে, ওটিতে হবে না।

সুধর্মা দুটি ফুল অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন। পত্নীকে বললেন ঃ একটি ফুল আগুন থেকে তুলে নাও।

সুদেহা মনে মনে নিবিষ্ট হয়ে প্রার্থনা করলেন ঃ যেটিতে পুত্রফল সেটিই যেন আমি তুলি। হে শিব, হে অগ্নি, সেটিই যেন আমি তুলি।

সুদেহা ফুল গ্রহণ করলেন।

সুধর্মা একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। বললেন ঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। মিছিমিছি উতলা হয়ো না। বরং হরির সেবা কর। তিনিই মুখ তুলে চাইবেন।

সুধর্মা ঈশ্বরের চিন্তায় পুনরায় মগ্ন হলেন।

সুদেহা পুত্র চান। পুত্র তাঁর চাইই। তিনি স্বামীকে বললেন ঃ আমাতে না হয়, অন্যাতে হবে। তুমি আর একটি বিবাহ কর।

সুধর্মা বললেন ঃ তাতেই যদি তোমার শান্তি আসে তবে তাই হবে। কিন্তু এখন যাও। জপটা অন্তত করতে দাও।

সুদেহা পাত্রী স্থির করে ফেললেন। নিজের ভাইঝিকে নিয়ে এলেন। স্বামীকে বললেন ঃ একে বিবাহ কর।

সুধর্মা বললেন ঃ এখন এত করে বলছ বটে কিন্তু পরে এই তুমিই অন্যরকম বলবে। হয়ত বলবে, ও তোমার ভাইয়ের মেয়ে, ওর প্রতি তোমার ভালবাসার অন্ত নেই। কিন্তু ওর যখন পুত্র হবে তখন এই তুমিই অন্যরকম হয়ে যাবে।

সুদেহা বললেন ঃ ঘুশ্মা আমার ভাইঝি। কিন্তু আমি তিন সত্য করে বলছি, ওকে আমি বড় বোন বলেই মান্য করব। আমি পণ করেছি গো, তুমি না কর না।

সুধর্মা চঞ্চল হলেন। বললেন ঃ যা বলছ তা-ই হবে।

একদিন শুভলগ্নে সুধর্মা ঘুশ্মার পাণিগ্রহণ করলেন। সুদেহাকে বললেন ঃ ঘুশ্মা তোমার আপনার জন। ওকে তুমি দেখো।

সুধর্মা নিশ্চিন্ত মনে ধর্মে মন দিলেন। ঘুশ্মাকে বললেন ঃ রোজ মাটি দিয়ে একশো এক শিব গড়বে, পুজো করবে।

স্বামীর আজ্ঞায় সরলা ঘুশ্মা রোজ শিব গড়েন, পুজো করেন, পুজো শেষে বিসর্জন দেন পাশের পুকুরে।

দিন যায়। পুকুরে নিত্য শিবলিঙ্গ বিসর্জিত হয়। দিন যায়। ক্রমে একলক্ষ শিবলিঙ্গ জমা হল ঐ বৃহৎ পুকুরে।

শিব কৃপা করলেন। ঘুশ্মা এক পুত্র পেলেন। সুন্দর একটি হীরের টুকরো ঘুশ্মার কোল আলো করল। সুধর্মা খুশি হলেন, কিন্তু ধর্মের মধ্যেই ডুবে রইলেন।

যে আসে সেই বলে ঃ আহা, সোনার টুকরো ছেলে। এই না হলে ছেলে?

কেউ বলল ঃ ভাগ্যমানী মা তুমি। নইলে এমন ছেলে কোলে আসে!

একটি পদ্ম ধীরে ধীরে ধারাল এক চক্রে পরিণত হল। সুদেহা এতদিন বোঝেননি। এতদিনে বুঝলেন, তাঁর মনের মধ্যে সেই চক্রই অবিরত কেটে কেটে বসছে। রক্তাক্ত হৃদয়ে সুদেহা কেবলই ছটফট করেন।

কিছুদিন পরে এক ব্রাহ্মণ এলেন সুধর্মার কুটিরে। অনুনয় করে বললেন: আমার কন্যাটিকে ঘরে নাও। তোমার পুত্রবধূ কর।

সুধর্মা ব্রাহ্মণের অনুনয় ঠেলতে পারলেন না। সুখ ছিল। এবার সুখের পর সুখ। পুত্র ছিল, এল পুত্রবধূ।

সুধমা ও ঘুশ্মার মনে থৈ থৈ করল আনন্দ। বাড়িতে কুটুম্ব আসে। আহ্লাদে আনন্দে ঘুশ্মার দিন কাটে।

সুদেহার জ্বালা বাড়ল। তিনি দেখলেন, যারা আসে তারা ঘুশ্মাকেই মান দেয়, খাতির করে। রক্তাক্ত হৃদয়ে তিনি এককোণে পড়ে রইলেন।

একদিন সুধর্মার মনে বড়ই উল্লাস হল। পুত্র ও পুত্রবধূকে কোলে করে একবার ঘুশ্মাকে দেখান, একবার দেখান সুদেহাকে। সুধর্মার যেন খেলাতে পেয়ে বসল। ঘুশ্মা আনন্দে আটখানা হলেন। সুদেহা দাঁড়াতে পারলেন না। তাঁর বুক ফেটে আসছিল। তিনি অন্য ঘরে আস্তে আস্তে পা বাড়ালেন। চৌকাঠ পেরিয়েই মাটিতে আছড়ে পড়ে সুদেহা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

ঘুশ্মা ছুটে এলেন। বললেন: ছেলে, ছেলে-বৌ এ তো আপনারই। আপনিই আমাকে হাতে করে এনেছিলেন। এরা তো আপনারই।

ছেলে ছেলে-বৌ দুজনেই সুদেহার সেবা করল। সুধর্মাও কত প্রকারে আদর করলেন।

সুদেহা মনে শান্তি পেলেন না। আগুন জ্বলেছে, ও আর নিভবে না। জ্বলবে, সারাজীবন জ্বলবে এবং জ্বলবে এবং জ্বালাবে।

যত দিন যায় ততই সুদেহা কুটিলতায় ভরে উঠেন। একদিন তাঁর মনে হল, এ দুঃখ যাবার নয়, এ আগুন নিভবার নয়। নিভতে পারে একমাত্র ঘুশ্মার চোখের জলে।

সুদেহার মন বিষে বিষে নীল হল। সুদেহা ঘোরতর পাপের কথা চিন্তা করলেন: বিনাশ চাই, ওর পুত্রের প্রাণ চাই।

সুদেহা মনে মনে অশেষ উল্লাস অনুভব করলেন।

সবার অলক্ষ্যে একটি পদ্ম পরিণত হল শাণিত এক চক্রে। এতদিন কেটে কেটে বসছিল নিজ হৃদয়ে। এবার তাকে সুদেহা বের করবেন। রাত্রির অন্ধকারে সে চক্র একদা মুক্তি পেল।

এক চক্র, হল যেন লক্ষ সর্প। ধীর মন্থর বুকে হেঁটে হেঁটে লক্ষ সর্প অন্ধকার নিয়ে খেলা করল।

পুত্র ও পুত্রবধূ ঘুমের কোলে মাথা রেখে স্বপ্নে তখন বিভোর। বাইরে

অন্ধকার। অথচ স্বপ্নের জগতে ওরা তখন আলোর তরঙ্গে তরঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে।

সুদেহা বিড়ালের মত পা টিপে টিপে অগ্রসর হলেন। হাতে তাঁর শাণিত এক ছুরি। হাত কাঁপল না। মন কাঁপল না।

বিড়ালের মত এসেছিলেন। শিকার ধরে আবার চলে গেলেন। পুত্রের ছিন্ন ভিন্ন দেহ সরোবরের জলে একলক্ষ শিবলিঙ্গের পাশে মহানিদ্রায় অভিভূত হল।

সুদেহার মন তৃপ্তিতে ভরে উঠল। তিনি পেরেছেন। এবার নিদ্রা, শুধু নিদ্রা, সুখনিদ্রা। চোখের পাতা আরামে মুদে এল। কতদিন পরে আজ সুদেহা নিদ্রার উৎসবে বিভোর হয়ে গেলেন।

রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে মুছে এল। আলো ফুটল। ঘুশ্মা উঠেছেন, সুধর্মাও। ওঁরা স্নান করে রোজকার মত কাজ করতে লাগলেন। সুদেহাও কাজে মগ্ন। কতদিন পরে কাজে মগ্ন। কতদিন পরে কাজেও আজ তিনি পরম উল্লাস অনুভব করছিলেন। আজকের এই সকাল যেন সুদেহার কাছে নতুন। ভার নেই, দুঃখ নেই, বেদনা নেই, জ্বালা নেই। সুদেহা যেন নেচে নেচে কাজ করছেন।

পুত্রবধূর ঘুম ভেঙ্গেছে। বিছানায় রক্ত, কাটা ছেঁড়া আঙুল, মাংস। পুত্রবধূ ভয়ে চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে এল। দুটি সরল চোখ ভয়ে বিহ্বল।

সুদেহাকে বধূ জিজ্ঞেস করল ঃ মাগো, তোমার ছেলে কৈ? বিছানায় রক্ত, মাংস।

সুদেহা আনন্দে বিহ্বল। তিনি তখন মেঘের রথে চড়ে কোন এক অচীন পুরে পাড়ি দিয়েছেন। মুখে বললেন ঃ আহা হা, বাছা কৈ ? কোথায় আমার সাতরাজার ধন মাণিক।

ঘুশ্মা তখন শিবের পুজো করছিলেন। পুত্র মৃত। তিনি শুনলেন। ঘুশ্মা পুজোয় ছিলেন, পুজোতেই রইলেন।

রক্তে রক্তে বীভৎস সে শয্যা। ঘুশ্মার হৃদয় বিচলিত হল না। শিবের চরণে সমর্পিত হয়েছে তাঁর মন। তিনি বুঝলেন, যাঁর ধন তিনিই নিয়েছেন। রাখবার হলে তিনিই রাখতেন। ঘুশ্মা বুঝলেন, জগদীশ্বর এক মালাকর। ফুল তুলে তিনি মালা গাঁথেন। খেয়াল হয়, তিনি মালা ছিঁড়ে ফেলেন।

ঘুশ্মা শিবলিঙ্গ নিয়ে শিবময় হয়ে সরোবরের দিকে চললেন। বিসর্জন দিয়ে তিনি ফিরে আসছেন। মনে মনে জপছেন শিব শিব। সহসা থমকে দাঁড়ালেন। ছেলের ডাক, মধুর মা-ডাক। সরোবরের তীরে তাঁর প্রাণাধিক পুত্র। বলছে ঃ মা, এদিকে এসো। আমি মরে আবার বেঁচে উঠেছি। এসো,

দেখ।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন ঘুশ্মা। কোন রূপ চঞ্চলতা নয়, শান্ত ধীর স্থির ভাবে এসে দাঁড়ালেন পুত্রের সম্মুখে।

মৃত্যু হয়েছিল, নিস্তরঙ্গ ছিল মায়ের মন। মৃত পুত্র বেঁচে উঠল, নিস্তরঙ্গ রইল মায়ের মন। অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হলেন দেবাদিদেব। জ্যোতির শরীরে নেমে এলেন। বললেন: খুব খুশি করেছ। এবার বর চাও। তোমার পুত্রকে সুদেহা হত্যা করেছিল। এই ত্রিশূলে আমি তাকে হত্যা করব, পাপের দণ্ড দেব।

ঘুশ্মা বললেন: সুদেহা আমার ভগিনীর মত। তাকে আপনি রক্ষা করুন। সুদেহা আপনার অপকার করেছে, বিনিময়ে কেন তার উপকার করবেন? আপনার দর্শনেই যে তার মুক্তির দরজা যাবে খুলে।

শিব বললেন: তুমি বর চাও।

ঘুশ্মা বললেন: আপনি এখানে অবস্থান করুন।

: ও বর চেয়ো না।

: যদি বরই দান করেন তাহলে ঐ বরই দিন।

শিব সম্মত হলেন। বিখ্যাত হল ঘুশ্মেশ্বর।

শিব বললেন: এই সরোবর লিঙ্গে লিঙ্গে ভরে এসেছে। এটি হোক শিবালয়। তোমার জন্যই আসা, শেষে এখানে থেকে যাওয়া। তোমার কল্যাণ হোক। কোন দিনই লুপ্ত হবে না তোমার বংশ।

ঘুশ্মা ও সুধর্মা সুদেহার পাপে দুঃখিত হলেন। লিঙ্গরূপী শিবকে একশো একবার প্রদক্ষিণ করলেন। বারবার প্রার্থনা করলেন: সুদেহার পাপ বিধৌত হোক, সুদেহা সুস্থ হোক।

শিবের প্রসাদ নামে সর্বত্র। জগৎ-চরাচর তাই মধুময়। ঘুশ্মা মধুময় হলেন। সুধর্মা মধুময় হলেন। সুদেহাও মধুময় হলেন।

২৯. নৃসিংহচরিত

লক্ষ্মী ও নারায়ণ। লক্ষ্মী বললেন: আপনার এই কোমল শরীর। কিন্তু যুদ্ধকালে অতি প্রচণ্ড। এই শরীরে অমন যুদ্ধ কি করে যে সম্ভব! আমার কিন্তু বড় সাধ হয়, একবারটি দেখি।

নারায়ণ বললেন: আচ্ছা দেখাব।

নারায়ণ লক্ষ্মীকে যুদ্ধ দেখাবেন। কিন্তু সুযোগ কোথায়? এই কথাই সেদিন নারায়ণ চিন্তা করছিলেন। সহসা দ্বারের কাছে গোল শুনে এগিয়ে গিয়ে

দেখেন একেবারে শাপশাপান্ত পর্যন্ত কাণ্ড গড়িয়ে গেছে। তাঁরই দ্বারপাল জয় ও বিজয়। সনক প্রমুখ ঋষিকুমাররা এসেছেন। জয় ও বিজয়ের কিছু হয়ত ত্রুটি ঘটে থাকবে। ওঁরা ক্রোধে শাপশাপান্ত করে বসেছেন। তাই এত গোল।

নারায়ণ বললেন ঃ জয়-বিজয়ও দোষ করেছে, আবার আপনারাও শাপ দিয়ে ভাল করেননি। তবে শাপ প্রত্যাহার আর সম্ভব নয়। কিন্তু ওদের কিঞ্চিৎ কৃপা বিতরণ হয়ত করতে পারেন।

ঋষিকুমারগণ বললেন ঃ পৃথিবীতে ওরা যদি বিষ্ণুভক্ত হয়ে জন্মে তাহলে মুক্তি আসবে সাতজন্মে। অবশ্য তিনজন্মেও আসতে পারে, কিন্তু জন্মাতে হবে শত্রুভাবে।

জয় ও বিজয় বললেন ঃ তিন জন্মই ভাল। হোক শত্রুভাব, তবু বেশিদিন তো নয়।

জন্ম হল জয়ের, জন্ম হল বিজয়ের। মুনি কশ্যপ হলেন ওদের পিতা। একজন হলেন হিরণ্যকশিপু, আর একজন হিরণ্যাক্ষ। বিষ্ণু এই জন্মে নৃসিংহ হয়েছিলেন। সনক প্রমুখ ঋষিরা হয়েছিলেন প্রহ্লাদ প্রমুখ বিষ্ণুভক্ত। দ্বিতীয় জয় বিজয় হল রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, বিষ্ণু রাম, কুমারগণ বিভীষণ হনুমান। তৃতীয় জন্মে ওরা হল শিশুপাল ও দন্তবক্র, বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ, কুমারগণ হয়েছিলেন অক্রূর প্রভৃতি।

হিরণ্যাক্ষ প্রবল ও পরাক্রান্ত। সে যখন বালক তখনই খেলনা হিসেবে সে সূর্যকে করায়ত্ত করেছিল। হস্তী ও সিংহ হল তার বাহন। ওদের পিঠে চড়ে হিরণ্যাক্ষ নিয়ত ক্রীড়ায় মত্ত হয়। দুষ্ট বালকের দুষ্ট বুদ্ধি। যেমন করে একটি কুকুর এক খণ্ড পিঠেকে মুখে করে ঠিক তেমন করেই হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে মুখে গ্রহণ করে একদা সাগরের তলে প্রবেশ করল। ব্রহ্মা বড়ই বিষণ্ণ হলেন। সাধের পৃথিবী গেল কোন অতল তলে।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর স্তব করলেন। বিষ্ণু প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র দিয়ে বরাহের রূপ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। একটি ছোট বরাহ। ক্রমশ সেই বরাহ-শরীর বিষ্ণুর মায়াবলে প্রকাণ্ড হল।

ব্রহ্মা আরও স্তব করলেন। বিষ্ণু এলেন সাগরতীরে। সেখানে সন্ধ্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন নারদ। নারদ বরাহরূপী বিষ্ণুকে দেখেই ছুটে এলেন। স্তব করে বললেন ঃ আজ্ঞা করুন।

বরাহ বললেন ঃ আমার সঙ্গে এবার হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ। যতদিন যুদ্ধ চলবে তুমি ততদিন এই জল শোষণ করবে।

নারদ বললেন ঃ যথা আজ্ঞা।

পাঁচ শো বছর ধরে জলযুদ্ধ হল। পাঁচ শো বছর যুদ্ধ হল স্থলে। অতঃপর একদা সেই মহাবরাহ পৃথিবীকে মুখে করে অতল জলের তলা থেকে

বেরিয়ে এলেন।

ব্রহ্মা সাধের পৃথিবী ফিরে পেলেন। কিন্তু ওদিকে হিরণ্যকশিপু ভাইয়ের মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে প্রতিকার প্রার্থনা করল। অযুত বর্ষ ধরে তপস্যা করে চলল। তার শরীরে বৃক্ষ জন্মাল। সে বৃক্ষে পাখিরা নীড় রচনা করল। হিরণ্যকশিপুর ক্ষান্তি নেই। তপস্যায় সে মগ্ন।

ব্রহ্মা উপায়ান্তর না দেখে এসে বললেন ঃ ভয়ানক তপস্যা করেছ। এখন বর নাও।

হিরণ্যকশিপু বলল ঃ তোমার সৃষ্ট এই পৃথিবীতে কেউই যেন আমাকে বধ করতে না পারে।

ব্রহ্মা বর দিলেন। দেখতে দেখতে হিরণ্যকশিপু ত্রিভুবনজোড়া রাজ্য স্থাপন করলেন। দিকে দিকে তাঁর আজ্ঞা প্রচারিত হল। যারা বিরুদ্ধাচরণ করল তারা মরল। কালে হিরণ্যকশিপুর এক পুত্র হল। নাম প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ পাঁচে পড়তেই তাঁকে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হল। গুরু প্রহ্লাদকে শিক্ষা দেন আসুরী বিদ্যা, কিন্তু প্রহ্লাদ সব পাঠেই কেবল বলতেন 'নমো নারায়ণায়'। গুরু নিষেধ করেন। প্রহ্লাদ বলেন, 'নমো নারায়ণায়'।

গুরু না পেরে প্রহ্লাদকে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন ঃ হরিনাম ছেড়ে যদি কোনদিন আসতে পার তাহলেই এসো।

হিরণ্যকশিপু পুত্রকে কোলে করে অনেক সোহাগ করলেন। বললেন ঃ কি পড়েছ বল তো ?

প্রহ্লাদ বললেন ঃ নমো নারায়ণায়।

হিরণ্যকশিপু হাহাকার করে উঠলেন। গুরুকে ডেকে পাঠালেন। বললেন ঃ এ সব কি শিক্ষা দিয়েছ ?

গুরু বললেন ঃ আমি ওকে শিক্ষা দেব কি, ওই আমাকে শেখায়। অন্যদেরও নষ্ট করছিল। তাই তো পাঠিয়ে দিয়েছি।

দৈত্যরাজ অন্তঃপুরে এলেন। ছেলেকে কয়াধুর কোলে দিয়ে বললেন ঃ কি শিখেছে একবার শোন।

কয়াধু ছেলের কথা শুনে বললেন ঃ বাছা হরি হরি করলে তো রাজ্য পাবেনা। আর রাজ্য না পেলে দুঃখেরও অবধি থাকবে না।

প্রহ্লাদ বললেন ঃ কখনো শুনেছেন দিগ্গজ মশকের ভয়ে রাজদ্বার পরিত্যাগ করে বনবাসী হয়েছে ? আমার মুখ থেকেও অবিরাম হরিনামই শুনবেন। হরির সেবা করেই যে আমার জন্ম ও জীবন সার্থক হয়েছে। আমি কি সেই হরিকে ত্যাগ করতে পারি ?

কয়াধু বললেন ঃ মহারাজ, প্রহ্লাদ অত্যন্ত অবাধ্য। আমার অসাধ্য।

হিরণ্যকশিপু অমাত্যদের ডেকে পাঠালেন। বললেনঃ মহা কুলাঙ্গার। ও থাকলে কুলের নাশ। অতএব পূর্বাহ্ণেই ওকে বিনাশ করা কর্তব্য। যে করে হোক ওকে বধ কর। হয় ও হরিকে ছাড়ুক, নয় প্রাণকে।

অমাত্যেরা তৎপর হলেন। শত চেষ্টাতেও প্রহ্লাদ নিহত হলেন না। অগ্নি শীতল হল, জল স্থল হল, বিষ হল অমৃত, আর শাণিত অস্ত্র হল কোমল কুসুম।

অমাত্যেরা বড় গোলে পড়লেন। এ কি অমর? প্রহ্লাদ বললেনঃ বিস্ময়ের কিছু নেই। আমার পরমাত্মা হরি। জল সেই তাঁর শয্যা, অগ্নি মুখ আর বিষ লক্ষ্মীর সহোদর—আমার মাতুল। তাছাড়া ধরাদেবী হরির আদেশ ভিন্ন কিছু করেন না।

অমাত্যগণ রাজসান্নিধানে গমন করলেন। বললেনঃ মহারাজ, এ যে দেখছি অমর। কোন কিছুতেই ওর মৃত্যু নেই। মৃত্যু তো দূরের কথা, সামান্য যন্ত্রণা পর্যন্ত উৎপাদন করতে আমরা পারিনি। আমরা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছি, জলে ডুবিয়ে দিয়েছি, বিষ প্রয়োগ করেছি, নানাবিধ অস্ত্রও প্রয়োগ করেছি। কিন্তু সব বিফল হয়েছে। মহারাজ, আপনার পুত্র অমর।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বহুভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ বললেনঃ ও সবে সুখ নেই, ওসবে আপাতসুখ, স্বপ্নসুখ।

উপায়ান্তর না দেখে অসুররাজ পুত্রকে পুনরায় গুরুগৃহে প্রেরণ করলেন।

গুরুগৃহে সবাই অধ্যয়নে রত। কিন্তু প্রহ্লাদই আনমনা। গুরু কেবলই বললেনঃ দেখ সবাই কেমন পড়ছে। আর তুমি পড়ছ না। অথচ তুমি রাজার পুত্র। রাজ্য হবে একদা তোমার। তুমি লেখাপড়া শেখো মহারাজেরও এই ইচ্ছা। পুত্রের কর্তব্য পিতার আজ্ঞা পালন করা।

প্রহ্লাদ বললেনঃ নমো নারায়ণায়।

গুরু নেই, প্রহ্লাদই হতেন গুরু। বালকদের শেখাতেনঃ দেখ পিতামাতা ভাইবন্ধু কেউই কেউ নন, কেউই সেই অসামান্য সুখ দিতে পারেন না। অতএব একমাত্র হরিকেই ভজনা করা কর্তব্য। হরি নামেই সুখ, সুখের মত সুখ।

বালকেরা যেন খেলা পেল। ওরা বলাবলি করলঃ নমো নারায়ণায়। গুরুর কানে যেতেই তিনি গর্জন করে উঠলেন। প্রহ্লাদকে বললেনঃ তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। নইলে এমন দুর্বুদ্ধি কখনো কারও হয়?

গুরুর তর্জনে অন্য বালকেরা সঙ্গে সঙ্গেই নারায়ণের নাম ছাড়ল। মনে মনে ভাবল, মুখেও আনবে না আর কখনো।

কিন্তু প্রহ্লাদ নামরসে যেমন ডুবে ছিলেন তেমনই রইলেন।

গুরু বললেন ঃ পিতার কথা একদম ভুলে গেছ। ফের যদি ও সব হরিফরি শুনি তাহলে ভয়ানক শাস্তি পাবে।

প্রহ্লাদ বললেন ঃ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি আমার পিতাকে লঙ্ঘন করছি না। যতদিন সেই পিতার পিতা জগৎ-পিতাকে না পাচ্ছি ততদিন হিরণ্যকশিপুই আমার পিতা। সূর্য যখন আকাশে থাকেন না তখন প্রদীপের স্বল্প আলোতেই আমরা খুশি থাকি। কিন্তু সূর্যের আলোয় ভুবন প্লাবিত হলে মন আর প্রদীপশিখায় খুশি হতে চায় না। জগৎপিতাকে পেলে পিতার অবস্থাও হয় ঐ প্রদীপশিখারই মত। সব পুত্রই যদি কাজের আগে 'এ আমার পিতার কাজ, অতএব কর্তব্য' এরকম ভেবে কাজ করত তাহলে বরুণের পুত্র অগস্ত্য কি সমুদ্রের জল শোষণ করতেন? আসলে যে পথে গেলে পরম পিতার সঙ্গে লীন হওয়া যায় সেই পথই পথ। আমি সেই পথেই আছি, আপনি যদি তাতে তাড়না করেন, করুন। যাঁকে আপন বলে জেনেছি রক্ষা করার হলে তিনিই করবেন।

গুরু প্রহ্লাদকে বহুতর শাস্তি দিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ রইলেন নির্বিকার।

গুরু হাল ছেড়ে দিলেন। রাজার কাছে এসে বললেন ঃ আপনার পুত্র আপনারই থাক। ওকে শিক্ষা দেওয়া আমার কর্ম নয়।

হিরণ্যকশিপু খুব চিন্তান্বিত হলেন। মন্ত্রীপুত্রদের ডেকে তিনি বললেন ঃ তোমরা ধন্য, পিতার অবাধ্য নও। প্রহ্লাদকে কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে দাও না। দেখি ও যদি তোমাদের মত হয়।

মন্ত্রীপুত্ররা প্রহ্লাদকে নিয়ে নির্জনস্থানে গিয়ে বললেন ঃ তোমার পিতা যে সে লোক নন, দেবতারা ওঁর নামে কম্পমান। অমন পিতার-মত-পিতার অবাধ্য হলে তোমার কখনোই ভাল হবে না। পিতার কথা মত চল, বল। তবে তো তুমি পুত্রের মত পুত্র।

প্রহ্লাদ বললেন ঃ এ জগতে পিতাই বা কে মাতাই বা কে? কেই বা বন্ধু, কেই বা ভ্রাতা। সকলেই স্বার্থপর। সকলেই আপন কর্মফল অনুযায়ী কাজ করে, চলে যায়। কে কার? সন্ধ্যে হলে অনেক পাখি এক গাছে আশ্রয় নেয়। সকাল হয়, উড়ে যায় আপন আপন কাজে। তারপর আবার অন্য গাছে অন্যদের সঙ্গে। সংসারে পিতা মাতা ভাইবন্ধুও ঐরকম। যাকে সুখ বলে মনে মনে মানছ আসলে তা সত্য নয়—স্বপ্ন। কর্মক্ষয় না হলে বারবার জন্ম, মুক্তি থাকে বহুদূরে। হরিকে ভজনা কর, কর্ম পাবে ক্ষয়, মুক্তি আসবে এগিয়ে। মলিন বস্ত্রে কখনও রঙ ধরে না। অমলিন বস্ত্রেই রঙ ধরে। মনে পাপ, মলিন, রঙ সে মনে বসবে কি করে। হরিকে ডেকে ডেকে মন হয় ধৌত, পবিত্র। মনে তখন রঙ ধরে। অতএব তোমরা যা করছ কর। আমি যা করছি করতে দাও। তোমরা মূর্খ, তাই আমাকে উত্যক্ত করছ।

মন্ত্রীপুত্ররা রাজাকে বলল ঃ অসাধ্য।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আহ্বান করলেন। বললেন ঃ হরির আরাধনা করে তুমি যা পাও আমার কাছেও তাই পাবে। আমাকেই হরি বলে মানো। দেবদানব নাগ গন্ধর্ব সবাই আমার বশ। আমিই হরি, অন্য হরি আর কেউ নেই। যদি থাকেই তাহলে বল না সে কোথায়? নিগ্রহ অনুগ্রহ সবই আমি করতে পারি। আমি ছাড়া আর হরি কে? তুমি বালক, তাই বুঝছ না। যা বলছি তা সত্য।

প্রহ্লাদ বললেন ঃ 'আমি হরি আমি হরি' ওরকম কেন বলছেন? হরিতে আপনাতে দুস্তব ভেদ। যেমন ভেদ মণি ও কাচে, কোকিল ও মণ্ডুকে, কর্দম ও চন্দনে, সাত্ত্বিক তামসে। যেমন ভেদ সূর্য ও খদ্যোতে, বেদ ও লৌকিক বাক্যে লোহায় ও সোনায়, গো ও শূকরে। তোমাতে ও হরিতেও অমনি ভেদ। তোমার মধ্যে অহংকার, অভিমান, কাম, ক্রোধ। তুমি মুক্তি দেবার কেউ নও, হরি দান করেন মুক্তি। নিজেকে হরি হরি করে জাহির করলেই কি কেউ হরি হয়? হাতি দরজায় বাঁধা, কে সাধ করে হাতি ছেড়ে শেয়ালের পিঠে উঠে ভ্রমণে বেরুবে?

হিরণ্যকশিপু বললেন ঃ বেশ, তোমার ঐ হরি কোথায় আছেন বল?

প্রহ্লাদ বললেন ঃ তিনি সর্বত্র। স্থূল সূক্ষ্ম, চেতন অচেতন, নদী-পর্বত সমুদ্র, মাটি গাছ পালা সর্বত্র তিনি। তিনি আমাতে তিনি তোমাতে। তিনি সর্বত্র। তিনি সর্বকালে। হরি নেই এমন স্থানের অস্তিত্বও নেই।

হিরণ্যকশিপু বললেন ঃ তিনি যদি সর্বত্রই তাহলে ঐ স্তম্ভমধ্যেও নিশ্চয় আছেন।

ঃ নিশ্চয় আছেন।

ঃ তাহলে তোমার পরম পূজনীয় হরিকে এবার দেখ।

একটি মাত্র মুহূর্ত। হিরণ্যকশিপু ক্রোধে ফেটে পড়লেন। খড়্গ হাতে নিয়ে বেগে তিনি ধেয়ে গেলেন।

সহসা যেন বজ্রপতন হল। খড়্গের আঘাতে স্তম্ভ বিদীর্ণ হল। পলকে আবির্ভূত হলেন বিষ্ণু। মাথার দিকে তিনি সিংহ, পায়ের দিকে মানুষ ঃ নৃসিংহ। মহাভয়ংকর আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর গর্জনে আকাশ বাতাস থরথর করে কাঁপতে থাকল। তাঁর কেশর-আস্ফালনে মেঘসমূহ খণ্ডবিখণ্ড হল। যেন প্রলয়কাল সমাগত। নৃসিংহের মুখ থেকে অযুত জ্বালা ঠিকরে বেরিয়ে এধারে ওধারে ধাবিত হল। দৈত্যরা জ্বালায় কাতর হল। হঠাৎ তিনি হুংকার দিলেন। দৈত্যস্ত্রীদের গর্ভ পতিত হল। বৃহৎ বৃহৎ নখে তাঁর সর্বগাত্র আবৃত। দৈত্যরা ভয়ে অস্থির হল। তথাপি তারা যুদ্ধ করে চলল। কিন্তু বিষ্ণুর এক নিশ্বাসে সমস্ত দৈত্য নিহত হল। গ্রহ চন্দ্র তারকা চঞ্চল হয়ে

উঠল। পর্বত বিচলিত হল, সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হল। হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর যুদ্ধ। লোকসমূহ সন্তাপিত হল।

সায়ংকালে বিষ্ণু যেন লোকসমূহের সন্তাপ বুঝলেন। দৈত্যরাজকে উনি স্তম্ভ মধ্যে আকর্ষণ করলেন। কোলের উপর ফেলে তীক্ষ্ণ নখে দৈত্যরাজের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। নৃসিংহ রক্তপানে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। নাড়ী সকল স্থাপন করলেন স্বীয় কণ্ঠদেশে।

দেবতারা পরিতুষ্ট হয়ে পুষ্প বৃষ্টিতে নৃত্যে সংগীতে চতুর্দিক মুখর করে তুললেন।

লক্ষ্মী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মনে মনে চিন্তা করলেন: প্রভুর একি অদ্ভূত রূপ!

প্রহ্লাদ হরির মহিমায় ধন্য ধন্য করলেন।

হিরণ্যকশিপু নিহত। কিন্তু নৃসিংহদেবের তেজ তখনো সমস্ত চরাচরকে ব্যাকুলিত করছিল। দেবতারা কূল পেলেন না। কি করবেন? কোথায় যাবেন? কি করলে শান্তি আসে নৃসিংহদেবের? দেবতারা কেউই তাঁর সমীপে গমন করতে সাহস পেলেন না। ওঁরা প্রহ্লাদকে বললেন: তুমি আগে আগে চল।

কেউ কেউ ইন্দ্রকে বললেন: তোমারই তো যাওয়া উচিত আগে।

ইন্দ্র বললেন: আগে গিয়ে চোখ খোয়াতে আমি সম্মত নই।

ব্রহ্মা আগেভাগেই বলে রাখলেন: আমাকেও বল না বাপু। দাড়ি পুড়ে মরি আর কি।

লক্ষ্মী বললেন: এমন তো কখনো দেখিনি, যেতে ভরসা হয় না।

ঋষিরাও চুপ করে রইলেন। নানারকম আলোচনা চলল। এ ক্রোধের কি শান্তি নেই? যদি থাকে তাহলে কোন্ পথে আসবে শান্তি!

অবশেষে দেবতাদের প্রার্থনায় প্রহ্লাদ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

দুরু দুরু বক্ষে দেবতারা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। প্রহ্লাদ নৃসিংহের নিকটবর্তী হলেন। দেবতারা দেখলেন, নৃসিংহদেব জিহ্বা দ্বারা প্রহ্লাদের অঙ্গ সাদরে স্পর্শ করছেন। প্রহ্লাদকে তিনি আলিঙ্গন করলেন।

নৃসিংহদেব বললেন: এই দুষ্ট দানবের জন্য আমার হৃদয়ে প্রচন্ড সন্তাপ উপজাত হয়েছিল। এখন তোমার স্পর্শে সে সন্তাপ বিদূরিত হল। তুমি আমার প্রিয় পুত্র। সুখে রাজত্ব কর। তোমার বংশের কেউই আমার হাতে আর নিহত হবে না। তুমি সুখে শান্তিতে রাজত্ব কর।

নৃসিংহদেব এবার ফুৎকার দিলেন। প্রচণ্ড সেই ফুৎকারে সব লণ্ডভণ্ড হল। দেবতারা দেখলেন আর এক উৎপাত। ওঁরা গণেশকে বললেন: আপনি নৃসিংহদেবকে যে করে হোক শান্ত করুন। আপনার তো বুদ্ধির সীমা

নেই। বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু একটা এবার করুন।

গণেশ সম্মত হলেন। মোটা শরীর, তদুপরি বৃহৎ এক উদর। গণেশ মূষিকের উপর আরোহণ করে অগ্রসর হলেন। সবাই গণেশের কলেবর ও তাঁর বাহনটিকে দেখে মনে মনে খুব মজা পেলেন। ও দিকে নৃসিংহদেব ফুৎকারের পর ফুৎকার ত্যাগ করছেন। যেতে যেতে গণেশের বাহন সেই ফুৎকারের ধাক্কায় একেবারে উলটে গেলেন। গণেশও ছিটকে পড়লেন কিছুটা দূরে। দেবতারা হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠলেন। এমনকি নৃসিংহদেবও হাসিতে ফেটে পড়লেন। দেবতাদের ধড়ে যেন প্রাণ এল। মনে মনে ভাবলেন হয়ত নৃসিংহদেব কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েছেন। কিন্তু নৃসিংহদেব হাস্য করলেও তাঁর তেজ পূর্ববৎই রইল।

দেবতারা উপায়ান্তর না দেখে শিবের স্তব করতে লাগলেন। স্তব ধ্বনিত হল : হে দেবাদিদেব, সমুদ্রমন্থনকালে হলাহল গ্রহণ করে তুমিই আমাদের রক্ষা করেছিলে। তুমি নীলকণ্ঠ, তোমাকে নমস্কার। তোমাকে নমস্কার করলেই দূরে যায় তাবৎ দুঃখ। আমাদের দুঃখ দূর কর।

মহাদেব বললেন : দুঃখ দূর করাই আমার ব্রত।

মহাদেব ধারণ করলেন শরভের রূপ। নৃসিংহ সেই ভয়ংকর শরভরূপ দেখে বললেন : তুমিই আজ দেবসমাজকে রক্ষা করলে।।

৩০. আহুক ও আহুকী : নল-দময়ন্তী

শিবপূজা : মহাফল।

সূত বললেন : ব্রহ্মা, নারদ, বশিষ্ঠ ; স্বায়ম্ভুবমনু, প্রিয়ব্রত, ইক্ষ্বাকু ; মান্ধাতা, সগর, নহুষ ; দিলীপ, দশরথ : এঁরা শিবপূজা করেছিলেন। মহাফল পেয়েছিলেন। স্বয়ং রামচন্দ্র, তিনিও শিবের পূজা করেছিলেন। পুরূরবা, সুদ্যুম্ন ওঁরাও খ্যাত। ধনুর্ধর অর্জুনও ব্যাসের উপদেশে শিবের পূজায় রত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও বাদ যাননি।

: ওঁর শিবই তো বিল্বেশ্বর ?

: বিল্বেশ্বর, অজস্র বিল্বপত্রে পূজিত হয়েছিলেন, তাই কৃষ্ণের সেই শিব বিল্বেশ্বর।

: এঁদের কথা জানি। শুনেছি রাজা নল পূর্বজন্মে সামান্য ব্যাধ ছিলেন। শিবের পূজায় হয়েছিলেন রাজা নল। রাজা নলের এ বৃত্তান্ত আমাদের তেমন জানা নেই।

: অর্বুদাচল পর্বত। আহুক ও আহুকী : ব্যাধ ও তদীয় পত্নী।

আহুকী শিবপরায়ণ। কোটীশ্বরের মাথায় সে নিত্য জল ঢালে, পুজো করে।

শিব ফল দিলেন। আহুক ও আহুকীর শরীরে সর্বক্ষণের জন্য যেন জোয়ার ধরা রইল। ভোগে উপভোগে বিহ্বল দুটি প্রাণী অর্বুদাচল পর্বতে রচনা করল স্বর্গ।

একদিন আহুক কুটিরে ছিল না। ধারে কাছে কোথাও শিবের পুজোর জন্য গিয়েছিল।

অতিথি এলেন। মাথায় জটা, এক যতি।

যতি ভেবেছিলেন, একবাত্রি এখানে থাকবেন। কিন্তু কুটিরে দেখলেন একাকিনী এক নারী। যতি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দ্বিধা, সংকোচ, ভয়। যতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আহুকী বুঝল। বলল ঃ তাতে কি। তুমি তো বাবার মত।

যতি ব্যাধের কুটিরে আশ্রয় নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আহুকও ফিবে এল। বলল ঃ আজ্ঞা করুন, বলুন কি আপনার প্রয়োজন ?

ঃ শুধু রাত্টুকুর জন্য একটু আশ্রয়।

ঃ আমার এই ছোট্ট কুটির। স্থানের বড় অকুলান। নইলে আর আপত্তি কি ?

যতি চলে যেতে চাইলেন।

আহুকী বলল ঃ কিন্তু আপনি গেলে আমাদের ধর্ম নষ্ট হবে।

আহুকী আড়ালে এসে আহুককে বলল ঃ তোমরা ভিতরে থেকো, আমি বাইরে থাকব। হাতে অস্ত্র থাকবে। ভয়টা কিসের !

কিন্তু আহুক মনে মনে সায় পেল না। পত্নী থাকবে বাইরে, আর সে থাকবে ভিতরে, এ কখনই হয় না। সেই বরং বাইরে থাকতে পাবে। যা হবার হবে। বাঘে ভালুকে খায় তাকেই খাবে। বনে বনে বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়াই করে সে অভ্যস্ত, কিন্তু তার পত্নী তো তেমন অভ্যস্ত নয়।

রাত্রি এল। আহুক কুটিরের বাইরে বইল। কুটিরের ভিতরে তার পত্নী নিদ্রায় অভিভূত, যতি ধ্যানে নিমগ্ন।

বাইরে হিংস্র অন্ধকাব পৃথিবী। বাঘ ডাকছে, ওদিকে সিংহের গর্জন। আহুক সতর্ক রইল। সম্মুখেই যেন দুটি অগ্নিকুণ্ড। আহুক অস্ত্র ত্যাগ করল। বিকট গর্জন করে অন্ধকার বনের মধ্যে জন্তুটি লুটিয়ে পড়ল। সারারাত্রি এরকম কত জন্তুজানোয়ার এল, গেল। শেষমেষ আহুককে খেল বাঘে।

ফর্সা হল। যতি এসে দাঁড়ালেন বাইরে। কিন্তু একি ! একি ! টুকরো টুকরো ছড়িয়ে রক্ত, মাংস, হাড়—এধারে ওধারে।

যতি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। বারংবার নানাভাবে হা-হুতাশ করলেন। ওঁরই জন্য একজনের হল প্রাণান্ত। ওঁরই জন্য ছোট্ট একটি সংসার ভেঙ্গে গেল।

আহুকী বলল: আপনি মিথ্যে শোক করছেন। আমার স্বামী ধন্য। তাই এমন কারণে তাঁর মৃত্যু হল। আমিও যাব সহমরণে। ওঁর শরীর পুড়বে, আমারও পুড়বে। পুড়বে একসঙ্গে।

চিতা রচিত হল। চিতায় স্থাপিত হল আহুকের ছিন্ন ভিন্ন দেহাবশিষ্ট।

অগ্নি প্রজ্বলিত হল। আহুকী প্রবেশ করল প্রজ্বলিত সেই আগুনে।

প্রসন্ন হস্ত বাড়িয়ে সহসা কোথা হতে যেন নেমে এলেন শিব। বললেন: পবিত্রতা বলতে তুমি, নিষ্পাপ বলতে তুমি। তুমি ধন্য। অথচ এ জন্ম দুঃখে দুঃখেই গেল কেটে। আবার তোমাদের জন্ম হবে—সুখ করবার জন্য অন্য এক জন্ম। এই মহাযোগী ধারণ করবেন হংসের রূপ। ঘটিয়ে দেবেন তোমাদের বিবাহ। আহুক জন্ম নেবে নৈষধ নগরে। সেখানে রাজা বীরসেন। আহুক হবে বীরসেনের পুত্র নল। বৈদর্ভ নগর। রাজা ভীম। তুমি হবে ভীমের কন্যা দময়ন্তী।

ঋষিরা জিজ্ঞাসা করলেন: এই শিবই তো অচলেশ?

সূত বললেন: হ্যাঁ, ভক্তদের রক্ষা করতে উনি এখানেই রইলেন।

৩১. দ্বৈতবনে পঞ্চপাণ্ডব: অর্জুনের দীক্ষা

পাণ্ডবদের জীবনে সে এক দুর্দিন! পাশাখেলায় ওঁরা সর্বস্ব খোয়ালেন। যেতে হল বনে।

পাণ্ডবরা দ্বৈতবনে এসে বসবাস করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের তপে তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব দিলেন অপরূপ ও অদ্ভুত এক স্থালী। ওঁদের আহারের দুঃখ ঘুচল।

পিছনে দুষ্ট শত্রু। মন্দ অভিপ্রায়।

পাণ্ডবগণ বিপদে পড়লেন। দুর্যোধন পাঠিয়েছেন দুর্বাসাকে। দুর্বাসার সঙ্গে দশসহস্র শিষ্য। দুর্বাসা এসে দ্রৌপদীকে বললেন: আমরা অতিথি, আমাদের পরিতৃপ্ত কর।

পাণ্ডবরা ভয়ানক বিচলিত হলেন। এই বনে এই দশসহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করা যে অসম্ভব।

যুধিষ্ঠির ওঁদের বললেন: আপনারা স্নান সেরে আসুন।

মুখরক্ষা এ যাত্রা অসম্ভব। পঞ্চপাণ্ডব ঠিক করলেন, প্রাণত্যাগ করাই

শ্রেয়। অন্য কোন পথ আর নেই। প্রাণই ও'রা ত্যাগ করবেন, উদ্যোগও করলেন।

দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। এতবড় বিপদ, কৃষ্ণ যেন আসেন, করুণা করেন।

কৃষ্ণ এলেন। নিজে খেলেন সামান্য শাকান্ন। কিন্তু দুর্বাসা এবং তাঁর দলবলকে পরিতৃপ্ত করলেন।

দুর্বাসা প্রস্থান করতে করতে বললেন: ভগবান যাকে রাখেন তাকে মারে কার সাধ্য। পাণ্ডবরাই ধন্য। ভগবানের কৃপায় পাণ্ডবরাই কৃতার্থ।

পাণ্ডবরা বড় বিব্রত। ও'রা কৃষ্ণকে বললেন: শত্রু অতিশয় প্রবল। আপনি একটা উপায় বলুন।

কৃষ্ণ বললেন: যা বলি তাই কর। পার পাবে। তোমাদের মত অবস্থায় আমিও পড়েছিলাম। তখন আমার সর্বত্র শত্রু। অথচ জয় করতে হবে। দ্বারকায় এসে উপায় ভাবছি। এমন সময় মহাত্মা উপমন্যুর দর্শন পেলাম। উনি উপদেশ দিলেন: শঙ্করের আরাধনা কর। আমি বটুক পর্বতে গিয়ে ক্রমাগত সাতমাস ধরে শম্ভুর আরাধনা করলাম। শম্ভু প্রসন্ন হলেন, বর দিলেন, প্রবেশ করলেন সেই পর্বতের গুহায়। আমার যা কিছু ক্ষমতা দেখছ তার সবই সেই তাঁরই কৃপায়। এখনও নিয়মিত সেই তাঁরই আমি সেবা করি। তোমরাও কর। পার পাবে।

কৃষ্ণ চলে গেলেন। পাণ্ডবরা দুর্যোধনের গতিগতি বুঝবার জন্য একজন ভিল্লকে প্রেরণ করলেন। বলে দিলেন: প্রজাহিতের জন্য দুর্যোধন কি করছেন সেইটে জেনে এস।

ভিল্ল গেল। দেখল দুর্যোধন যথার্থই যত্নপর। প্রজাদের দিকে তাঁর মনোযোগেরও অভাব নেই।

ভিল্ল এল। পাণ্ডবরা সব শুনে উদ্বিগ্ন হলেন।

কি করবেন? কোথায় যাবেন? চিন্তায় চিন্তায় ও'রা মলিন হলেন। কিন্তু মুহূর্তে যেন ও'রা উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। যেন স্বয়ং ধর্ম এসেছেন। মাথায় জটা, মূর্তিমান তেজ। পাণ্ডবরা কুশাজিনের আসন বাড়িয়ে দিলেন। পাঁচ জনেই হর্ষ প্রকাশ করে বেদব্যাসকে ঘিরে বসলেন। পূজা করলেন, স্তব করলেন। বললেন: আপনি এসেছেন, আমাদের দুঃখ নাশ হল। দুর্যোধন যেভাবে আমাদের পীড়িত করছে তাতে আমরা কাতর। আপনি এসেছেন, এবার সব কষ্ট নষ্ট হবে। আপনার অসাধ্য কিছু নেই, সেই আপনি এসেছেন। আমরা আপনার আশ্রয় পেলাম। তথাপি যদি দুঃখের অবসান না হয় জানব অদৃষ্টই আমাদের মন্দ।

: তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা সত্যকে ত্যাগ করনি। দুর্যোধন ও তোমরা

—আমার কাছে দুইই সমান। তবু যারা সত্যপর তাদের দিকেই পণ্ডিতের পক্ষপাত। চোখও গেল, ধর্মকেও ধৃতরাষ্ট্র ছাড়লেন। তোমরাও তাঁর পুত্র। কিন্তু তিনি লোভের বশ্য হয়ে তোমাদের রাজ্য অপহরণ করেছেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তোমরা যখন খুবই ছোট তখন ধৃতরাষ্ট্রের মন এমন ছিল না। তিনি তোমাদের খুবই টানতেন। কিন্তু পরে দুর্যোধনের অত্যাচার নিবারণ তিনি করেননি। তোমরা পথে বসলে। ওদিকে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র, এদিকে ধর্মপরায়ণ তোমরা। তোমাদেরই ভাল হবে। ভাল কাজের ফল কখনো মন্দ হতে পারে না। যেমন বীজ বপন করবে অঙ্কুরও ঠিক তেমনই নির্গত হবে। বিমর্ষ হয়ো না, মুষড়েও পড়ো না, তোমাদের ভাল হবেই।

পাণ্ডবরা বললেন: বনে এসেও দুর্যোধনের হাত থেকে নিস্তার নেই. এখানেও চলেছে তার অত্যাচার। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি এমন কোন উপদেশ দিন। কৃষ্ণ এসেছিলেন, তিনি বললেন, শম্ভুর আরাধনা কর। আমরা করিনি।

ব্যাস যেন কথা কেড়ে নিয়ে বললেন: আমিও দেবদেব শঙ্করের আরাধনা করি, এখনো করছি। তোমরাও কর, দুঃখ নষ্ট হবে।

ব্যাস মনে মনে বিচার করলেন। ওঁর দিব্যদৃষ্টিতে অর্জুনের মূর্তিই ধীরে ধীরে স্থির হল। উনি বুঝলেন, অর্জুনই যোগ্য। শিবের তপস্যায় এদের মধ্যে অর্জুনই যোগ্য। ওরই মধ্যে আছে তপস্যার সংস্কার। এ জন্মে নররূপ, কিন্তু ও এক পুরাতন মুনি।

ব্যাস অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বললেন: জগৎচরাচরে যা কিছু দেখছ, যা কিছু ধ্যান করছ সবেতেই শিব। যিনি বিষ্ণু তিনিও এই শিবেরই এক অদ্ভুত রূপান্তর। অতএব শিবের সেবা কর··· বিষ্ণু তুষ্ট হন বহুকালে, শিব অতি অল্পকালে। উনি তুষ্ট হন, ভোগ দেন, মুক্তিও দেন। অতএব শিবের সেবা কর। প্রথমে ইন্দ্রকে তুষ্ট কর, উনি তুষ্ট হলে ক্ষাত্রিয়ের মঙ্গল, উনি তুষ্ট হলেই দান করেন শিবমন্ত্র। তুমি স্নান করে এসো, আমি তোমাকে ইন্দ্রমন্ত্র দান করব।

অর্জুন স্নান করে এলেন। পূর্ব দিকে মুখ করে ব্যাসের কাছ থেকে অর্জুন ইন্দ্রমন্ত্র গ্রহণ করলেন।

ব্যাস অর্জুনকে পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজাবিধি বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: প্রথমে ইন্দ্রের পূজা করবে, ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে আজ্ঞা করলে মগ্ন হবে শিবের পূজায়। কিন্তু যাই কর, এখানে নয়। তুমি ইন্দ্রকীল পর্বতে গমন কর। সেখানে ভাগীরথীর নিকটবর্তী থেকে তপস্যা কর। তপস্যায় বাধা আসবে বহু, সে সব চূর্ণ করবে অস্ত্র বলে। আর সর্বদা মনে মনে পাঠ কর শিবের স্তব।

ব্যাস অর্জুনকে আশীর্বাদ করলেন। অপর চারভ্রাতাকেও কাছে ডাকলেন। বললেন ঃ ধর্ম ছেড় না, আশীর্বাদ করি—জয়ী হও।

ব্যাস প্রস্থান করলেন। বনান্তরালে পঞ্চপাণ্ডবের বিষণ্ণ অন্তঃকরণ অপার্থিব এক আনন্দে প্লাবিত হল।

অর্জুনের অঙ্গে এক নবতর তেজদীপ্ত কান্তি। যুধিষ্ঠির বললেন ঃ তুমিই পারবে। আমাদের মধ্যে তুমিই এ বিষয়ে যোগ্যতম। ব্যাসের কথা মিথ্যা হবার নয়। অতএব ওঁর উপদেশ পালন কর।

অর্জুন উদ্যোগ করলেন। যেতে হবে ইন্দ্রকীল পর্বতে। যেতে হবে একা। এক বিষণ্ণতা কাটল, এল আর এক বিষণ্ণতা। প্রিয়তম অর্জুন। তাঁকে ছাড়তে হবে। দ্রৌপদীর চোখ অশ্রুসিক্ত হল। কিন্তু উনি অশ্রুরোধ করলেন।

অর্জুন যাত্রা করলেন ॥

৩২. অর্জুনের তপস্যা ঃ ইন্দ্রের উপদেশ

সবাই মিলে অর্জুনকে ইন্দ্রকীলে প্রেরণ করলেন। অর্জুনকে ছাড়তে কারও মন চায়নি। তবু অর্জুনকে যেতে দিতে হয়েছে। অর্জুন থাকবেন না একথা ভেবে ওঁদের কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সে কষ্ট যে এত তীব্র তা আগে থেকে একেবারেই অনুমান করতে কেউ পারেন নি। যতই দিন যেতে লাগল বেদনা ততই তীব্র হতে লাগল। পাঁচজনে একত্র বসে ওঁরা বলাবলি করলেন ঃ দুঃখের দিনে প্রিয় কিছু পেলে দুঃখ কমে, কিন্তু প্রিয় কিছুর বিচ্ছেদ হলে দুঃখ বাজে দ্বিগুণ হয়ে।

অর্জুন গেছেন দূরে। দুঃখের ভারে পাণ্ডবরা অবনত। ব্যাস এলেন। বেদনার কথঞ্চিৎ শান্তি হল। পাণ্ডবরা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। বললেনও ঃ আর পারিনা, নিত্য দগ্ধ হচ্ছি। ঠিক এই সময়েই আপনি এলেন। আমাদের জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। এখানে আমাদের কাছে আপনি কিছুদিন এবার থাকুন।

ব্যাস সম্মত হলেন। উনি রয়ে গেলেন। মাঝেমাঝেই যুধিষ্ঠির খেদ করেন। বলেন ঃ এত দুঃখ হয়ত আর কেউ আর কোনদিন পায়নি। প্রভু, এর কি অবসান নেই।

ব্যাস বললেন ঃ দেখ বৎস, তোমার এ দুঃখ কোন দুঃখই নয়। পূর্বকালে রাজা নল, হরিশ্চন্দ্র এবং রামচন্দ্র অবর্ণনীয় দুঃখ পেয়েছিলেন। সে তুলনায় তোমার দুঃখ সামান্য। শরীর ধারণ করলেই দুঃখ। মাতৃগর্ভে প্রবেশ করার পর থেকেই ক্লেশের শুরু। তারপর শুধু ক্লেশ আর ক্লেশ। অবশেষে ঘনায়

মৃত্যু। অতএব দুঃখ-দুঃখ আর কর না। সত্যের সেবা কর। শিব যাতে প্রসন্ন হন এমন কাজ কর। ওতেই সর্বদুঃখের নাশ।

ওদিকে অর্জুন চলেছেন। এপাশে ওপাশে আকাশে বাতাসে যেন মঙ্গলের বার্তা। চলতে চলতে যা কিছু অর্জুন দেখলেন সবেরই শুভ তাৎপর্য। অর্জুন বুঝলেন, এবার শত্রুর ক্ষয় অনিবার্য।

ইন্দ্রকীল পর্বত, গঙ্গার তীর, অশোককানন। কিংবা কানন নয়, স্বর্গ। অর্জুন এই স্বর্গে এসে উপনীত হলেন।

অর্জুন মুগ্ধ চিত্তে গুরুর উপদেশ স্মরণ করলেন। গুরু যেমন বলেছিলেন তেমনটিই রচনা করলেন সজ্জা। গুরু যেমন বলেছিলেন তেমনটিই স্থাপন করলেন মাটির মূর্তি। এবার জপ, ধ্যান, পূজা। নানাভাবে অর্জুন ইন্দ্রের উপাসনা করলেন।

দেবতারা বিচলিত হলেন, বিস্মিতও হলেনঃ কে এ? কখন এল? কিভাবে এল? কিই বা করতে চায়?

ইন্দ্রসমীপে দেবতারা নিবেদন করলেনঃ কে যে বুঝছি না, অথচ তপস্যার তেজে আমরা পুড়ছি। আপনার অশোক কাননে বসে তপস্যায় মগ্ন রয়েছেন। উনি কি কোন ঋষি না দেবতা না সূর্য কিংবা কি অগ্নি?

ইন্দ্র সব বুঝলেন। অথচ দেবতাদের কাছে কিছুই ভাঙ্গলেন না। ইন্দ্র দ্রুত রূপ বদল করলেন।

সুন্দর ইন্দ্রমূর্তি যেন শূন্যে লীন হল। ইন্দ্র ছিলেন, পরমুহূর্তে ইন্দ্র নেই। দাঁড়িয়ে অতি এক বৃদ্ধ। মাথায় জটা, শরীরে জরা, পরনে মৃগের চর্ম। বৃদ্ধ প্রতি পদক্ষেপে পড়তে পড়তে টলতে টলতে অর্জুনের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন।

অর্জুন তটস্থ হলেন। জরাতুর বৃদ্ধকে খুশি করতে অর্জুন ত্রুটি করলেন না। পাদ্য দিলেন, অর্ঘ্য দিলেন, স্তব করলেন, পরিচয় সুধালেন।

বৃদ্ধ উত্তরে কিছু বললেন না। উলটে আপাদমস্তক অর্জুনকে একবার নিরীক্ষণ করে বললেনঃ কাঁচা বয়সে এত তপ! নিশ্চয়ই এ তপ মুক্তির জন্য নয়? জয়ের জন্য, কি বল?

অর্জুন অকপটে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। বৃদ্ধ বললেনঃ সুখের জন্য তপ করে মরছ, অথচ এটা ঠিক নয়। কারণ সুখ স্বপ্নবৎ। তাই ওর জন্য তপস্যা করা ঠিক নয়। মুক্তির জন্য যদি কর তাহলে অবশ্য খুবই ভাল কথা, কর, প্রাণপণ করে কর। কিন্তু বৎস, ইন্দ্রকে ভজনা করছ, কিন্তু ইন্দ্র তো মাত্র সুখ দিতে পারেন, মুক্তি দেবার সামর্থ্য তো ইন্দ্রের নেই। কাজেই বলছিলাম কি, তপ কর কিন্তু কদাচ সুখের জন্য নয়, কর মুক্তির জন্য।

অর্জুন কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হলেন। বললেনঃ মুক্তিটুক্তির জন্য আমি তপ করছি

না, করছি রাজ্যের জন্য। আর করছি যারতার কথায় নয়, ব্যাসদেবের কথায়। কাজেই ওসব এলোমেলো কথা বলে আমার তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না। বরং অনুগ্রহ করে অন্যত্র গমন করুন।

পলকমাত্র। জরাতুর বৃদ্ধ শূন্যে লীন হল। দাঁড়িয়ে রইল এক বৃদ্ধ। কিন্তু পলক মাত্র। অর্জুন দেখলেন বৃদ্ধ নেই, দাঁড়িয়ে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র।

অর্জুন ঈষৎ লজ্জিত হলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর প্রশংসা করলেন। বললেন ঃ হ্যাঁ, যথার্থই নিশ্চল তোমার মন। কম্পন নেই এক বিন্দুও। পারবে, তুমিই পারবে। তোমার বিপক্ষ খুব বলবান। সত্য বলতে কি, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সকলেই অজেয়। এমনকি আমারও। কাজেই আমারও কিছু করার নেই, বলতে পারি শুধু উপায়।

সাগ্রহে অর্জুন তাকিয়ে রইলেন ইন্দ্রের মুখের দিকে। ইন্দ্র বলে চললেন ঃ পাবেন একমাত্র শিব। জয়ই যদি তোমার কাম্য হয় তাহলে তুমি শিবকে ভজনা কর। বিষ্ণু বল, ব্রহ্মা বল, সবাই জয় কামনায় ঐ শিবকে ডাকেন। অতএব আমার মন্ত্র ছাড়, এবার ধর শিবের মন্ত্র। মাটির শিবলিঙ্গ নির্মাণ করে অশেষ প্রকারে শিবের পূজো কর। সিদ্ধ তুমি হবেই।

ইন্দ্র প্রস্থান করলেন। কিয়ৎ দূরে গিয়ে ফিরে এসে বললেন ঃ শুভ কাজ করতে যাচ্ছ। বাধা আসবেই। ভুলেও যেন বিচলিত হয়ো না। সাবধানে খুব ধৈর্যসহকারে ধীরে অগ্রসর হবে।

অর্জুনের আর এক জন্ম লাভ হল। নব এক প্রভাতে নব আনন্দে অর্জুন যেন জেগে উঠলেন। মনে গুঞ্জন করে ফিরল ইন্দ্রের শেষ বাক্যগুলো ॥

৩৩. কিরাত ও অর্জুন

নবজীবনে নবআনন্দে নবতর উৎসাহে অর্জুন ধ্যান পরায়ণ হলেন। ব্যাস তাঁকে শাস্ত্রবিধি উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্জুন সেই বিধি পালন করলেন। পরম যোগীর মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিনি জপে মগ্ন হলেন।

অর্জুন তপস্যা করছেন। কঠিনতম আশ্চর্য তাঁর সেই তপস্যা। দেবগণ মুগ্ধ হলেন। ওঁরা শিবসমীপে উপনীত হয়ে বললেন ঃ মানুষ, অথচ আশ্চর্য সুন্দর ওর তপস্যা। আমরা মুগ্ধ। অথচ আশ্চর্য, এখনো আপনি উদাসীন।

দেবতারা শিবের বহুবিধ স্তব করলেন। তাঁদের কামনা শিব যেন যান, ভক্তের ভগবান তিনি। তিনি যেন যান। করুণা করেন অর্জুনকে। দূর করেন দেবতাদের চিন্তা। নতুবা তপের সন্তাপে দেবসমাজ নিয়ত তাপিত হবেন।

শিব বললেন ঃ চিন্তা করনা, যাও। তোমাদের কাজ আমি করব।

দেবতারা প্রাণ পেলেন। ওঁদের প্রত্যাগমনের পথ আনন্দে হল স্বর্ণবর্ণ।

ওদিকে ক্ষান্তি, ক্লান্তি নেই। অর্জুনের তপস্যায় প্রদীপ্ত হল বনভূমি।

দুর্যোধন সংবাদ পেয়েছেন। দুরাত্মার ছলাকলার রহস্য অপার। দুর্যোধন অর্জুনের তপস্যা মাটি করতে চান।

বনে এল দুষ্ট এক দৈত্য। নামে মূক, রূপে বরাহ। দুর্যোধনের অনুচর।

বনভূমিতে যেন ঝঞ্ঝা এসেছে। গাছপালা ভেঙ্গেচুরে, মাটি খুঁড়ে, বিকট গর্জন করে মূক এল এগিয়ে। অর্জুন দেখে সন্দিগ্ধ হলেন। বুঝলেন এ তাঁর শত্রু। এসেছে তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে। কিন্তু কে এ, কোথা থেকে এল? যথার্থই কি এ তাঁর শত্রু! বহুতর সংশয়ে অর্জুন দুললেন। একবার ভাবলেন, হয়ত শত্রুই। জীবনে বহু দৈত্যদানবই তো বধ করেছেন। হয়ত তাদেরই কারো আপনজন। হয়ত এসেছে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে। কিংবা হয়ত হবে দুর্যোধনেরই কোন-না-কোন মিত্র।

অর্জুন মনে মনে অনেক চিন্তা করলেন। দৈত্য প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে আসছে। বহুতর চিন্তাও অর্জুনের মনে বিদ্যুতের মত চমকে চমকে চলে যাচ্ছে। যাকে দেখে মন খুশি হয় তাকেই তো বলে সখা। সেই তো শেষ পর্যন্ত করে উপকার। কিন্তু যাকে দেখে মন কলুষিত হয় শাস্ত্র বলে সে শত্রু। তাছাড়া আচার দেখে বোঝা যায় কেমন ঘরে জন্ম, শরীর দেখে বোঝা যায় কেমন আহারে রুচি, বাক্য শুনে বিচার করা যায় জ্ঞানী কি মূর্খ। চোখেও ভাসে হৃদয়েরই ছবি। চোখ কখনো উজ্জ্বল, কখনো প্রীতিযুক্ত, কখনো ঈষৎ রক্তবর্ণ। সম্মুখে মিত্র, চোখ হয় উজ্জ্বল; সম্মুখে পুত্র, চোখে ভাসে প্রীতি; সম্মুখে কামিনী, চোখ হয় বক্র; সম্মুখে শত্রু চোখ হয় আরক্ত। অর্জুনের সমস্ত ইন্দ্রিয় কলুষিত হয়েছে। অর্জুন মনে মনে বুঝলেন ঃ নির্ঘাৎ এ শত্রু। শত্রুর নিধনই শ্রেয়। ব্যাসও তাঁকে একদা বলেছিলেন ঃ যে দুঃখ দেবে তাকে নির্বিচারে হনন করবে।

সংশয় দূরে গেল। অর্জুন ধনুতে শর যোজনা করলেন।

শিব এসে পড়েছেন। গণ পরিবৃত হয়ে অর্জুনকে তিনি পরীক্ষা করতে এসেছেন। পরীক্ষা, অতএব আর স্ব-রূপ নয়, ব্যাধের রূপ। লতা দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা চুল, গায়ে মাটির আঁকিবুকি, পরণে কৌপীন। শিব এখন ব্যাধ। শিবের হাতে ধনুর্বাণ, পিঠে তূণীর। গণেরাও সাজল ব্যাধের অনুচর। শিব যেন ব্যাধদের রাজা।

বনে এসেছেন ব্যাধরাজা। বন তোলপাড় হল। বনে এসেছে দৈত্য। বন তোলপাড় হল। অর্জুন হতচকিত হয়ে সেই ব্যাপ্ত মহাশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন। সবই যেন আসন্ন বিপদের সংকেত। অর্জুন শিবকে স্মরণ করলেন।

শিব যদি প্রসন্ন তাহলে সর্ববিপদের ভঞ্জন। ব্যাস একথা বলেছিলেন, কৃষ্ণও বলেছিলেন, স্মৃতিতে এমনকি বেদেও এই রকম উক্ত হয়েছে। শিব সর্বদা সর্বথা মঙ্গল করেন। তিনি ভক্তের ভগবান। শিবের ইচ্ছাই সব ইচ্ছা। শিবেব ইচ্ছাতেই বিষ বিষ, অমৃত অমৃত। শিবের ইচ্ছাতেই বিষ অমৃত, অমৃত বিষ। হয়ত কখনো কখনো তিনি দুঃখও দান করেন। কিন্তু সে দুঃখ সাময়িক, নিতান্তই ভক্তের মনোবল পবীক্ষা করতে তিনি কখনো-সখনো দুঃখও উৎপাদন কবেন।

অর্জুনের সংশয়কাতর চিত্তে বল এল ফিরে। তাঁব মঙ্গল নিশ্চিত। অতএব মুষড়ে পড়ার কিছু নেই।

কয়েকটি মাত্র পল। এরই মধ্যে কত চিন্তা! কিন্তু ওদিকে দৈত্যরূপী শূকব আবও নিকটবর্তী হয়েছে। যা কিছু করার এখনই করা দরকার। সময় সমাগত। শত্রুব শেষ কখনো রাখতে নেই। শূকরটি এখন পর্বতের চূড়ায়। অর্জুন লক্ষ্য স্থির করলেন।

ভক্ত বৎসল শিব। দৈত্য এসেছে বনে। এসেছে তাঁরই ভক্তের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে। শিব ত্বরিতে বাণ-নিক্ষেপ করলেন। অর্জুনও করলেন। ওদিক থেকে ছুটে এল শিবের বাণ। শূকরের পুচ্ছভাগে বিদ্ধ হয়ে মুখ ফুঁড়ে বাণ গেল বেরিয়ে। মিশল গিযে মাটিব তলায়। এদিক থেকে অর্জুনের বাণ এসে বিদ্ধ হল শূকরের মুখে। পুচ্ছ ফুঁড়ে বাণটি পড়ল ঠিক পাশেই।

বিকট সেই দৈত্য বধ হল। দেবতারা শান্তি মানলেন। আকাশ থেকে ছড়িয়ে দিলেন শতেক ফুল। শিব খুশি, ভক্ত রক্ষা পেল। অর্জুন খুশি. শিব তাঁকে রক্ষা কবেছেন। অর্জুন বারবার শিবের নাম করতে লাগলেন।

বিপদ কেটে গেছে। দৈত্য নিহত। অর্জুন এগিয়ে চললেন। এবার কাজ, বাণটির পুনরুদ্ধার। ওদিক থেকে কে-না-কে এসে বাণটি গ্রহণ করায় অর্জুন তাকে তিবস্কাব করলেন। বললেনঃ আমার বাণ, কেন নিচ্ছ? অর্জুন বাণ গ্রহণ করলেন।

শিবেব ভৃত্য এসেছিল বাণ আহরণ করতে। সে অর্জুনকে বলল: ও বাণ আমাদের, তোমার নয়, অতএব ওটি গ্রহণ কর না।

অর্জুন বললেনঃ এইমাত্র আমি ওটি ছুঁড়েছি। এ আমারই বাণ। আমাবই বাণ এমন দেখতে। আমারই বাণের পিছনে লগ্ন ময়ূরের পুচ্ছ। এই দেখ এ বাণে আমার অঙ্কিত চিহ্ন, আমার নাম। এ বাণ আমারই, তোমাদের নয়।

ব্যাধ বন কাঁপিয়ে হেসে উঠল। বলল: তপস্বীর বেশ! এ যে দেখছি নিতান্তই ভেক। নইলে তপস্বী কখনো মিথ্যে বলে না। আর তুমি মেতেছ সেই মিথ্যেরই বেসাতিতে। ভেব না আমি একা। আমার মত বহু ব্যাধে

পরিবৃত হয়ে আমাদের রাজা এখানে সম্প্রতি বাস গেড়েছেন। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাকে রাজা করতে পারেন, আবার ধুলোয় মিশিয়েও দিতে পারেন। সেই তাঁর বাণ কি কখনো তোমার কাছে রাখা চলে! আর না হয় তুমি তপস্বীই। কিন্তু কেমন তপস্বী? চৌর্যে চঞ্চলতায় তো তপস্যার ক্ষয়। কেউ কি ইচ্ছে করে তপস্যার ক্ষয় করে? অতএব ভালোয় ভালোয় ওটি দাও। আর যদি নেহাৎ রাখতেই চাও তাহলে বরং চেয়ে নাও। আমাদের রাজা হামেশাই ওরকম বহুতর বাণ বিতরণ করে থাকেন। এমন কি চাওয়ার মত করে চাইলে বাণ কেন, অনেক কিছুই তুমি তাঁর কাছে পেতে পার। এবার চপলতা ত্যাগ কর।

অর্জুন বললেনঃ যা যা বলেছ সবই বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলছ। যেমন তোমার জাতি দেখছি ঠিক তেমন-তেমনই তোমার বাক্য। আর তোমাকে দেখেই তোমাদের রাজার দৌড় যে কতদূর তাও বুঝতে পারছি। আমি ক্ষত্রিয়, আর তোমরা ব্যাধ। আমি প্রার্থনা করব তোমাদের কাছে! বরং তোমাদের রাজাকে ডাক। সে এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে এই বাণ গ্রহণ করুক।

ব্যাধ বলল: মূর্খ বলেই অমন বলছ। সেধে মরণ ডেকে আনছ।

অর্জুন বললেনঃ শুনেছি সিংহের সঙ্গে শৃগালের যুদ্ধ খুব উপহাসের। এবার সেই যুদ্ধ না হয় একবার দর্শন কর।

ব্যাধ এসে শিবসমীপে অর্জুনের কথা নিবেদন করল। শিব বললেনঃ বলগে যে অর্জুন মরলে অর্জুনের পত্নী বড় দুঃখিত হবেন। তার চেয়ে মিট-মাট করে নেওয়াটা কি বুদ্ধির কাজ নয়?

শিবভৃত্য এসে অর্জুনকে যথারীতি বলল। অর্জুন বললেনঃ উনি ঠিকই বলেছেন। তবে ওটি সত্য হবে বিপরীতভাবে। দেখ, যদি সত্যিই এ বাণ আমি দিয়ে দিই তাহলে আমার কুল কলংকিত হবে। আমার মুখ তো উজ্জ্বল হবেই না। তাছাড়া এ যাবৎ যা শিখেছি সবই যাবে বৃথা। তাই বলছিলাম, তোমরা সদলবলে এসো। পরাক্রম প্রকাশ করে এ বাণ গ্রহণ কর। কখনো কি শুনেছ যে শৃগাল দেখে সিংহ ভয়ে কুঁকড়ে গেছে?

শিব সব শুনে খুশিতে একেবারে আটখানা হলেন। তিনি স্বয়ং অর্জুনের কাছে এলেন।

অর্জুন শিবের নাম করে ব্যাধরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। শিবের অনুচররাও প্রচুর অস্ত্র প্রয়োগ করল। কিন্তু সব অস্ত্রই বিফল হল। ওরা যে বাণই নিক্ষেপ করে তাকেই মাঝ পথে অর্জুন ছেদন করেন। উপরন্তু শরাঘাতে বিপক্ষকে করে তুললেন ব্যতিব্যস্ত। শিবের অনুচরেরা যে যেদিকে পারল পলায়ন করল। তপস্যাক্ষেত্র হল যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধক্ষেত্র শূন্য হল। রইলেন শুধু অর্জুন ও শিব। এবার দুজনের যুদ্ধ।

শিব ধনু ত্যাগ করে মল্লযুদ্ধে রত হলেন। অর্জুনের সমস্ত অস্ত্র নষ্ট করলেন। অর্জুনের বর্মও ভেদ করলেন। শিব ও অর্জুনের মল্লযুদ্ধ। সমগ্র পৃথিবী ঘন ঘন কম্পিত হল। দেবতারাও আর্ত হলেন।

সহসা শিব আকাশে উত্থিত হলেন। আকাশে থেকেই যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুনও আকাশে উঠে শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। উড়ে উড়ে যুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ। অর্জুন সুযোগ পেলেন। শিবের পা ধরে শূন্যে ঘোরাতে থাকলেন। ভগবান ভক্তের বশ্য। শিব এ কথা বোঝাতে যেন বদ্ধ-পরিকর। অর্জুন তাঁকে ঘোরালেন, তিনি ঘুরলেন। ঘুরতে ঘুরতে অর্জুনের হাত ফসকে এক সময় শিব বেরিয়ে এলেন। ঈষৎ হেসে স্ব রূপে প্রকটিত হলেন।

অর্জুন আচম্বিতে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এই তো সেই পরম কারণ। এঁকেই তো তিনি পূজো করছেন, ইনিই তো সেই শিব।

অর্জুন লজ্জিত হলেন। সন্তপ্ত চিত্তে শিবের পদমূলে পতিত হয়ে বারবার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

শিব বললেনঃ তোমার কোন অপরাধ হয়নি। পরীক্ষার ছলে এসব আমিই করেছি। তুমি আমাকে অস্ত্রাঘাত করেছ, আমি তাকে জ্ঞান করেছি পূজো বলে। আমি সন্তুষ্ট। এবার বর চাও।

শিব অর্জুনকে দুহাত ধরে মাটি থেকে তুললেন। তথাপি অর্জুনের মনে দ্বিধা। শিব বললেনঃ বৎস, দ্বিধা ত্যাগ কর। শত্রুদের মধ্যে তোমার যশ বাড়িয়ে তোলার জন্যই এই অদ্ভুত কাজ করেছি। তোমার মনের দ্বিধাও মোহমাত্র।

অর্জুন কথঞ্চিৎ সুস্থ হলেন। স্তব করলেন। বহু প্রকারে শিবকে নমস্কার করলেন।

শিব বললেনঃ বর প্রার্থনা করলে কৈ ?

অর্জুন বললেনঃ তুমি সবই জান, তথাপি বলছ, তাই বিশদ করেই জ্ঞাপন করছি। শত্রু ভয় দূর হয়েছে, শুধু তোমার দর্শনেই ও ভয় মুখ লুকিয়েছে। এবার ইহলোকে যাতে আমার যশোবৃদ্ধি হয় এমন কিছু বর দাও।

শিব অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করলেন। বললেনঃ ইহলোকে তুমি অজেয় হবে। কৃষ্ণ আমারই অংশ। আমি তাঁকে বলব, তিনি তোমার সহায় হবেন। তুমি রাজ্য পাবে, ভোগ করবে।

শিব অর্জুনকে আলিঙ্গন দান করলেন। ভক্তের উপর ভগবানের বাৎসল্য প্রকাশিত হল।

অর্জুন কৃতকৃতার্থ। দেবতারা পরম হর্ষে অর্জুনকে প্রশংসা করলেন।

অর্জুন প্রত্যাগমন করেছেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ চার ভাই দ্রৌপদী সবাই

যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। যুধিষ্ঠির সমস্ত শুনে উচ্ছ্বাস সহকারে বললেন ঃ শিবই ধন্য।

কৃষ্ণ এলেন। সব শুনে বললেন ঃ আমি তাই শিবের সেবা করি। উনি সর্ব দুঃখ নাশ করেন। আমি পুজো করি। তোমরাও কর ॥

৩৪. বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র লাভ

অসুররা বলবান হয়ে উঠল। ক্রমে দেবতারাও তাদের কাছে নিয়ত লাঞ্ছিত ও পীড়িত হতে লাগলেন। ধর্ম লুপ্ত হতে বসল। দেবতারা বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানালেন। বললেন ঃ হে প্রভু, এদের হিংসায় আমাদের প্রাণ যায় যায়। আপনি আমাদের উদ্ধার করুন।

বিষ্ণু বললেন ঃ ওদের বিরুদ্ধে আমারও আপাতত কিছু করার নেই। আগে শংকরের আরাধনা করি। তারপর যদি কিছু পারি।

দেবতারা বিষণ্ণ হয়ে ফিরলেন। কিন্তু মনে তাঁদের অনন্ত আশ্বাস। বিষ্ণু বসবেন তপে। অতএব একটা কিছু এবার হবেই হবে।

বিষ্ণু এলেন কৈলাসে। সেই হবে তাঁর তপের ক্ষেত্র। বিষ্ণু কুণ্ড নির্মাণ করলেন। জ্বালিয়ে দিলেন অগ্নি। শুরু হল শংকরের পুজো।

কত স্তব কত মন্ত্র। ওদিকে মানস সরোবরে কত পদ্ম। বিষ্ণু ঐ পদ্মে নিত্য শংকরের পুজো করেন।

শিবের প্রসন্ন মুখ বিষ্ণুর দিকে ফিরল না। বিষ্ণু হতাশ হলেন। শিবের সহস্র নাম আর সহস্র পদ্ম। এবার পুজো অন্যতর।

শিব এবার ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করতে চাইলেন। ছলের অভাব হল না। সহস্র পদ্ম, শিব একটি অপহরণ করলেন।

পুজায় বসে বিষ্ণু দেখেন একটি পদ্ম নেই। অথচ পুজোর আসন থেকে উঠা সম্ভব নয়। আবার পুজোও থেকে যায় অসম্পূর্ণ।

বিষ্ণু মনে মনে চিন্তা করলেন ঃ তাঁর চোখই তো পদ্ম। অতএব ওটি উৎপাটন করেই দিব্য সমাধা হতে পারে পুজো।

বিষ্ণু স্বীয় নেত্র উৎপাটন করতে উদ্যত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিব আবির্ভূত হয়ে বিষ্ণুকে বাধা দিলেন।

বিষ্ণু জ্যোতির্ময় সেই শিবকে অশেষবিধ স্তবে প্রসন্ন করলেন। শিব বললেন ঃ তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে! এই নাও সুদর্শনচক্র। এই চক্রই তোমাকে দেবতাদের দুঃখ দূর করতে সহায়তা করবে।

অযুত প্রভা সেই চক্রের। বিষ্ণু স্নান করে পবিত্র হয়ে উত্তর মুখে দাঁড়িয়ে

সেই চক্র গ্রহণ করলেন।

শিব বললেন ঃ সহস্র নাম পাঠে সহস্র দুঃখেরও নাশ। আর এই চক্র ধারণে অভীষ্ট সিদ্ধি।

অতঃপর শিব বিষ্ণুকে বর দিতে চাইলেন। বিষ্ণু প্রার্থনা করলেন ঃ ভক্তি।

শিব বললেন ঃ ভক্তির অধিকার তোমার আসবে। তুমি হবে সর্বপূজ্য। তোমার নামেই নষ্ট হবে সমস্ত পাপ।

বিষ্ণু কৃতার্থচিত্তে চক্রধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। সহসা শিবেব সেই জ্যোতির মূর্তি লীন হল সূর্যের আলোয়॥

৩৫. ব্যাধের ব্রতপালন

ইহকাল ঃ যেমন কর্ম, পরকাল ঃ তেমন ভোগ। বধে পাপ, পাপে নরক। চুরি পাপ, পাপে নরক। রুরুদ্রুহ নামক ব্যাধের ইহকাল শুধু পাপেব ইতিহাস। শুধু বধ, শুধু চুরি।

সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা, মাতা পিতা। সংসার পোষণের ভার রুরুদ্রুহের। অথচ রুরুদ্রুহ সামান্য এক ব্যাধ। সে বনে বনে ঘুরত, মৃগ বধ করত। কোনদিন পেত, কোনদিন পেত না। পেত না, অতগুলি লোকের ক্ষুধা তা বুঝত না। এমন কি নিজেকেও রুরুদ্রুহ বুঝাতে পারত না। সে চুরি করত।

রুরুদ্রুহের জীবনে দিনে দিনে রচিত হল পাপের পাহাড়।

সংসারে কর্ম আছে বহু। সব কর্মই মন্দ নয়। মন্দ কর্মে মন্দ গতি, ভাল কর্মে ভাল গতি। রুরুদ্রুহ ভাল কর্মের ধারে কখনো যায়নি। বলতে কি, জানতও না কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ।

জানত না, তথাপি পাকে-প্রকারে করে ফেলেছিল। রুরুদ্রুহের জীবন থেকে অপসৃত হয়েছিল পাপের পাহাড়।

সেদিন ছিল শিবরাত্রি। মাতা পিতা স্ত্রী সকলে বলল ঃ ঘরে আহার্য বাড়ন্ত। যে করে হোক নিয়ে এস। নইলে উপবাস।

ক্ষুণ্ণ মনে খিন্ন চরণে রুরুদ্রুহ তীর এবং ধনু নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বনের পথে। সারা দিন তন্নতন্ন করে সারা বন সে ঢুঁড়ে ফিরল। কিন্তু দেখা মিলল না একটি মৃগেরও। বনে মৃগ নেই ঃ রাতারাতি সবে মিলে চলে গেছে যেন অন্য বনে।

বেলা পড়ে এল। মৃগ মৃগ করে ছুটে ছুটে আকাশের দিকে একবারও চোখ তোলার হুঁশ হয়নি তার। সূর্য পাটে বসল, বনের মধ্যে গুটিগুটি

অন্ধকার এল নেমে। গাছে গাছে পাখিদের ত্রস্ত পাখার শব্দ।

রুরুদ্রুহ সব অন্ধকার দেখল। বেলা পড়ে এল! এত আগে সূর্য গেল অস্তে! ঘরে ছেলেমেয়েরা হয়ত কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। পিতামাতা, তার স্ত্রী হয়ত আশায় আশায় বসে আছে পথ চেয়ে। অথচ ব্যাধ রুরুদ্রুহের জাল আজ শূন্য। অথচ কিছু তার চাইই।

একটু গেলেই এক জলাশয়। ওখানে সন্ধ্যায় কোন না কোন জীব জল পান করতে আসবেই। তখনই সারাদিনের শ্রম সার্থক করে রুরুদ্রুহ ঘরের পথে জোর কদমে চালিয়ে দেবে পা।

জলাশয়। তীরে বেলগাছ। রুরুদ্রুহ বেলগাছে গা ঢাকা দিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে, জল খেতে আসবে, তারপর একটি মাত্র তীর। এক তীরেই ঘাটের উপর লুটিয়ে পড়বে একটি হরিণ, রুরুদ্রুহ নেমে আসবে, জালে জড়িয়ে কাঁধে ফেলে জোর কদমে ঘরের পথে চালিয়ে দেবে পা।

রুরুদ্রুহের শরীরে বল ফিরে এল। আঁজলা আঁজলা করে অনেকটা জল সে খেয়ে ফেলল। ভাবল ঃ গাছে বসে আবার যদি পিপাসা পায়! একটু জল সঙ্গেও নিল। তারপর আস্তে আস্তে বেলগাছে বেশ উঁচুতে মজবুত একটি ডালে পাতাপুতির আড়ালে চুপটি করে সে বসে রইল।

কখন আসে কখন আসে—এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে থেকে রুরুদ্রুহের চোখ টনটন করে উঠল।

সহসা রুরুদ্রুহ আনন্দে নড়েচড়ে উঠল। ঐ তো আসছে! ঐ তো!

লাফিয়ে লাফিয়ে একটি মৃগী এসে ঘাটে নামল। চকিত চোখে এদিক ওদিক চাইছে, আবার জলে মুখ দিচ্ছে। সন্তর্পণে রুরুদ্রুহ ধনুকে শর জুড়ল।

রাত্রি তখন প্রথম প্রহর। রুরুদ্রুহের নড়াচড়ায় একটু জল উছলে পড়ল গাছের তলায়, দুএকটি পাতাও খসল, পড়ল গাছের তলায়। গাছের তলায় শিবলিঙ্গ। তারই মাথায় জল পড়ল, পড়ল বিল্বপত্র। শিবের পূজা হল।

ব্যাধ জানলও না। শিবের কৃপায় তার পাপ দগ্ধ হল।

ঘাটে তখনো হরিণী জল পান করছে। চকিতে চারিদিকে ত্রস্ত চোখে চাইছে। সহসা বেলের ডাল নড়ে উঠল। হরিণী চোখ তুলে দেখল ব্যাধের হাতে উদ্যত ধনু।

পালাবার পথ নেই। সম্মুখে অবধারিত মৃত্যু। এত বিপদেব মধ্যেও হরিণীর মাথায় এক বুদ্ধি এল।

হরিণী ব্যাধকে বলল ঃ কি করতে চাও?

ব্যাধ বলল ঃ বাড়িতে সবাই ক্ষুধায় কাতর। তোমাকে বধ করে তাদের ক্ষুধা দূর করব।

নিদারুণ বাক্য। তথাপি হরিণী আনন্দ ভরে বলতে লাগল ঃ আমার মাংসে তোমাদের সুখ হলেই আমি সুখী। পরের উপকারেই তো সুখ, সুখের মত সুখ। কিন্তু একটু সবুর কর। একবার আমাকে গৃহে যেতে দাও। শিশু সন্তানগুলিকে ওদের পিতার হাতে তুলে দিয়ে আসি। তারপর আমার মাংসে যত প্রকারে খুশি যতখানি খুশি তোমরা তৃপ্ত হয়ো।

রুরুদ্রুহ বলল ঃ বিপদে পড়লে সকলেই অমন কথা অনেক বলে। কিন্তু ওভাবে ভোলার পাত্র আমি নই।

ঃ বায়ু, সপ্তসমুদ্র সকলেই সত্যকে আশ্রয় করে নিজের নিজের কাজে রত। সত্যকে আশ্রয় করে চলেন বলেই ওঁদের নাম। আমিও মিথ্যে বলছি নে।

ঃ অমন ঢের কথা আমার শোনা আছে।

হরিণী বলল ঃ যদি না আসি তাহলে মহাপাপ যেন আমাকে স্পর্শ করে। ব্রাহ্মণ বেদ বিক্রি করলে বা তিনসন্ধ্যা আহ্নিক না করলে যে পাপ হয়, যদি না আসি তাহলে সেই পাপ যেন আমাকে লাগে। পতির কথা অমান্য করলে সতীর যে পাপ, উপকারীর অপকার করায় যে পাপ, হরিকে স্মরণ না করায় যে পাপ—সমুদয় পাপ যেন আমায় লাগে। আমি দিব্যি করছি ঃ আসব, আসব, আসব।

ব্যাধ বলল ঃ তাহলে তাড়াতাড়ি কর।

হরিণী যেন প্রাণ পেল। আকণ্ঠ জল পান করে পরমানন্দে নিজের আশ্রয়ে ফিরে এল।

হরিণী ফিরছে না। এত দেরি তার করার কথা নয়। হরিণীর ভগিনী ভগিনীর খোঁজে সেই ঘাটে এসে দাঁড়াল।

ব্যাধ ধনুতে পুনর্বার বাণ যোজনা করল। এবারও একটু জল চলকে নিচে পড়ল, কয়েকটি বেলপাতা খসে নিচে পড়ল, এবং পড়ল শিবের মাথায়।

তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। শিব দ্বিতীয় প্রহরেও পূজা পেলেন।

এ হরিণীও ব্যাধকে সুধালো ঃ কি করছ ?

ব্যাধ বলল ঃ তোমাকে বধ করব। আমার পরিবারবর্গ উপবাসী। তোমার মাংসে রচিত হবে তাদেরই আহার্য।

এ হরিণীও বলল ঃ আমার কি ভাগ্য! এত দিনে বোধকরি এ জীবন সফল হল। অনিত্য শরীর। অথচ তা দিয়েই সাধিত হবে পরের উপকার। কিন্তু আমার একটি কথা রাখ।

এও আগের হরিণীর মত একবার গৃহে যেতে চাইল। ব্যাধ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। কিন্তু শেষমেষ হরিণীর দিব্যির বহর দেখে বলল ঃ যাও, কিন্তু ঠিক এস যেন।

হরিণীরা ফিরছে না। হরিণ শংকায় আতুর। অবশেষে সেও বেরিয়ে পড়ল

খুঁজতে। কোথায় গেল ? কোথায় ? নানা কথায় হরিণের মন তখন তোলপাড় হচ্ছে। ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ত্রস্ত চাহনি ফেলে ফেলে হরিণ এসে দাঁড়াল সেই ঘাটে।

ব্যাধ খুব খুশি হল। এমন হৃষ্টপুষ্ট হরিণেই সুখ। গায়েগতরে মাংসও আছে খুব। ব্যাধের সংসার বেশ কয়েক বেলা ফেলে ছড়িয়ে বেশ আয়েস করে দিব্যি খেতে পারবে।

ব্যাধ ধনু আকর্ষণ করল। ব্যাধের নড়াচড়ায় এবারও চলকে একটু জল নিচে পড়ল। কয়েকটি বেলের পাতাও খসে নিচে পড়ল, এবং পড়ল শিবের মাথায়।

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। প্রহরে প্রহরে তিনবার পূজা হল।

ব্যাধের নড়াচড়ায় চকিত দৃষ্টি মেলে হরিণ তাকে দেখল। বলল ঃ কি করছ ?

তারপর সেই আগের মতন কথোপকথন। ব্যাধ বলল ঃ বাপু, আগেও ঠিক তোমারই মতন আসব বলে দুজন গেছে। এখনও আসেনি এবং আসবেও না। এবার আর ছাড়াছাড়ি নয়।

হরিণও বহু দিব্যি গালল। ব্যাধ যেন বিরক্ত হয়েই বলল ঃ যাও যাও। চটপট যেন এস।

দুই হরিণী ফিরে এসেছে। হরিণও এল। ওরা সবাই ব্যাধের কথা বলল। বলল ঃ দিব্যি করে বলে এসেছি। যেতে হবেই।

বড় হরিণী বলল ঃ আমিই যাই। কারণ আমিই আগে গিয়েছিলাম।

ছোট হরিণী বলল ঃ আমি তোমাদের দাসী। আমিই যাই। তুমি থাক।

হরিণ বলল ঃ তা হয় না। আমারই যাওয়া কর্তব্য।

হরিণীরা বলল ঃ তুমি যাবে, আর আমরা থাকব। বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার কোন দরকার নেই।

ছেলেমেয়েদের একজন প্রতিবেশীর হাতে সঁপে ওরা তিনজনেই রওনা হল। কিছুক্ষণ পরে ছেলেমেয়েরা ভাবল ঃ আমরাই বা বাদ যাই কেন। ওঁরা যদি মরেন, আমরাও মরব।

ঘাটের উপর তিন হরিণহরিণী। ব্যাধ গাছের শাখায় বসে পুলকিত মনে ধনুতে বাণ যোজনা করল। হাতের বাণ হাতেই রইল। ব্যাধ দেখল ঃ আরও আসছে। কচি কচি কটি মৃগশিশু।

রুরুদ্রুহ ধনুতে বাণ যোজনা করল। তখন রাত্রি চতুর্থ প্রহর। এবারও জল পড়ল, পাতা পড়ল, আর পড়ল শিবের মাথায়। শিবের পূজা হল।

শিবরাত্রি। চারপ্রহরে পূজা। রুরুদ্রুহের তাবৎ পাপ বিদূরিত হল।

হরিণহরিণী বলল ঃ এসেছি, এবার কৃতার্থ কর।

রুরুদ্রুহ অজ্ঞান ছিল। পূজা, পূজাফল ঃ অন্তরে চৈতন্যের উদয়।

রুরুদ্রুহ ওদের কথায় অবাক হয়ে ভাবল ঃ ওরা সামান্য পশু। অথচ সমুন্নত। সামান্য পশু, অথচ শরীরপাত করে পরের উপকারে আগ্রহী। আমি মানুষ, আচরণে অমানুষ। ওরা পশু, আত্মদানে উম্মুখ। আমি মানুষ, পরপীড়নে আত্মপোষণই করেছি। পাপ করেছি, শুধুই পাপ, এবং পাপ।

রুরুদ্রুহ তীরধনুক নামিয়ে রাখল। বলল ঃ তোমরা যাও।

শিবের প্রসাদ নেমেছে অন্তরে। অন্তরে আলোর প্লাবন। অন্তরে এক অভূতপূর্ব বেদনা।

শিব দর্শন দিলেন। ব্যাধকে বর দিতে চাইলেন।

রুরুদ্রুহের মন তখন আনন্দ ও বেদনায় টনটন করছে। সে বলল ঃ সবই তো পেয়েছি।

রুরুদ্রুহ শিবের চরণে পতিত হল।

কৃপা করতে এসেছেন। কৃপা তিনি করবেন। বিহ্বল ভক্ত না চাইলেও শিব তাকে বর দিলেন। বললেন ঃ তুমি গুহ, এই নামেই রটবে তোমার খ্যাতি। এখন থেকে তুমি সুখী, যা চাইবে তাই পাবে, সুখে ধনে মানে ভরে উঠবে। দশরথপুত্র শ্রীরাম একদা তোমার গৃহে যাবেন, তুমি তাঁকে পূজবে, ভক্ত হবে।

তারপর উন্মোচিত হবে তোমার মুক্তির দুয়ার।

হরিণেরা যাই যাই করে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাধের ভাবান্তরে ওরা পড়ে গেছে আতান্তরে। তারপর সহসা সেই পরম দর্শন। দর্শনমাত্র মুক্তি। বিমান এল, সবাইকে নিয়ে গেল স্বর্গে।

অর্বুদাচল পর্বতে শিব আবির্ভূত হয়েছেন। অর্বুদাচলে উনিই ব্যাধেশ্বর।

পাকেচক্রে হয়ে গেল পূজা। ব্যাটা জানতও না, বুঝতও না, অথচ পাকে চক্রে জল পড়ল পাতা পড়ল, পূজা হল। তাতেই ব্যাধের পোকাপড়া জীবন করুণাঘন শিবের করুণায় মঞ্জরিত হয়ে উঠল লতায় পাতায় ফুলে ।।

৩৬. শিবব্রত

মা বললেন ঃ ঘরের খাচ্ছ, ঘরের পরছ, স্ফূর্তি করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ঘেন্নাপিত্তি ছেড়ে বাপভাই মা বোনের সম্মুখ দিয়েই রোজ যেখানে সেখানে গিয়ে রাত্তির কাটিয়ে আসছ। ভেবেছ চিরকাল একভাবেই যাবে। তাঁকে এখনো চেনোনি, একদিন দেবে ঘাড়ে ধরে দূর করে।

বেদনিধি অন্য ঘরে চলে গেল। মা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বকেই চললেন।

ছোট সুনিধি বলল ঃ দিনদিন যে কি হচ্ছে ! ছি'ছি ! এত বেদ পড়লে, আর শেষে কিনা তোমার গতি হল··। ছি ছি।

সুনিধি ধমক খেল। বেদনিধি গুম হয়ে বসে রইল।

ব্রাহ্মণ ফিরলেন। ওঁর চোখে মুখে আহ্লাদ। উনি গৃহিণীকে ফিস ফিস করে বললেন ঃ রাজা খুশি হয়েছেন। এই দেখ কত অলংকার। দিয়েছেন। চুপি চুপি ভাল কোথাও লুকিয়ে রাখ।

বেদনিধির কান খাড়া হয়ে উঠেছিল। ফিস ফিস করে বললেও, উত্তেজিত ছিলেন ব্রাহ্মণ। বেদনিধি সব শুনতে পেল। মা খুশিতে উজ্জ্বল। চুপিচুপি এক জায়গায় তিনি ওগুলি রেখে দিলেন। বেদনিধি সব দেখল।

সারাদিন বেদনিধি ছটফট করল। কখন রাত্রি হয়, কখন রাত্রি হয় ! রাত্রি হবে। সবাই তলিয়ে যাবে ঘুমে। তাবপব পা টিপে টিপে· । কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! আজ অমন গয়না পেয়ে সে না জানি কত আদর করবে। আজকের রাত্রি হবে আদরের রাত্রি। বেদনিধি বিভোর হয়ে গেল।

গণিকালয়ে বেদনিধির মান আজ বর্ধিত হল। গণিকার গায়ে গয়না। আলো ঝকমক। ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে, ভালবাসায় বারবার ভেঙ্গে পড়ে অনেক মায়া ছড়িয়ে এক মায়াবিনী বেদনিধির সম্মুখে নৃত্য করল। আদরে আহ্লাদে পরিপূর্ণ রমণীয় একটি রাত্রির মৃত্যু হল।

পরদিনই রাজার প্রমোদভবনে নিমন্ত্রিত হয়ে এল সেই নর্তকী। নর্তকীর নৃত্য যেন আজ খুলেছে। শরীরে লাবণ্য, অনেকবিধ ছন্দ, তদুপরি রাজকীয় অলংকারের দ্যুতি। উজ্জ্বল আলোর নিচে নৃত্যের বোলে ভঙ্গিতে মুদ্রায় রচিত হল এক অদ্ভুত মোহ। রাজা বিমুগ্ধ, কিন্তু বেহুঁশ নন। তাঁর নজরে পড়ল সেই পরিচিত অলংকার।

বারবার তাঁর মনে সংশয় এসে দোলা দিল ঃ ব্রাহ্মণকে দিলাম, অথচ ঝলমল করছে একটা বেশ্যার শরীরে !

রাজা তলিয়ে যান উপভোগের অতলে। সংশয় এসে ঠেলে তাঁকে ভাসিয়ে তোলে। রাজা ভাবেন ঃ অত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ! তবে কি বেশ্যাসক্ত ?

রাজা তলিয়ে যান উপভোগের অতলে। আবার ভেসে উঠেন ঃ ব্রাহ্মণ কি এতই আসক্ত যে পুরস্কারের অলংকার চড়িয়ে এল গণিকার অঙ্গে ?

সহসা রাজা উপকূলের শক্ত মাটির উপর নিক্ষিপ্ত হলেন। নৃত্য বন্ধ হল। রাজা নর্তকীকে সুধোলেন ঃ কোথায় পেলে এ অলংকার ?

নর্তকী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে লাস্য বিস্তার করে রাজাকে ভোলাতে চাইল। রাজা ভর্ৎসনা করলেন। নর্তকী মিথ্যা বলল। রাজা বহু করে নরম সুরে বারবার সুধালেন ঃ কোথায় পেয়েছ ? সত্য করে বল। বলই না।

নর্তকী আনুপূর্বিক বর্ণনা করল।

রাজার মুখে চোখে যেন অনেকখানি রক্ত একসঙ্গে সঞ্চালিত হল। উনি জোর করে নর্তকীর অঙ্গ থেকে সমস্ত অলংকার গ্রহণ করলেন।

প্রভাত। প্রভাতেই রাজার তলব। ব্রাহ্মণ অনেক সংশয়ে অনেক আনন্দে দুলতে দুলতে এলেন রাজার সমীপে।

রাজার কথা শুনে ব্রাহ্মণ কেমন যেন একটু ভয় পেলেন। রাজা বললেন: একটু দরকার হয়ে পড়েছে, সেই অলংকারগুলো একবার নিয়ে আসুন।

ব্রাহ্মণ সারা পথ ভাবতে ভাবতে এলেন। কি এমন ঘটল? মাঝেমাঝেই তাঁর গলাবুক শুকিয়ে আসছিল। গৃহে এসে ব্রাহ্মণীকে বললেন: সেই গয়নাগুলো একবার নিয়ে এসো।

ব্রাহ্মণী পাশের ঘরে ঢুকলেন। খুঁজলেন। আঁতি পাতি করে খুঁজলেন। কিন্তু কোথাও নেই। এখানেই তো তিনি রেখেছিলেন। কিন্তু কোথায় গেল? তবে কি রাখেননি? রেখেছিলেন কি স্বপ্নে?

ব্রাহ্মণী চেঁচিয়ে মেচিয়ে কেঁদেকেটে বললেন: ও মা আমার কি হবে গো!

ব্রাহ্মণ সব বুঝলেন। রাজাকে এসে অকপটে সব বললেন। রাজা একটু হাসলেন। অলংকার দেখিয়ে বললেন: এই সেই অলংকার। নর্তকীর অঙ্গশোভা বর্ধন করছিল। আমি খুলিয়ে নিয়েছি।

ব্রাহ্মণ বাড়ি এসে স্ত্রীকে খুব গালমন্দ করলেন। অত অসাবধানী হয়ে মূল্যবান দ্রব্য যত্রতত্র রাখা কি উচিত? যত্রতত্র ছিল বলেই তো হতচ্ছাড়া ছেলেটা হাতিয়ে নিয়ে খারাপ মেয়েমানুষটার সঙ্গে ঢলাঢলি করে এল।

বেদনিধি বাড়ি ফিরল। পড়ল একেবারে পিতামাতার মুখোমুখি।

পিতা বললেন: দূর হ! তোর মুখদর্শনেও পাপ। যে ছেলে কুলের মুখে কালি দিচ্ছে সে ছেলেকে দূর করে দেওয়াই উচিত।

বেদনিধি বিতাড়িত হল গৃহ হতে। কোথায় যাই কোথায় যাই করে উঠল গিয়ে সেই বারাঙ্গনার আশ্রয়ে। গযনা দিয়েছিল। সেও ভালবাসা দেখিয়েছিল। গয়না খোয়া গেছে। এবার অবজ্ঞা পাবার পালা। বেদনিধি পেল, গালমন্দ খেল। তবু রইল। কোনমতে মুখ গুঁজে রাতটুকু পড়ে রইল।

রাত গেল। রাতের প্রহরে প্রহরে বেড়ে বেড়ে প্রভাতে প্রচণ্ড ক্ষুধা ও প্রচণ্ড তৃষ্ণা তাকে পাগল করে তুলল।

বাইরে সুন্দর প্রভাত। ভিতরে কাতর বেদনিধি। লোক চলাচল শুরু হয়েছে। কত লোক যাচ্ছে, আসছে। সহসা বেদনিধির চোখ চকচক করে উঠল। জিব ভিজে উঠল।

এত নৈবেদ্য ! এত উপচার ! নির্ঘাৎ খুব ধনী কেউ চলেছে কোন মন্দিরে।

বেদনিধি বেরিয়ে পড়ল। চলল পিছন পিছন। যদি কিছু মেলে।

নৈবেদ্য নিয়ে লোকজন শিবের মন্দিরে প্রবেশ করল। বেদনিধির মনে পড়ল ঃ আজ শিবরাত্রি, তাই এত সমারোহ, এত পূজা।

দিন গেল, সন্ধ্যা হল। ভীড়ের সঙ্গে মিশে বেদনিধি পূজা দেখল। পিপাসায় ক্ষুধায় বেদনিধি তখন মরিয়া ! কখন সুযোগ আসে, কখন আসে ? সে অস্থির হয়ে পড়ল।

প্রহরে প্রহরে মন্দিরে পূজা হল, নৃত্য হল, গীত হল। প্রহরে প্রহরে পূজা শেষে কেউ গৃহে গমন করল, কেউ মন্দিরেই নিদ্রিত হল।

বেদনিধি অপেক্ষায় ছিল। সবাই ঘুমিয়ে, এই অবসর। বেদনিধি পায়ে পায়ে অগ্রসর হল। শিবের সম্মুখে থরে থরে থালায় থালায় সজ্জিত বহুতর নৈবেদ্য। বেদনিধি অগ্রসর হল।

প্রদীপের সলতে পুড়ে এসেছে। স্বল্প আলো। শিবের চারপাশে অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে। থালায় থালায় কোনটায় কি রয়েছে বেদনিধি বুঝতে পারল না। পাগড়ির কাপড় থেকে সামান্য একটু ছিঁড়ে সে সলতে পাকাল। উসকে দিল প্রদীপশিখা। অন্ধকার কেটে গেল, বেদনিধির চোখেও জ্বলে উঠল ক্ষুধা, লোভ। যত পারল তত নিল। তখনো সকলে ঘুমিয়ে। বেদনিধি পুঁটলি বেঁধে গুটি গুটি বাইরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। যদি কেউ জেগে উঠে ? বুক ঢিপঢিপ করছে, চোখের তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কোনমতে শুধু একবার বেরিয়ে পড়া। তারপর অনেক স্বস্তি।

সহসা একজনের গায়ে পা লেগে যেতেই ঘুম ঘোরে কে কে বলে সে চেঁচাতে লাগল। আরো অনেকে উঠে পড়ল। রব উঠল চোর চোর।

মুহূর্তের মধ্যে বেদনিধি পড়িমরি করে ছুটল। রাজার রাক্ষীরাও ছুটল তার পিছু পিছু।

ছুটে ছুটে রক্ষীরা যখন দেখল চোর দূরে গিয়ে পড়েছে অনেক তখন তারা ছুঁড়তে লাগল তীর। কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে তীর বেরিয়ে যেতে লাগল। বেদনিধি তখন ভয়ে পাগল। সে আরও ছুটল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল না। তীরবিদ্ধ শশকের মত সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

নরলোকে এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়েছে। যমদূতেরা ছুটে এল। ব্রাহ্মণের আত্মাকে নিয়ে যাবে যমপুরে। যাবজ্জীবন ব্যাটা পাপ করেছে। যমালয়ে হবে বিচার, তারপর নেমে আসবে সমুচিত দণ্ড।

ওদিকে শিবদূতেরা ছুটে এল। নরলোকে এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়েছে।

পুণ্যবান ব্রাহ্মণ। শিবব্রতে শুদ্ধ হয়েছে ব্রাহ্মণের স্বত্ত।

যমদূত ও শিবদূত। একেবারে মুখোমুখি।

যমদূতেরা হেঁকে বলল ঃ যাবজ্জীবন যে শুধু পাপ করেছে তাকে নিতে তোমরা কেন ?

শিবদূতেরা বলল ঃ শিবের ব্রত করেছে, ওর আর পাপ নেই। সমস্ত পাপ পুড়ে ছাই।

যমদূতেরা শিবদূতের কথায় বিশ্বাস করল না। বিবাদ করল। অবশেষে পরস্পরে মিলে এল যম সমীপে।

যম বললেন ঃ তোমরা নিবৃত্ত হও। শিবদূতেরা যথার্থ বলেছেন।

যম শিবদূতগণকে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণকেও প্রশংসা করে রাজা করে দিলেন কলিঙ্গ দেশের।

বেদনিধি হল কলিঙ্গের রাজা। এই জন্মই তার শেষ জন্ম। পূজায় পূজায় এই জন্মেই সে লাভ করল মুক্তি।

না জেনে না শুনে পাকেপ্রকারে নিতান্ত অযত্নভরে পরম পাপী বেদনিধির করা হল শিবের ব্রত। তারই এমন আশ্চর্য ফল। না জানি জেনে শুনে ভক্তি ভরে করলে লাভ হয় কি না কি পরম ফল ।।

৩৭. কে বড়

মহারাজ বলি ত্রিলোক জয় করলেন। বিষ্ণু গেলেন তাঁরও উপর দিয়ে। তিনি প্রভাব ছড়ালেন। বলি বদ্ধ হলেন। বিষ্ণু হলেন ত্রিলোকের অধীশ্বর।

দৈত্যেরা ভীত হল। প্রভাব ছড়িয়েছেন, কিন্তু কি এমন প্রভাব ? দৈত্যদের মনে ত্রস্ত কৌতূহল। প্রহ্লাদ প্রমুখ নামী সব দৈত্য। তাঁরা এলেন। বিষ্ণুর মহিমা দর্শনের জন্য তাঁরা এসে ক্ষীর সাগরের তীরে সমবেত হলেন। সিদ্ধরা এসেছেন, সাধ্যরা এসেছেন, গন্ধর্ব বিদ্যাধর নাগ নদী পর্বত ব্রহ্মর্ষি সবাই এসেছেন। এমনকি অপ্সরারাও এসেছেন ভীড় করে। ক্ষীর সাগরের তীরে যেন মেলা বসেছে। বিষ্ণুকে ওঁরা দেখলেন, স্তব করলেন। বললেন ঃ আপনি আছেন, ত্রিলোক আছে। নতুবা ভেসে যেত কবে। আপনি আছেন, কল্যাণের আলোয় ত্রিলোক তাই নিত্য বিধৌত। সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, অবশেষে দুহাতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন রেণুরেণু কল্যাণাশিস্।

বিষ্ণু বললেন ঃ একদা ব্রহ্মা এই চরাচর সৃষ্টি করেছেন। মহাদেবের প্রসাদ পেয়ে তিনি স্রষ্টা হয়েছিলেন। আমিও মহাদেবের প্রসাদ পেয়েছি। অর্জন করেছি শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব। প্রলয়ের সময় অকথ্য অন্ধকারে চরাচর আবৃত

হয়েছিল। সেই সময় সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে শুধু আমি রইলাম। সহস্র মস্তক, সহস্র লোচন, সহস্র পদ। হাতে শঙ্খ চক্র ও গদা। আমি রইলাম। বিজন অন্ধকারে একা আমি রইলাম। সাগরের জলে আমি শয়ন করে রইলাম।

বিজন অন্ধকারে সাগরজলে শয্যা পেতে আমি শুয়ে আছি। দেখলাম সম্মুখে এক মহান্ত পুরুষ। পরনে কৃষ্ণসারের চর্ম, হাতে কমণ্ডলু। জ্যোতির্ময় সেই পুরুষই ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা এগিয়ে এলেন। বললেনঃ সাগরের জলে শুয়ে আছ, কিন্তু কি কারণে? বল। আমি সমস্ত লোকের কর্তা, সর্বব্যাপী। আমি অনাদিদেব। অতএব উত্তর দাও। দেরি কর না।

আমি বললাম, সৃষ্টি করি পালন করি আবার সংহারও করি। আমি জগতের প্রভু নারায়ণ।

আমরা উভয়েই সেই সময় বাদ ও বিতণ্ডায় মত্ত হলাম। অকস্মাৎ উত্তরের আকাশ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দেখলাম তেজের এক মহাপিণ্ড। তেজের সেই পিণ্ড ব্যাপ্ত হয়েছে স্বর্গ ও মর্ত্যে।

বাদ ও বিতণ্ডা দূর হল। বিমুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে অপলকে সেই দিকে আমরা তাকিয়ে রইলাম।

আমরা তাকিয়ে আছি। কতক্ষণ ছিলাম জানিনা। নজরে পড়ল জ্যোতির সেই ব্যাপ্ত পিণ্ডের মধ্যে এক লিঙ্গ। দ্বাদশ অঙ্গুলি তার পরিমাপ। অথচ তাকিয়ে থাকা যায় না, ভাবা যায় না, এমন তেজ। শত শিখা নির্গত হচ্ছে লিঙ্গের সেই অঙ্গ থেকে। আমরা স্তম্ভিত, বিমূঢ় ও বিস্মিত। আমরা তাকিয়ে রইলাম।

ব্রহ্মা বললেন, এর আদি দেখছি নে, অন্তও না। এস সন্ধান করি। তুমি নিচের দিকে দেখ, আমি যাই উপর পানে। দেখি পাই কিনা এর আদি ও অন্ত।

ব্রহ্মা যোগের আশ্রয় নিলেন। মনের মত গতিতে তিনি ঊর্ধ্বে ধাবিত হলেন। আমিও মনের বেগে অধোদেশ সন্ধানে যাত্রা করলাম।

হাজার হাজার বছর পেরুল। কিন্তু আদি মিলল না, অন্তও নয়। আমি শ্রান্ত হয়েছি, ব্রহ্মাও। উভয়ে ব্যর্থ শ্রমে শ্রান্ত হয়ে সেই সাগর জলে এসে আবার মিললাম।

শক্তিতে আমার তুল্য কেউই না, ব্রহ্মার তুল্যও কেউ না। সেই আমরা ভয় ও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথা যেন শূন্য হয়েছিল। চিন্তায় কেউই পারলাম না কুলিয়ে উঠতে।

ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হলেন। বুঝলেন ইনি কারণেরও কারণ। আপাতত রূপ

নিয়েছেন লিঙ্গের। ব্রহ্মা গদগদ কথায় স্তবের অঞ্জলিতে তাঁকে পূজা করলেন।

মহাদেব ধীরে ধীরে প্রকটিত হলেন। উদ্ভাসিত এক মূর্তি জেগে উঠল আমাদের সম্মুখে। দেখলাম কোটি সূর্যের প্রভায় মণ্ডিত এক অপরূপ পুরুষ। মণিরত্ন অলংকারে অনুলেপনে সজ্জিত সেই পুরুষ। হাতে পিনাক, পট্টিশ, বজ্র ও শূল। সর্পে রচিত উপবীত। পরণে চীরবস্ত্র।

তিনি কথা বললেন। দুন্দুভির ধ্বনিতে তাঁর কথা ভেঙ্গে পড়ল। তিনি অট্টঅট্ট হেসে উঠলেন। সেই হাসিতে সেই বিজন সমুদ্র কেঁপে উঠল। কোটি বজ্র যেন একসঙ্গে ফেটে পড়ল। মহাদেব কথা বললেন। বললেন, ভয় নেই। চেয়ে দেখ, ভয় নেই। তুমি ব্রহ্মা। তুমি আমার ডান হাত। তুমি বিষ্ণু। আমার বাঁ হাত। তোমরা আমার পুত্র। আমি এসেছি। এবাব বর প্রার্থনা কর।

আমরা উভয়ে যেন প্রাণ পেলাম। প্রার্থনা করলাম, অন্য কিছু নয়, ভক্তি—অচলা ভক্তি। মহাদেবে আমাদের ভক্তি যেন অচলা হয়। প্রার্থনা করলাম, মাত্র এই ভক্তি ॥

৩৮. নিয়মী ব্রাহ্মণ

সংশয় বিস্তারিত হয়েছে পার্বতীর চিত্তে। পার্বতী ব্যাকুল।

নিয়ম পালনে কি ফল উপজাত হয়? এই প্রশ্নে পার্বতীর চিত্ত সংশয়িত, আলোড়িত। এই প্রশ্নই তাঁর অন্তরকে শরের মত বিদ্ধ করছে অবিরত। তিনি কাতর।

কাতর পার্বতী মহাদেবের শরণ নিলেন। বললেনঃ আপনি আমার নাথ। আপনি সর্বজ্ঞ। আমার প্রতি আপনার প্রেমও অনির্বচনীয়। অতএব বলুন। সংশয় নিরসন করুন। পুঞ্জ পুঞ্জ হিম জাল বিস্তার করে। চরাচর আচ্ছন্ন হয়। সূর্যদেব কিরণ বর্ষণ করেন। চরাচর উদ্ভাসিত হয়। আমার চিত্তও হিমে হিমে আচ্ছন্ন, আবৃত। আপনি সূর্য হোন, আমি উদ্ভাসিত হই।

মহাদেব বললেনঃ নিয়মের আচরণ সহজ নয়। কিন্তু করলে তার ফল বড় অপূর্ব। মানুষের জীবনে সুখ আছে, কিন্তু তা ক্ষণিকের। জীবন বুদ্‌বুদের মত। এই আছে, এই নেই। নিয়মের অনুষ্ঠান দুষ্কর, কিন্তু শ্রেয়। যে সব মানুষ লোভী, যে সব মানুষ ধর্মকে দ্বেষ করে তারা আপাত সুখকেই বড় বলে মানে। আপাত দুরূহ অথচ পরিণামে অশেষ সুখপ্রদ এমন কর্মকে এরা আমল দেয় না। দেবতারা নিয়ম আচরণ করেন, তাই তাঁদের

দেবত্ব। আকাশের পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তাও নিয়মের প্রসাদে। অগ্নি জ্বলেন, সূর্য আলো ঢালেন, বায়ু প্রবাহিত হন—পশ্চাতে এই নিয়মের আচরণ। এমনকি এই তুমি যে শক্তিতে আমাকে পতিরূপে লাভ করেছ তাও উপজাত হয়েছে ঐ নিয়মের অনুষ্ঠান থেকে।

অতঃপর মহাদেব পার্বতীকে বললেন ঃ একজন লোক নিয়মী হয়ে কি অপূর্ব ফল পেয়েছিল সেই বৃত্তান্ত তোমাকে বলছি, শোন ঃ

নামেই ব্রাহ্মণ, কাজে কদাপি নয়। কাশীধামে এই রকম এক ব্যক্তি বাস করত। চেহারায় কুৎসিত, স্বভাবেও তাই। কাজের ছিল না কোন। কিন্তু নৃশংসতায়, পরের দ্রব্য অপহরণে ছিল পরম নিপুণ। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, কিন্তু ব্রাহ্মণের আচরণ সে ত্যাগ করেছিল। নিত্যমুখর তার রসনা। মুখর আত্ম-প্রশংসায়, মুখর পরনিন্দায়। বেদের নিন্দাও উচ্চারিত হত তার পাপমুখে। দেবগণ তাকে ধিক্কার দিতেন। ব্রাহ্মণ, কিন্তু নিতান্তই নামে। আসলে পরম অপবিত্র। তাই পরদ্রব্যে তার লোভ, বর্ণবৈষম্যে অশ্রদ্ধা, দেবদ্বিজে ঘৃণা, ওঙ্কার উচ্চারণে ক্লান্তি।

বাড়িতে সর্প নিয়ে স্বস্তিতে কেউ বাস করতে পারে না। ব্রাহ্মণ মূর্ত অস্বস্তি। তাই তার সঙ্গ সবাই পরিহার করত।

জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করত না। তাই তার অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। দাঁত নেই এমন যে সর্প, শিঙ নেই এমন যে বৃষ, পক্ষ নেই —পক্ষী, পুষ্প নেই—বৃক্ষ ঃ এদের মান নেই কোথাও। কাশীধামে ঐ ব্রাহ্মণের অবস্থাও হল অমনি। সবাই তাকে পীড়িতই করত, প্রীত করত না কখনোই।

একানব্বই বৎসর অতিক্রান্ত হল। দিকে দিকে কত পরিবর্তনের তরঙ্গ উঠল, পড়ল। কিন্তু ব্রাহ্মণ যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। অসৎ ছিল, অসৎই রয়ে গেল।

অম্বুজপদ। পূজনীয় এক সিদ্ধ। সিদ্ধ গন্ধর্ব নিত্য তাঁকে বন্দনা করেন। অম্বুজপদ এলেন কাশীক্ষেত্রে। মহাদেবকে তিনি দর্শন করবেন।

কাশীর মৎস্যোদরীর তট। পঞ্চায়তন। সেখানে ওঙ্কারনাথের বাস। অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হয় ওঙ্কারনাথের দর্শনে। প্রদক্ষিণে বারবার জন্ম নিতে হয় না ধরায়। পরম পবিত্র এস্থান। দেবতারাও এখানে বিহার করেন।

অম্বুজপদ এসেছেন এখানে। পরমসিদ্ধ অম্বুজপদ। নিজের রূপ ছেড়ে বিকৃতরূপ ধরেছেন তিনি। ভ্রমণ করছেন পঞ্চায়তনে।

ব্রাহ্মণকুলে নিত্য কালি দিচ্ছেন যিনি সেই ব্রাহ্মণও ছিল ধারেকাছে। সে দেখল অম্বুজপদকে। বিকৃতাঙ্গ অম্বুজপদ তার উপহাসের পাত্র হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে সে রীতিমত সম্মান দেখাল অম্বুজপদকে। বলল ঃ আহা চোখ জুড়িয়ে যায়। দিব্যকান্তিতে আপনি বিভূষিত, মনোহর। নিশ্চয়ই স্বর্গ থেকে

আপনার আগমন। এক অঙ্গে এত কান্তি! এতো পৃথিবীর ব্যাপার নয়। আপনি স্বর্গবাসী, মর্ত্যে এসেছেন, কিন্তু কি অভিলাষে?

সিদ্ধ অম্বুজপদ বললেনঃ আপনার অনুমান যথার্থ। স্বর্গে আমি বিশেষ পরিচিত। আপনার কি সুধাবার আছে কিছু?

ব্রাহ্মণ বললঃ স্বর্গে বাস! অপ্সরাশ্রেষ্ঠ রম্ভাকে নিশ্চয়ই চেনেন?

ঃ অবশ্যই, সম্যক প্রকারে।

ঃ স্বর্গে আপনার বাস। স্বর্গের কে না চাঁদের মত রমণীয় রম্ভাকে জানে? আপনি আবার যখন স্বর্গে যাবেন তখন আমার হয়ে সেই অনিন্দ্যনীয়ার কুশল জিজ্ঞাসা করবেন।

ঃ যদি তাঁকে দর্শন করতে স্বর্গে যাই তাহলে অবশ্যই আপনার কথা মনে রাখব।

অম্বুজপদ স্বর্গে এলেন। বায়ুর মত তাঁর গতি। মুহূর্তের মধ্যে তিনি স্বর্গনগরীতে এসে উপস্থিত হলেন। কমনীয় স্বর্গনগরী, কমনীয় রম্ভা। রম্ভা আকাশ থেকে বহির্গত হচ্ছেন, যেন চন্দ্রকলা। অম্বুজপদ তাঁর সমীপবর্তী হলেন। রম্ভাকে তিনি দেখলেন, যেন নতুন করে। এ তো রম্ভা নয়, লক্ষ্মী, পদ্ম নেই এই যা। অম্বুজপদ দেখলেন, দেখতে থাকলেন। রম্ভার বদনমণ্ডলে পূর্ণিমার চাঁদ, অঙ্গে স্বয়ং অনঙ্গদেব। প্রশস্ত বক্ষ স্থল, তদুপরি দুটি নিটোল গজকুম্ভ, মনোহর নিতম্বপ্রদেশ। অম্বুজপদ দেখলেন। হাতে বীণা। রম্ভা চলেছেন। চরণযুগলে পূর্ণপ্রস্ফুটিত রক্তপদ্মের আভা।

অম্বুজপদ জিজ্ঞাসা করলেনঃ এক ব্রাহ্মণ। বারাণসীতে বাস। তোমার কুশল সুধিয়েছেন। তুমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত?

রম্ভা বললেনঃ সে রকম তো কেউ নেই। কৈ মনে তো পড়ছে না। না না ওরকম কারো সাথে কোন সম্পর্ক আমার নেই।

সিদ্ধ বললেনঃ ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।

অম্বুজপদ বারাণসীতে এলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখল। বললঃ দর্শন পেয়েছেন? উত্তরে কি বললেন তিনি?

সিদ্ধ বললেনঃ বহুক্ষণ চিন্তা করে অবশেষে হেসে রম্ভা বললেন যে তিনি এরকম কাউকে চেনেন না। নামও শোনেননি কখনও।

ব্রাহ্মণ বললঃ আপনি গিয়ে বলুন যে রম্ভা ব্রাহ্মণকে জানেন না এ তো বড় বিস্ময়ের কথা।

সিদ্ধ পুনর্বার স্বর্গে এলেন। সম্মুখে রম্ভা। বললেনঃ সে ব্রাহ্মণ তোমার পরম প্রিয় অথচ তুমি তাকে সমাদর করনা। এর কারণ কি? সেই ব্রাহ্মণ এই কথার উত্তর প্রার্থনা করেন।

স্মিত হেসে রম্ভা বললেনঃ ব্রাহ্মণকে নিয়ম করতে বলবেন। নিয়ম করলে

স্বর্গে আসা সম্ভব হবে, আমার কাছে তাঁর আত্মজ্ঞাপনের ইচ্ছাও পূর্ণ হবে।

রম্ভা সিদ্ধ অম্বুজপদকে নমস্কার করে নন্দনকাননে প্রবেশ করলেন।

অম্বুজপদ আবার কাশীধামে এলেন। বললেনঃ যদি রম্ভার কাছে আত্মজ্ঞাপনের ইচ্ছা থাকে তাহলে নিয়ম করুন।

ব্রাহ্মণ বললঃ আজ পাষাণ ভোজন করব না। এবার স্বর্গে গেলে রম্ভাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে ব্রাহ্মণ পাষাণ ভোজন করে না তার কথা কি তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত?

সিদ্ধ আবার স্বর্গে এলেন। আবার রম্ভার সম্মুখবর্তী হলেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রাহ্মণ নিয়ম করা শুরু করলেন। রম্ভাও তাঁর কথা মনে ভাসিয়ে তুলতে থাকলেন।

প্রদীপের আলোয় অন্ধকারের আবরণ অপসৃত হয়। ব্রাহ্মণ নিয়ম করলেন। অপূর্ব তার প্রভাব। সমস্ত বস্তুর উপর থেকেই অন্ধকারের আবরণ খসে পড়ল, পড়তে থাকল। কেউ প্রীতি করত না। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিয়মী হয়েছেন। হয়েছেন সবার প্রিয়, প্রাণপ্রিয়। নিয়মী ব্রাহ্মণ। জ্যোতির্ময় ব্রাহ্মণ। অবশেষে পরিগ্রহ করলেন উদ্ভাসিত এক জন্ম। গতি হল ব্রহ্মলোকে।

মহাদেব এবার পার্বতীকে বললেনঃ নিয়ম করল, তাই স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের মত সুখ করল। নিয়মের উপাসনাতেই মানুষের জীবনে স্বর্গ হয়ে উঠে সত্য ও অনিবার্য॥

৩৯৹ চন্দ্রশেখর

পার্বতী বললেনঃ চন্দ্রের মত শুভ্র আপনার কান্তি। আপনার মস্তকে চন্দ্র, আপনি চন্দ্রশেখর। দেহের এক অর্ধে আমাকে ধারণ করেছেন। আর মস্তকে অর্ধচন্দ্র। চন্দ্রের এই মহাসম্মান! কেমন করে এটি সম্ভব হল—এই প্রশ্নই বারবার আমাকে কৌতূহলে আক্রান্ত করছে। বিষয়টি গোপনীয়। কিন্তু আমি আপনার সহধর্মিণী। অতএব দয়া প্রকাশ করুন। পরাক্রান্ত কৌতূহল নিরসন করুন।

মহাদেব শুনলেন। প্রেমাবিষ্ট হলেন। আলিঙ্গন দান করলেন পার্বতীকে। বললেনঃ শোন—

তুমি সতীরূপ পরিত্যাগ করলে। আমি কাতর হলাম। বিরহ-কাতর। নির্বেদ উপস্থিত হল। বনে বনে বাসই হল সুখের! বনে বনে ভ্রমণ করতে থাকলাম। মনে মনে ইচ্ছা তপস্যা করব। গুহায় গুহায়, নদীর তীরে তীরে,

বৃক্ষের মূলে মূলে, বনে বনে বিচরণ করি। পদ্মে পদ্মে শোভিত জলাশয়। তার সমীপে নিবাস করি।

তপ চলল। কঠোর সে তপ। বিকীর্ণ হত অসীম তেজ। যেখানে বাস করতাম সেখানেই অগ্নি ব্যাপ্ত হত। সমস্ত ভস্মীভূত হত। কত শত বৃক্ষ দগ্ধ হল, পর্বত দগ্ধ হল। কখনো পর্বতের শৃঙ্গ ধূমে আচ্ছন্ন হত, কখনো জ্বলত অনন্ত তেজ বিস্তার করে।

চন্দ্রের প্রভা হীন হল, সূর্যের দীপ্তি ম্লান হল, গ্রহমণ্ডলও হল নিষ্প্রভ। যম লোকসমূহের নিয়ন্তা। কিন্তু তিনিও যেন জরায় আক্রান্ত হলেন। ত্রিলোকের হাল হল অত্যন্ত মন্দ।

দেবতারা বিচলিত হলেন। দেবতারা এলেন। সঙ্গে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা। আমার তেজে আকীর্ণ মন্দর পর্বত। তাঁরা এলেন তার চূড়ায়।

ইন্দ্র বললেন ব্রহ্মাকে ঃ কে কি মহাশক্তির প্রভাবে সমস্ত কিছু এভাবে উত্তপ্ত করছেন, পীড়িত করছেন? এর প্রশমন কি সম্ভব নয়? যদি সম্ভব তাহলে উপায় বলুন।

জলভরা মেঘ যেন গর্জন করে উঠল। গম্ভীর এক ধ্বনি আকাশে বাতাসে বিস্তারিত হয়ে কাঁপতে থাকল। ব্রহ্মা বললেন ইন্দ্রকে।

ব্রহ্মা বললেন ঃ এ তেজ মহাদেবের। তাঁর বিক্রম জানি এমন ক্ষমতা আমার নেই। তাঁর সম্মুখে আমরা নিতান্তই তুচ্ছ। জগতের হিত চাই। হিতকর কাজই আমি করব।

মহাদেব চন্দ্রশেখর। চন্দ্র নেই শিখরে। তাই তাঁর এত অশান্তরূপ। অতএব চন্দ্রকে ঐ দেবদেবের মস্তকে সংস্থাপন কর। মহাদেব শান্ত হবেন। সমস্ত দহন নিবারিত হবে। পত্নী নেই, মহাদেব প্রদীপ্ত অগ্নির দহন বিস্তার করেছেন। মস্তকে চন্দ্র সংস্থাপিত হবে, সমস্ত তেজ সংহৃত হবে। চন্দ্রলাভে তুষ্ট হবেন মহাদেব। আমাদের কার্যও সিদ্ধ হবে। মহাদেব শান্তি লাভ করবেন, ত্রিলোক স্নিগ্ধতায় আবৃত হবে।

দেবতারা ব্রহ্মার কথা রক্ষা করলেন। অমৃতে পূর্ণ হল, বিষে পূর্ণ হল। অমৃতকুম্ভ, বিষকুম্ভ। কুম্ভে কুম্ভে বিগলিত চন্দ্র।

দেবতারা চললেন। সঙ্গে ব্রহ্মা। দুটি কলস। এক হাত উঁচু। একটিতে অমৃত, অন্যটিতে বিষ। কলস থেকে মন্দ মন্দ গন্ধ উত্থিত হতে লাগল। ফুল ও চন্দনের গন্ধে চতুর্দিক পরিপূরিত হল। দেবগণের চিত্ত প্রসন্নতায় সংবিষ্ট হল।

ব্রহ্মা আমাকে বললেন ঃ গ্রহণ করুন। এক কুম্ভে বিষ, অন্যে অমৃত। গ্রহণ করুন। আপনার ঐশ্বর্য প্রকটিত হোক। দেবতারা দর্শন করুন। নয়নমন সার্থক করুন।

আমি গ্রহণ করলাম। প্রথমে অমৃতকুম্ভ। আমার মস্তকে চন্দ্র সংস্থিত হলেন। একটি বঙ্কিম রেখায় চন্দ্র আমাকে শোভিত করলেন।

বিষকুম্ভ গ্রহণ করলাম। মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করলাম, গ্রীবা দেশে লেপন করলাম। গ্রীবা হল নীল। শিখরে চন্দ্র, তাই আমি চন্দ্রশেখর। কণ্ঠে বিষ, তাই নীলকণ্ঠ। সেই থেকে চন্দ্র ও বিষ হল আমার শরীরেরই অঙ্গ।

জলে পৃথিবীর ধূলি মরে। শিরে চন্দ্র। আমার তেজও হল প্রশমিত। সেই থেকে দেবব্যাপারে আমি সৌম্য। নামে শিব, কাজেও শিব হলাম এবং দেখতে হলাম আগের চেয়ে অনেক সুন্দর, পরম সুন্দর ॥

৪০. ভস্মভূষণ ও পর্ণাদ

পার্বতী ও মহেশ্বর।

পার্বতী বললেন ঃ আমার অশেষ পুণ্য। তাই এমন পতি। দেবগণের পতি মহাদেব। আমার পতি সেই দেবপতি। শ্মশানে শ্মশানে প্রমথগণের সঙ্গে আপনি নৃত্য করেন। আপনার ঐশ্বর্যের অন্ত নেই। অণিমাদিতে নিত্য ভূষিত। বিভূতি আপনার ভূষণ, অথচ ভূতি ও ধূলি লেপনে পরম অনুরাগ। চন্দন রয়েছে, কত শত অনুলেপন রয়েছে। কিন্তু আপনি অঙ্গে লেপন করেন ধূলি ও ভস্ম। এমনকি আমার থেকেও প্রিয় আপনার ভস্ম। জানতে ইচ্ছে করে কোত্থেকে এল এই ভস্ম? কেমন করে কেড়ে নিল দেবাদিদেবের মন?

মহাদেব বললেন ঃ ভস্ম আমার অনুলেপন। অকারণে নয়। পিছনে রয়েছে এক কাহিনী। শোনাই, শোন ঃ

ব্রাহ্মণ। মহা তেজস্বী। জন্ম ভৃগুবংশে। ব্রাহ্মণ তপস্যা শুরু করলেন। অতি কঠোর সে তপস্যা। গ্রীষ্ম ঋতুতে চতুর্দিকে অগ্নির কুণ্ড জেলে মাথার উপর প্রচন্ড তাপ সয়ে তিনি তপস্যা করেন। দুরন্ত শীত। হিমশীতল জলের মধ্যে শয়ন করে তিনি তপস্যা করেন। বর্ষায় মাথার উপর দিয়ে বয়ে যেত বৃষ্টি আর বৃষ্টি। খোলা আকাশের তলে অশেষ কষ্ট সয়ে ব্রাহ্মণ তপস্যা করেন, করে চলেন। দিন যায়। ক্ষুধার উদ্রেক হয়। চতুর্থ দিন, পঞ্চম দিন, ষষ্ঠ, সপ্তম বা দশম দিনে তিনি আহারের চেষ্টা করেন। দুটি একটি কথা বলেন। ভল্লুক, শরভ, সিংহ, শৃগাল বনে বনে ছোটে। ফল সংগ্রহ করে। এনে উপস্থিত করে তাঁর সম্মুখে। তপের প্রভাব—বাঘ-গোরু, সিংহ-মৃগ—এদের চিরাচরিত বৈররীতিও লুপ্ত হয়েছিল। বাঘ অহিংস, সিংহও তাই।

তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তপে তপে ব্রহ্মর্ষি। তপস্যার তেজ, অগ্নিও যেন হার মানে। লোকসমূহ সন্তাপিত হতে লাগল।

তপস্বী। আহার্য শুধু শাক। সঙ্গে লবণও নয়। শাক মাত্র। লোকে জানল তিনি পর্ণাদ। আহার করেন মাত্র পর্ণ। লাভ করেন উত্তম উত্তম সামগ্রী আহারের পরম তৃপ্তি।

বহুদিন পেরিয়ে গেল। একদিন তাঁর মনে চিন্তা হল। তপস্যা করছেন। ক্লান্তি মানছেন না, শ্রান্তিও না। অবলম্বন মাত্র সত্য ও ধর্ম। কিন্তু কি করে বুঝবেন যে তিনি শুচি ও শুদ্ধ হয়েছেন? অন্তঃস্থল থেকে উত্তর উত্থিত হলঃ যেদিন রক্ত হবে শাকের রসের মত বিবর্ণ সেদিনই বুঝা যাবে সমস্ত কলুষ তাঁর অপগত হয়েছে।

একটি দিন এল। মহাদিন। রক্তের মত লাল কুশ। চিরে চিরে তিনি রাখছিলেন। ধর্মের কাজ হবে। কুশ চিরে চিরে তিনি রাখছিলেন। রক্তের দণ্ড চিরে চিরে তিনি রাখছিলেন।

কুশের ধারাল ডগা। আকস্মিক ভাবে তাঁর মধ্যমাটি ছিন্ন হল। রক্ত পতিত হল। তপস্বী সবিস্ময়ে দেখলেন। তাকিয়ে রইলেন। রক্ত নয়, শাকের রস। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের ঘোর। বিকট হাসিতে ফেটে পড়ে প্রবল আবেগে নৃত্য করতে করতে আনন্দধ্বনি করতে থাকলেন তিনি। বিকট গর্জনের মত সে ধ্বনি বাতাসে কাঁপতে থাকল। অনুগত মৃগদল ভীত হল, ত্রস্ত হল। ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা পলায়ন করল। সিংহ দেখেও হয়ত এত ভীত তারা হয় না। তারা ছুটে পলায়ন করল। যেদিকে পারল সেদিকে।

মহাদেব বলে চললেনঃ আমার মনে হল ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্ত হয়েছেন। অবশেষে কি উন্মাদ হবেন? আমি ব্রাহ্মণের বেশ নিলাম। তাঁর সম্মুখবর্তী হলাম। বললাম, হে পর্ণাদ আমি এসেছি। কিন্তু পর্ণাদ বধির হয়েছেন। নৃত্য ও গর্জন যেমন চলছিল চলতে থাকল। বনভূমি প্রকম্পিত হতে থাকল। আমি তাঁর আরো নিকটবর্তী হলাম। নৃত্য বন্ধ হল। আমি তাঁর হাত ধরলাম। বললামঃ এ কি? হঠাৎ এ ভাব কেন? এ আচরণ কেন? চন্দ্রের থেকে তো অন্ধকার জন্মে না। তোমার এ আচরণ ও মনোভাব অত্যন্ত অনুচিত। (নিজের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে তপস্যার ফললাভ একবিন্দুও হয় না। অতএব সুস্থ হও। এতদিনের তপস্যা মাটি করনা। চন্দ্র কখনো বলেন না যে তিনি সুন্দর, সূর্য কখনো অহংকার করে বলেন না যে তিনি মহা তেজস্বী, অগ্নিও কি তাঁর ক্ষমতার বড়াই করেন? করেন না। বোঝেন, তাই করেন না। তপস্যায় তুমি নির্মল হয়েছ। আত্মপ্রশংসায় মুগ্ধ হলে সে নির্মলতায় কালি পড়ে। অতএব সুস্থ হও। অহংকার ত্যাগ কর)

পৃথিবী শরীররূপিণী। আত্মা ও এ এক নয়। এতে বহু রস। তোমার শরীর থেকে শাকের রস নির্গত হয়েছে। বিস্ময় মেনো না এতে। পৃথিবীতে কত শত বড় বড় তপস্বী আছেন। তুমিই একমাত্র নও। অতএব অভিমান

পরিত্যাগ কর।

আমার শরীরও তপে তপে নির্মল হয়েছে। তৃণ দগ্ধ হলে ভস্মে পরিণত হয়। আমার শরীর থেকে সেই ভস্ম নির্গত হয়। দেখ।

আঙ্গুল দ্বারাই মধ্যমাটি ছিন্ন করলাম। ভস্ম বিনির্গত হতে থাকল। যেন যজ্ঞের সুধাধারা।

মুনি বিস্ময়ে হতবাক হলেন। অবশেষে বললেনঃ আপনি কে? আমার প্রচণ্ড অহংকার প্রশান্ত করেছেন এবং করেছেন নিজ তপের প্রভাবে। আপনি কে?......অপূর্ব আপনার তপস্যা। আমি বহুকাল ধরে মহাদেবের তপস্যা করছি।...আপনিও নিশ্চয় করেছেন। দর্শনও পেয়েছেন তাঁর। সর্বজ্ঞ তপস্বী, বলুন আমি কবে দর্শন পাব?

আমি নিজরূপে প্রকটিত হলাম। পর্ণাদ বিমূঢ় হলেন। পদতলে পতিত হলেন। অতঃপর তাঁর স্তবে সংস্তুত হলাম।

আমি প্রসন্ন হয়ে বললামঃ তুমি আমার প্রিয়তম গণাধিপতি হবে।

সেই থেকে ভস্ম আমার অনুলেপন হয়েছে। ভস্মই আমার কান্তিতে দিব্যতা সঞ্চার করে। ভস্মস্নানেই আমার পরম পরিতোষ।

গঙ্গাস্নানে যে পুণ্য ভস্মস্নানেও তাই। পুষ্কর, প্রভাস ও সপ্তমক তীর্থে স্নান করলে যে পুণ্যের সঞ্চয় ভস্মস্নানেও তাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, শক্র, যম, অগ্নি, বরুণ পূজ্য। ভস্মস্নান করেই তাঁরা পূজ্য। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, ঊনপঞ্চাশ বায়ু এবং দুই অশ্বিনীকুমার—এঁরা দেবতা। এঁদের দেবত্বও এই ভস্মস্নানেই অর্জিত।

ভস্মই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ভস্মস্নানেই সর্ববিপদ থেকে পরিত্রাণ।

পর্ণাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। তাই ভস্মে আমি নিত্য অঙ্গ লিপ্ত রাখি॥

৪১. শ্মশানচারী

মানুষের মৃত্যু হয়। গতি হয় শ্মশানে। শ্মশান। অতি ঘোরতর এক স্থানের নাম। শব দাহ হয়। ধূমে ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন হয়। যারা দাহ করে তাদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। চোখে প্রচণ্ড জ্বালা। চোখ গাঢ় লালে বীভৎস হয়। একটি নয়, দুটি নয়, বহু বহু চিতা। পরপর একের পর এক চিতা জ্বলছে। শব পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে। জীবনের সায়াহ্ন বেলার ছবিটি শ্মশানে। এ দিকে ও দিকে সিদ্ধচারণগণ। এদিকে ওদিকে শিরা, উপশিরা, গলিত মাংস, রক্ত। বাতাস দুর্গন্ধে ভারাক্রান্ত। প্রেতে প্রেতে, ভূতে ভূতে

ভয়ংকর শ্মশান। শিয়াল চিৎকার করছে, ছুটে পলায়ন করছে, একে অন্যকে আক্রমণ করছে। জড়াজড়ি, হুটোপাটি, চিৎকার। শত শত কাকের উল্লাসধ্বনি, পেচকের কর্কশ বীভৎস সংকেত। মাংস গন্ধে উন্মত্ত বহু শত কুকুর, তাদের উন্মত্ত প্রতিযোগিতা। ভয়ানক শ্মশানভূমি। দর্শনে বীভৎস, শ্রবণে ভয়ংকর, ঘ্রাণে পরম ঘৃণ্য। ভয়ংকর, বীভৎস, ঘৃণ্য শ্মশানভূমি।

এই শ্মশানে শিবের বাস। ঘোর রাত্রে মরার মাথাব খুলিতে চিতার আগুনে মহিষ পাক করতে করতে তিনি নৃত্য করেন। শিব নৃত্য করেন; সঙ্গে শ্মশানের বাতাসে ফেটে পড়ে তাঁর অট্টহাসি। শিব নৃত্য করেন। অট্টঅট্ট হাসিতে চতুর্দিকে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেন। শিব শান্ত। কিন্তু শ্মশানে তিনি উন্মত্ত। শ্মশানে তাঁর শয়ন। উন্মত্তের মত সন্ত্রাসে সন্ত্রাসে আকাশে বাতাসে লক্ষকোটি বিমূঢ়তা সঞ্চারিত কবতে করতে দানবদের নিহত করে শিব শ্মশানে শয়ন কবেন।

দুর্গা বিস্মিত। দুর্গা বিমূঢ়। শিব শান্ত। শিব প্রভুদেরও প্রভু। তথাপি তাঁর এরকম আচরণ। দুর্গার মনে সংশয়। এ কাজ হয়ত সাজে না শিবের। তাই উচিত নয় হয়ত।

পিণ্ডদান করা হচ্ছে। কুশেকাশে, ছিন্ন যজ্ঞসূত্রে, মুষলে, উদূখলে সমাকীর্ণ স্থান। চিতা জ্বলছে। একের পর এক চিতা জ্বলছে। ঘৃত আহুত হচ্ছে। চিতার আগুন আকাশ আক্রমণে উদ্যত হচ্ছে। এখানে মৃতের খাটবালিশ, ওখানে কুলো খোন্তা। এখানে ছেঁড়া কাপড়চোপড়, ওখানে ফাটা বালিশের তুলো। এখানে মরা মানুষের চুল, ওখানে মৃত পশুর চামড়া।

ভয়ানক শ্মশান। এখানে মানুষ আসে না। আসতে ভীত হয়। রৌদ্র, অদ্ভুত, বীভৎস এই তিন মিশে অন্যতর এক ভাব তাব মনে উপজাত হয়। শিব ত্রিলোকের নাথ। তিনি এখানে শয়ন করেন। অট্টঅট্ট হাস্য করেন। সন্ত্রাসিত করেন চরাচর।

দুর্গা শিবের ভার্যা। কিন্তু শিবের এ আচরণে তিনি সন্তপ্ত। এ আচরণ কদাপি সুন্দর নয়, বরং অসৎ কুৎসিত।

শিবের ঈশ্বব শিবই। তিনিই জানেন তাঁর ব্যবহারের কারণ। দুর্গা তাই শিবকে সুধিয়েছেন: গূঢ় কোন হেতু নিশ্চয়ই এর পশ্চাতে আছে। কি সে হেতু?

মহাদেবেব চিত্তে কৌতুক, উল্লাস। মহাদেবের নয়নে তারই আলো। তিনি বর্ণনা করলেন:

স্বর্গ। রৌদ্রমুহূর্ত সমুপস্থিত হল। মহাদেব রোদন করতে লাগলেন। কণ্ঠ চিরে বিকট ধ্বনি নির্গত হতে লাগল। অনাদি অব্যয় পুরাতন দেব এলেন। বললেন: রোদন কেন? ভয়ের কি ঘটেছে যে এমন কান্না জুড়েছ?

মহাদেব বললেন ঃ আমি যেমন, আমাকে তেমন-তেমন নাম দিন।

ঃ এই জন্য কান্না ? চিন্তা কি ? রুদ্রনাম নাও। এই নামেই সবাই জানবে তোমায়।

মহাদেবের রোদন থামল না। সেই দেব আবার সুধোলেন ঃ আবার রোদন করছ ? কিন্তু কেন ? কি তোমার অভিলাষ ?

ঃ নাম, আরো নাম দিন।

সাতটি নামে সেই দেব মহাদেবকে ভূষিত করলেন। কিন্তু রোদনে ছেদ পড়ল না। রোদনে রোদনে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

লোকেশ্বর সেই কেশব মহাদেবের হাত ধরলেন। বললেন ঃ রোদনে রোদনে বায়ু ভারাক্রান্ত। কি কারণে এত রোদন করছ ?

তিনি নাম দিলেন। আরো আরো অনেক নাম।

মন পড়তে জানেন, অভিপ্রায় বুঝতে জানেন। তাই বললেন ঃ তুমি সমস্ত দেবতার মধ্যে মুখ্য বলে পরিগণিত হবে। তুমি মহাদেব।

মহাদেবের রোদন স্তব্ধ হল।

দুর্গাকে মহাদেব নামসমূহের অর্থ বললেন। বললেন, সুভ্রূ স্ত্রীগণ নয়, অশুচি বস্তুই তাঁর প্রার্থিত। লোকসমূহও করেন বিশেষ রূপে দ্রাবিত। অতএব তিনি রুদ্র।

সংহারসময়ে তিনিই হরণ করেন সবলকে। তাই হর। কালরূপে তাঁর বিচরণ, তাই কাল।

শৄ-ধাতুর অর্থ ভক্ষণ। সৃ-ধাতুর অর্থও তাই। লোকসমূহকে শেষ সময়ে গ্রাস করেন মহাদেব। মহাদেব সেই কারণে শর্ব ও সর্ব নামে বিদিত। সজ্জন পণ্ডিত যাঁরা তাঁদের চিত্তে জ্ঞানের সূর্যোদয় হোক—মহাদেবের এই কামনা। ভয় জাগান তাই এঁদের চিত্তে। ভব নাম এই জন্যেই।

ছাগ বা সামান্য মানুষের রক্তমজ্জায় আলিপ্ত যে তৃণ সে অতি ক্ষুদ্র। এদেরই বরণ করেন শিব। এদেরই জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও বিনষ্ট হয়, উগ্রের শাস্তি আসে। শিবের তাই উগ্র নাম। শিব মহৎ থেকে মহান, মহীরপতি, হুংকার করেন মহাশব্দে। মহেশ নাম এই জন্যেই।

শিব ঈশ্বরের ঈশ্বর। তিনি সৃষ্টি করেন, নাশ করেন, সর্বস্ব দান করেন। তিনি পরমেশ্বর। শিব আবার রৌদ্রকর্মা। তিনি সংহার করেন। রৌদ্রভাবের আচরণ করেন। শিব রৌদ্রকর্মা।

এ নাম সাহায্যে শিবের স্তব করলে তিনি প্রসন্ন হন। যে চিতাকুণ্ডে শিবের পূজা করে ব্যবহার করে এই নামাবলি সে দেবপূজ্য। ব্রহ্মের সঙ্গে তার সাম্য ঘটে। যে ব্যক্তি এই নাম নেয় মৃত্যুর পর সে নিত্য গাণপত্য পদ লাভ করে।

শিব বললেন ঃ বিধাতার আদেশ অন্যথা করার নয়। সেই পুরুষের

আদেশেই আমার কর্ম। আমি কাল, সংহার করি। তুমি কালরাত্রি। বিধাতার ইচ্ছা, তাই এই কর্মই আমি করি। শ্মশান তাই আমার কাছে পরম রমণীয়। পুণ্যক্ষেত্র শ্মশান, সিদ্ধক্ষেত্র শ্মশান। শ্মশানবাসেই আমার সুখ, আহ্লাদ, পরম পরিতৃপ্তি ।।

৪২. অবিমুক্তক্ষেত্র ও যক্ষ হরিকেশ

অবিমুক্ত ক্ষেত্র ও ওঙ্কারদেবের মাহাত্ম্য অপার। ব্যাস শুনতে চাইলেন। সনৎকুমার বর্ণনা করলেন।

মহাদেব ও পার্বতীর মধ্যে একদা এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। সনৎকুমার শুনেছিলেন। যেমন শুনেছিলেন ব্যাসকে ঠিক তেমনটিই বললেন।

অবিমুক্ত ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এখানেই শিব পরম সন্তোষ লাভ করেন। আত্মজ্ঞানই সব কিছুর সার। আত্মজ্ঞানেই মোক্ষ। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে এই আত্মজ্ঞানই প্রমূর্ত। এ ক্ষেত্রে তাই শিবের বাস। শিব থাকেন, নিত্য বিরাজ করেন, তাই নাম অবিমুক্ত।

হরিকেশ এক যক্ষের নাম। ব্রহ্মে তাঁর নিষ্ঠা, ধর্মে অশেষ মতি। যক্ষ সমাজে হরিকেশ বন্দিত, প্রবল প্রতাপান্বিত।

হরিকেশ শিবের ভক্ত। জন্ম থেকে নিয়ত শিবধ্যানেই তাঁর মতি। শয়নে স্বপনে সর্বদা তাঁর মনে শিব শিব এই ধ্বনি। হরিকেশ শিবময়।

যক্ষ সমাজে হরিকেশ এক নিন্দিত ব্যতিক্রম। পিতা পূর্ণভদ্র একদা বললেনঃ অন্যরকম হয়েছ। পুত্র বলে আর তোমাকে মানি না। তুমি আর আমার পুত্র নও। যক্ষ বংশে জন্ম। ক্রূরতা হবে তোমার মনের ভূষণ। হিংস্র হবে, মাংস হবে ভোজ্য। কিন্তু তুমি সম্প্রতি অনাচারে পরায়ণ হয়েছ। এটি নিন্দার, তাই করার নয়। যা করা সাজে তাই সঙ্গত। অশেষ পুণ্য করে যক্ষ সমাজ মানুষের ভাব অতিক্রম করেছে। দেবত্ব তাদের চিত্তে, আচারে, আচরণে। কিন্তু তোমার আচরণ নিতান্তই মানুষের মত। ও রকম ধর্ম কর্মের মুখে ছাই। তুমি এই মুহূর্তে দূর হও। যেখানে খুশি সেখানে যাও। কিন্তু এখানে নয়, এক মুহূর্তের জন্যও নয়।

হরিকেশ বিতাড়িত হলেন। এলেন বারাণসীতে। তপে তপে তাঁর দিন কাটে। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। অবশেষে তাঁকে মনে হত যেন শুকনো কাঠ, যেন পাথর।

বারাণসী। মহাদেবের আলয়। বাস করেন আরো বহু শত যোগী। তাঁরা শিবের আরাধনা করেন। হরিকেশ তাঁদের সঙ্গেই থাকেন। ইন্দ্রিয় শাসন করে

একাগ্র হয়ে তিনি তপস্যা করে চললেন। মনে পরম প্রসন্নতা।

হরিকেশ তপস্যা করেন, করতে থাকলেন। এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হল। শিব খুশি হলেন।

পাথরের মত নিশ্চল হরিকেশের শরীরের চারিধারে বল্মীকের ঢিপি রচিত হল। দেহের মাংস বহু শত কীটের দংশনে দংশনে বিদ্ধ হল, ছিন্ন হতে লাগল। হরিকেশের শরীর জীর্ণ হল। রক্ত রইল না, মাংসও রইল না। একরত্তিও রইল না।

অস্থিময় হরিকেশ। কুন্দের পবিত্রতা শুভ্রতা, চন্দ্রের প্রভা স্নিগ্ধতা যেন সঞ্চারিত সেই অস্থিময় শরীরে। হরিকেশ কুন্দ হলেন। হরিকেশ চন্দ্র হলেন। হরিকেশ শঙ্খ হলেন।

তপস্যা। হরিকেশ ভাবলেনঃ দেহ যাচ্ছে, যাক। হবার হলে আবার হবে। শিব আছেন, তিনি রাখবেন। তপস্যায় তন্ময়। শিবচিন্তায় তন্ময় হরিকেশ অন্যচিন্তা বিস্মৃত হলেন। চিত্তে জেগে রইল প্রদীপের একটি অকম্পিত শিখা।

এক সময়ে পার্বতী পরমেশ্বরকে বললেনঃ আপনার উদ্যান রমণীয়। দেখেছি। তবু সাধ যায়, আবার দেখি।

পরমেশ্বর নির্গত হলেন। সঙ্গে পার্বতী। উদ্যান—রমণীয়, মনোহর। পার্বতী নানা প্রশ্ন করেন। পরমেশ্বর উত্তর করেন।

উদ্যানঃ পরম রমণীয়, পরম মনোহর। বৃক্ষ, লতা গুল্মে বিচিত্র সে উদ্যান। নয়ন রঞ্জিত করে এমন শোভা, ঘ্রাণ আমোদিত হয় এমন সৌরভ, শ্রবণ নন্দিত হয় এমন সুরধ্বনি। গুল্ম, কর্ণিকার, বকুল, অশোক, পুন্নাগবন শোভা বিস্তার করছে, সৌরভের আস্তরণ বিছিয়েছে বায়ু স্তরে। ফুলে ফুলে মৌমাছি। গুঞ্জনে বনভূমি মুখরিত। কূজনে, সুরের প্রবাহ রচনায় পাখিরা ব্যস্ত। কলহংস, কারণ্ডবপক্ষী, মত্ত মৌমাছি, অন্যবিধ শত শত পক্ষী। কূজনে নিস্বনে উদ্যান মায়াময়। সহকার বৃক্ষ, তিলবৃক্ষঃ ফুলে ফুলে অবনত। বিদ্যাধর চারণরা গানে, অপ্সরারা নৃত্যে উদ্যানের মনোময়তা বৃদ্ধি করেছে।

হস্তীরা বিচরণে পরিতৃপ্ত। মৃগগণ বিচরণে উল্লসিত। উল্লাস, তৃপ্তি।

কমলে কমলে আবৃত জলাশয়। সারস ও হংস। সন্তরণে আহ্লাদিত। জলাশয়ের জল ঈষৎ ঈষৎ কম্পিত হচ্ছে। কমলবন কাঁপছে, দুলছে। সারস নয়, হংস নয়ঃ আহ্লাদিত কমল। কমল চলছে। কমলে কমলে আবৃত জলাশয়। কমল কাঁপছে, দুলছে, চলছে।

একটি জলাশয়, দুটি জলাশয়, অনেক জলাশয়। জলাশয়ের ধারে ধারে মন্দির। লাল কালো সবুজ নীল সোনালী হলুদ। রঙে রঙে মেশামেশি। রঙে রঙে বিচিত্র। এই বিচিত্র বিস্তীর্ণ উদ্যানমধ্যে জলাশয়। তার উপর

মন্দির। যেন এক পশলা হাসি।

পূর্ণিমার চাঁদ হাসে। সোনার আলো ঢালে। উদ্যানের তিলফুল হয় চাঁদফুল।

মৌমাছি ভ্রমরের গুঞ্জনে, বিদ্যাধর চারণের গানে অপ্সরাদের নাচের শিঞ্জনধ্বনিতে বায়ুস্তরে মদিরতা, গন্ধ গন্ধে বায়ুস্তরে অশেষ মোহ। বায়ু স্তরে মোহ, মদিরতা। বায়ু মোহে বিহ্বল, মদিরতায় বিহ্বল।

মহাদেব দেখলেন। ঘুরে ঘুরে পার্বতী দেখলেন। বললেনঃ হে দেব। আমি মুগ্ধ, বিহ্বল। শুনেছি। তবু আপনি আবার বলুন। অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য আমাকে বলুন। আমার চিত্ত মুগ্ধতার বিহ্বলতার পরমস্তরে সমুন্নত হোক।

মহাদেব বললেনঃ এ এমন ক্ষেত্র যেখানে তপস্যায় নিশ্চিত মুক্তি। এ ক্ষেত্র আমার ভক্তে ভক্তে সমাকীর্ণ। পরম প্রিয়, গোপনীয়, অতি গোপনীয় এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র।

পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে, হরিদ্বারে, নৈমিষারণ্যে স্নান এবং বাস। তথাপি হয়ত মুক্তি হয় না। কিন্তু এখানে তা নয়। এ ক্ষেত্রের এমন গুণ। তীর্থের রাজা প্রয়াগ। অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রয়াগেরও রাজা। একদা জৈগীষব্য পরম তপ করেছিলেন, সিদ্ধ হয়েছিলেন। অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মহিমাতেই তাঁর সেই সিদ্ধি। অন্য তীর্থে যা দুর্লভ এখানে তা সুলভ। মহাযক্ষ কুবের গণেশত্ব পেলেন। এমনিতে নয়। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে তিনি শিবময় হয়েছিলেন, তাই। ঋষি সংবর্ত ও ভাবিতার্থ তপ করছেন। তাঁদের সিদ্ধি সন্নিকট। বিখ্যাত ব্যাস এখানেই সুখে বাস করছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য, ইন্দ্র—এঁরাও আমাকে উপাসনা করেন এবং তা এই পুণ্যস্থানে বসেই।

অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অপার। মন বিষয় রসে মগ্ন, ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে। মৃত্যু হল এখানে, পেল মুক্তি। হাজার হাজার বছর তপের আগুনে ঝলসেও যোগীরা যা পাননি অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মরলে সেই দুর্লভ মোক্ষ আসে হাতের মুঠোয়।

বারাণসী নগরী ধন্য। তিন ভুবনের সার সঞ্চিত এই ধামে। বারণসী পরম রমণীয় ও পুণ্যজনক এক দিব্যধাম। পাপে পাপে আত্মা কালি হয়েছে, এখানে এলে দূর হয় সেই কালি। নির্মল আনন্দে অতিবাহিত হয় জীবন।

মহাদেব স্তব্ধ হলেন। কিন্তু ক্ষণকাল। মনে তাঁর অন্যচিন্তা। হরিকেশ ভক্ত শ্রেষ্ঠ। হৃদয়ে তাঁর ভক্তির মণি জ্বলছে। তাকে বর দিতে হবে। মহাদেবের মনে এই চিন্তা।

পার্বতীকে মহাদেব বললেনওঃ তপে তপে নিয়মে নিয়মে যক্ষের তাবৎ পাপ বিধৌত হয়েছে। ওকে বরদান করা সঙ্গত। সময় সমুপস্থিত।

মহাদেব এলেন। হরিকেশের সম্মুখে দেবাদিদেব। অস্থিময় হরিকেশ। অস্থির অণুতে অণুতে শিব, শিব। হরিকেশ প্রণত হলেন। দিব্যচক্ষু পেলেন। দেখলেন সম্মুখে শঙ্কর। বৃষের উপর উপবিষ্ট। সঙ্গে প্রমথগণ।

মহাদেব বললেন ঃ এমন বর দেব, যা ত্রিলোকে দুর্লভ। সমগ্র শরীর দিয়ে তুমি আমাকে লাভ কর।

হরিকেশের জীর্ণ শরীরে প্রফুল্লতার বন্যা নামল। দেবাদিদেবের পদতলে লুণ্ঠিত হল এক স্তবক প্রফুল্লতা।

হরিকেশ বললেন ঃ আপনাতে আমার ভক্তি, তাতেই আমার আনন্দ ও শান্তি। এ ভক্তি অচলা হোক, অক্ষয় হোক, এ শান্তি চিরন্তন হোক। যেন গণপতি হতে পারি, লোকের অন্নদাতা হতে পারি, নিত্য বাস করতে পারি ধুন্ধুরবনে। সেখানে থাকব, নিত্য দেখব আপনাকে। প্রভু, আমাকে এই বর দান করুন।

মহাদেব বললেন ঃ জরা মৃত্যু সর্বদুঃখ থেকে তুমি দূরে থাকবে, হবে গণপতি। সবাই তোমাকে পূজবে, তুমি বর দেবে। পরাজয়ের লজ্জা কখনো তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি যক্ষ, কিন্তু হবে গণাধ্যক্ষ। উদ্ভ্রম, সম্ভ্রম — এই দুই প্রমথ তোমারই পরিচারক হবে। তুমি আজ্ঞা করবে, ওরা পালন করবে।

মহাদেব প্রস্থান করলেন। রুদ্র এলেন, রুদ্রাবাসে যেন রৌদ্র উঠল ॥

৪৩. পঞ্চায়তনের মহিমা

পঞ্চায়তন। সেরা এক তীর্থ। সনৎকুমার বললেন ঃ মহিমায় মহিমায় পঞ্চায়তনের খ্যাতি পঞ্চমে সমুন্নত। বহুতর বৃত্তান্ত আছে এর সমর্থনে। বস্তুতই পঞ্চায়তনের মহিমার কাহিনী বর্ণনার নয়। এক নয়, দুই নয়, অনেক। পর্বতপ্রমাণ। পঞ্চায়তন পুণ্যতীর্থ। তার কাহিনী পুণ্যজনক।

সনৎকুমার ক্ষণমাত্র নীরব রইলেন। হয়ত চিন্তা করলেন। অযুত বৃত্তান্তের মধ্য থেকে একটি তুলে নিলেন।

মণ্ডূকী মাত্র। কিন্তু সিদ্ধি তার এসেছিল। মণ্ডূকী পঞ্চায়তনে থাকে। ওঙ্কারদেবের অতি নিকটে মণ্ডূকী থাকে।

দেবসমীপে নিত্য নিবেদিত হয় নির্মাল্য। মণ্ডূকী নির্মাল্য ভোজন করে।

দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হয়। মণ্ডূকী থাকে, নির্মাল্য ভোজন করে। অবশেষে তার জীবনের শেষ দিনটি সমাগত হল। জন্মচক্রের একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হল। শুরু হল অন্য জন্ম।

মণ্ডূকী পুণ্য করেছিল। জন্মাল রাজার ঘরে। রাজার নাম সুমনা। তাঁর রাজঘর আলোকিত হল। রাণীর কোল জুড়ে একখণ্ড হীরক জ্বলতে থাকল।

মণ্ডূকী রাজার কন্যা হল।

কন্যা বড় হতে থাকল। শতদল দল মেলল। রাজকন্যার শরীরে শতদলের হাসি। রাজার দৃষ্টি এড়াল না। পিতা তিনি। কর্তব্যে অবহেলা চলে না।

রাজা সুমনা অভিলাষ জ্ঞাপন করলেন। শতদল দল মেলে হাসছে। বরের হাতে দেবার এই তো সময়।

রাজকন্যা রাজাকে নিবারণ করলেন। রাজা তাঁর বাইরেটাই দেখেছেন। কিন্তু কন্যার অন্তরে অন্তরে বৈরাগ্যের সূর্যোদয় হয়েছে। অজস্র কিরণে তিনি তম নাশে সমুদ্যত।

রাজা নিবারিত হলেন। নতুন সূর্য। তার আলোয় আলোকিত পথ। উজ্জ্বল সেই পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজকন্যা এসে উপস্থিত হলেন বারাণসীতে। সূর্যের দিব্য আলো পথ আলোকিত করতে করতে অবশেষে পঞ্চায়তনে এসে যেন ডুবে গেল। লীন হল ওঙ্কারদেবে। সূর্য অস্তমিত হল। ওঙ্কারদেব পশ্চিম আকাশ হলেন। শেষ কিরণে আকাশটা দাউ দাউ করে জ্বলল। রাজকুমারীর ওঙ্কারদেব দর্শন হল। পদ্মের খোলসটা খসে পড়ল। আলোর পরম উজ্জ্বল একটি রশ্মি শিবলোকে সমুত্তীর্ণ হল।

রাজকন্যা সিদ্ধি পেলেন। মুক্তি পেলেন শিবলোকে।

সনৎকুমার বললেন ঃ আরো আছে। এ মাত্র এক। আরো আছে বহু শত।

রাজাব নাম প্রতাপমুকুট। ধর্মে অচলা মতি তাঁর। পুত্রটিও পিতার মত। রাজা ধার্মিক, রাজপুত্র ধর্মাত্মা। যেমন রাজা তেমনি রাজপুত্র। বরং রাজপুত্র আরো যেন কিছু। পুত্রের কাছে পিতার হাব। পুত্র তত্ত্বজ্ঞানী।

কাল অতিবাহিত হয়। এখানেও রাজার কর্তব্য, পিতার কর্তব্য। রাজা পুত্রকে বললেন ঃ বিবাহ কর, সুখী হই।

পুত্র বললেন ঃ আজ্ঞা করবেন না, প্রতিপালন করতে পারব না।

রাজা বললেন ঃ আমি পিতা, আমার কথা রাখা তোমার কর্তব্য। তুমি বিবাহ কর। নচেৎ কুলের মুখে কালি পড়বে। নরকে ডুবতে হবে চিরতরে। অতএব অন্যথা কর না।

রাজা ধার্মিক। রাজপুত্র ধার্মিক ও তত্ত্বজ্ঞানী।

রাজপুত্র কিঞ্চিৎ উদাস হলেন। আগের আগের বহু শত জন্মের কথা একের পর এক তাঁর মনের উপর ভাসতে থাকল, ডুবতে থাকল। তিনি বিমনা হলেন। অবশেষে বললেন ঃ অসংখ্যবার আমি জন্মেছি, অসংখ্যবার মৃত্যুর শীতলতায় আমি নিমজ্জিত হয়েছি। জন্ম, জরা, মৃত্যু এইভাবে বারবার আমি

আবর্তিত হয়েছি। স্ত্রীও পুত্রকন্যার সঙ্গে ঘর করেছি। সুখ পেয়েছি। অবশেষে মহা অবসানে সব ছাড়ার দুঃখে আমি ভারাক্রান্ত হয়েছি। বারবার অসংখ্যবার জন্মে জন্মে এ অনুভব আমার চিত্তে সঞ্জাত হয়েছে। তৃণগুল্মলতা হয়েছি, পশুপক্ষী হয়েছি, স্ত্রীও হয়েছি, পুরুষও হয়েছি। জন্মে জন্মে আমি গণ, কিন্নর, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর হয়েছি, নাগ যক্ষ রাক্ষস হয়েছি, গুহ্যক হয়েছি, দানব হয়েছি, অপ্সরারূপেও জন্মলাভ করেছি। জন্মেব বক্তপথে চলে চলে আমি ক্লান্ত। সমস্ত প্রকার আবর্তনেই আমি আবর্তিত। অবশেষে এই বুঝেছি যে বিবাহ এক প্রকার বিড়ম্বনার নাম। অতএব ওটি করতে বলবেন না।

সিদ্ধির পথ দুস্তর। রাজত্বের অভিমান ত্যাগ করলেই সিদ্ধি আসে না। আসে শরীরের অভিমান ত্যাগ করলে। রাজ্যের অভিমান নেই, কিন্তু শরীরের অভিমান আছে, তাতে দুঃখ বাড়ে বই কমে না। শরীরের অভিমান। সুখ আছে। কিন্তু সে সুখ শত্রুর সুখের মত। বিফলতাই তার অবদান।

জগতে দুটি বস্তু মাত্র সত্য। এক মৃত্যু, দুই ব্রহ্ম। যে সমস্ত পৃথিবী হাতের মুঠোয় পেয়েও মমতাগ্রস্ত হয় না, রাজ্য তার কাছে নিতান্তই অর্থহীন। দ্রব্যে মমতা আছে, ইন্দ্রিয়ের অনুবর্তনে রত এমন লোকেব জীবনেই মৃত্যু এক মহাভয়। সাক্ষাৎ মিললে তবেই সম্ভব পরিত্রাণ। অন্যথায় মৃত্যুভয় হিমনীল কবে জীবচিত্তকে।

কামনার আগুন সবার মনে। আমার মনে এ আগুন। আপনার মনে এ আগুন। সবার মনে এ আগুন। আমি তাই আপনার প্রশংসা করি, আপনি করেন আমার। তপস্যা। কেউ করে সকাম কর্মের দ্বারা। কেউ করে মুক্তির জন্য। আমার চিত্তেও কামনা আছে। তবে সে অন্যতর। তীর্থে তীর্থে যাব, বেদের অনুধ্যান করব—এই মাত্র। পঞ্চায়তন, ওঙ্কারদেবের সান্নিধ্যই আপাতত আমার কাম্য। অতএব আমি যাব। বারাণসীতে যাব। পঞ্চায়তনে যাব। ওঙ্কারদেবের আরাধনায় আরাধনায় চিত্তকে সংবিষ্ট করব। আগের জন্মেও আমি সেখানে গেছি, থেকেছি, পরম দেবের সেবা করেছি। সে সব অনেক কথা।

রাজপুত্র কিঞ্চিৎ থামলেন। বললেনঃ অনেক জন্ম পেরিয়ে একবার বৈশ্যবংশে আমার জন্ম হল। শিবের প্রতি ভক্তি ছিল। ব্রত করতাম, নিয়ম করতাম, স্তব করতাম। মহাদেব প্রসন্ন হতেন। তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে অবশেষে এলাম অবিমুক্ত ক্ষেত্রে। পঞ্চায়তনে ওঙ্কারদেবকে দর্শন করলাম। সম্মুখেই রুদ্রাবাস। সেখানে রইলাম। বৈশাখ মাসে রাত্রি জাগরণ করে অতিবাহিত করলাম। দেবতারা দেখলেন, গন্ধর্বেরা দেখলেন, কিন্নরেরা দেখলেন। পুণ্য কর্ম করেছিলাম। তাই জন্ম পেলাম আপনার পুণ্যগৃহে।

রাজপুত্র পুনর্বার স্তব্ধ হলেন। কিছুকাল পরে করজোড়ে বললেনঃ

অনুমতি দিন, যাই। সংসারে আছি। মায়া আচ্ছন্ন করছে। ওঙ্কারদেব আমাকে দিব্যজ্ঞান দিয়েছেন। অতএব আমি বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি, মায়া আমার চিত্তলোকে ধীরে ধীরে জাল বুনে চলেছে। মনে তাই পীড়া জাগছে। অতএব অনুমতি করুন, যাই। পঞ্চায়তনে যাই, তাঁকে দেখি। তাঁকে দেখলে মুক্তি। জন্মের চাকায় বাঁধা পড়ে অবিরত পিষ্ট হতে হতে আত্মা অতীব ক্লিষ্ট। আমাকে অনুমতি দিন, আমি যাই, মুক্ত হই।

রাজা বললেনঃ পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা আমারও মনে পড়ছে। আমিও ক্লেশ অনুভব করছি। আমিও সেই মহাক্ষেত্রে গমন করব। মায়া মমতা ও অহংকারের খোলসটি ছাড়তে পারলে চিত্তের শোধন হয়। শুদ্ধ চিত্ত। অবিমুক্ত ক্ষেত্র। মুক্তি।

রাজার মন বৈরাগ্যের আলোয় উদ্ভাসিত হল। কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি ঐ আলোর সমুদ্রে নিমগ্ন হলেন।

মহাদেবকে নিত্য স্মরণ করেন, মনন করেন, ধ্যান করেন। অবশেষে বারাণসী ক্ষেত্রে ওঙ্কারদেবকে তিনি পেলেন। পূর্বজন্মেও তিনি ওঙ্কারদেবের মন্দিরে কপোতরূপে বাস করেছেন। প্রদক্ষিণ, উপাসনায় পুণ্য করেছিলেন। এ জন্মে তাই রাজা প্রতাপমুকুট। প্রতাপমুকুট ওঙ্কারদেবের স্তব করেন। রাজপুত্র ওঙ্কারদেবের স্তব করেন। পিতা ও পুত্র আরাধনা করেন, করতে থাকলেন।

স্তবের ধ্বনিতে ধ্বনিতে ক্রমশ রাজার অন্তরে দিব্যতেজ উপজাত হতে থাকল। অবশেষে সে তেজ হল কোটি সূর্যের মত মহাতেজ। রাজা মুক্ত হলেন।

রাজা প্রতাপমুকুট শিবের স্তব করেছিলেন। অপূর্ব সে স্তব। সনৎকুমার তার কিছু বলে বললেনঃ সেই মহাপুরুষকে জানতে পারলে সংসারে এসে নিত্য মরতে হয় না। তাঁর মাহাত্ম্য লক্ষ কোটি মুখে কীর্তন করেও শেষ করা যায় না। আমি যা বললাম তা যে কত কিঞ্চিৎ তা অনুমানেরও অগম্য ॥

৪৪· নৃত্যে বিস্ময়

হিমালয়ের কন্যাঃ কালী নাম পেয়েছিলেন, ভার্যা হয়েছিলেন শিবের।

স্বভাবে কালী অনন্যা। শিবের পরমা প্রিয়া।

অবিমুক্ত ক্ষেত্র পুণ্যস্থান, শ্রেষ্ঠস্থান। মহাদেব দেবীর সঙ্গে এখানেই রমণ করেন। পঞ্চায়তনে দেব ও দেবী রমণ করেন। পঞ্চায়তনে দেব ও দেবীর বহুশত মুগ্ধ প্রহর অতিবাহিত হয়।

দেবী মহাদেবের পূজো করেন। হরের পূজোয় দেবী কৃতার্থ হন। পূজো চলে। গন্ধর্ব, অপ্সরা, বিদ্যাধররা নাচে গায়, বাদ্য বাজায়।

লক্ষ বর্ষ পার হয়। মহাদেব নৃত্য করেন। বিন্দু বিন্দু স্বেদ মহাদেবের দেহে মুক্তোর দীপ্তি আনে। মহাদেবের মুক্তোস্বেদ। মুক্তোর বিন্দুগুলি ফাটে। প্রথমে প্রমথগণ, পরে ভূতগণ নির্গত হল। তারাও নৃত্য করতে থাকে। মহাদেব নৃত্য করেন, প্রমথগণ নৃত্য করে, ভূতগণ নৃত্য করে। প্রথমগণ নৃত্য করে, পতিত হয়, বিবস্ত্র হয়। মহাদেব নৃত্য করেন। পার্বতী বিস্মিত হলেন। বললেন ঃ অদ্ভুত আপনার নৃত্য। যত দেখছি ততই বিস্ময় মানছি। আপনার এ নৃত্য অদ্ভুত। পূর্বে মন্দরে নৃত্য করেছেন, দেখেছি। কৈলাসে করেছেন, দেখেছি। অন্যান্য পর্বতে নৃত্য করেছেন, দেখেছি। কিন্তু এ নৃত্য অদ্ভুত। আমি বিস্মিত। অদ্ভুতত্ব, কিন্তু কি কারণে?

মহাদেব ঈষৎ হাসলেন। দেবীর মুখের দিকে তাকালেন। পরম আদরে তিনি যেন একটি পদ্ম তুলে ধরলেন। সেই পদ্মকেই যেন মহাদেব বললেন ঃ কারণ আছে। ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে শত শত তীর্থ। এ তীর্থ শ্রেষ্ঠতম। আমার প্রিয়। জগদম্বা পদ্মবনে কেলি করেন। পদ্মবনে জগদম্বার অশেষ আহ্লাদ, উল্লাস। ব্রহ্মারও। এক্ষেত্রে আমারও।

আত্মাকে জয় করেছেন। দিব্য চোখ পান। জ্ঞানবান হন। আমাকে দেখেন ঃ পরম পুরুষ, চার বাহু। আমাকে তাঁরা দেখেন, দেখতে পান। স্থানটি পঞ্চায়তন। অতএব দেখতে পান।

তিন নেত্র, হস্তে শূল, বৃষের উপর উপবিষ্ট। মহাদেব। পঞ্চায়তনের মানুষ পূর্বে মহাদেবের এই মূর্তি সরাসরি দেখতে পেত। এস্থান শিবলোক হয়ে যায়। যাদের চিত্ত বিষয়রসে মজেছে, যাদের বিবেক হেজেছে তারাই শুধু বঞ্চিত হয় এই মহাদর্শন থেকে। শাস্ত্র মানেনা, আচরণও তদ্রূপ—তারা শুধু পঞ্চায়তনের সেবাতেই সম্পন্ন হয় শমে দমে। পরমেশ্বরকে দেখতে পায়।

অবিমুক্ত ক্ষেত্র পুণ্যস্থান। অবিমুক্তক্ষেত্র মহাস্থান। একথা সবাই জানতে পায় না। তারাই জানতে পারে যারা অন্য জন্মে আমাকে পূজেছে।

বৈশাখ মাসের চতুর্দশী তিথি। বিশিষ্ট একটি দিন। ঐ দিনই বারাণসী ক্ষেত্রে সাধুরা আমাকে দেখতে পাবেন। ও দিন পুণ্যদিন, মহাদিন। পঞ্চায়তনে মহাদেব। মহাদেবের দর্শন হবে। হবে মাত্র সাধুদের।

এখানে ওঙ্কারেশ্বর। দিকে দিকে দেবতারা, ঋষিরা। দিকে দিকে রুদ্রগণ, পাশুপতগণ। পূর্বে কেশব ও স্বয়ম্ভু, দক্ষিণে কোটি রুদ্র, উত্তরে বামদেব, সাবর্ণি, অঘোর, কপিলদেব, আর পশ্চিমে দেব কৃত্তিবাস।

আমার প্রিয়তম স্থানের নাম পঞ্চায়তন। নৃত্যে তাই অন্যতর ছন্দ ॥

৪৫. রাজা পুষ্পবাহন

সূর্য ঃ তেজে তেজে প্রচণ্ড, উদ্দীপ্ত। পুষ্পবাহন ঃ রাজা, চিত্তে যেন স্বয়ং সূর্যদেব।

সূর্যকল্প রাজা পুষ্পবাহন। তিনভুবনে তিনি বিখ্যাত। মহাদেবের স্তব করেছিলেন। মহাদেব তুষ্ট হয়েছিলেন. পদ্ম দিয়েছিলেন। সোনার অদ্ভুত এক পদ্ম রাজা পুষ্পবাহন লাভ করেছিলেন।

দেবাদিদেব স্বর্ণকমল দিয়েছেন। পুষ্পবাহন লাভ করলেন দিব্যগতি। ইচ্ছা হত, তিনি স্বর্গে যেতেন। ইচ্ছা হত, তিনি মর্ত্যে যেতেন। ইচ্ছা হত, তিনি পাতালে যেতেন, সপ্তদ্বীপে যেতেন। যেমন খুশি যেখানে খুশি সেখানেই পুষ্পবাহন যেতেন। যেতেন দিব্যগতিতে।

শিবের প্রসাদ ঃ সোনার কমল। সোনার কমলের প্রসাদ যত্রতত্র দিব্যগতি। নাম তাই পুষ্পবাহন। পুষ্করে বাস। সপ্তদ্বীপের এক দ্বীপও নাম পেল পুষ্কর দ্বীপ।

পুষ্পবাহনের পত্নী পার্বতীর মত। রূপ রূপ, রূপেরূপে অপরূপা। গুণ গুণ, গুণে গুণে অনিন্দিতা, মাননীয়া। নাম লাবণ্যবতী। মহাদেবের পার্শ্বে পার্বতী, পুষ্পবাহনের লাবণ্যবতী। মহাদেবের অমেয় প্রেম পার্বতীতে ; পুষ্পবাহনের লাবণ্যবতীতে।

রাজা পুষ্পবাহন সোভাগ্যের উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত। অযুত পুত্র তাঁর। প্রতি পুত্রই গণ্যমান্য। ধর্মের আলোয় তাঁদের আত্মা উদ্ভাসিত। বীর্যবত্তা অতুলনীয়। রাজা পুত্রদের দেখেন, মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হন।

পুষ্পবাহন [illegible]। তিনি চিন্তা করেন ঃ এমন কিছু কর্ম তিনি করেননি যার ফলে অশেষবিধ এই সৌভাগ্য সম্ভব হতে পারে। বিভূতি, কীর্তি খ্যাতি, লাবণ্যবতীর মত পত্নী, অঢেল ধনরত্ন এমনিতে হবার নয়। কিন্তু হয়েছে। তিনি পেয়েছেন। এ জন্মে তিনি পুণ্য কিছু করেননি। তবু পেয়েছেন। অন্য জন্মের বহু শত পবিত্র কর্মের ফল হিসেবে এ জন্মে নিশ্চয়ই এমন সুখ সৌভাগ্য তাঁর লাভ হয়েছে। পুষ্পবাহন একদিন এইসব চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় প্রচেতা নামক এক মুনি এলেন।

রাজা বললেন ঃ অন্যজন্মের কর্মফলেই কি লাভ হয়েছে এমন সব দিব্য ঐশ্বর্য ? যদি হয়, বলুন।

প্রচেতা বললেন ঃ ও জন্মে ব্যাধ ছিলে। প্রবৃত্তিও ছিল ব্যাধের মত। হিংসায় পূর্ণ ছিলে, দয়া ছিল না এক বিন্দুও। কাজও করতে সেই মত। শরীর হয়েছিল বিকৃত, কুৎসিত। তোমার কেউ ছিল না। পিতা নয়, ভ্রাতা

নয়, পুত্র নয়, কন্যা নয়, বন্ধুবান্ধবও নয়। ছিল মাত্র এক ভার্যা।

একবার দেশে অনাবৃষ্টির আগুন জ্বলল। অন্ন হল দুর্লভ। পেটে পেটে ক্ষুধা দাহ সৃষ্টি করল। তুমিও পীড়িত হতে থাকলে। বনে বনে ভ্রমণ করতে। সামান্য বন্যফলও জুটত না।

একদিন ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পথ চলছ। নজরে পড়ল দূরে এক বিশাল পদ্ম। অবাক হলে। নিকটে এসে দেখলে পদ্মে পদ্মে পূর্ণ এক সরোবর। জল দেখা যায় না। পদ্মের পর পদ্ম।

সরোবরে নামতে গেলে। কিন্তু কাদায় পা বসে গেল। উঠলে। বহু শ্রমে বহু পদ্ম তুমি তুললে। এলে অবিমুক্ত নামক এক পুরে।

ভেবেছিলে পদ্ম বেচে আহার সংগ্রহ করবে। সমস্ত পুরী ঘুরলে। কিন্তু একটিও বিকোল না। মনে বড় আশা ছিল, কিন্তু পুরল না। পেটে বড় জ্বালা ছিল, জুড়ল না। ঘোর অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হলে। সঙ্গে তোমার পত্নী। তার অবস্থা আরও শোচনীয়। তোমরা চলতে পারছিলে না। বসলে।

তোমরা বসলে। জায়গাটি রুদ্রাবাস। ক্রমে রাত্রি ঘনাল। মঙ্গলধ্বনিতে বাতাস কাঁপল। মৃদু মৃদু নন্দ মন্দ কাঁপল। মন ভরল মধুর প্রশান্তিতে। হৃদয়ে দেবতার প্রসাদ। দেবতা হৃদয়ে নামলেন।

তোমরা ভাগ্য করেছিলে। দেবতার দর্শন হল। দেবীর দর্শন হল। তোমরা ভাগ্য করেছিলে।

পঞ্চায়তনে এসেছ, দেখছ। দিব্য অনুভূতিতে চিত্ত প্লাবিত হল। দেখলে ঃ দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, ব্রাহ্মণ। দেখলে ঃ তাঁরা শিবময়, শিবধ্যানে তন্ময়।

তোমার মনে শিব-শিব। ভক্তি। তোমার ভার্যার মনও তোমারই মনের রঙে রঞ্জিত হল। সেখানেও শিব ভক্তি।

ক্লান্তি দূরে গেল। ভাবলে ঃ এত এত পদ্ম, এত এত শোভা। মনে হল পদ্মগুলি যেন কুণ্ঠায় পাণ্ডুর হয়েছে। শিবের শ্রীচরণেই এই শোভার স্ফূর্তি। পড়ে আছে বিষণ্ণ অন্ধকারে।

দ্বিধা রইল না। সমস্ত পদ্ম নিবেদন করলে শিবপদে। পদ্ম যেন স্বর্ণময় হল। তোমার চিত্তে শিবের স্পর্শ। তুমি লুব্ধ হলে না। সেই স্বর্ণময় পদ্ম শিবের পদমূলই উজ্জ্বল করতে থাকল। তোমার মন সমুন্নত হয়েছিল। বিস্ময়ে মন বিচলিত হল, হতে থাকল। অবশেষে আহ্লাদের ঢল নামল তোমার চিত্তপ্রদেশে।

বিনিদ্র একটি মহারাত্রি শেষ হল। আলোয় আলোয় থই থই করে উঠল পঞ্চায়তনের প্রাঙ্গণ। শিবকে তোমরা দেখলে। দেখে দেখে আশ মিটছিল না। বারবার দেখলে। ঘুরে ঘুরে দেখলে। খুশিতে খুশিতে বিগলিত হয়ে হয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেবাদিদেবকে তোমরা দর্শন করলে। তোমাদের জীবনে সে এক

পরম প্রভাত এসেছিল।

পঞ্চায়তনের চত্বরটি ধুয়ে মুছে তকতকে করলে। পত্নীও তোমার কাজে হাত লাগাল। এইভাবে সেই মন্দির প্রাঙ্গণ তোমাদের হাতে নিত্য বিধৌত হত, পরিমার্জিত হত। অবশেষে মৃত্যু এল। দেবাদিদেবের কোলে যেন তোমার মৃত্যু হল। পত্নীর হাতে আগুনও পেলে। তারপরই তোমার এই অমেয় সুখ, ঐশ্বর্য।

ওঙ্কারেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণনার নয়। যা করেছিলে তা সামান্য। কিন্তু ওঙ্কারেশ্বরের মাহাত্ম্য অপার। তাই এত সুখ, এত ঐশ্বর্য।

আকাশপথে ভ্রমণ কর, সেই মত দিব্যযান লাভ করেছ। ঈশ্বর তোমার প্রতি পরিতুষ্ট। অতএব এখানে নয়, ওখানে গমন কর। ওঙ্কারেশ্বরের শরণ নাও। পবম প্রসাদ লাভ হবে।

প্রচেতা মুনি বলছিলেন। বাজা বোমাঞ্চিত হচ্ছিলেন। শেষে বললেনঃ আমার পুণ্য বহু শত, তাই সঙ্গ পেয়েছি আপনার, তাই শ্রবণ নন্দিত হল অপূর্ব এই পূর্বজন্মের বৃত্তান্তে।

রাজা পুষ্পবাহন বারাণসীতে গমন করলেন। তিনি সন্ধান পেয়েছেন. জেনেছেন। চিত্ত সমুদ্র হল। ভক্তির তরঙ্গে উত্তাল হল সেই সমুদ্র॥

৪৬. শিলাদ ও নন্দী

ঋষি শিবলোকে উপনীত হয়েছেন। অকস্মাৎ তিনি স্তব্ধ হলেন। দেখলেন ভয়ংকর নরক, তদুপরি লম্বমান এক লোক। সেখানে যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছেন তাঁরই পিতৃপুরুষগণ।

ঋষি শিলাদ। শিলবৃত্তি তাঁর। শিলাদ স্তব্ধ হলেন, বিমূঢ় হলেন। তিনি শুনলেন পিতৃপুরুষের কণ্ঠধ্বনি। তাঁরা শিলাদকে ডেকে বলছেন; উদ্ধারের ব্যবস্থা কর। হে শিলাদ, বংশধারায় ছেদ পড়েছে। তাই এই দুর্ভোগ। তুমি পুত্রলাভের জন্য তৎপর হও। দেবাদিদেব মহাদেবকে ভজনা কর। তিনি পুত্র দেবেন, আমরা গতিলাভ করব। অবসান হবে তাবৎ যন্ত্রণার।

শিলাদ পিতৃপুরুষের আহ্বানে নীরব থাকতে পারলেন না। মহাদেবের তপস্যায় মগ্ন হলেন। দিব্য সহস্রবর্ষ কঠোর তপ করলেন শিলাদ।

মহাদেব সন্তুষ্ট হলেন। বর দিতে এগিয়ে এলেন।

শিলাদ দেবাদিদেবের পদতলে লুণ্ঠিত হলেন। এক স্তবক শ্বেত পুষ্প মহাদেবেব চরণমূলে উদ্ভাসিত জন্মলাভেব কাতরতা জ্ঞাপন করল। ফুল কথা বলল। শত ফুল শত কথায় স্তব করল দেবাদিদেবেরঃ তোমাকে নমস্কার

তোমাকে নমস্কার। তুমি স্রষ্টা, জগতের পতি। তুমিই ঈশ্বর। যোগে তুমি গম্য। তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।

মহাদেব বললেন ঃ বব দিতেই এসেছি। প্রার্থনা কর।

শিলাদ পুত্র প্রার্থনা করলেন।

বললেন ঃ অযোনিজ এক পুত্র আমার কাম্য। বর দিন যেন লাভ করতে পারি। সে পুত্রও যেন হয় আপনারই মত।

মহাদেব বর দান করলেন।

শিলাদ মহাদেবের আশিস্ পেয়েছেন। হর্ষে উদ্বেলিত তাঁর চিত্ত। তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন। অন্যান্য ঋষিরাও শুনলেন। শিলাদের তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি। অন্যান্য ঋষিরাও শুনলেন। শুনে আহ্লাদিত হলেন।

কাল অতিবাহিত হতে লাগল। একদা শিলাদ যজ্ঞভূমি দর্শন কবলেন, কর্ষণও করলেন। লাঙ্গলের ফলা মাটিব বুক চিরে যেতে লাগল। যজ্ঞভূমি কর্ষিত হতে লাগল।

শিলাদ হঠাৎ বিমূঢ় হলেন। বিস্মিত হলেন। অবশেষে ভীত হলেন। সূর্য ও অগ্নি যেন সশরীরে নেমে এসেছেন মাটির বুকে। লাঙ্গলের ফলায় এক কুমার। তার লোমকূপপথে শতসূর্য যেন প্রকাশিত। সূর্যে লিপ্ত সে অঙ্গ। অগ্নির তরলিত প্রবাহ সে অঙ্গে। সোনাঢালা কান্তি, অথচ সূর্যের রূপালি স্রোত তার অন্তরে। অঙ্গে আগুন নয়, সূর্য নয়—এক অদ্ভুত আলো, আলোর আলো।

শিলাদ ভীত হলেন। ভাবলেন ঃ এ এক উৎপাত। নিশ্চিত এ রাক্ষস। ভয়, দূরে দূরে রইলেন শিলাদ।

অথচ সেই অদ্ভুত আলোর পিণ্ড থেকে মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি ঝরে পড়ল। বাতাস মধুময় হল, শিলাদের কর্ণে মধু বর্ষিত হল। আলোময় সেই কুমারের কণ্ঠে 'পিতা-পিতা'-ধ্বনি। আলো চলল, কুমার এলেন শিলাদের নিকটে। প্রদীপ্ত অনলের শিখা, কিন্তু পরম স্নিগ্ধ। কুমার শিলাদের নিকটবর্তী হলেন। পরম দীনভাবে শিলাদের সম্মুখে কুমার এলেন। শিলাদের সম্মুখে দিব্য আলোর স্তম্ভিত এক ঝরণাধারা।

শিলাদের মনে ভয়, দ্বিধা। কুমারের ডাকে সাড়া দিলেন না। শিলাদ মৌন রইলেন।

আকাশমার্গে বায়ু নিস্বনিত হল। ধ্বনি ঝরল, অর্ঘ নিল। শিলাদ শুনলেনঃ মহাদেবের বর, অযোনিজ পুত্র, তোমারই। তোমার পুত্র। মহাদেব দিয়েছেন। বুকে টেনে নাও।

শিলাদ তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নয়ন নন্দিত হতে থাকল। শিলাদের মন আনন্দে আবৃত হল। কুমারের নাম হল নন্দী।

নন্দীকে বুকে আশ্রয় দিলেন শিলাদ।

আশ্রম। শিলাদ, নন্দী। দিন যায়, যেতে থাকল। নন্দীর চূড়াকরণ হল, উপনয়ন হল। চারবেদ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ—নন্দীর শিক্ষা হল। নন্দী গন্ধর্বশাস্ত্র শিখলেন, শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করলেন, শকুনজ্ঞানে নিপুণ হলেন, প্রাণী চিকিৎসায় পারদর্শী হলেন। নন্দী শিখতে থাকলেন। মাতৃচরিতে, ভুজঙ্গচরিতে নন্দীর চিত্ত সম্পন্ন হল। ধর্মশাস্ত্রে নন্দী মার্জিত হলেন। মাত্র পাঁচটি দিন। নন্দী পড়লেন, শিখলেন। আটপ্রকার ব্যাকরণ, পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চযজ্ঞ, জ্যোতির্গণজ্ঞান নন্দীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হল। মাতৃতত্ত্বে, মহামন্ত্রে, যোগশাস্ত্রে নন্দী ভূষিত হলেন।

নন্দী হলেন, হয়ে উঠলেন। নন্দী কর্ম করেন, সুচারু সুসম্পন্ন কর্ম। নন্দী কথা বলেন, মধুর মধুর কথা। নন্দীর মনে প্রসন্নতা, পবিত্রতা। শিশিরে ধোয়া কুন্দফুল। সবাই দেখেন, শোনেন—সম্প্রীত হন।

সাত বছরের শিশু নন্দী। চিন্তায় ধর্মে ভাবনায় অনিন্দ্য। শিলাদের আশ্রম জ্ঞানের সৌরকরে উদ্ভাসিত হল। শিলাদের আশ্রমে পারিপাট্য, বৈদগ্ধ্য। শিলাদের আশ্রম সরোবর হল—প্রসন্নতার পবিত্রতার দুগ্ধ-সরোবর। একদা দুই তপস্বী সেই সরোবরে প্রবেশ করলেন। তপে তপে সর্ব অঙ্গে তাঁদের দিব্যতা। তেজে তেজে জ্বলছে। দুটি অনির্বাণ হোমশিখা। মিত্রাবরুণ—দুই তপস্বী এসেছেন শিলাদের আশ্রমে।

শিলাদ আহ্লাদিত হলেন। অভ্যর্থনা করলেন। স্তব করলেন।

ঋষিদ্বয় সুধালেন ঃ পুত্র হয়েছে তোমার। অন্যের মনে তুষ্টি আনে, ধর্ম করে—এমন কি হয়েছে এই পুত্র? মৃদু কথায় অন্যের মনে সন্তোষ আনতে পারে কি তোমার পুত্র?

শিলাদ আরো আহ্লাদিত হলেন। বললেন ঃ বংশ আলো করেছে।

শিলাদ মাথা রাখলেন ঋষিদ্বয়ের চরণে। নন্দীও প্রণত হলেন।

তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। বললেন ঃ ধর্ম কর, ধর্ম বাড়ুক। গুরুসেবা কর, অশেষ মতি হোক এই সেবায়।

শিলাদ কললেন ঃ তপে সিদ্ধি পেয়েছেন। নিত্য সত্য বলেন। প্রাণীর গতিও আপনাদের অজানা নয়। আশীর্বাদ করলেন, সুন্দর আশীর্বাদ। আমার পুত্র আপনাদের আশীর্বাদ পেল। আমি ধন্য, পুত্রও ধন্য। সবই হল, কিন্তু দীর্ঘ আয়ু তো আশীর্বাদ করলেন না?

মিত্রাবরুণ বললেন ঃ আটবছর আয়ু। এই বছরই শেষ। তার পরই মৃত্যু আসবে। কেউ রোধ করতে পারবে না। আশীর্বাদ বৃথা।

শিলাদের মনে অমাবস্যা ঘনাল। প্রিয় পুত্র। তার মৃত্যু। শিলাদ কল্পনাও করতে পারেন না। শিলাদের মন কালবৈশাখীর উদ্দামতায় বিপর্যস্ত

হল, হতে থাকল।

মিত্রাবরুণ বিদায় নিলেন। শিলাদের ক্রন্দনে ক্রন্দনে সেই সরোবর নীল হল।

পিতা বিমর্ষ, ক্রন্দনে ক্রন্দনে বায়ুস্তরে অনন্ত অবসন্নতা।

নন্দী সুধালেন ঃ কি এমন ঘটেছে যার জন্য আপনি এরকম বিকলচিত্ত হয়েছেন ?

শিলাদ বর্ণনা করলেন। মুনিরা সত্য কথা বলেন, তাঁদের কথা। অতএব শিয়রে অবধারিত মৃত্যু। অকালে পুত্র যাবে, বাতি নিভবে।

নন্দী বললেন ঃ আমার মৃত্যু সহজ নয়। দেবদানব বা যম কারো ইচ্ছাতেই কিছু হবে না। শরীরে আঁচড়টি পড়বে না। আপনি শান্ত হোন।

শিলাদ বললেন ঃ কি এমন যোগ শিখেছ কি এমন তপস্যা জেনেছ যার বলে অনিবার্য মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে।

ঃ বিদ্যায় নয়, তপস্যায় নয়। বিদ্যায় হয় না, তপস্যায়ও হয় না। যাতে হয় আমি তা-ই করব। দেবাদিদেব মহাদেব অনুগ্রহ করবেন, আমি পাব, মৃত্যুকে জয় করব। অন্য উপায় নেই, পথও নেই। একমাত্র সেই তাঁরই কৃপায় যা সম্ভব আমি তা অর্জন করব, তিনি জয় করবেন আমার মৃত্যুকে। আমি আয়ু লাভ করব।

ঃ হাজার বছরের তপে দর্শন পেয়েছিলাম মহাদেবের। বর দিলেন। পুত্র পেলাম, তোমাকে পেলাম। কিন্তু হাতে মাত্র এক বছর। কি করে পাবে তাঁকে, জয় করবে মৃত্যুকে ? হাতে মাত্র এক বছর।

ঃ তপস্যা নয়, বিদ্যা নয়। কিন্তু তাঁকে পাব। পাব ভক্তিতে। শুদ্ধ মন নিয়ে পরম ভক্তি ভরে তাঁকে ডাকব, পাব, পাব, পাব। মৃত্যুকে জয় করব। প্রশান্ত মনে বিদায় দিন। আমি ফিরব। কৃতার্থ হয়ে ফিরব। জন্ম হবে না, মৃত্যুও হবে না। কিছুই হবে না। কৃতার্থ হয়ে ফিরব। বিদায় দিন। মনে যে কালমেঘ জমেছে ওটিকে উড়িয়ে দিন। আমি নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন করব। মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করবে না, কোনমতেই পারবে না। সহস্র মৃত্যু, শতকোটি যম ক্রোধে আরক্ত হয়ে দণ্ডপাশ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিদ্ধ করলেও আমি যেমন আছি তেমনই থাকব। ভয় দূর করুন। আমার মনে শুদ্ধভাব, জলে থাকব, জপ করব শতরুদ্রীয় অধ্যায়। মহাদেব দর্শন দেবেন। মহাদেব বর দেবেন। আমার মৃত্যুকে হরণ করবেন।

শিলাদ স্তব্ধ হলেন। পুত্রের কথায় আশ্বস্ত হলেন। বিদায় দিতে হবে। দিলেন। মনে মনে জেগে রইল বিদায় দেবার অনন্ত বেদনা।

নন্দী প্রণত হলেন। পিতার পদবন্দনা করে প্রস্থান করলেন।

এবার শুরু হবে তাঁর জপ ধ্যান, ভক্তির প্রদীপে শিবের আরতি।

নন্দী যাত্রা করলেন। সম্মুখে প্রসারিত বিসর্পিত পথ। নন্দী চলেন। পথ চলে। নন্দী চলেন।

পথের শেষ হল। সম্মুখে নদী। ভুবনা নদী। নন্দী নদীতে প্রবেশ করলেন।

জলমধ্যেই রচিত হল ধ্যানের আসন। তন্ময় নন্দী। তদ্গত নন্দী। নিমজ্জিত নন্দী। নন্দী জপ করেন। শিবজপ। ক্রমে কোটি জপ সম্পূর্ণ হল।

মস্তকে জটার ভার। মহাদেব। নন্দীর সম্মুখে প্রসন্ন মহাদেব। বললেন ঃ প্রীত হয়েছি। বর প্রার্থনা কর।

নন্দী প্রণত হলেন। বললেন ঃ আর এক কোটি জপ করি, মনে এই অভিলাষ। পূরণ কর।

মহাদেব ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করলেন।

আবার জল, জপ, ধ্যান। তন্ময় নন্দী। বিভোর নন্দী। আর এক কোটি জপ হল।

মহাদেব এলেন। বললেন ঃ বর নাও। আমি এসেছি।

নন্দী বললেন ঃ মনে জাগ্রত আর এক কোটি জপের সাধ। পূরণ কর।

মহাদেব প্রস্থান করেন। নন্দী জপ করেন। তৃতীয় কোটি জপও পূর্ণ হল। নন্দীর শরীর উজ্জ্বল শিখা বিস্তার করে জ্বলল। যুগান্ত সূর্যের প্রভা নন্দীর সর্ব শরীরে।

মহাদেব এলেন। সঙ্গে ভূতগণ। নন্দীকে হাতে ধরে তুললেন। দক্ষিণ হস্তের স্পর্শ বিন্যস্ত করলেন নন্দীর দেহে। বললেন ঃ তপস্যা করছ, আমি অতীব তুষ্ট হয়েছি। এবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর।

নন্দী বললেন ঃ এক কোটি জপ করি—এই বর দিন। করি, ধন্য হই।

মহাদেব বললেন ঃ আমার মহা সন্তোষ সংসাধিত হয়েছে। অতএব আর কেন ? যা চাইবে তা-ই পাবে। ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক চাও, পাবে। সূর্য হতে চাও, রুদ্র হতে চাও, হবে। যা চাও তা-ই পাবে। অতএব আর কেন ?

মহাদেবের শ্রীচরণে নন্দীর মস্তক সংস্থাপিত হল। স্তবের ধ্বনি উঠল তাঁর কণ্ঠে ঃ

এদিক ওদিক সর্বদিক তুমি ব্যাপ্ত করে রয়েছ। তুমি অতীন্দ্রিয়, যোগীশ্বর, তুমি অজেয় তোমাকে শতকোটি নমস্কার। সহস্র কোটি নমস্কার। কোটি কোটি নমস্কার। তোমাতে আমার চির অনুরক্তি আসুক, ভক্তি আসুক। এই বর দান কর। করে ধন্য কর।

প্রণত নন্দীর দুই চোখে ভক্তির বিগলিত ধারা। মহাদেব সম্প্রীত চিত্তে নন্দীকে তুললেন। শ্রীহস্ত দ্বারা পরম স্নেহে মুখ মুছিয়ে দিলেন।

বললেন ঃ আমার প্রসাদ পেয়েছ। সব পেয়েছ। জন্মগ্রহণের ক্লান্তি, জরার যন্ত্রণা, মৃত্যুর ভয়াবহতা তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি শিবলোকে সমুত্তীর্ণ হবে। তুমি হবে, তোমার আত্মীয়, বন্ধুজন শিবলোকে সমুত্তীর্ণ হবে। আমার মত হবে, সর্বদা থাকবে আমারই পাশে পাশে। বলে, বীর্যে, পরাক্রমে, রূপে তুমি আমার মত হবে। যে ক্ষীরোদসমুদ্র বহুতর ঐশ্বর্যমণ্ডিত, বহুতর দ্বীপে পরিশোভিত সেখানে তুমি বাস করবে।

মহাদেব বর দিলেন। নন্দীর গলায় শোভা পেল মহাদেবের দেওয়া পদ্মের দিব্য মালা। পরিশোভিত নন্দী নবকান্তিতে ঐশ্বর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে জ্বললেন। মহাদেবের পাশে মহাদেব। দ্বিতীয় শঙ্কর। নন্দী শঙ্কর হলেন।

মহাদেব বললেন ঃ এ স্থানেই সিদ্ধি পেয়েছ। জপেতপে এবং অবশেষে সিদ্ধি প্রাপ্তিতে এ স্থান পুণ্যজনক। জাপ্যেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হোক এই মহাস্থান।

এক নদীর সৃষ্টি হল। গর্ভে তার পবিত্র সলিল, অশেষবিধ শোভা। নদী স্ত্রীমূর্তি ধারণ করল। পদ্মের দলের মত দুই চোখে অপার্থিব চাহনি। নদী করজোড়ে মহাদেবের সম্মুখবর্তী হল।

মহাদেব বললেন ঃ তোমার নাম হোক যজ্ঞোদকা। যজ্ঞের জন্যই তোমার জল উদ্ভূত হয়েছে। অতএব ঐ নামই যথার্থ।

সম্মুখে দেবী ভবানী। মহাদেবের সঙ্গে নন্দী। দেবীকে বললেন ঃ নন্দী পুত্র, ওকে স্নেহ কর।

দেবী নন্দীর মস্তক আঘ্রাণ করলেন। স্নেহের স্পর্শ সঞ্চালন করলেন তার গায়ে। হৃদয়ে পুত্রস্নেহ! দেবীর শরীরে পয়ঃস্রোত উৎপন্ন হল। নন্দী অভিষিক্ত হতে থাকলেন সেই স্রোতের ধারায়। তিন স্রোত। দেবীর কর্ণপথে উৎপন্ন হল এক মহানদী। ত্রিস্রোতা নদী। নন্দী হৃষ্ট হলেন। উল্লাসের ধ্বনিতে উচ্ছ্বসিত হলেন॥

৪৭· নন্দীশ্বরের অভিষেক ও বিবাহ

মহাদেব পার্বতীকে বললেন ঃ নন্দীকে গাণপত্য দেওয়া হবে। সম্মতি আছে তো তোমার ?

দেবী বললেন ঃ নন্দী আপনার পুত্র। বাধা নেই কোন। সপ্তলোকের আধিপত্যে, গণাধ্যক্ষদের আধিপত্যে স্বচ্ছন্দে নন্দীকে ভূষিত করা চলে।

দেবীর উত্তরে মহাদেব পরিতুষ্ট হলেন।

মহাদেবের চতুর্দিকে সিদ্ধ, সুর ও প্রথমগণ। মহাদেব পূর্বমুখী হলেন।

মহাদেবের বহু অনুচর। দিগ্বাসী অনেক রুদ্র। মহাদেব সবার কথা চিন্তা করলেন।

দেখতে দেখতে গণাধ্যক্ষরা মহাদেবের সম্মুখবর্তী হলেন। পূর্বদক্ষিণ উত্তর পশ্চিম ঊর্ধ্ব অধঃ বিভিন্ন দিক থেকে তাঁরা এলেন। মহাদেবের সম্মুখবর্তী হলেন। মহাদেব পরিবৃত হলেন।

হাতে হাতে তাঁদের বিচিত্র শস্ত্র। শূল, নিষঙ্গ, বহুতর সব শস্ত্র। বিচিত্র তাঁদের আকার, বিচিত্র বর্ণ। কারও কণ্ঠ নীল, কারও গ্রীবা কৃষ্ণ। কারও চোখে কোটিসূর্যের প্রভা। একজনের শতনেত্র, একজনের শতপাদ। বিচিত্র তাঁদের ক্ষমতা। ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন করতে পারেন কেউ। কেউ পারেন বায়ুর মত বেগে চলতে।

গণাধ্যক্ষরা এলেন। একে একে শিবসমীপে গণাধ্যক্ষরা এসে উপস্থিত হলেন।

ভারভূতি। গণাধ্যক্ষ। দর্শনে অনন্ত ভীতি জাগে এমন তাঁর মুখ। চোখে ভ্রূকুটি। পঞ্চযোজন লম্বা, পঞ্চযোজন চওড়া। ভারভূতি এলেন। চন্দ্র ও শঙ্খের মত রঙ, চার মুখ। মুখে মুখে প্রসারিত জিহ্বা। কানদুটি আকাশ মুখী, উদ্ধত। হাতে পাশ। মনের মত বেগ। গণাধ্যক্ষ ভারভূতি এলেন। সঙ্গে শত ভূত, ভারভূতির সদৃশ।

এলেন সোমবর্ষ। সঙ্গে কোটি রথি। যোগে ধ্যানে সোমবর্ষে অনন্তশক্তি।

অম্বাশিব এলেন। শিবের পার্ষদ। হাতে শূল। এলেনঃ মনে হল প্রলয়ের বহ্নি প্রজ্বলিত হল। অম্বাশিব। শিরে অর্ধচন্দ্র, চার চার হাত, এক পা। সঙ্গে শতকোটি গণপতি। হাতে হাতে তাদের শূল।

হর এলেন। বিশাল উদর, হাজার হাত, হাজার চরণ, হাজার চক্ষু। গলায় মুণ্ডের মালা। মাথায় অর্ধচন্দ্র ও সর্প। হর এলেন, সঙ্গে এক এক কোটি হর।

তেজে তেজে দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করে এলেন চতুর্মুখসোম।

মহাদেবোর্ধবাহনের ভয়াল বিশাল মুখ। উদর কৃশ। হাজার হাত নেড়ে শত চরণে হেঁটে তিনি এলেন। শঙ্কুর মত দুটো কান। মাথার কেশে যেন বন্দী বিদ্যুৎ।

অজৈকপাদ। সম্মুখে চলতে পারেন, পশ্চাতে পারেন। কোটি প্রমথে পরিবৃত হয়ে তিনি এলেন। একটি পর্বত চলে চলে এল। সোনার পদ্ম ও বৃক্ষে বৃক্ষে শোভিত একটি পর্বত চলে চলে এল। অজৈকপাদ এলেন শিবসমীপে।

আর এক গণপতি। চারিদিকেই মুখ, চারিদিকেই হাত, চারিদিকেই পা। প্রবল ও পরাক্রান্ত।

অপাদ আর একজনের নাম। বাহু ক্ষুদ্র, কিন্তু অশনি শোভিত। সঙ্গে আট কোটি অনুচর। অপাদের মতই সবাই। সঙ্গে আরো শতকোটি গণপতি।

কুন্দের বর্ণ বিকীর্ণ করতে করতে উপস্থিত হলেন নিকুম্ভ। শিরে চন্দ্র, গলায় মাল্য। সহস্র হাত, শত চরণ, শত মুখ। মাথায় বিদ্যুতের কেশগুচ্ছ। সঙ্গে শতকোটি গণ।

সূর্যাপ্যায়ন শিবের পরম প্রিয়। শত সর্পে মাল্য রচনা করে সূর্যাপ্যায়নের সজ্জা রচনা করেছে। তপে তপে প্রদীপ্ত তিনি।

আরো বহু এলেন। এলেন বজ্রাভরণ, সর্বমানী, মহাতেজা, চন্দ্রায়ুধ, চক্রধারী, কটাকট। ছয় কোটি গণ সঙ্গে তাঁরা এলেন।

আরো এলেন। এলেন প্রণবাদিত্যমূর্তি, চন্দ্রাবর্তন, সহস্রশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ কম্বভদ্র, কুম্ভকর্ণ, ধূম্রকেশ, নীলোদ্ভব, সপ্তশিরা, অপস্মার, বিশ্ববল, মহীধর, মহাবল, বিনায়ক, নন্দিক, পিঙ্গাক্ষ, কুষ্মাণ্ড, ককুদ, অমোঘ, ভূতিক, দেবেশ, পতাকী, বিকৃতি, বীর, কুম্ভ, মনু, মেঘ প্রভৃতি গণপতি। শিবের চতুর্দিক গণপতিগণ ও তাঁদেব অনুচরবর্গে সমাচ্ছন্ন হল।

বীরভদ্র, মেঘসৌদামিনী, বিদ্যুৎ, মৃত্যু, যম, কাল, বিষধর, শতমাব, মহামার, পর্বতাভরণ, একশৃঙ্গ, ভৃঙ্গিরিটি—এঁরাও বাদ গেলেন না।

সকলেই গাল বাজিযে মহাশব্দে গগন পরিপূরিত করে শিবসমীপে সমুপস্থিত হলেন। কেউ রথে এলেন, কেউ এলেন পুষ্পকবিমানে। কেউ এলেন অশ্বে, নাগে, ভল্লুকে। কেউ এলেন সিংহে, পক্ষীতে, ব্যাঘ্রে, হস্তীতে।

দিকে দিকে ভেরী নিনাদিত হল। শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পণব, আনক, গোমুখ, একপুষ্পক, পটহ, সম্মিলিত ভাবে বাজতে থাকল। সঙ্গে মিশল ডমরু ডিণ্ডিম, বেণু, বীণা, দর্দর ও করতালের ধ্বনি।

অবশেষে বিষ্ণু এসে আসন পরিগ্রহ করলেন। চারিদিকে রইলেন সিদ্ধ মুনিরা। দক্ষিণে রইলেন ঋগ্বেদ, দিব্যকুণ্ডলে অলংকৃত। পশ্চিমে রইলেন সামবেদ, বিচিত্র তাঁর রূপ। উত্তরদিকে অথর্ববেদ প্রদীপ্ত হলেন। পূর্বদিকে যজুর্বেদ, সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের দীপ্তি, আগে আগে রইল ইতিহাস, পুরাণ।

মহাদেবের চতুর্দিক সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হল। বাতাস ধ্বনিতে ধ্বনিতে প্রকম্পিত হল।

মহাদেব বিষ্ণুকে বললেন: অভিষেক কর। আমার এবং নন্দীব। নারায়ণ সামান্য হাসলেন। বললেন: তাই কবব।

ইতোমধ্যে ইন্দ্র, বসুগণ প্রভৃতি দেবতা আকাশপথে মহাধ্বনি বিস্তার করে আগমন করলেন।

প্রমথরা মহাদেবকে প্রণতি জানাল। বলল: কি কারণে এই বিরাট ব্যবস্থা? কি করতে হবে আমাদের? সমস্ত সমুদ্র কি মরুতে পরিণত করতে হবে, না

পর্বতসমূহের উৎপাটনে সৃষ্টি করতে হবে সমুদ্র? নাকি সবান্ধবে যমকে পাঠাতে হবে যমালয়ে?

মহাদেব বললেনঃ ও সব নয়। কি কারণ, শ্রবণ কর। নন্দী আমাদের প্রিয়তম। আমার ইচ্ছা নন্দীশ্বর তোমাদের উপর প্রভুত্ব করুন। তোমরা তাঁর অভিষেক সম্পন্ন কর।

মুহূর্তে অভিষেকের উপকরণ সংগৃহীত হল। সুমেরুর মত আসন হল, মণ্ডপ রচিত হল। সবই স্বর্ণময়, দিব্য। মণ্ডপের স্তম্ভে স্তম্ভে জ্বলল বৈদূর্য, মুক্তা, মণি, রত্ন।

নন্দীকে সেই দিব্য আসনে স্থাপন করা হল। মহাদেব দিব্যবস্ত্রে, গন্ধদ্রব্যে, কেয়ূরে, কুণ্ডলে, মুকুটে নন্দীকে সুসজ্জিত করলেন। হার, পট্টিশ, শূল, বজ্র, রশনা, ছত্র এবং চামর। নন্দী গ্রহণ করলেন মহাদেবের হাত থেকে।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা নন্দীর স্তব করতে লাগলেন। স্তবের মন্ত্র ধ্বনিতে, ভক্তির ভাবে সকলের চিত্ত প্লাবিত হল।

নন্দী অভিষিক্ত হলেন।

দেবতারা জয়ধ্বনি করলেন। অসুরেরা জয়ধ্বনি করলেন। যক্ষ ও নাগ গণও জয়গান করল। সঙ্গে বাদ্য বাজল বহুশত। ডিণ্ডিম, ধেনুকা, মর্দনা, শঙ্খ, ভেরী, মর্দল, বংশ, বাংশিকা, কর্করা ও গোবিষাণিকা বাজল। ঐকতানে ঐকতানে আকাশ বাতাস আহ্লাদিত হয়ে উঠল।

নন্দী অভিষিক্ত হলেন।

এবার নন্দীর বিবাহ।

মহাদেব দেবতাদের নিকট কন্যা প্রার্থনা করলেন। যেমন-তেমন কন্যা নয়। লক্ষ্মীমন্ত কন্যা, পয়মন্ত কন্যা। মনকে রঞ্জিত করবে, মনকে হরণ করবে। এমন কন্যাই কাম্য।

মহাদেব বললেনঃ দাও, প্রীত ও প্রসন্ন হব।

দেবতারা বললেনঃ প্রভু, নন্দী জগতের প্রভু। সেই হেতু সেই কন্যারও এবং আমাদেরও। আপনি কেন প্রার্থনা করছেন? এটি স্বস্তিপ্রদ নয়। আমাদের পিতা কশ্যপ, পিতামহ মরীচি, তাঁর পিতা ব্রহ্মা, আপনি ব্রহ্মারও পিতা। আপনি প্রার্থনা করছেন, শুধু শুধুই লজ্জিত করছেন আমাদের।

মহাদেব বললেনঃ মিথ্যে বলনি। কিন্তু উপায় নেই। লোকহিতের জন্যই আমার এই প্রার্থনা। মুনিরা এরকম করেন। সনাতন ধর্ম রাখতে হবে, অদত্তা কন্যা তাই গ্রহণ করা ঠিক নয়।

দেবতারা ধ্যানে কন্যা সমর্পণ করলেন। ব্রহ্মা হোতা হলেন। নন্দীর বিবাহ হল।

চারণগণ এলেন, গন্ধর্বরা এলেন। নারদ এলেন, পর্বত এলেন। এলেন

চিত্রসেন, সর্বাশিব, সুরুচি, হাহা, হূ হূ। এঁারা এলেন, গান করতে করতে এঁরা এলেন। গানে গানে বায়ু মধুময় হল, সবার চিত্তে আবেশের ঘোর নেমে এল।

উর্বশী এলেন, রম্ভা এলেন, তিলোত্তমা এলেন। আরো এলেন বহু বহু অপ্সরা। নৃত্যে নৃত্যে দেবমণ্ডলী বিমুগ্ধ হলেন। গানে গানে নৃত্যে নৃত্যে সুন্দরের প্লাবন রইল। নন্দীর বিবাহ সভা প্লাবিত হল।

নন্দীর মনে অনন্ত আনন্দ। মহাদেব ও পার্বতীর চরণ বন্দনা করলেন নন্দী। একে একে আশিস্ মাগলেন বিষ্ণুর, ব্রহ্মার।

মহাদেব নন্দীকে বললেনঃ তুমি পুত্র, এ পুত্রবধূ। আমার পুত্রবধূ তোমার প্রিয়া। আমি কৃতার্থ, আমি প্রসন্ন। এবার বর দিতে চাই, প্রার্থনা কর।

নন্দী বললেনঃ আমার শিবভক্তি চিরন্তন হোক, শিবপ্রসাদেও যেন বঞ্চিত না হই কোনদিন। এ ছাড়া আমার আর কিছু কাম্য নেই। একটি মাত্র প্রার্থনা আছে। আপনার অদেয় কিছু নেই। আপনি দেবেন। আমার পিতা শিলাদ। তাঁকে আপনি অনুগ্রহ করুন।

শিব বললেনঃ তোমার প্রতি আমি তুষ্ট, দেবী পার্বতীও পরিতুষ্ট। তুমি যাবে, তোমার পিতা যাবেন, পিতামহ যাবেন। যাবেন যেখানে আমার বাস সেখানে। সবাই যাবেন শিবলোকে। শিবলোকে গতি হবে, ঐশ্বর্যে সমন্বিত হবে। বলে বলে হবে পরাক্রান্ত, গুণে গুণে হবে সর্বপূজ্য। হবে, হবে। তোমার বংশের সবার হবে। আর আমি আছি তুমিও আছ, তুমি আছ আমিও আছি। সর্বত্র আমি-তুমি, তুমি-আমি। বৈভ্রাজ পর্বতের অনন্ত গুণ। তাবৎ ইচ্ছা চরিতার্থ হয় বৈভ্রাজে এলে। বৈভ্রাজ পর্বত বৃক্ষে বৃক্ষে জলাশয়ে জলাশয়ে পরিশোভিত। বৈভ্রাজ দিব্য পর্বত। ওটি তোমাকে দান করলাম।

দেবী পার্বতী বললেনঃ প্রাণ চায় তোমাকে বর দিই। তুমি প্রার্থনা কর।

নন্দী বললেনঃ ভক্তি চাই, অচলা ভক্তি।

মরুৎ-এর কন্যা, নন্দীর পত্নী। দেবীর পদতলে তিনি পতিত হলেন। আশিস্ প্রার্থনার আর্তি আকুতি তাঁর সর্বঅঙ্গে। তিনি আশিস্ প্রার্থনা করলেন।

দেবী বললেনঃ জন্ম নিতে হবে না। ও চাকায় ঘুরতে হবে না। আমি যেমন তুমিও হবে তেমন। আমাতে তোমার মতিও থাকবে অটুট। ব্রহ্মা আছেন, বিষ্ণু আছেন, এবার ওঁরা তোমায় বর দিন। তুমি কৃতার্থ হও।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সমস্বরে বললেনঃ দেবীর কথা, দেবী প্রসন্না। তিনি বলছেন। অতএব তাই হবে।

মহাদেব বললেন ঃ নন্দী আমার পুত্র, তোমাদেরও। সেইভাবেই ওকে দেখো। নন্দী আমার দ্বারপাল, নন্দী দেবগণের প্রভু। সেইভাবেই তাকে দেখো।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সমস্বরে বললেন ঃ তাই হবে।

দেবতারাও মহাদেবের কথা শুনলেন, রুদ্রগণও। দেবগণ রুদ্রগণ সমস্বরে বললেন ঃ তাই হবে।

নন্দী বললেন ঃ প্রার্থনা করি আমি যেন আপনাদের প্রিয় হতে পারি, আর আপনারা পারেন আমার। আমাদের বন্ধন হোক প্রীতির। বিচ্ছেদের ম্লান স্পর্শে যেন কখনো আমরা বিষণ্ণ না হই।

রুদ্রগণ বললেন ঃ হে নন্দী, অদ্য থেকে আপনি আমাদের প্রভু। আমরা ধন্য। যেমন কার্তিক তেমনি আপনি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি ও শিবানীর সঙ্গে আপনার বাস। আপনি সফল হোন। দেবাদিদেব স্বয়ং আপনাকে সম্মান দিয়েছেন, সমাদর করেছেন, আমরাও অভিষেক করেছি। তথাপি দেখছি আপনার নম্রতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। যথার্থই গুণে গুণে আপনি গুণময়, আবার গুণহীনও।

নন্দী প্রীত হলেন। তিনি গণপতিদের স্তব করলেন। মহাসম্মেলন সমাপ্ত হল।

অবশেষে একে একে সকলে দেবাদিদেবকে প্রণতি জানিয়ে যার যেথা স্থান সেখানে গমন করলেন, করতে থাকলেন। মহাসম্মেলনের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে শূন্য হল, ধীরে ধীরে সেখানে নেমে এল মহামৌনের প্রশান্তি॥

৪৮. নীল কণ্ঠ

ঋষিরা সম্মিলিত হয়েছেন। মধ্যস্থানে বসে আছেন সনৎকুমার।

ঋষিরা সুধালেন ঃ শিব নীলকণ্ঠ। নীলের শ্রীতে শিবের কণ্ঠ সুন্দর। কিন্তু কি প্রকারে ঐ কণ্ঠপ্রদেশ নীল হল ? অমন মৃত্যুর বর্ণ, অথচ অপরূপ। কি প্রকারে সম্ভব হল এটি ?

সনৎকুমার বললেন ঃ কোটি বৎসর পূর্বে বায়ুর কাছে শুনেছিলাম। যেমনটি শুনেছি ঠিক তেমনটিই বর্ণনা করছি।

সনৎকুমার বর্ণনা করলেন ঃ কৈলাস পর্বতের উত্তরে নদী, উদ্যান, উপবন, সরোবর। কৈলাস পর্বতের উত্তরে পর্বতশৃঙ্গ, দেবমন্দির, বহুতর তীর্থ। নিত্য সেখানে শিবের পূজা হয়। স্তবে স্তবে ওঙ্কারে হুঙ্কারে এবং নমস্কারে সে স্থানে এক অপরূপ দিব্যতা আসে। ভক্তির সৌরভে বায়ু পরিপূরিত

থাকে। একদা মধ্যাহ্ন সময়ে পূজার শেষে বায়ু বললেন, নীলকণ্ঠায় নমঃ।

অষ্টাশি সহস্র বালখিল্য মুনি পূজায় রত ছিলেন। তাঁরা শুনলেন, নীলকণ্ঠায় নমঃ। তাঁদের মনে কৌতূহল উদগ্র হল। বললেনঃ এ নামে মহাপুণ্য। এ নামে বিধৃত অসীম তাৎপর্য। কিন্তু কিভাবে শিবের কন্ঠ নীল হল? হে বায়ু, তুমি জীবের জীবনস্বরূপ, তুমি সর্বত্র যেতে সক্ষম। তোমার সাহায্যেই বর্ণ ধনির রূপ পায়, অর্থময় হয়। কথায় যা ধরা যায় না বোঝা যায় না তাও তোমার ধরাছোঁয়ার মধ্যে। অতএব বল, পাপ নাশ হোক।

বায়ু বললেনঃ বসিষ্ঠ এক ধর্মাত্মার নাম। ব্রহ্মার নাকি তিনি মানসপুত্র। একদা এই বসিষ্ঠ মহাবীর কার্তিকেয়কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কার্তিকেয় শুনেছিলেন শিবের মুখে। শিব বলছিলেন পার্বতীকে। কার্তিকেয় ছিলেন পার্বতীর কোলে। তিনি শুনেছিলেন। পুণ্যকথা। বললে হিত হবে, শুনলে হিত হবে। তাই কার্তিকেয় বলেছিলেন।

কার্তিকেয় বললেনঃ কৈলাস পর্বত। শ্রী ও সৌন্দর্যে অপূর্ব। নবসূর্যের দীপ্তি ও কমনীয় লাবণ্যে অপরূপ। বজ্র ও স্ফটিকে নির্মিত কৈলাসের সোপান। চতুর্দিকে ঐশ্বর্য, চতুর্দিকে সৌন্দর্য। গাছে পালায়, লতায় পাতায়, ফুলে ফলে, পাখির কূজনে কূজনে কৈলাস পর্বত যেন একটি ছবি, যেন একখানি গান। কৈলাস পর্বতের গাত্রে গাত্রে গান খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, ভেঙ্গে পড়ে, পড়তে থাকে। মধুর মোলায়েম সে গান। মধুর, গম্ভীর, ভয়ংকর সে গান।

মুখারত কৈলাস পর্বত। গণেশ্বরের লীলাক্ষেত্র। তাঁরা এখানে নিত্য নব লীলায় প্রমত্ত হন। বিচিত্র তাঁদের আকারপ্রকার। বিচিত্র বেশভূষা। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন জন্তুর মেলা। পরপর বাঘ, সিংহ, হরিণ, ভেড়া, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল। গণেশ্বরদের মুখের ছবিতে বিচিত্র সব জন্তু জানোয়ারের আদল। কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ মোটা, কেউ রোগা। কারো এক কান, কারো দুই, কারো নেই। কারো এক পা, কারো দুই, কারো বিশাল, কারো বহু, আবার কারো নেই, আদপেই নেই। মাথার বেলায়ও এমনি, চোখের বেলায়ও এমনি।

এই কৈলাস পর্বতে একদা শিব ও পার্বতী বসে আছেন। চতুর্দিকে শোভা, সংগীত এবং ভূতগণ।

পার্বতী সুধালেন শিবকেঃ আপনার কণ্ঠ যেন নীল মেঘের পাহাড়। কেন এমন হল?

শিব বললেনঃ ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থিত হল। দেবে দানবে মিলে মন্থন করলেন সমুদ্র। আগে উঠল বিষ। প্রলয়ের আগুন জ্বলেছে, তেজে সমগ্র চরাচর দগ্ধ হচ্ছে। সেই আগুনের মত বিষ উঠল। দেবতারা এবং দানবরা

বিষণ্ণ হলেন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। তাঁরা এলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা অবাক হলেন। দেবশরীর। নিয়ত আলো ঝরে, লাবণ্যের তরঙ্গ উঠে। সেই দেবশরীর ম্রিয়মাণ? দেবতারা ভীত, সন্ত্রস্ত, বিপর্যস্ত। ব্রহ্মা চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের ঐশ্বর্যের শেষ নেই। ব্যাধি নেই, জরা নেই। ত্রিলোকের অধিপতি তোমরা। যখন যেখানে খুশি বিমানে আরোহণ করে অনায়াসে তোমরা যেতে পার। তোমাদের ইচ্ছায় ত্রিলোকের প্রজারা যা খুশি হতে পারে, পেতে পারে। সেই তোমরা ম্লান হয়েছ! মনে হচ্ছে সিংহের পীড়নে কাতর মৃগ। কি ব্যাপার? কি কারণে তোমাদের এই হাল?

দেবতারা বললেন: সমুদ্র মন্থিত হয়েছে। বিষ উঠেছে। অতি ভয়ংকর সেই বিষ যেন জগৎকে দ্রাবিত করবে, নিশ্চিহ্ন করবে।

ব্রহ্মা সম্যক অবগত হলেন। দেবতাদের নিয়ে তিনি আমার কাছে এলেন। বহু প্রকারে আমার স্তব করলেন। আমি প্রসন্ন হয়ে বললাম, আমার দ্বারা কি কাজ হতে পারে?

ব্রহ্মা তাঁর পদ্মের মত দুই চোখ মেলে বললেন: সমুদ্র মন্থনে বিষ উঠেছে। মেঘপাহাড়ের মত প্রলয়ের আগুনের মত সেই বিষ। সবাই ভীত, তাই আমরা আপনার শরণাগত। আপনি প্রসন্ন না হলে চরাচর ছারখার হবে। ঐ বিষ আপনি পান করুন। আপনার পক্ষেই এ কার্য সম্ভব। স্বয়ং বিষ্ণুও বিষের প্রভাবে কৃষ্ণ বর্ণ হয়েছেন। আপনি ব্যতীত ঐ বিষে সমগ্র চরাচর জরজর হবে।

আমি সেই বিষ পান করলাম।

ব্রহ্মা বললেন: বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছেন। আপনার কন্ঠ অপরূপ হয়েছে।

দেবতারা বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কালকুট পান করে আমি নীলকণ্ঠ হলাম।

দেবতাবা স্তব করলেন। করতে থাকলেন। দেবতারা বিমানে আরোহণ কবে অতি ঘোর শব্দে বায়ুমণ্ডল প্রকম্পিত করতে করতে বায়ুর বেগে স্বর্গে উপনীত হলেন। দেবতারা শিবের স্তব করতে থাকলেন।

সনৎকুমার বললেন: আমি এই রকমই শুনেছিলাম।

ঋষিরা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে আদিত্যপথে প্রস্থান করলেন ॥

৪৯. ত্রিপুর দহন

হিরণ্যকশিপু। শ্রেষ্ঠ এক দৈত্যের নাম।

হিরণ্যকশিপু নিহত হল। নৃসিংহ তাকে নিধন করলেন।

দৈত্যদানবেরা ভেঙ্গে পড়ল। সম্পূর্ণ মুষড়ে পড়ল।

ময় আর এক বিখ্যাত দৈত্য। দুঃখ হতাশা তার বুকেও বেজেছে। দানবরাজ হিরণ্যকশিপু। কিন্তু সে নিহত। সিংহাসন আজ শূন্য। হৃদয়ে হৃদয়ে শূন্যতার বেদনা। ময়ের মনও ভারাক্রান্ত। তার কেবলই মনে হতে থাকল কন্দর্পের কথা। রতি নেই, কন্দর্প। পাণ্ডুর কন্দর্প। মৃত্যুপাণ্ডুর হিরণ্যকশিপু।

ময় তপস্যায় মগ্ন হল। তপে তপে দুর্ধর্ষ হবে। মনে এই অভিলাষ। একা ময় নয়। সঙ্গে এল বিদ্যুৎপ্রভ ও তারকাক্ষ। এরাও পরম পরাক্রান্ত। শুরু হল তিন অসুরের নিদারুণ তপস্যা।

শীত আসে। হিমালয়ের হিমসাগরে বসে তারা তপস্যা করে। গ্রীষ্ম আসে। প্রখর সূর্য চরাচর সন্তাপিত করে। পঞ্চাগ্নি জ্বলে। পঞ্চাগ্নি মধ্যে প্রবিষ্ট হয় অসুর। তপ চলে। বর্ষা আসে। চতুর্দিক জলে জলে ভরে। জলময় ভূমি হয় ওদের তপস্যার ক্ষেত্র। ওরা তপস্যা করে।

সহস্র দিব্য বৎসর কাটল, সহস্র দিব্য যুগ কাটল।

তিন অসুরের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকল অগ্নির দীপ্তি। শরীরে শুধু অস্থি ও চর্ম। কিন্তু তেজে সূর্যও যেন লজ্জা মানে।

ব্রহ্মা এলেন। বললেনঃ দুশ্চর তপ করেছ। পূর্বে কালি ছিল। এখন নেই। এক বিন্দুও নেই। দেখছি চিত্ত দিব্য শুভ্র হয়েছে। সমুজ্জ্বল হয়েছে। অতএব সময় হয়েছে। বর চাও, দিই।

ময় মাটিতে জানু পেতে বসল। হাত জোড় করে প্রণত হল। অবশেষে বললঃ অনন্ত শক্তি চাই, হব দুর্ধর্ষ। দিব্য পুর চাই, হব পরম সুখী। হনন করতে পারবে না, অমর হতে চাই, জীবনে মৃত্যু থাকবে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই আমার কামনা। আপনি পরিপূরণ করুন।

ব্রহ্মা বললেনঃ উত্তম বরই প্রার্থনা করেছ। কিন্তু এমন নিশ্ছিদ্র বর দিতে আমি পারি না।

ময় বললঃ যা চেয়েছি তার সমুদয় সিদ্ধ হোক। অন্যথা করবেন না। তবে হাজার বছর পূর্ণ হবার ঠিক পরেই মাত্র অর্ধ নিমেষ সময়ে সামান্য ছিদ্র রাখা যেতে পারে। কোন দেবতা ঠিক সেই সময়ে ত্রিপুরে এসে একটি মাত্র বাণে ত্রিপুর জ্বালিয়ে দিতে পারলেই সূচিত হবে আমার বিনাশ।

ব্রহ্মা আর অন্যথা করলেন না। বললেনঃ তাই হবে।

ত্রিপুর সৃষ্ট হল। মহা দুর্যোগের মেঘ ঘনীভূত হল।

ত্রিপুর। তিন পুরের সমাহার। প্রথম পুর লৌহময়। দ্বিতীয়পুর রজতময়। আর তৃতীয় স্বর্ণময়।

তৃতীয় পুর তুলনারহিত। সেখানে অযুত প্রভা, অমেয় সৌন্দর্য। এ আর

এক স্বর্গ। স্বর্গও হয়ত হার মানে। এ এমন এক পুর।

চন্দ্রের কিরণে প্রতিটি ঘর সেখানে প্লাবিত। স্নিগ্ধ আলোর বন্যায় রাত্রির অন্ধকার সেখান থেকে নির্বাসিত। গ্রীষ্ম সেখানে হতবীর্য। মন্দ মন্দ শীতল বায়ু। অসুরদের করত নিত্য আহ্লাদিত।

ত্রিপুর। সমুচ্চ হর্ম্যমালায় পরিশোভিত। মেঘ নেই, ভয় নেই, অথচ বিদ্যুৎচমক। ঘরের কোণে কোণে এখানে ওখানে সর্বত্র বিদ্যুৎচমক। বিদ্যুতের চমক, অথচ স্নিগ্ধ, সুন্দর। মণিমুক্তা, হীরা মাণিক্যখচিত গৃহগাত্র থেকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিত হয়। হতে থাকে। অসুরদের নয়ন মনে শত শত আহ্লাদের বুদ্বুদ উঠে, ভাঙে, আবার উঠে।

ত্রিপুর। বৃক্ষে বৃক্ষে সমাকীর্ণ। সমস্ত ঋতুতেই বৃক্ষে বৃক্ষে ফুল, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল। বর্ণে বর্ণে দিব্য অপরূপ।

ত্রিপুর। দীঘিতে সরোবরে পরিশোভিত। সরোবরে সরোবরে সহস্র সহস্র পদ্ম! খুশি সেখানে ছবি হয়েছে। ছবি সেখানে প্রাণ পেয়েছে। তারা ঈষৎ ঈষৎ নাচে, দোলে। পুলক বিস্তার করে দর্শকের চিত্তে। সেখানে গান আছে। শত শত বিহগের কূজনে কূজনে সেখানকার বাতাসে গান ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। পুলক বিস্তারিত হয় অসুরদের চিত্তে।

ত্রিপুর। সহস্র কামিনী পরিবৃত এক রম্যপুর। রমণীয় ত্রিপুর। অযুত কামিনীর নয়নে নয়নে সেখানে বিদ্যুৎ ঝলে। যৌবন সেখানে চিরবন্দী। টানা-টানা নয়নে নয়নে লজ্জা। চপলতা। পুরুষের বক্ষ মাঝে রক্ত নৃত্য করে উঠে, অবশেষে নৃত্যে নৃত্যে উন্মত্ত হয়—এমন অযুত কামিনীতে ত্রিপুর পরিবৃত।

ত্রিপুর। লোহার পুরে থাকে তারকাক্ষ। রজতের পুরে থাকে বিদ্যুৎপ্রভ। ময় থাকে সোনার পুরে। তিন পুরে তিন অসুর। দুর্ধর্ষ, তপের বলে ব্রহ্মার বরে অজেয়।

তিনপুরে তিন অসুর। তিন পুরে ভোগ, ভোগ, ভোগ, বিলাস, বিলাস, বিলাস। অঢেল, অফুরন্ত। ক্ষমতা করায়ত্ত। তিন ভুবনের তাবৎ সৌন্দর্য লুণ্ঠন করে তিন অসুর প্রমত্ত হল। শত্রুর বলগর্ব নষ্ট করে জগতের শ্রী ও সৌন্দর্য হরণ করে তারা উন্মত্ত হল। দেবতারা নিয়ত ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকলেন। অবজ্ঞা, অবহেলা, অত্যাচারে তাঁরা সন্তাপিত হতে থাকলেন।

দিব্য সহিষ্ণুতা। তাতেও ফাটল ধরল একদিন। দেবতারা ক্রুদ্ধ হলেন। সামান্য অসুর, তার এত প্রতাপ, এত ঔদ্ধত্য! দেবতারা বিচলিত হলেন। কিন্তু জানতেন ময়ের বিনাশ নেই। এলেন তাই ব্রহ্মার কাছে।

ব্রহ্মা। সম্মুখে সন্তাপিত দেবমণ্ডলী। ব্রহ্মা শুনলেন। ময়ের অত্যাচারের কাহিনী তিনি শুনলেন। ব্রহ্মা। সম্মুখে ক্রুদ্ধ দেবমণ্ডলী।

ব্রহ্মা বললেন ঃ আমার সাধ্য নয়, তোমাদেরও নয়। শক্তিতে ওরা দর্ধর্ষ।

তোমাদের শক্তি ও বীর্যও কম নয়। কিন্তু ময়ের সম্মুখে ধূলিতে বিলীন হবে। একমাত্র গতি শিব। অতএব চল। আমিও সঙ্গে যাব, বিষ্ণুও যাবেন। অতএব চল। দেবাদিদেবের স্তব করি, নিবেদন করি সন্তাপের কথা। ত্রাণ আসবে। তিনি আনবেন।

শিব থাকেন কৈলাসে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু কৈলাসে এলেন। শিবদর্শন হল। দর্শন, অতঃপর স্তব।

সম্মিলিত স্তবের তরঙ্গে শিবের সন্তোষ উজ্জ্বল হয়ে দুলল। তিনি বললেনঃ বিপদ ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু কি চাও তোমরা? আমি কি করতে পারি তোমাদের জন্য? জ্ঞাপন কর। চরিতার্থ হবে, অবশ্যই হবে।

দেবগণ নিবেদন করলেনঃ তিন অসুরে মিলে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করছে। অপ্সরাদের হরণ করছে। স্বর্গের শ্রী দলিত, অবমথিত। ব্রহ্মা বর দিয়ে রেখেছেন। অতএব ওদের সম্মুখে আমাদের শক্তি নিতান্তই তুচ্ছ, বানের মুখে তৃণের মত। ব্রহ্মা বলেছেন, ক্ষমতা নেই। বিষ্ণু বলেছেন; ক্ষমতা নেই। অজেয় ও দুর্ধর্ষ ময়। ব্রহ্মাবিষ্ণুও স্তব্ধ। একমাত্র আপনিই গতি। আপনিই পারেন। রক্ষা করুন আমাদের। সন্ত্রাসের নরকে পচে মরছি। ওরা বলছে দেবতাদের নিধন করবে। ওরা পরম পরাক্রান্ত। আপনি রক্ষা করুন। কিংবা পথ বলুন। বর দেবেন? দিনঃ ত্রিপুর নষ্ট হোক, ওরা নিহত হোক। এইই আমাদের কামনা।

শিব অভয় দিলেন। বললেনঃ আমার তেজের অর্ধেক গ্রহণ কর। যুদ্ধ কর। ওরা ধ্বংস হবে।

দেবতারা বললেনঃ আপনার তেজ! সে অতি ঘোরতর ও ভয়ংকর। অর্ধাংশ কেন, সহস্র ভাগের এক ভাগ সহ্য করবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। ও শক্তি আমাদের ধারণারও অগম্য। গ্রহণ তো জলে শিলা ভাসার মত। আপনি সদয় হোন। নিজে অস্ত্র ধরুন। ত্রিপুর বিনষ্ট করুন। ব্রহ্মা বর দিয়ে রেখেছেন। বড় মারাত্মক সে বর। একমাত্র ভরসা অর্ধনিমেষ সময়। হাজার বছর পুরবে। ঠিক তারপর অর্ধনিমেষ। সেই সময় কাউকে ত্রিপুরে যেতে হবে। একটি মাত্র বাণে দগ্ধ করতে হবে পুর। তবেই সম্ভব। অন্যথায় স্বর্গ নিশ্চিহ্ন হবে।

মহাদেব বললেনঃ ত্রিপুর দুর্গম। অতি উত্তম কথা। আমিই যাব। ত্রিপুর দগ্ধ করব। রথ প্রস্তুত কর। আমাকে বহন করতে পারে এমন দিব্য রথ প্রস্তুত কর। রথে আরোহণ করে আমি ত্রিপুরে যাব, পুরী দগ্ধ করব।

দেবতারা সন্দীপ্ত হলেন। বুকে যেন হিমালয় চেপে ছিল। সেটি নামল। অন্ধকারে ডুবে ছিলেন। সম্মুখে আলোর সাগর। বিষণ্ণ দেব-অন্তর লক্ষ ফণা বিস্তার করে আনন্দে দুলতে লাগল।

শিব আরোহণ করবেন। যুদ্ধে যাবেন। রথ প্রস্তুত করতে হবে। স্বয়ং শিব বলেছেন রথ প্রস্তুত কর। অতএব দেবতারা প্রযত্নে পরায়ণ হলেন।

মহারথ নির্মিত হল। ব্রহ্মা, সূর্য, পবন, কুবের, যম সমস্ত দেবতাই সেই রথে স্থাপিত হলেন। কয়েকজন দেবতা হলেন ধ্বজ। চার বেদ হল অশ্ব—যোজিত হল মহারথে। রথের চাকা হল বৎসর। হিমালয় ধনু। জ্যা চাই, স্বয়ং দেবদেব হলেন জ্যা। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও তাবৎ দেবতার সম্মিলিত প্রয়াসে ও প্রযত্নে মহারথ প্রস্তুত হল।

শিবসমীপে নিবেদিত হলঃ প্রস্তুত। রথসজ্জা সম্পূর্ণ।

শিব এলেন। দেখলেন। শিব উপরে তাকালেন। শিব নীচে তাকালেন। দেখলেনঃ তেজে তেজে ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যে মণ্ডিত অতি ভয়ংকর এক মহারথ।

শিব ব্রহ্মাকে বললেনঃ হয়েছে। অতি সুচারু হয়েছে। রথ ধনু সবই হয়েছে ঠিক ঠিক। কিন্তু শুধু রথে, শুধু ধনুতে তো ত্রিপুর দহন সম্ভব নয়। বাণ কৈ। আনয়ন কর।

প্রণত ব্রহ্মা বললেনঃ সাধ্যমত সব করেছি। বাণটিকে আপনি সৃষ্টি করুন।

পাশেই ছিলেন বিষ্ণু ও অগ্নি। শিব আহ্বান করলেন। বিষ্ণু হলেন শর। চন্দ্র হলেন শরের মুখ। অগ্নি হলেন শল্য। শিব বাণ রচনা করলেন।

রথ চলবে। সব প্রস্তুত। শিব ব্রহ্মাকে সুধালেনঃ রথের সারথি হবে কে?

ব্রহ্মা নিজেই সম্মত হলেন। অপেক্ষা শুধু শিবের অনুমোদন।

শিব খুশি হয়ে ব্রহ্মার হাত ধরে রথে উঠলেন। শিবরথে শিব। শিব যুদ্ধে গমন করবেন। শিবানুচরেরা সমুপস্থিত হলেন। নন্দীশ্বর এলেন, শঙ্কুকর্ণ এলেন, চণ্ডেশ্বর এলেন। এলেন আরো অনেকে। যোগের শক্তিতে সবাই শিবসদৃশ। রণে অশেষ নৈপুণ্য, অসীম পরাক্রম। এঁরা এলেন। রুদ্রতেজে রুদ্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এঁরা এলেন।

শিব চলেছেন যুদ্ধে। শিব উঠেছেন রথে। শিব পরিবৃত। অনুচরে অনুচরে দিকসমূহ আচ্ছাদিত হল। অস্ত্রেশস্ত্রে ঝনৎকার, ভেরী ও শঙ্খের নিনাদ। আকাশ পরিপূরিত।

শিব চলেছেন যুদ্ধে। শিবমস্তকে বহুতর পুষ্পের পশলা বর্ষিত হল।

দেবতারা বইছেন। শিব দেহের ভার। মহাভার। শিব ভার হ্রাস করলেন। দেববাহিত রথে শিব আসছেন অসুর নিধনে। অসুররা দেখল। দেখামাত্র পলায়ন। য পলায়তি স জীবতি।

ও দিকে ত্রিপুরের আকাশে মেঘ ঘোরতর বর্ণ ধারণ করেছে। নারদ এলেন। দৈত্য দানব সকলে মিলে তাঁকে আপ্যায়ন করল। নারদ আহ্লাদিত

হলেন। বললেন ঃ শিব আসছেন। ত্রিপুর দগ্ধ করবেন। দিব্য রথে চেপে শিব আসছেন। তোমাদের অন্ত্যদশা ঘনিয়ে এল বলে। তিনি আসছেন দিব্যরথে। সারথি স্বয়ং ব্রহ্মা। অতএব যা করার এই বেলা কর।

ময়াসুর চিন্তিত হল। সে দুর্ধর্ষ, ব্রহ্মার বরে বলীয়ান। তথাপি ময় চিন্তার ভারে মস্তক অবনত করে রইল।

ময়ের আহ্বান। তারকাক্ষ এল, বিদ্যুৎপ্রভ এল। অন্যসব অসুরেরাও সমবেত হল। ময় বলল ঃ শিব আসছেন। ব্রহ্মা সারথি। লক্ষ্য ত্রিপুর।

ময়ের কণ্ঠস্বরে বজ্র নিত্য লজ্জাহত। কিন্তু আজ সে স্বর বুঝিবা কিঞ্চিৎ কম্পিত।

তারকাক্ষ বলল ঃ হে দানবরাজ এর জন্যই কি আপনার ললাট কুঞ্চিত? এর জন্যই কি আপনার পরাক্রমের জ্যোতি কিঞ্চিৎ স্তিমিত? মনে হয় আপনি এই মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত। বস্তুত আমরা অবধ্য। ত্রিপুর দুর্ভেদ্য। অতএব স্মরণ করুন বৃহস্পতি ও শুক্রের কথা ঃ বলবানের স্বভাব বীর্য প্রকাশ করা। জয়ের ইচ্ছাকে মনের মধ্যে প্রজ্বলিত করে তুলে শত্রুকে পর্যুদস্ত করাই উচিত কাজ। কোথায় আমাদের বলবীর্য আর কোথায় দেবতাদের বলবীর্য! তুলনাই হয় না কোন।

বিদ্যুৎপ্রভ ঝলসে উঠল ঃ দেবমণ্ডলী মূঢ়। সমাগত তাই রণে। নিতান্তই নিশ্চিহ্ন হবার সাধ হয়েছে, হবেও তাই। হে দানবরাজ আপনি যুদ্ধ করুন। জয় অনিবার্য। আপনি স্বর্গ অধিকার করুন। আমরা দেখি আর এক হিরণ্যাক্ষকে আর এক হিরণ্যকশিপুকে।

ময় চিন্তিত। তারকাক্ষ ও বিদ্যুৎপ্রভর বিদ্যুতের মত কথাতেও তার চিন্তা দূর হল না। ত্রিপুরের আকাশে কৃষ্ণমেঘ ঘনীভূত হচ্ছিল। ময়ের মনেও সেই মেঘ। ময় বলল ঃ তা হবার নয়। হবেও না। কিছুতেই হবে না। অসম্ভব।

ঃ ... .

ঃ তা হবার নয়। কিছুতেই নয়। যিনি দেবদানব সমগ্র বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন, সংহারের কর্তাও যিনি, সেই তিনি আসছেন। আসছেন আমাদের সংহারেরই উদ্দেশ্য নিয়ে। অতএব নিশ্চিত মৃত্যু। অন্য কোন উপায় নেই। ...আমি শিবের ভক্ত। তাই তাঁকে জানি। মুহূর্তের ইচ্ছায় যিনি জগতের সৃষ্টি ও লয় করতে পারেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ! এতো চিন্তারও অগোচর। আমাদের তপস্যার শক্তি, সে তো অকিঞ্চিৎকর। তোমরা বলছ বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে যুদ্ধে বিরত থাকাই শ্রেয়। বরং তাঁকে স্মরণ কর। তিনি পার করবেন। সামান্য নুড়ি, কিন্তু বাসনা আস্ত পর্বত গলাধঃকরণের। তোমাদের 'যুদ্ধ করব', 'জিতব'—এসব কথা শুনে আমার তাই মনে হচ্ছে।

নারদ বললেন ঃ তোমার কথা খুবই সত্যি। কিন্তু সময় অপগত হয়েছে।

তোমরা এমনিও মরবে অমনিতেও মরবে। মিছিমিছি কাপুরুষের মত মরবে এই যা। তোমরা মরবেই। যুদ্ধ কর, মরবে। বিনত থাক, মরবে। কিন্তু মনে রেখ তোমাদের পিতা দনুর কথা। মহাবীর পরাক্রান্ত দনু। এই মুহূর্তে তোমার কথা শুনলে হয়ত তিনি লজ্জায় নীল হতেন। যুদ্ধ কর না। না করাই শ্রেয়। বিনত থাক। মহাদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বিনত থাকাই ভাল। কিন্তু তাতে তোমাদের মৃত্যু হবে, উপরন্তু যশ নষ্ট হবে। যুদ্ধ কর, মৃত্যু হবে, কিন্তু হবে প্রমথেন্দ্র। যুদ্ধ কর, বীর্য প্রদর্শন কর। চাই কি মহাদেব খুশিও হতে পারেন। বরও দিয়ে ফেলতে পারেন। তাই আমার মতে তোমাদের উচিত জড়তা ত্যাগ করা। দনুর পুত্রদের সাজে এমন কাজ করা।

তারকাক্ষ ও বিদ্যুৎপ্রভু সমস্বরে বলল ঃ নারদের কথা খুবই সত্য। হে দানবরাজ এ প্রসঙ্গে বাণের কথা স্মরণ করুন।

ময় বুঝল ঃ নিশ্চিত বিনাশ। তবু বলল ঃ নারদের কথা সত্য, নারদের কথা সুন্দর।

নারদ বললেন ঃ চিন্তা কি ? আমি রক্ষার ব্যবস্থা করছি।

নারদ রক্ষাবন্ধন রচনা করলেন। দানবরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

নারদ সফল হয়েছেন। মায়া বিস্তার করে ওদের যুদ্ধে উদ্দিপ্ত করেছেন। অতএব তিনি খুশি।

প্রহৃষ্ট নারদ উদ্দেশ্য সংসাধন করে শিবসন্নিধানে গমন করলেন।

ত্রিপুরের দানবসমাজে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব। ভেরীর নিনাদ। সজ্জিত দানবসৈন্য।

ঐ আসে, ঐ দেখা যায় রথের চূড়ো—প্রতীক্ষাশ্রান্ত দানবসৈন্যদের মধ্যে মুহুর্মুহুঃ এই ধ্বনি।

অবশেষে সেই মহারথ দানব সৈন্যদের নজরে পড়ল। তারা অগ্রসর হল। প্রজ্বলিত অগ্নি, পিপীলিকা ধায়, ওরাও ধাবিত হল।

আর এক হিমালয়। চলে চলে এগিয়ে আসছে। আসছে ত্রিপুর অভিমুখে।

দূরে ত্রিপুর দুর্গ। শিব সৈন্যরা দেখল। সম্মিলিত হল। উৎফুল্ল হল। আনন্দের ধ্বনি করে উঠল। আকাশ ফাটফাট হল।

মহাদেবের এ পাশে এসে দাঁড়ালেন চণ্ডেশ্বর। ওপাশে ত্র্যক্ষ। চণ্ডেশ্বরের হাতে কুঠার, শাণিত ও প্রজ্বলিত। মুখব্যাদান করে অসীম ভীতি সঞ্চালন করে তিনি দাঁড়ালেন। ত্র্যক্ষের হস্তে ত্রিশূল ও মুষল—তীক্ষ্ন ও প্রচণ্ড।

ভৃঙ্গী, বীরভদ্র আরো বহুশত সম্মুখে অগ্রসর হলেন। কারো হস্তে বজ্র, কারো ত্রিশূল, কারো অসি, গদা, কারো ঋষ্টি।

ওদিকে দৈত্যরাও অগ্রসর হয়ে এল। অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘাত, স্ফুলিঙ্গে আকাশ মার্গ প্রজ্বলিত হল, হুঙ্কারে গর্জনে গগন ভরল।

মহাদেব দেখছেন। রথের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বাণমোচনের সেই চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করতে লাগলেন। যুদ্ধ চলেছে। তিনি দেখছেন। মাঝে মাঝে হাসির অট্টধ্বনিতে ফেটে পড়ছিলেন। সে ধ্বনিতে গণ ও প্রমথরা উল্লাস ও উৎসাহ অনুভব করছিল। সে ধ্বনিতে দানবদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল।

নন্দীও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভৃঙ্গীও বসে রইলেন না। বিদ্যুৎপ্রভকে দশবাণে বিদ্ধ করলেন। অসুরেরা শত শত অস্ত্র নিক্ষেপ করল, কিন্তু ভৃঙ্গীর সামান্য বিকারও উৎপাদিত হল না।

পশ্চাৎ দিক থেকে ভৃঙ্গিরিটিও শূলে বিদ্ধ করলেন বিদ্যুৎপ্রভকে। বিদ্যুৎপ্রভ কাতর হয়ে পড়ল। অবশেষে কোন প্রকারে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে রক্তাক্ত কলেবরে সে পলায়ন করল। কিন্তু ভঙ্গ দিল না একেবারে।

গণেশের কাঁধ ফুঁড়ে বিদ্ধ হল বিদ্যুৎপ্রভর শর। আবারও বাণ মোচিত হল। তেষট্টি বাণে গণেশের মর্ম বিদ্ধ হল, আবার এল দশবাণের এক ঝাঁক। মর্ম বিদ্ধ হল গণেশের।

আহত গণেশ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বিদ্যুৎপ্রভের গলা নিষ্পেষণ করলেন। অবশেষে মস্তকটিকে ছিন্ন করলেন দুষ্ট অসুরের দেহ থেকে। গণেশ এটি করলেন, মনে হল একটি হস্তী একটি পদ্ম ডাঁটি থেকে ছিঁড়ে নিল।

বিশাল শরীর থেকে ছিন্ন একটি মুণ্ড। সে মুণ্ডে বৃন্তচ্যুত পদ্মের অসীম পাণ্ডুরতা। যুদ্ধ হচ্ছে, হয়ত যুদ্ধ নয়, উৎসব। সেই উৎসবভূমিতে বিদ্যুৎ-প্রভের ছিন্নমুণ্ড বৃন্তচ্যুত পাণ্ডুর পদ্ম।

নেমি ও বল। অপর দুই অসুর। পরম পরাক্রমী। ওরা ধেয়ে এল। শঙ্কুকর্ণ আক্রান্ত হলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই শঙ্কুকর্ণ তাঁর নৈপুণ্য দেখিয়ে দিলেন। একটি মাত্র মুহূর্ত। কিন্তু দেখা গেল নেমি ও বলের রথ মুখ থুবড়ে মাটিতে গুঁড়িয়ে পড়েছে। ওরাও কম যায় না। অন্য দুই রথে চেপে আবার এল এগিয়ে। শঙ্কুকর্ণ বিদ্ধ হতে থাকলেন তীক্ষ্ন বাণসমূহে। শঙ্কুকর্ণ অধীর হলেন না, ত্বরা করলেন না। ভাল করে লক্ষ্য করলেন একবার। তারপর ছুঁড়ে মারলেন প্রচণ্ড এক মুষল। এক মুষলে দুই অসুরেরই শেষ নিশ্বাস নির্গত হল।

ত্রিপুর বীরশূন্য ছিল না। আরো বহুশত অসুর হাহা শব্দে এগিয়ে এল। নারাচ, বজ্র, কুঠার হস্তে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রমথগণের উপর। কিন্তু সব তুচ্ছ হল। ধূলিতে মিশল। সিংহের কাছে হল মৃগ। একে একে অসুররা মৃত্যু বরণ করতে থাকল। পর্বতের মত বিশাল দেহ। হাত দুখানি গেছে উড়ে, বমন হচ্ছে রক্ত। ঝড়ের আঘাতে সমুদ্রে পতিত মেঘের মত অসুররা পতিত হতে লাগল।

ওদিকে তারকাক্ষ তখনও পুরীর মধ্যে অবস্থান করছিল। সংবাদ গেল বল হত, নেমিও নিহত। বীর তারকাক্ষ ছুটে বেরিয়ে এল। ক্রুদ্ধ ও আরক্ত তারকাক্ষ। সে ধেয়ে আসছে। শঙ্কুকর্ণ বিলম্ব করলেন না। তার মস্তকে আঘাত করলেন। কিন্তু নিমেষমধ্যে তারকাক্ষ সে আঘাত সামলে নিল। চক্র নিক্ষেপ করল। শঙ্কুকর্ণ আহত হলেন। ক্রোধে সাক্ষাৎ রুদ্র হলেন। মুষ্টির আঘাতে তারকাক্ষের মস্তক বিদীর্ণ করলেন। বিপন্ন তারকাক্ষ। পা টলছে। সব ঝাপসা মনে হচ্ছে। তবুও সে চলতে চেষ্টা করল। আবার অস্ত্র নিক্ষেপ করল। কিন্তু দাঁড়াতে পারল না। আহত তারকাক্ষ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্তে রক্তে বীভৎস হয়েছিল তার শরীর। যন্ত্রণার বীভৎস অভিব্যক্তিটিও ফ্রেমে আঁটা ছবির মত তার মুখে চোখে, সর্বশরীরের কুঞ্চনে বাঁধা পড়েছিল।

তারকাক্ষ নিহত। অসুররা ছত্রভঙ্গ ও হতোদ্যম হয়ে পড়ল। মৃতদেহ বহন করে ময় সমীপে তারা উপনীত হল। ময় সমস্ত শুনল। অসুররা সমস্তই নিবেদন করল। কিন্তু তারা এত বিচলিত, বিপর্যস্ত ও কাতর যে বারবার ক্রন্দনে ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

ময় বলল ঃ বিচলিত হয়ো না। অমৃত আছে। অতএব ওকে পুনর্জীবিত কর।

তারকাক্ষ নতুন জীবন পেল। আষাঢ়ের বিষণ্ণ আকাশে এক ঝলক সূর্য-কিরণের হাসি বিস্তারিত হল।

তারকাক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় উপস্থিত হল। ব্রহ্মা মহাদেবকে বললেন ঃ নিহত হয়েছিল, কিন্তু নতুন জীবন পেয়ে আবার যুদ্ধে এসেছে। ময়ের পুরে অমৃত আছে। প্রভু, অনুগ্রহ করুন। ময়কে প্রহার করে অমৃত হরণ করুন।

মহাদেব মুহূর্তের মধ্যেই অমৃত উদ্ধার করলেন।

ব্রহ্মা বললেন ঃ পরাক্রান্ত দৈত্যদের সঙ্গে আপনার প্রমথগণের যুদ্ধ দেখবার মত। দেখলাম। সহস্র দিব্য বৎসরও দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হল। কিন্তু আসল যে উদ্দেশ্য তাতো সিদ্ধ হল না। ত্রিপুর তো বিনষ্ট হল না। আর কেন অপেক্ষা করেন ? সময় তো সমাগত। এবার নিক্ষেপ করুন। প্রলয়ের বহ্নি বিস্তৃত হোক ত্রিপুরে।

মহাদেব পিণাকে বাণ যোজনা করলেন। মনে মনে ইচ্ছা করলেন ঃ ত্রিপুর নিস্পন্দ হল, সমগ্র চরাচর নিস্পন্দ হল। ভয়ংকর সেই বাণ মোচিত হল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মহাদেবের কণ্ঠচিরে উচ্চারিত হল আত্মধিক্কারের ধ্বনি। নন্দী ছুটে এলেন। প্রণত হলেন। চোখেমুখে ফুটিয়ে তুললেন জিজ্ঞাসা।

মহাদেব বললেন ঃ ময় আমার ভক্ত। ভক্তের বেদনা যে আমাকেই বাজবে। নিবারণ কর। অনলকে, সোমকেও।

নন্দী বায়ুর গতিতে ছুটে গেলেন। দেখলেন ময় প্রণত। শিবভক্তিতে

বিনত।

নন্দী বললেনঃ ভয় রেখ না কোন। সুস্থ হও। মহাদেব জেনেছেন। জেনেছেন ময় এক ভক্তের নাম। অতএব তিনি রক্ষা করবেন।

ময় নন্দীকেও বিনতি জানাল। এদিকে অগ্নি চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে প্রচণ্ড তেজে ত্রিপুরকে লেহন করবার জন্য জিহ্বা প্রসারিত করেছেন।

নন্দী বললেনঃ ক্ষান্ত হও। তাঁর আদেশঃ ত্রিপুর দহনে বিরত হও।

অগ্নির প্রশ্নঃ কেন? কিসের জন্য?

নন্দী বললেনঃ এই পুরীতে যাঁর বাস তিনি শিবভক্ত। তিনি মহাত্মা ময়।

অগ্নি বললেনঃ হে শিবভক্ত তুমি এই পুরী ত্যাগ কর।

ময় পুরী ত্যাগ করল। সঙ্গে নিল সোনার শিবলিঙ্গ।

ময় পুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হল, কিন্তু প্রবিষ্ট হল পাতালে।

নন্দীশ্বর ফিরে এলেন। শিবসমীপে নিবেদিত হল সমস্ত বৃত্তান্ত।

ত্রিপুরে বহ্নি ব্যাপ্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে সমস্ত পুড়ছে। চারিদিকে ভীতি, সন্ত্রাস, পলায়ন, আর্তরব।

সুন্দরী রমণীরা বেরিয়ে পড়েছে। ছুটছে। ত্রাণ খুঁজছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চলেছে। অঙ্গ থেকে খসে পড়েছে তাবৎ আচ্ছাদন। দৈত্যরমণীরা আর্তনাদ করছে। কেউ জানলায় কি গৃহের শীর্ষে, কেউ বিমানে। সব পাথরের মূর্তিঃ বিহ্বল, বিমূঢ়। চতুর্দিক থেকে শত শিখা বিস্তার করে অগ্নি ছুটে আসছে। পলায়নের পথ নেই। সম্মুখে নিশ্চিন্ত মৃত্যু। কেউ মদে পতিসঙ্গে উপভোগের আনন্দে বিহ্বল। পর্যঙ্কের উপর শায়িত অবস্থাতেই সেই মহামৃত্যুর দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে তারা তাকিয়ে রইল।

পুরুষরা ছুটছে। নারীরা ছুটছে। প্রাণের ভয়। সবাই ছুটছে।

সম্ভ্রান্ত রমণী, আকাঙ্ক্ষিত রমণী। প্রাণের ভয়, আঁকড়ে ধরতে থাকল পুরুষকে। সম্ভ্রান্ত, সুন্দরী, কাম্য। পুরুষ মোহে বিহ্বল হতে থাকল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। সম্মুখে ক্ষুধিত হুতাশন। কাম মোহ ছুটে যেতে থাকল। ছুটে পলায়ন করতে থাকল। ছুটতে ছুটতে আগুনের হলকায় ঝলসে ঝলসে কোন দিকে পথ না পেয়ে সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল, মরতে থাকল।

মৎস্য, মকর ও হাঙ্গরের মহোৎসব। একে একে দৈত্যরা পড়ছে। একে একে দৈত্যাঙ্গনারা পড়ছে। মৎস্য, মকর ও হাঙ্গরের মহোৎসব। খুবলে খুবলে গিলে গিলে তারা ভোজন করতে থাকল।

সুন্দরী রমণী। অগ্নিতে কাতর। জলে পড়ে দংশনে কাতর।

সুন্দরী রমণী। জলে পড়েছে, মকরে হাঙ্গরে খুবলে খাচ্ছে। তীরে দাঁড়িয়ে

তাদের পতিগণ। অসহায় তারা। সুন্দরীর রোষভরা দৃষ্টির লেহনে অগ্নির হলকায় তীরে দাঁড়িয়ে তারা জ্বলছে, পুড়ছে। কয়েক মুহূর্ত পরে হয়ত তারাও পড়বে জলে, যাবে জলচরদের পেটে।

রতিক্রিয়ার অবসান হয়েছে। ক্লান্ত ও শ্রান্ত রমণী। পুনর্বার পতির আক্রমণ। রমণীর চোখে রোষ। মকরকবলে দৈত্যরমণী। চোখে রোষ। দুই রোষ, কিন্তু প্রকারে এক।

ত্রিপুর দগ্ধ হল। অগ্নি, চন্দ্র ও বিষ্ণু সহায়ে নির্মিত প্রচণ্ড শর। কর্ম সমাপ্ত। শিবের হাতে ফিরে এল সেই দিব্যশর।

দেবমণ্ডলী মহাদেবকে সহস্রকোটি নমস্কারে স্তুতি করলেন। ত্রাণ এনেছেন। শান্তি এনেছেন। দেবতারা স্বস্তিতে স্বস্তির শ্বাস মোচন করলেন।

মহাদেব বললেনঃ অভীষ্ট সিদ্ধ। অতএব যাও। যার যেখানে স্থান, সেখানে যাও।

শিবও ত্রাণ পেলেন। কৈলাসে এলেন। যেন প্রাণ পেলেন।।

৫০. সাম্য

দরিদ্র। অতি দরিদ্র। স্বামী এবং স্ত্রী। ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী। মাত্র দুজনের সংসার।

ব্রাহ্মণ বিদ্বান, নাম দানরুচি। দানরুচির মন বিদ্যার আলোয় বিধৌত, ধর্মে মার্জিত।

দানরুচির মন অন্যসুরে বাঁধা। সংসারে আছেন, থাকতে হবে তাই আছেন।

দুটি প্রাণীর সংসার। বিষয়রস নয়, মন মজেছে অন্যরসে। তাই উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনেই জীবন চালান।

সংসার চলে, জীবন চলে। দানরুচি পত্নীসঙ্গে ধর্ম করেন, তপ করেন। ভাগীরথীর মন্দ মন্দ হাওয়ায় দিনগুলি আস্তে আস্তে অতি সংগোপনে ভেসে যায়।

দানরুচি ও তদীয় পত্নী। প্রত্যহ হোম করেন। অতিথি সেবা করেন। তারপর দিনের ষষ্ঠভাগে আহার করেন নিজেরা।

সহজব্রতে দিনগুলি সহজে কেটে যেত। অতিথি আসত। প্রায় প্রত্যহই আসত। কিন্তু ফিরত না কদাপি।

দানরুচি ব্রাহ্মণ, ব্রত পরায়ণ। মনে বিদ্যার আলো। দানরুচি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে থাকলেন। উজ্জ্বলতা থেকে ক্রমে উপজাত হল তেজ। তেজে

তেজে দানরুচি অগ্নিকে অতিক্রম করলেন, এমনকি সূর্যকেও।

জ্যোতির্ময় দানরুচি। অগ্নি প্রসন্ন হলেন। দেবতার প্রসন্নতা পুষ্প হল। বর্ষিত হল দানরুচির শিরে।

একটি দিন। দুর্দিন। দিবসের ষষ্ঠভাগ অতিক্রান্ত হল। অতিথি এল না কোন। হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতকেও দানরুচি উপেক্ষা করলেন। সন্ধান করে ফিরলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ মিলল না কোন অতিথির।

দিন শেষ হল। সূর্য পাটে বসল। অতিথি এল না কোন। পশ্চিম আকাশ বেদনায় লাল হল। অতিথি এল না কোন।

উপবাসে দানরুচি ক্লান্ত। এমন ছন্নছাড়া দিন! মনে বিষাদ। দানরুচি বাসুদেবকে স্মরণ করতে থাকলেন।

পতি উপবাসী, পত্নীও তাই। পতির ব্রত, পত্নীরও ব্রত। পতি ও পত্নী। মাত্র দুজন। দুজনেই বিষণ্ণ, উপবাসে খিন্ন।

বাইরে শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ। পথ শূন্য। অতিথি এল না কোন।

অগ্নি দেখলেন। বুঝলেন। অবশেষে তিনি দর্শন দিলেন। চণ্ডাল বেশে কদর্য আকার নিয়ে অগ্নি দানরুচিকে দেখা দিলেন।

দানরুচি দেখলেন গাছের তলে শীতার্ত এক চণ্ডাল। আরো কাছে এলেন। শীত, অথচ শরীরে আবরণ নেই কোন। শত শত ব্রণে সর্বশরীর তার কণ্টকিত। পুঁজরক্ত গড়িয়ে পড়ছে, শুকিয়ে মামড়ি পড়েছে। বীভৎস কুৎসিত এক চণ্ডাল।

দানরুচি দেখতে থাকলেন। আরো এগিয়ে এলেন। মনে অসীম মমতা। নয়নে তারই ছায়া। মুখে তারই প্রতিধ্বনি: আহা, আহা!

দানরুচি আগুন জ্বাললেন। অতি সত্বর জ্বাললেন। শীত কিঞ্চিৎ নিবারিত হল। পীড়িত লোকটি যেন প্রাণ পেল।

দানরুচি বললেন: এসো। আমার গৃহে এসো। অন্নগ্রহণ করবে। এসো।

লোকটি বলল: জাতিতে অতি নীচ। কুৎসিত। এখানেই অন্ন দিন। কাকপক্ষীকেও যেমন দেন তেমনই দিন। গ্রহণ করি।

দানরুচি বললেন: আমি জাত মানি না। জাতে কি আসে যায়। সবার মধ্যেই তো রয়েছেন সেই ভগবান। সৃষ্টির সব কিছুতেই তো তিনি। অতএব চলুন। কুৎসিত অকুৎসিত বলে আসলে কিছু নেই। অতএব চলুন। আমাকে কৃতার্থ করুন;

চণ্ডাল হৃষ্ট হল। দানরুচির গৃহে এল। দানরুচিও যথাবিধি অতিথির পূজা করলেন।

চণ্ডাল-শরীর অন্তর্হিত হল। নির্গত হলেন স্বয়ং অগ্নি। দানরুচির

সম্মুখে প্রসন্ন অগ্নিদেব।

অগ্নি বর দিলেন: সাম্যবোধে উদ্দীপ্ত তোমার চিত্ত। মোহনাশ হয়েছে, পাপ ক্ষয় হয়েছে। অতএব তোমার গতি হোক। মোক্ষই তোমার পুরস্কার ।।

৫১. জিজ্ঞাসু মুনিমণ্ডলী

সৃষ্টির ঊষা। সংসারের ঢাকা ঘুরতে শুরু করেছে সবে। মুনিরা বিবাদে মত্ত হলেন। বাদ চলল, অনুবাদ চলল এবং চলল। মীমাংসা হল না কোন।

একজন বলেন: ব্রহ্ম এই।

অন্যজন বলেন: কদাপি নয়, আসলে ঐ।

কেউ বললেন: বকে মরছ মিছিমিছি। ব্রহ্ম এও নয়, ওও নয়। অন্য এক কিছু।

বাদ চলল, অনুবাদ চলল। জানা হল না কিছুই।

মুনিদের বুদ্ধি উত্তম। ওঁরা এলেন ব্রহ্মার কাছে। সে এক অপূর্ব স্থান। সুমেরুর একটি শৃঙ্গ। এদিকে দশযোজন, ওদিকে দশযোজন। বিস্তীর্ণ এক বন, ব্রহ্মবন। অজস্র ছবি, অসংখ্য গান যেন বিগলিত হয়ে সেই ব্রহ্মবনকে প্লাবিত করে রেখেছে। এরই মধ্যে নির্মিত হয়েছে এক নগর। সোনামোড়া নগর। মণিমুক্তাখচিত হাতির দাঁতে গড়া নগর। আকাশছোঁয়া সব বাড়ি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় আকাশকে চেপে দূরে আরো দূরে সরিয়ে দেওয়ার উদ্ধত ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত।

ব্রহ্মা থাকেন এখানে। মুনিরা এলেন। ব্রহ্মা। যেন কাঁচা সোনা দিয়ে গড়া। অঙ্গে শত আভরণ। মুনিরা বিমুগ্ধ হলেন। মুনিরা অভয় পেলেন। ব্রহ্মার মুখে প্রসন্নতা, পদ্মপাতার মত চোখে করুণা। মুনিদের মুগ্ধতা সীমা ছাড়াল। তাঁরা দেখলেন শুক্লবস্ত্রে আবৃত, মাল্যবিভূষিত ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা বসে আছেন। চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সৌরভ। সৌরভে বায়ু ভুর ভুর করছে।

সূর্য। কিরণ তাঁর শোভা। তেমনি ব্রহ্মার সরস্বতী। চামর হাতে পার্শ্বে সরস্বতী।

মুনিরা অন্যলোকে এসেছেন। দিব্যলোক। মনে দিব্য প্রভাব।

মুনিরা স্তব করলেন। ব্রহ্মা সুধালেন: সবাই মিলিত হয়েছ। এসেছ। কিন্তু কেন?

ওঁরা বললেন: অজ্ঞানের তমে ডুবে আছি। মত্ত হয়েছি তর্কে। কিন্তু তর্কে সম্প্রতি শ্রান্ত হয়েছি। অথচ যেজন্য তর্ক তারই সমাধান হল না কোন। আপনি সর্বজ্ঞ। আপনিই বলুন। আলো পাই। পার পাই। বলুন সেই

পুরুষ কে যিনি সর্বপ্রাণী হতে প্রাচীন এবং পরিপূর্ণ ? কে এই পরমেশ্বর যাঁকে জানি নিত্যশুদ্ধ বলে ? সম্মুখে দেখছি সুন্দর জগৎ। কিন্তু কে প্রথম সৃষ্টি করলেন এই আশ্চর্য জগৎ ? শেষ পর্যন্ত কিসেই বা এ বিলীন হয় ? তাঁকে কি দেখা যায় ? পেতে পারি কি আমরা ? যদি সম্ভব, পথ বলুন।

ব্রহ্মার নয়ন বিস্ফারিত হল। তিনি ধ্যানস্থ হলেন। অবশেষে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। মুখে উচ্চারিত হল ঃ রুদ্র রুদ্র। মনে আনন্দ। অঙ্গে ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু স্বেদ। স্বেদ নয়, বিন্দু বিন্দু আনন্দ।

ব্রহ্মা পুলকিত হয়ে গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন ঃ (তিনি শিব, তিনি শম্ভু। কথা দিয়ে ধরা যায় না, মন দিয়ে ছোঁয়া যায় না, অথচ মনে মনে তাঁর বাস। তাঁরই চিন্তাতে মনে মনে অনন্ত আনন্দ। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র সমস্ত কিছু সেই তাঁতেই বিলীন হয়। সৃষ্টির ঊষাতে যখন চতুর্দিক ছিল তমে তমে আবৃত তখন একমাত্র ইনিই বর্তমান ছিলেন। তিনি আদি অথচ তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই। চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা জ্বলে। কিন্তু জ্বলে তাঁর শরীরেরই কিরণের বলে। শিবই শ্রেষ্ঠ, শিবপদই শ্রেষ্ঠ। একমাত্র ভক্তির পথে চলেই দর্শন মেলে পরমেশ্বরের। ব্রত তপস্যা কর, সমৃদ্ধ হয় ভক্তি। শেষ পর্যন্ত ভক্তির আলোতেই তাঁর দেখা মেলে। দেবগণের নয়নে তাঁর স্থূলরূপ, যোগীদের সূক্ষ্মরূপ। আর এক মূর্তি তাঁর আছে। দুয়ের অতিরিক্ত আর এক মূর্তি। নিত্য আনন্দস্বরূপ সে মূর্তি। মনে যদি শিবজ্ঞান, সংসারের শতদোষ অন্তরকে করবে পীড়িত। ঐ পীড়া থেকে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য থেকে শিবচিন্তা, ধ্যান, আসক্তি। তারপর যোগ, ভক্তি এবং অবশেষে শিবপ্রসাদ।

ব্রহ্মা কিয়ৎক্ষণ মৌন রইলেন। তারপর বললেন ঃ এক দেবযজ্ঞে বায়ু এখন ব্যস্ত। সহস্র বছর ধরে সে যজ্ঞ চলবে। তারপর তিনি নৈমিষারণ্যে আসবেন। তিনি তোমাদের বলবেন। বহুতর হিতকথা তিনি তোমাদের শোনাবেন। তোমরা শুনবে, শুনবে, কৃতার্থ হবে। অনন্তর যাবে বারাণসীতে। সেখানে শিব থাকেন। ভক্তদের প্রসাদ বিতরণের উদ্দেশ্যে বারাণসীতে শিব নিত্য বিহার করেন। সেখানে যাবে বহু কিছু দেখবে, জানবে ! অবশেষে আবার এসো আমার কাছে। এখন নয়, সেই তখন কীর্তন করব মুক্তির উপায়।

একটি চক্র দেখিয়ে ব্রহ্মা আবার বললেন ঃ এটি ত্যাগ করছি। এটি চলতে থাকবে। তোমরা অনুসরণ করতে থাকবে। চলতে থাকবে। অবশেষে দেখবে চলতে চলতে শীর্ণ হয়েছে এর নেমি। যেক্ষেত্রে এটি হবে, জানবে জপতপের জন্য সেইটিই শ্রেষ্ঠ জায়গা।

সূর্যের মত এক চক্র। ব্রহ্মা ত্যাগ করলেন। মুনিরা অনুসরণ করলেন।

অবশেষে ফলে ফুলে সমৃদ্ধ, সরোবরে ঝর্ণাধারায় পরিশোভিত এক বনে সেই চক্রের নেমি শীর্ণ হয়েছিল। সেই বনই নৈমিষারণ্য। অরণ্য, অথচ হিংস্র

জন্তু জানোয়ার নেই একটিও। অরণ্য, অথচ মনোহর। ব্রহ্মা বলেছিলেন, তপজপের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। তাঁর কথা যথার্থ। অরণ্য, অথচ প্রশান্ত। নৈমিষারণ্য। ধর্মভ্রষ্ট পুরুরবা মুনিদের কুশবজ্রে এখানেই নিহত হয়েছিলেন। এখানেই প্রজাপতিগণ দিব্যযজ্ঞ করেছিলেন, এখানেই নিরস্ত হয়েছিলেন বেদবিরোধী পণ্ডিতমণ্ডলী। নৈমিষারণ্য—তপক্ষেত্র, জপক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র, পুণ্যক্ষেত্র।

নৈমিষারণ্যে মুনিরা যজ্ঞপর হলেন। যজ্ঞে আয়োজনের শেষ ছিল না। বিরাট ও বিশাল। মহাযজ্ঞ।

যজ্ঞশেষে বায়ু এলেন। ব্রহ্মার পুত্র বায়ু। জীবনের কারণ বায়ু। তিনি এসেছেন। মুনিরা আনন্দে গদগদ হলেন। প্রণাম করে অভ্যর্থনা করলেন। বসতে দিলেন সোনার আসনে। বায়ু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যজ্ঞ ভালভাবে হয়েছে তো ? নাকি দৈত্যেরা দৌরাত্ম্য করেছে ?

ঃ সর্ব বিষয়েই মঙ্গল।

ঃ বেশ, সুন্দর। সব সুসম্পন্ন, সুসম্পূর্ণ। এবার কি করবে বলে মনে করেছ ?

ঃ আপনি এসেছেন। আমরা সফল। আপনি এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন অশেষবিধ কল্যাণ। বহুদিন থেকেই আমরা জিজ্ঞাসু হয়েছি। ব্রহ্মা কি এ নিয়ে বহু তর্ক করেছি, অনুধ্যান করেছি। কিন্তু যে তিমিরে ছিলাম রয়ে যেতে হল সেই তিমিরেই। ব্রহ্মার আরাধনা করলাম। তিনি বললেন, মহাদেবই সমস্ত সৃষ্টির মূল। তিনিই সব। ভক্তির সাহায্যেই শুধু তাঁকে পাওয়া যায়। ব্রহ্মাই এখানে আমাদের আসতে বলেছেন, তপ করতে বলেছেন। বলেছিলেন, যজ্ঞ কর, যজ্ঞ শেষ হলে বায়ু আসবেন। তিনি বলবেন, তোমাদের জ্ঞান হবে। সেই আপনি এসেছেন। এবার আমাদের চিত্তে আলোর বন্যা বইবে। আমরা ভাসব, ভাসব। জ্যোতির সমুদ্রে আমরা ভাসব।

বায়ু বললেন ঃ খুশির কথা। বলব। অবশ্যই বলব। সেই দেবাদিদেবের কথা বলাও তো পুণ্যের।

ঋষিরা বললেন ঃ আপনি ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞানী, ব্রহ্মার শিষ্য! জানতে ইচ্ছে হয় কি প্রকারে মহা আশীর্বাদ আপনি পেয়েছিলেন ?

ঃ ঊনিশের কল্প। নাম শ্বেতলোহিত। ব্রহ্মা। মনে সৃষ্টির ইচ্ছা। ব্রহ্মা তপস্যা করলেন। তিনি সৃষ্টি করবেন।

ব্রহ্মা তপস্যা করছেন। প্রচণ্ড সে তপে মহাদেব যেন বিগলিত হলেন। মহাদেব মুনি হলেন, নাম শ্বেত। মহাদেব শ্বেতমুনি হলেন। কৌমার্যের ছটা মুনির সর্ব অঙ্গে। ব্রহ্মার সম্মুখে মহাদীপ্তির এক অপরূপ বিগ্রহ। বিগ্রহের কম্পিত অধরপথে বাক্য ঝরে পড়ল। ঝর্ণার ধারা নামল। উপলবন্ধুর পথ। ঝর্ণাধারা নামল। প্রশান্ত গতি, গম্ভীর কলনাদ। অজস্র বুদ্বুদ রচিত

হল। আলোর শতসহস্র বুদ্বুদ। সেগুলো ফাটল, আলো ছড়াল, দিগ্‌সমূহ উদ্ভাসিত হল। জ্ঞানের আলোয় ব্রহ্মার চিত্তলোক প্লাবিত হল। ব্রহ্মা জ্ঞানী হলেন। বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করলেন।

বায়ু বলে চললেন ঃ ব্রহ্মা শুনেছিলেন পরমেশ্বরের মুখ থেকে, আমি শুনেছি ব্রহ্মার মুখ থেকে। তপ করেছিলাম, ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়েছিলেন। দিয়েছিলেন। আমি সমৃদ্ধ হয়েছিলাম ॥

৫২. ব্রহ্মার সৃষ্টি

পৃথিবীর উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় ও ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হল। প্রলয়ের বিষাণ বাজল প্রমত্ত বাতাসের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে। বৃক্ষে বৃক্ষে আচ্ছাদিত বনভূমি। বৃক্ষের পল্লবে পল্লবে আকাশকে ছোঁয়ার আকুলতা। বনভূমি আহ্লাদে বিহ্বল। কিন্তু হয়ত আকাশ ক্রুদ্ধ হল।

বনভূমির আহ্লাদিত হস্তপ্রসারণ। কিন্তু আকাশ ক্রুদ্ধ হল। উদ্ধত বনভূমি। উদ্ধত বৃক্ষমণ্ডলী। সারা আকাশ জুড়ে প্রলয়ের হুংকার বিস্তারিত হল। বনভূধি সমতলে পর্যবসিত হল। ধূলিতে লীন হল অগণিত পল্লবের আহ্লাদ।

জগৎ অগ্নিময় হল। দাউ দাউ করে পৃথিবী জ্বলতে থাকল। ক্ষুধিত অগ্নি। পৃথিবী পুড়ল, ছাই হল।

পৃথিবী যেন উলটে গেছে। সমুদ্র উঠে গেছে আকাশে। জল ঢেলে পড়ছে। পৃথিবী প্লাবিত হল। দিকে দিকে শুধু জল, জল, জল। দিকে দিকে শুধু ঢেউ, ঢেউ, ঢেউ। জল নৃত্য করছে। ঢেউয়ের মাথায় অযুত খুশি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে থাকল। পৃথিবী হল উতলা সমুদ্র।

ব্রহ্মা নারায়ণের সঙ্গে একাত্ম হলেন। শয়ন করলেন সেই জলের উপর।

নিদ্রায় অভিভূত নারায়ণ। শিব বিছিয়েছেন নিদ্রা। অভিভূত নারায়ণ।

প্রভাতবেলায় দিক্‌সমূহ স্তোত্রের মধুময় ধ্বনিতে পরিপূরিত হল। সিদ্ধগণ স্তোত্র পাঠ করছেন। দেবগণ স্তোত্র পাঠ করছেন। সুরের ঝংকারে নারায়ণ প্রবোধিত হলেন। উত্থিত হলেন।

নিদ্রাভিভূত নারায়ণ। এবার জাগরিত নারায়ণ। চোখে তখনো ঘুম লেগে। তিনি এদিকে তাকালেন, ওদিকে তাকালেন। তন্দ্রায় বিজড়িত চক্ষু। কিছুই দেখতে পেলেন না। দেখলেন তিনি আছেন। শুধুই তিনি। আর কিছু নয়। এবার তন্দ্রাজড়ানো চোখে বিস্ময় বিস্তারিত হল। মনে চিন্তার শত তরঙ্গভঙ্গ। কোথায় মিলাল নদী, পাহাড়, অরণ্য, নগর? কোন্ অতলে তলাল সুন্দরী

পৃথিবী ? নারায়ণের মনে প্রশ্নের বিদ্যুৎ খেলে গেল। কিন্তু সমাধান হলনা কিছু।

ব্রহ্মা পিতাকে স্মরণ করলেন। ব্রহ্মা ত্রিলোচনকে স্মরণ করলেন। ব্রহ্মার মনে দেবাদিদেবের প্রসাদ নামল। ব্রহ্মা অবগত হলেন। বুঝলেন পৃথিবী তলিয়েছে। অতলে যেন মুখ লুকিয়েছে।

পৃথিবীর অধিপতি ব্রহ্মা। পৃথিবী নিমজ্জিত। পৃথিবীকে উদ্ধার করতে হবে ঃ পৃথিবীর অধিপতির মনে এই চিন্তা।

পৃথিবীকে উদ্ধার করতে হবে। নামতে হবে অতলে। ব্রহ্মা বরাহের রূপ নিলেন। বরাহ, যেমন তেমন বরাহ নয়, দিব্যসুন্দর, জলে নিপুণ, বিশাল, বিপুল। আকার বরাহের, কিন্তু যেন এক পর্বত। বরাহের গর্জন, মনে হয় ক্রুদ্ধ মেঘ হুংকার দিচ্ছে, চরাচর প্রকম্পিত হচ্ছে।

দিব্য বরাহ, সুন্দর বরাহ, কিন্তু ভয়ানক। অঙ্গে নীল মেঘের অসীম দ্যুতি, হুংকারে ফেটে পড়ছে অযুত গর্ব।

ব্রহ্মা হলেন বরাহ। সর্বশরীরে পেশীসমূহের সুমিত বিন্যাস। খুরে ক্ষুরের ধার। পদ্মরাগমণির বর্ণ যেন অদ্য অপহৃত। মহাবরাহের চোখে সেই বর্ণ।

ব্রহ্মা বরাহ হয়েছেন। বরাহের অঙ্গে অপূর্ব এক জ্যোতি। চোখ মেলে তাকানো যায় না, তাকাতে পারলে চোখ ফেরানো যায় না এমন জ্যোতিতে সেই বরাহের অঙ্গ ঈষৎ ঈষৎ কম্পিত।

গণ্ডদেশ আগুনের জটায় আবৃত। অবয়ব বহুবিধ অলংকারে অলংকৃত। ব্রহ্মা মহাবরাহ হয়েছেন। বিশাল এক মেঘখণ্ড যেন। বুক চিরে চিরে বিদ্যুৎ চমকিত হয়েছে, কিন্তু বন্দী হয়েছে চিরতরে। জ্যোতির্ময় মেঘখণ্ড।

বরাহ নিশ্বাস গ্রহণ করছে। বরাহ নিশ্বাস ত্যাগ করছে। সমুদ্রের জল-সমূহ উন্মাদ হয়ে উঠছে।

ব্রহ্মা মহাবরাহের রূপ ধরেছেন। ডুব দিলেন সেই প্রলয়পয়োধিজলে। একটি বিশাল পর্বত সমুদ্রে নিমজ্জিত হল।

রসাতল থেকে পৃথিবী উদ্ধৃত হলেন। মহাবরাহের দাঁতে ধরা পৃথিবী প্রলয়ের জল থেকে ভেসে উঠল। জনলোকে সিদ্ধরা হর্ষে বিগলিত হলেন। মুনিগণ নৃত্যে নৃত্যে উদ্বেল হলেন। অসংখ্য পুষ্প বৃষ্টির মত ঝরতে থাকল সেই দিব্য বরাহের মস্তকে।

পুষ্পে পুষ্পে আচ্ছাদিত মহাবরাহ। লাখে লাখে জোনাকি জ্বলছে, নিভছে। জোনাকিরা জ্বলছে। জ্বলছে একটি কালো পাহাড়।

পৃথিবী যথাস্থানে সংস্থাপিত হল। ব্রহ্মা স্বীয় মূর্তিতে প্রকটিত হলেন। পৃথিবী সমতল হল। পর্বতসমূহ সুমিত বিন্যাসে বিন্যস্ত হল। পর্বতে

পর্বতে বৃক্ষে বৃক্ষে শোভিত হয়ে স্বীয় সৌন্দর্য বিকীর্ণ করতে করতে মহিমার আলোয় উদ্ভাসিত হতে হতে পৃথিবী পুনর্বিন্যস্ত হল।

ব্রহ্মা সৃষ্টি-পরায়ণ হলেন। তাঁর মনে সৃষ্টির বেদনা।

ব্রহ্মার চিত্তে উপজাত হল মোহ। তমোময় সে মোহ। মহামোহ উপজাত হল। আবির্ভূত হল তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং অবিদ্যা।

এক অপূর্ব সৃষ্টি। চতুর্দিকে তমোগুণের আবরণ। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ এদের অবিকশিত। এরা স্তব্ধ, অচেতন। নাম পেল নগ।

ব্রহ্মা তুষ্ট হলেন না। সৃষ্টি হল, কিন্তু মনোমত হল না। তির্যকস্রোত সৃষ্ট হল। কুটিল এদের গতি, আসক্ত নিয়ত অসতে। ব্রহ্মা তুষ্ট হলেন না। মনে মনে তাঁর এক স্থির উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য এদের দ্বারা সাধিত হবার নয়।

সৃষ্টি হল দেবগণের। অন্তরে অন্তরে এদের অনন্ত সুখ ও প্রীতি। অন্তরে অনাবৃত, বাইরেও তাই। প্রকাশের আনন্দ তাদের সর্ব স্বভাবে।

তথাপি ব্রহ্মার বেদনা ঘুচল না। অন্তরে জেগে রইল অশান্ত বেদনার তীক্ষ্নতম এক অনুভূতি। আবার তিনি সৃষ্টিপর হলেন। সৃষ্টি হল মানুষের। সৃষ্টি হল দুঃখদীর্ণ মানুষের। ব্রহ্মা সন্তোষ মানলেন। এরাই তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক করবে। বাইরে বাইরে এদের প্রকাশের আনন্দ, ভিতরে ভিতরে অন্ধকারের কালি, রজোগুণের উদ্দামতার প্রবাহ।

অতঃপর পঞ্চম প্রকার সৃষ্টিপ্রকরণে ব্রহ্মা তৎপর হলেন! অনুগ্রহসর্গ নামে চিহ্নিত হল ব্রহ্মার এই প্রয়াস। চারভাগে বিভক্ত এই নতুন সৃষ্টির প্রথমে স্থান পেল তারা যারা বিরোধ বা ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেল। তপস্যার শক্তিতে কৃপা পেল যারা তারা স্থান পেল দ্বিতীয়। তৃতীয়ে অধিষ্ঠিত হল ঈশ্বরের প্রসাদ পেয়ে যারা ধন্য হল তারা। আর সাধনায় যারা সিদ্ধ তারা রইল চতুর্থে। অনেকে এই চারপথের কোনটি দিয়েই চলল না। তারা হল ভূত, প্রেত, পিশাচ।

ব্রহ্মা প্রজাপতি। তিনি প্রজা সৃষ্টি করবেন। তাই সৃষ্টি করলেন সনন্দ, সনক, বিদ্বান, সনাতন, ঋভু ও সনৎকুমারকে। এঁরা ব্রহ্মার মানসপুত্র।

ব্রহ্মার ইচ্ছা পুত্রেরা প্রজাসৃষ্টিতে তৎপর হবে। আসলে কিন্তু অন্যরকম ঘটল। সনন্দ সনক সবার মনেই ঈশ্বরের প্রতি অনন্ত প্রীতি। প্রজাসৃষ্টিতে তাঁরা আদৌ মন দিলেন না।

ব্রহ্মা তপস্যায় মগ্ন হলেন। দীর্ঘকাল সৃষ্টির চক্র স্তম্ভিত হয়ে ছিল। ব্রহ্মা মগ্ন তপে। সৃষ্টি তাই স্তব্ধ।

তপে তপে বহুকাল কাটল। একদা তপের কষ্টে ব্রহ্মা কাতর হলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। তপের কষ্টে তিনি বেদনার্ত। ক্রুদ্ধ ব্রহ্মার আয়ত চোখ থেকে

অশ্রুর মুক্তো ঝরে পড়ল। ঝরে পড়ল, পড়ল এবং উৎপন্ন হল প্রেতের।

ব্রহ্মার রোষ বাড়ল। নিজের প্রতিই তিনি রুষ্ট হলেন। মনেমনে মন্দ বলে মানলেন নিজেকেই। পোড়া প্রাণ আর ধারণ করবেন না। মূর্চ্ছিত হলেন, প্রাণত্যাগ করলেন।

রুদ্রের অশেষ অনুগ্রহ। তিনি এলেন। মৃত ব্রহ্মার মুখপথে নির্গত হলেন। নিজেকে বিভক্ত করলেন একাদশ প্রকারে।

রুদ্র বললেন একাদশ রুদ্রকেঃ লোককে অনুগ্রহ করতে হবে। তাই তোমাদের জন্ম। অতএব যত্ন কর। প্রজায় বৃদ্ধি হোক, হিত হোক—এই আমার ইচ্ছা। অতএব তৎপর হও।

একাদশ রুদ্র রোদন করে উঠলেন। অবশেষে কেউ দৌড়ুলেন এদিকে, কেউ ওদিকে। রোদন করলেন, দৌড়ুলেন—তাই রুদ্রনাম।

ব্রহ্মার পুত্র মহেশ্বর ব্রহ্মাকে বাঁচিয়ে তুললেন। ব্রহ্মা প্রাণ পেলেন। মহেশ্বরের মুখে খুশি ঝলমল করে উঠল।

মহেশ্বর বললেনঃ প্রাণ পেয়েছ ফিরে। অতএব ভয় নয়, ভয় নয়। উঠ, আনন্দ করতে করতে খুশির ঢেউয়ে ভেসে ভেসে জেগে উঠ।

ব্রহ্মার মনে যেন স্বপ্ন জাল বিছিয়েছিল। তাঁর কানে মধু বর্ষিত হল। ধীরে ধীরে অতি ধীরে পদ্মের মত দুচোখ মেলে তিনি মহেশ্বরকে দেখতে থাকলেন।

প্রাণ হারিয়েছিলেন। ফিরে পেয়েছেন আবার। মহেশ্বরের কৃপায় প্রাণ পেয়েছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হাত জোড় করে ধীরে ধীরে অতি মোলায়েম অথচ গম্ভীর সুরে বললেনঃ আমার মনে আনন্দ। আপনার কথায় আমার চিত্তে আনন্দের বন্যা নেমেছে। দেখছি একাদশ প্রকারে আপনি বিরাজ করছেন। কিন্তু বুঝছিনা কে আপনি?

মহাদেব ব্রহ্মাকে স্পর্শ করলেন। বললেনঃ আমি তোমার পুত্র। এই ভাবেই জেনো আমাকে। আমিই তোমার পরম আত্মা। সম্মুখে দেখছ একাদশ রুদ্রকে। এঁরা এসেছেন তোমারই ভালোর জন্য। মোহে মোহে তুমি জড় বনেছ। ওটি ছাড়। ওঠ, প্রজা সৃষ্টি কর। যেমন করছিলে তেমনটি আবার কর। ওঠ, মোহ ত্যাগ কর।

ব্রহ্মার মনে খুশির ঝর্ণা বইল। তিনি স্তব করলেন। আট নামে ব্রহ্মা পরমেশ্বরের স্তব রচনা করলেন। অবশেষে বললেনঃ সৃষ্টি সুচারু করতে হবে, সমৃদ্ধ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমার শরীর থেকে আপনি উৎপন্ন হয়েছেন। আপনিও আসুন। আমার সহায় হোন।

মহাদেব বললেনঃ হবে, তাই হবে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

অতঃপর বন্ধস্রোত মুক্ত হল। জন্ম নিলেন মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য,

পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ। সৃষ্ট হলেন ধর্ম ও সংকল্প।

রুদ্র সহায়। ব্রহ্মার মনে অন্যতর ইচ্ছা। ব্রহ্মা সমাধিমগ্ন হলেন।

দেবগণের জন্ম হল। ব্রহ্মার মুখপথে দেবগণ নির্গত হলেন। ব্রহ্মার কক্ষ প্রদেশ থেকে পিতৃগণ নির্গত হলেন। জঘন থেকে নির্গত হল অসুরগণ, আর শিশ্নপ্রদেশ থেকে মনুষ্য। রাক্ষসেরা জন্ম নিল। ব্রহ্মার গুহ্যদ্বার হল রাক্ষসদের জন্মপথ।

ব্রহ্মার পার্শ্ব থেকে সর্প, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্বগণ জন্মগ্রহণ করল। বুক থেকে পাখিরা, মুখ থেকে ছাগেরা, পা থেকে হাতি, ঘোড়া, হরিণ ইত্যাদি প্রাণী আর লোম থেকে তাবৎ গাছগাছালি। সৃষ্টির রুদ্ধস্রোত উন্মুক্ত হল।

চতুর্মুখ ব্রহ্মা। প্রথম মুখ থেকে গায়ত্রী, ঋগ্বেদ উচ্চারিত হল। দক্ষিণমুখ থেকে সৃষ্টি হল যজুর্বেদ, ত্রৈষ্টুভ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎসাম এবং উক্‌থসমূহ। পশ্চিম মুখ থেকে ঝরল সামবেদ, ঝরল জগতীছন্দ, ঝরল সপ্তদশ স্তোম। উত্তর মুখ। অথর্ববেদ, অনুষ্টুপ ছন্দ ধ্বনিত হল এই মুখে।

সৃষ্টির বদ্ধস্রোত উন্মুক্ত হল।

ব্রহ্মার শরীর থেকে সৃষ্টি হল এই জগৎ।

ব্রহ্মবনে থাকেন ব্রহ্মা। এই বনে সূর্য, চন্দ্র, তারার শতেক আলো, পাহাড় পর্বত নদীনালা নগরের অমেয় শোভা।

ব্রহ্মা থাকেন ব্রহ্মবনে। ব্রহ্মবনে ব্রহ্মা এক সনাতন বৃক্ষ। ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেন জল। সেই জলে সিক্ত হতে হতে অব্যক্ত থেকে জন্ম এই বৃক্ষের। বৃক্ষের গুঁড়ি, বড় বড় ডাল হল বুদ্ধি। কোটর গুলি যেন কোটর নয়, ইন্দ্রিয়। ধর্ম ও অধর্ম হল ফুল, সুখ ও দুঃখ হল ফল।

স্বর্গ, আকাশ, চন্দ্রসূর্য, দিকসমূহ ও পৃথিবী—এরই সমন্বয়ে যেন ব্রহ্মা মূর্ত। স্বর্গ মস্তক, আকাশ নাভি, চন্দ্র ও সূর্য দুই চোখ, দিকসমূহ কান, পৃথিবী চরণ। ব্রহ্মার মহৎ রূপ। এই ব্রহ্মাই সৃষ্টি করলেন। ব্রাহ্মণের জন্ম তাঁর মুখ থেকে, বুক থেকে জন্ম ক্ষত্রিয়ের, উরুথেকে বৈশ্যের আর পা থেকে শূদ্রের।

ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির বন্ধস্রোত চিরকালের জন্য উন্মুক্ত হল। কিংবা সৃষ্টির স্তব্ধ চক্র বরাবরের জন্য চলল, চলল এবং চলল॥

৫৩. ব্রহ্মা ও বিষ্ণু

পরম ঈশ্বর মহেশ্বর। মহেশ্বর থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এঁরাও মহেশ্বরের অনুগ্রহে জন্মেছেন। মহেশ্বরের শক্তিই এঁদের শক্তি।

তিনি চালান, এঁরা চলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু করেন পালন আর রুদ্র করেন সংহার। এও মহেশ্বরেরই বিধান।

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র শক্তিতে সবাই অনন্য। ইনি দেখেন ওঁর শ্রীকে, উনি এঁর, তিনি তাঁর। ইনি কাতর, উনি কাতর, তিনিও কাতর। একের শ্রীতে অন্যে কাতর। মনে মনে তাই জন্ম নিল অন্য ইচ্ছা: অতিক্রম করতে হবে। ওঁকে বা তাঁকে ছাড়িয়ে উঠতে হবে, আনতে হবে স্বীয় প্রতাপের আওতায়।

মনে ইচ্ছা। কাজ করতে হবে, নচেৎ মনের ইচ্ছা মনেই মাথা খুঁড়বে। অতএব তপে ওঁরা সঁপলেন তনু, মন ও প্রাণ।

তপ সফল হল। পরমেশ্বর অনুগ্রহ করলেন। বললেন: সব কিছুতে সর্বত্রই তোমরা থাকবে, বিরাজ করবে।

প্রথম এক কল্পে রুদ্র বড় হয়ে উঠলেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণকে সৃষ্টি করলেন।

আর এক কল্প এল। ব্রহ্মা সবাইকে ছাড়িয়ে উঠলেন। রুদ্র ও নারায়ণকে জন্ম দিলেন।

আর এক কল্প এল। এবার বিষ্ণু। বিষ্ণু উঠলেন একেবারে চূড়োয়। ব্রহ্মার জন্ম হল। জন্ম দিলেন বিষ্ণু। রুদ্রের জন্ম হল। জন্ম দিলেন বিষ্ণু।

এইভাবেই চলে। কল্পে কল্পে এঁকে ওঁকে বা তাঁকে হারিয়ে উনি ইনি বা তিনি বড় হয়ে উঠেন। সেই সেই কল্পে মহর্ষিরা বড়র মহিমাই গান করেন।

কল্পের নাম মেঘবাহন। এই কল্পেরই একটি ঘটনা। নারায়ণ দিব্যসহস্র বৎসর ধরে মেঘ হয়ে শিবকে বহন করে ফিরেছেন।

বিষ্ণু মেঘ। মেঘের উপর শিব। মেঘ শিবকে বইছেন। শিব বোঝেন এটি এমনিতে নয়। তিনি মহাশক্তি দান করলেন।

বিষ্ণু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন। এ জগৎকেও সৃষ্টি করলেন।

ব্রহ্মা বিস্ময়ে বিষ্ণুর শক্তি ও সামর্থ্য নিরীক্ষণ করেন। কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পেলেন না ব্রহ্মা। অন্তরে জ্বলল ঈর্ষার আগুন।

মুখ বেঁকিয়ে হেসে তিনি বিষ্ণুকে বললেন: যাও, যাও। সব বুঝেছি। ভারি স্রষ্টা হয়েছ। আসলে শিবকে কোনমতে খুশি করে তাঁর শক্তিতেই তুমি সৃষ্টি করছ। আমিও তপ করব, তোমার মত ঢের ঢের সৃষ্টি তখন আমিও করব।

ব্রহ্মা তপস্যায় ডুবে রইলেন। অবশেষে সফলও হলেন। মহাদেবকে তিনি পেলেন।

ব্রহ্মা বললেন: বিষ্ণু ও আমি দুজনেই জন্মেছি আপনার ইচ্ছায়। দুজনেই জন্মেছি আপনার অঙ্গ থেকে। বিষ্ণু বাম দিক থেকে, আমি ডানদিক থেকে। আমিও জগৎ সৃষ্টি করেছি, সঙ্গে বিষ্ণুও করেছেন। কিন্তু বিষ্ণুকে আপনি

অধিক অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। তার শ্রীতে কাতর হয়ে থাকতে না পেরে তাকে আমি তিরস্কার করেছি। আমরা দুজনেই সমানভাবে সৃষ্ট হয়েছি। আপনার প্রতি আমার ভক্তি বিষ্ণুর থেকে কোন অংশে কম নয়। তথাপি সে আপনার অনুগ্রহ পেয়েছে। আমিও তদ্রূপ পেতে চাই। আমাকেও কৃতার্থ করুন।

শিব সামান্য হাসলেন। বললেন ঃ ঠিক আছে। দিলাম।

শিবশক্তিতে ব্রহ্মা সর্বশক্তিমান হলেন। অতএব আর বিলম্ব চলে না। ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে এলেন।

দেখলেন ঃ বিষ্ণু শুয়ে আছেন। ক্ষীরসাগরের তীরে সূর্যের মত প্রদীপ্ত, অযুত সোনায় মুক্তায় মাণিক্যে সজ্জিত শুভ্র বিমানের উপর বিষ্ণু শুয়ে আছেন।

ব্রহ্মা দেখলেন, যেন নতুন করে। বিষ্ণুর চার বাহু। বাহুতে শঙ্খ, চক্র, বুকে শ্রীবৎসচিহ্ন। মুখে চাঁদের ছায়া। স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন মুখে বিষ্ণু যোগনিদ্রায় ডুবে আছেন।

ব্রহ্মা বললেন ঃ আমাকে না তুমি গ্রাস করেছিলে? এবার যে আমি তোমাকে গ্রাস করতে যাচ্ছি।

বিষ্ণু চোখ খুলে মাথা তুলে ব্রহ্মাকে একবার দেখলেন। সামান্য হাসলেন।

ব্রহ্মা অযথা সময় নষ্ট করলেন না। তিনি এর মধ্যেই বিষ্ণুকে গ্রাস করেছেন। অবশেষে বেরও করলেন তাঁকে। নিজের দুই ভ্রুর মাঝখান থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বের করলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জন্ম দিলেন।

ওদিকে মহাদেব ব্যাপারটি উপভোগ করলেন। বিষ্ণুর শক্তি কত, ব্রহ্মারই বা কত—মহাদেব এলেন তাই দেখতে। অমূর্ত মহাদেব। কিন্তু মূর্ত হলেন আপাতত।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুজনেই মহাদেবকে দেখলেন। স্তব করলেন। মহাদেব অশেষ অনুগ্রহ ছড়িয়ে দিয়ে প্রস্থান করলেন।।

৫৪. প্রজাসৃষ্টির রহস্য

কল্পে কল্পে রুদ্র আবির্ভূত হন।

কল্পে কল্পে ব্রহ্মা সৃষ্টি-তৎপর হন। কিন্তু শেষে নিরাশ হন।

প্রজা বাড়বে, বেড়ে বেড়ে অনেক হবে—সৃষ্টি-তৎপর ব্রহ্মার মনে এই আশা।

আশা পুরে না। ব্রহ্মা দুঃখ পান, কাতর হন, মূর্চ্ছিত হন।

কল্পে কল্পে রুদ্র আবির্ভূত হন। পরমেশ্বরের আদেশ। রুদ্র জন্ম নেন। ব্রহ্মার পুত্র রূপে রুদ্র জন্ম নেন। ব্রহ্মাকে সাহায্য করেন, উদ্দীপিত করেন।

শিবের আদেশে রুদ্র আসেন। রুদ্র আসেন। শিবের সমস্তশক্তি ও ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়ে রুদ্র আসেন। শিবের মতই তাঁর রূপ। শিবের মতই তাঁর কার্য। শিবের মতই তাঁর আচরণ।

রুদ্র প্রদীপ্ত। যেন সহস্রবায়ু জ্বলছে। রুদ্রের মাথায় চাঁদ। সাপের মালা ও বলয়ে, মুঞ্জের মেখলায় তিনি সজ্জিত।

গঙ্গা শিবকে নিত্য অভিষিক্ত করেন। রুদ্রকেও করেন। শিবের বাস কৈলাস বাহন বৃষ। রুদ্রেরও তাই।

রুদ্র কথা বলেন। চতুর্দিক কাঁপতে থাকে, আওয়াজ ওঠে গমগম ! রূপে রূপে পরাক্রমে ভয়ংকর এই রুদ্র। কল্পে কল্পে ইনিই আবির্ভূত হন। ব্রহ্মাকে সাহায্য করেন প্রজাসৃষ্টির মত মহৎ কর্মে।

একটি কল্প এল। ব্রহ্মা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করলেন ঃ প্রজাসৃষ্টি করুন।

রুদ্র প্রজাসৃষ্টি করলেন। সমুদয় প্রজাই হল তাঁর মত। রুদ্র মন থেকে প্রজাসৃষ্টি করলেন। আকারে প্রকারে সবাই সাক্ষাৎ এক একজন রুদ্র। ক্রমে চোদ্দ ভুবন ভরে উঠল।

ব্রহ্মা দেখলেন রুদ্রে রুদ্রে চরাচর আচ্ছাদিত হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ এদের জরা নেই, মরণও নেই। এরকম প্রজায় কাজ নেই। সৃষ্টি করুন, কিন্তু যাদের করবেন তারা যেন মরণের হাতের মুঠোয় থাকে।

রুদ্র হাসতে লাগলেন। বললেন ঃ আমার দ্বারা অমন কাজ হবে না। মরবে এমন প্রজা অশুভ। ও তুমিই সৃষ্টি কর। যাদের সৃষ্টি করেছি এ যাবৎ তোমার সৃষ্টিতে উৎপাত হবেন না তাঁরা। তাঁরা থাকবেন আমারই সাথে সাথে।

ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধি হল না কোন। তিনি মন থেকে প্রজার জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই সৃষ্টিই হল শেষ। ও থেকে প্রজা বাড়ল না একজনও।

মিথুনক্রিয়ায় প্রজাসৃষ্টির কথা ব্রহ্মার মনে হল। ঈশ্বর গোড়াতে নারী সৃষ্টি করেননি। মিথুনের সাহায্য নেওয়াও তাই সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মা ঠিক করলেন ঃ এ সম্পর্কে পরমেশ্বরের পরামর্শ গ্রহণই যুক্তি যুক্ত। বিশেষ করে তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া প্রজা বাড়তে পারে না।

ব্রহ্মা তপস্যায় মগ্ন হলেন। তাঁর মনে আদ্যাশক্তির চিন্তা, শিবের চিন্তা। কঠোর তপে ব্রহ্মা শিবকে বিগলিত করলেন। শিব দর্শন দিলেন।

শিব প্রসন্ন হয়েছেন। তিনি এসেছেন। এসেছেন অর্ধ-নারীশ্বরের মূর্তিতে।

ব্রহ্মা গদগদ ভাষায় শঙ্কর ও শঙ্করীর স্তব করলেন।

শিব কথা বললেন। কথায় প্রসন্নতার সুর যেন বিগলিত হয়ে ঝরে পড়ল। শিব বললেন: আমার পুত্র তুমি। তপ করেছ, করছ। তোমার মনে যে অভিলাষ তা সত্বর পূর্ণ হবে। আমি পূর্ণ করব। এসেছি সেই জন্যেই।

মহাদেব এক মহাদেবীর সৃষ্টি করলেন। মনে হল যেন নিজের শরীর থেকেই মহাদেব সৃষ্টি করলেন এক মহাদেবীর।

জন্ম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই। মহাদেবী। চরাচর ব্যাপ্ত করে তিনি আছেন। সেই দেবীর জন্ম হল।

ব্রহ্মার সম্মুখে সেই দেবী। ব্রহ্মা দেখলেন। দেখলেন এবং যত দেখতে থাকলেন ততই বিস্ময় মানলেন। বুঝলেন এঁর মহিমার পার নেই। এমন মহিমা যা বুঝাবার নয়, বলবার নয়। ব্রহ্মা স্তব্ধ বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

অবশেষে ব্রহ্মা বললেন: জগৎ সৃষ্টি করেছি। মহাদেব আদেশ করেছেন। সৃষ্টি করেছি। প্রজা উৎপন্ন করেছি। কিন্তু করেছি মন থেকে। তাই বৃদ্ধি নেই। মিথুনক্রিয়াতেই বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু নারী নেই। আপনি সৃষ্টি করেননি, তাই নারী নেই। আপনি করুন। চরাচর প্রজায় প্রজায় সমাবৃত হোক, সুন্দর হোক। অতএব আপনি জন্ম নিন। দক্ষ আমার পুত্র। তার ঘরে আপনার এক অংশ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করুক। আমার চাওয়া পূর্ণ করুন।

দেবী নিজের ভ্রূর মধ্য থেকে এক কন্যার সৃষ্টি করলেন। শিবের মুখে হাসি, খুশি। তিনি সেই কন্যাকে বললেন: ব্রহ্মার পূজো কর। তাঁর ইচ্ছেমত কাজ কর।

ব্রহ্মা বললেন: তুমি দক্ষের কন্যা হও।

মহাদেবী ব্রহ্মার মনোরথ পূর্ণ করলেন। অবশেষে লীন হলেন মহাদেবের শরীরে। মহাদেবী অন্তর্হিত হলেন, মহাদেবও।

পুরুষ নারীর সংসর্গ করে। জন্ম হয় সন্তানের। এই সংসারের নিয়ম।

ব্রহ্মা তপ করেছিলেন। মহাদেবীর কৃপায় সংসারে বলবৎ হল এই নিয়ম। প্রজাসৃষ্টির রুদ্ধস্রোত মুক্ত হল, চিরতরে মুক্ত হল।

মহাদেব কৃপা করেছেন, মহাদেবী কৃপা করেছেন। ব্রহ্মা আবার সৃষ্টি-তৎপর হলেন।

ব্রহ্মা নিজেকে দুই অংশে ভাগ করলেন। এক নারী, এক পুরুষ। নারীর নাম শতরূপা, পুরুষের নাম স্বয়ম্ভুব মনু।

শতরূপা তপ করলেন। লাভ করলেন পতি। লাভ করলেন মনুকে। শতরূপা ও মনু। তাঁদের পুত্র হল, কন্যা হল।

ধীরে ধীরে সৃষ্টির স্রোত বইতে থাকল, এবং বইল। চিরতরে সৃষ্টির রুদ্ধস্রোত উন্মুক্ত হল॥

৫৫. শিব সতী ও দক্ষ

শিব থাকেন হিমালয়ে। শিব থাকেন হিমালয়ের চূড়ায়। দেবতারা এসেছেন, অসুরেরা এসেছেন, সিদ্ধরা এসেছেন, মহর্ষিরাও এসেছেন। ওঁরা এসেছেন, দেবাদিদেবকে দর্শন করবেন।

হিমালয়ের শিখর তীর্থ হয়েছে। দেব ও দেবী বসে আছেন। দেবতারা দেখছেন, অসুরেরা দেখছেন, সিদ্ধরা দেখছেন, দেখছেন মহর্ষিরাও। দেখছেন, দেখছেন এবং কৃতার্থ হচ্ছেন।

দক্ষও এসেছেন। শিব তাঁর জামাতা। কন্যার সঙ্গে জামাতাকে দেখবেন। দেবতাদের মধ্যে দক্ষও এসেছেন। গৌরবে তাঁর বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠেছে। শিব তাঁর জামাতা, সতী তাঁর কন্যা।

দক্ষ এলেন। আশা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হতাশ হলেন। কন্যা, জামাতা। তিনি পিতা, শ্বশুর। অন্যের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। বিশেষ আদর, বিশেষ আপ্যায়ন তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু হতাশ হলেন। দক্ষের স্ফীত বক্ষ নিমেষে চুপসে গেল। কিন্তু তিনি দক্ষ। তাঁর বক্ষ আবার স্ফীত হল। কিন্তু গৌরববোধে নয়। ক্রোধের উত্তপ্ত বাষ্পে।

দেব ও দেবী। তাঁদের কাছে সবাই সমান। দক্ষ অন্ধ হয়েছিলেন। সামান্য সত্যটুকুও তিনি বুঝতে পারেননি। দক্ষ ক্রুদ্ধ আক্রোশে অধীর হলেন।

যজ্ঞের আয়োজন হল। দক্ষ যজ্ঞ করবেন। সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছেন। কিন্তু শিব বাদ পড়লেন।

মহা সমারোহ। দক্ষের যজ্ঞ। অন্যান্য জামাতারা এসেছেন, কন্যারা এসেছেন। আদর আপ্যায়ন চলল, পুজো চলল। কোন ত্রুটি রাখলেন না দক্ষ।

সতী সব অবগত হলেন। নারদ শুভ খবর দিলেনঃ ওঁরা এসেছেন। সবাই এসেছেন পিতার ভবনে।

সতীর মন আনচান করে উঠল। তিনি যাবেন। সবার সঙ্গে মিলিত হবেন। সতী শিবকে বললেন। শিব বললেনঃ যাও।

সতী যাবেন পিত্রালয়ে। বিমান এল। মহাদেবী, তিনি যাবেন। অতএব যেমন-তেমন বিমান নয়। অতি সুন্দর দিব্য এক বিমান।

সোনা আগুনে দেওয়া হয়েছে, সোনার দীপ্তি আরও বেড়েছে। বিমানের অঙ্গে সেই বর্ণ, সেই দীপ্তি। রত্নে রত্নে, মালায় মালায়, মুক্তোবসানো চাঁদোয়ায় অপরূপ সেই বিমান। বিমানে শত শত স্তম্ভ রত্নে রত্নে খচিত। বিমানে উঠবার সিঁড়ি, শত শত সূর্য এখানে সেখানে যেন বন্দী। হীরাবসানো অপরূপ সিঁড়ি। সিঁড়ির শেষে বিদ্রুমমণিতে তৈরি তোরণ।

বিমানের মেঝে ঝলমল করছে। শত শত মণি থেকে শতশত আলোর ফলা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মেঝের উপর আসন—রত্নের, পুষ্পের।

বিমানের চূড়ায় সাদা পতাকা, বৃষের চিহ্ন আঁকা। মহাদেবী যাবেন। দ্বারদেশে গণাধিপতিগণ। ভিতরে বহু রমণী। ওঁরা দেবীর মন রঞ্জিত করবেন। ওঁদের কারো হাতে মৃদঙ্গ, কারো বীণা, কারো বেণু। এগুলি বাজবে, ওঁরা গাইবেন।

দেবী আসছেন। সঙ্গে সখীগণ। দেবী বিমানে আরোহণ করলেন। এ পাশে এক রুদ্রকন্যা। ওপাশে আর এক রুদ্রকন্যা। হাতে তাঁদের চামর। ওঁরা চামর দুলিয়ে দেবীকে সেবা করতে থাকলেন।

এ পাশে চামর দুলছে। ও পাশে চামর দুলছে। সরোবরে দুটি হাঁস যেন যুদ্ধের আস্ফালন করছে। দুই চামরের মাঝে দেবীর মুখ। মনে হয় দুই হাঁসের মধ্যে একটি পদ্ম।

দেবীর সখী সুমালিনী। অপার তাঁর প্রীতি। দেবীর মাথার উপর যেন একখানি চাঁদ। সুমালিনী ছত্র ধরেছেন। ছত্রের নীচে দেবীর সুন্দর মুখ। চাঁদের উপর যেন অমৃতের ভাণ্ডটি।

আর এক সখী। নাম শুভাবতী। দেবীর সম্মুখে একখানি খুশিমাখানো মুখ। শুভাবতী অক্ষ খেলায় মত্ত। দেবী সন্তোষ মানছেন।

আর এক সখী। নাম সুযশা। দেবীর চরণকমল। সুযশার বক্ষেও প্রস্ফুটিত দু'টি কমল। সেই কমলের উপর সেই কমল রেখে সুযশা দেবীর সেবা করতে লাগলেন।

আরো বহু সখী। কারো হাতে তালপাতার পাখা, কারো হাতে আয়না, কারো হাতে ফুল, অনুলেপন, কারো হাতে পানের ডিবা, কারো হাতে শুকপাখি।

দিব্য বিমানে মহাদেবী, পরমেশ্বরী। চতুর্দিকে সখীমণ্ডলী। যেন শরতের আকাশে চাঁদ, চতুর্দিকে তারামণ্ডলী।

শঙ্খ বেজে উঠল। যাত্রার সময় হয়েছে। বিমান চলবে। মহাশব্দ করে সংকেত জ্ঞাপন করা হল। বিমান ছাড়বে। এদিকে তালে তালে বাজনা বেজে উঠল। সহস্র শত গণাধ্যক্ষরা সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। সবাই সশস্ত্র। তেজে সবাই যেন এক একজন শিব। মধ্যে মধ্যে চললেন বৃষের পিঠে চেপে

গণপতি।

আকাশে দেবতারা দুন্দুভি বাজাতে থাকলেন। মুনিরা নেচে নেচে আনন্দ জ্ঞাপন করতে থাকলেন। সিদ্ধযোগীরা খুশি হলেন। মেঘেরাও খুশি হল। বিমানের উপর অঝোর ধারে নেমে এল মেঘেদের খুশি, ফুলের বৃষ্টি।

দেবীর বিমান চলল। পথে দেবতারাও এসে মিললেন। দেবী এলেন পিত্রালয়ে।

দক্ষ দেখলেন। কিন্তু প্রীত হলেন না।

দক্ষ অন্য কন্যাদের পূজাতেই ব্যাপৃত রইলেন। সতীকে উপেক্ষা করলেন।

অবশেষে দেবী বললেন ঃ দেবাদিদেব তিনি। তাঁর পূজা করলেন না। অথচ যজ্ঞ করছেন। আপনার কন্যাদের মধ্যে আমিই বড়। আমাকেও বাদ দিচ্ছেন। অথচ করছেন, যারা আমার ছোট তাদের পূজা। এটি নিন্দার। অথচ আপনি করছেন।

দক্ষ বললেন ঃ তোমার থেকে বয়সে ছোট হলেও রূপেগুণে তারা বড়, তাই তাদের পূজা করছি। আমার অন্য জামাতারাও শিব থেকে বড়। তাই তাদের আপ্যায়নে আমার আনন্দ। শিব তমোগুণের আকর, আমার শত্রু। তুমি সেই নিন্দিত পাত্রকেই বরণ করেছ। তাই আমি তোমাকে সমাদর করিনা।

দেবী বললেন ঃ এ যাবৎ কেউ যাঁর কোন নিন্দা করতে পারেনি আপনার মুখে সেই তাঁর নিন্দা ! যারা বিদ্যা চুরি করে, গুরুর বিরুদ্ধে যায়, দেবতা ও ঈশ্বরের নিন্দা করে তাদের শাস্তি হয় হাতে হাতে। আপনারও তাই হবে। ছারেখারে যাবে আপনার কুল।

দেবীর শরীরে দক্ষের রক্ত। ক্রোধে দুঃখে ঘৃণায় তিনি ঐ পাপ শরীর ত্যাগ করলেন।

দেবী এলেন হিমালয়ে। হিমালয় তপ করেছিলেন। দেবীকে পাবার জন্যই তাঁর তপ। দেবী এলেন হিমালয়ে। হলেন হিমালয়ের কন্যা।

দেবী রুষ্ট হয়ে দক্ষকে পরিত্যাগ করে গেলেন। মন্ত্রেরা ভীত হল এবং অবশেষে শূন্যে মিলাল। দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড হল।

মহাদেব সব শুনলেন। দেবীর অপমানে তাঁরই অপমান। তিনি দক্ষকে শাপ দিলেন, ঋষিগণকেও বাদ দিলেন না।

শিব শাপ দিলেন ঃ বৈবস্বত মন্বন্তরে তোমার জন্ম হবে নরকুলে। জন্ম হবে প্রাচেতস রূপে। ধর্ম করতে চাইবে, কর্মও করবে সেইমত। কিন্তু পদে পদে আমার বাধায় সব পণ্ড হবে।

কাল অতিবাহিত হতে থাকল। হতে হতে অবশেষে এল বৈবস্বত মন্বন্তর। ইতোমধ্যে হিমালয়ের কন্যারূপী দেবীকে শিব বিবাহ করেছেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। আয়োজন করেছেন প্রাচেতস দক্ষ।

হিমালয়ের পিঠে ঋষিরা থাকেন, সিদ্ধরা থাকেন। ওখানেই আয়োজিত হয়েছে দক্ষের যজ্ঞ।

যজ্ঞের ভাগ নিতে হবে। ইন্দ্র এসেছেন, বিষ্ণু এসেছেন, এসেছেন তাবৎ দেবমণ্ডলী। বাদ পড়েছেন শুধু শিব। দেবতারা এসেছেন, শিবকে ছেড়েই এসেছেন।

মহাঋষি দধীচি। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হলেন। অন্যায় করছেন দক্ষ। দধীচি জ্বলে উঠলেন। বললেন ঃ পূজা আসলে যাঁকে করা উচিত তাঁকেই বাদ দিয়েছ। অথচ পূজা করছ। এ পূজা আসলে পূজা নয়, পাপাচার। সংকে যে মানে না, অসৎকেই চালাতে যায় সৎ বলে তার কখনো কল্যাণ হয় না। দণ্ড পাবে, কঠোর দণ্ড নেমে আসবে। অতএব এই বেলা সতর্ক হও।

দক্ষ কোন কথা বললেন না।

দধীচি বললেন ঃ পশুপতি তিনি। তাঁর পূজা করছ না! কিন্তু কেন?

দক্ষ বললেন ঃ আমি একাদশ রুদ্রকে জানি। কোন মহেশ্বর-টয়েশ্বরকে জানি না, মানিও না।

ঃ যজ্ঞের রাজা মহেশ্বর। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, একাদশ রুদ্র সবাই যাঁর দাস সেই মহেশ্বরকে পূজা করছ না। কি ফল ছাই এমন যজ্ঞে?

ঃ বিষ্ণুকে এই যজ্ঞের অধিপতি বলে আমি মেনেছি। সোনার পাত্রে তাঁকেই দেব যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ভাগ।

ঃ মহেশ্বরের আরাধনা করনি। তোমার যজ্ঞ কখনই সম্পূর্ণ হবে না, হবার নয়।

দধীচি প্রস্থান করলেন। তাঁর কণ্ঠে বারবার ক্রোধ ফেটে ফেটে পড়ছিল।

দধীচি সত্য বলেছেন।

দেবগণের মন কাঁপল। একটা কিছু মন্দ ঘটবেই। দেবগণের মনে স্থির বিশ্বাস। তবু দক্ষকে তাঁরা ত্যাগ করতে পারলেন না।

ওদিকে দেবাদিদেব সবই জানছেন। দেবীকে সব বর্ণনা করলেন। দেবী বললেন ঃ যজ্ঞ পণ্ড কর।

মহাদেব মৌন রইলেন। দেবী ক্রমাগত তাঁকে তাতিয়ে তুললেন। অবশেষে মহাদেব বীরভদ্রের সৃষ্টি করলেন। দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করতে হবে। তাই সৃষ্ট হল এক পরাক্রান্ত পুরুষ।

বীরভদ্র। হাজার মুখ, হাজার চোখ। হাতে হাজার মুদগর, হাজার শর। শূল, টঙ্ক, গদা ও কার্মুকে সজ্জিত এক পরাক্রান্ত পুরুষ। একহাতে বজ্র জ্বলছে। একহাতে চক্র জ্বলছে। চুলেচুলে বিদ্যুতের স্তম্ভিত চমক। তদুপরি আধোচাঁদ।

বীরভদ্র। বিরাট একখানি মুখ। ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। বিশাল বিশাল

ধারাল দাঁত রয়েছে বেরিয়ে। জিহ্বায় লকলক করছে বিদ্যুৎ। যেমন মুখ তেমনি উদর। বিরাট, বিশাল, ভীতিপ্রদ।

বীরভদ্র। বজ্র ও সমুদ্রকল্লোল তাঁর কণ্ঠে। পরনে রক্তমাখা বাঘের ছাল। গলায় মালা, মুণ্ডমালা, বড় বড় দেবতার মুণ্ডে রচিত মালা।

বীরভদ্র। কানে মোটা ও গোল কুণ্ডল। নূপুর, কেয়ূর তাঁর অঙ্গে। বুকে মণিরত্নের দীপ্তি। ঝলমল করছে আগুন, অস্থির চঞ্চল এবং উত্তেজিত এক আগুন।

বীরভদ্র। বিক্রমে সিংহ বা ব্যাঘ্র, চলনে হস্তী। অঙ্গের কান্তিতে শঙ্খ, কুন্দ বা ইন্দু।

হঠাৎ মনে হল তুষারে আবৃত হিমালয় চলে চলে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। বীরভদ্র এসে দাঁড়ালেন। আর একজনও এসে দাঁড়ালেন বীরভদ্রের পাশে। তিনি ভদ্রকালী। সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, সর্ববিধ কর্মের সাক্ষী হবেন ; তাই বীরভদ্র স্বীয় ক্রোধ থেকে উৎপন্ন করলেন ভদ্রকালীর।

মহাদেবের সম্মুখে নতজানু বীরভদ্র, নতজানু ভদ্রকালী।

শিব বললেন ঃ তোমাদের কল্যাণ হোক।

ওঁরা বললেন ঃ আজ্ঞা করুন। দাস ও দাসী প্রস্তুত।

পার্বতী মহাদেবকে উত্তেজিত করেছেন। দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড হোক এটি পার্বতীর ইচ্ছা। পার্বতী তুষ্ট হন এটি মহাদেবের ইচ্ছা। অতএব মহাদেব পার্বতীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বড় গলায় বললেন ঃ প্রাচেতস দক্ষ যজ্ঞ করছেন ; যাও, বিনষ্ট কর সে যজ্ঞ। আমি কাছাকাছিই থাকব, পার্বতীও থাকবেন ; দেখব, তোমার বিক্রম দেখব, দুজনেই দেখব।

দেবীর দৃষ্টি ভদ্র ও ভদ্রার দিকে নিবিষ্ট। ধেনু তাকিয়ে আছে বৎসের দিকে। দেবীর দৃষ্টিতে এই দৃষ্টি।

মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করে তিনি বললেন ঃ দক্ষ যজ্ঞে রত। শিবকে ছেড়েই তিনি যজ্ঞ করছেন। এটি আমার বুকে বেজেছে। অতএব তুমি সেই যজ্ঞকে পণ্ড করে আমার প্রীতি উৎপাদন কর।

শিবের আদেশ, দেবীর আদেশ। বীরভদ্র মাথা পেতে তা গ্রহণ করলেন। একটি মালা যেন মস্তকে তুলে নিয়ে বীরভদ্র ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন।

বীরভদ্র অগ্রসর হলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর রোমকূপপথে নির্গত হল অনেক গণেশ্বর। ডান হাত থেকে বেরুল শতকোটি গণেশ্বর। বামহাত থেকে বেরুল বহুশত সর্বতোভদ্র। রুদ্রের বীর্যে এঁরা পরাক্রান্ত। এইভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে শতসহস্র গণেশ্বর সৃষ্টি হল। দেখতে দেখতে সমগ্র আকাশ, সমগ্র চরাচর গণেশ্বরে গণেশ্বরে সমাবৃত হল। প্রত্যেকেরই সহস্র হস্তে সহস্র শস্ত্র। শূল, গদা, টঙ্ক, উপল হাতে নিয়ে সিংহের পিঠে

চেপে সবাই আকাশে উঠলেন। তাঁরা হুংকার দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। সমগ্র আকাশ সমগ্র চরাচর থরথর করে কেঁপে উঠল।

বীরভদ্র রইলেন সবার মাঝে। বৃষের পিঠে পরাক্রান্ত বীরভদ্র, যেন শ্বেত মেঘের পিঠে স্বয়ং শিব।

একজনের হাতে সাদা চামর, মুক্তোর ঝালর দেওয়া ছাতা। বীরভদ্রের মাথার উপর চামর ও ছাতা ধরলেন ভসিতপ্রভ।

বীরভদ্র। পাশে ভসিতপ্রভ। যেন দুই মহাদেব। সামনে সামনে চললেন ভানুকম্প। হাতে তাঁর শঙ্খ। শঙ্খ বাজাতে বাজাতে সমুখে সমুখে ভানুকম্প এগিয়ে যেতে থাকলেন।

আকাশে দেবতারা বাদ্য বাজালেন, মেঘেরা ফুল ঝরালেন, বায়ু বইলেন মন্দ মন্দ অযুত গন্ধ ছড়িয়ে।

যুদ্ধে উৎসুক গণেশ্বববর্গ। ওঁরা যুদ্ধে যাত্রা করেছেন। ওঁরা চলেছেন। মনে যুদ্ধের মদ। ওঁরা মত্ত। নেচে নেচে আনন্দ করতে করতে, হাসি গান ও আলাপে প্রমত্ত হয়ে, হুংকারে দিকসমূহ প্রকম্পিত করতে করতে ওঁরা চললেন। মাঝে রয়েছেন বীরভদ্র ও ভদ্রকালী, যেন শিব ও পার্বতী। ওঁরা চলছিলেন। অবশেষে উপনীত হলেন দক্ষের যজ্ঞভূমিতে। প্রলয় যেন শরীর নিয়েছেন। এসেছেন দক্ষের যজ্ঞশালায়।

দক্ষের যজ্ঞ। মহাযজ্ঞ। মহাসমারোহ। বিষ্ণু এসেছেন। এসেছেন সমস্ত দেবতা। বিচিত্র ধ্বজা। বিচিত্র সব মণ্ডপ। সুবিন্যস্ত দর্ভে দর্ভে, প্রজ্বলিত অগ্নিতে অগ্নিতে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সোনার যজ্ঞপাত্রে এক অপরূপ শোভা বিস্তার করে মহাসমারোহের মূর্ত বিগ্রহ রূপে বিরাজ করছিল দক্ষের যজ্ঞশালা।

দেববালারা এসেছেন। অপ্সরারা এসেছেন। বেণু বাজছিল, বীণা বাজছিল, উচ্চারিত হচ্ছিল বেদের মন্ত্র। মুখরিত যজ্ঞক্ষেত্র। বীরভদ্র প্রবেশ করলেন সেই যজ্ঞক্ষেত্রে। বীরভদ্রের হুংকারে সমগ্র যজ্ঞভূমি চমকে উঠল। দেখতে দেখতে অন্যান্য গণেশ্বরের হুংকার উঠল। দেবগণের প্রাণ গেল উড়ে। ওঁরা পলায়ন করতে থাকলেন। এদিকে ছুটলেন কেউ, ওদিকে কেউ। বসন-ভূষণ খসে পড়ল। ওঁরা ছুটলেন ত্রাহি ত্রাহি রব তুলে। ওঁরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ়।

মনে হল হয়ত সুমেরু পর্বত বিদীর্ণ হচ্ছে, কিংবা হয়ত পৃথিবী। পৃথিবী কাঁপছে, মাতাল হয়েছে বায়ু, সমুদ্র উঠেছে ফেঁপে। অগ্নি সূর্য গ্রহ তারা নক্ষত্র সব যেন মুহূর্তে অন্ধকারের আচ্ছাদনে মুখ ঢেকেছেন। একি অঘটন! একি দুর্বিপাক! দেবমণ্ডলী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ওঁরা ছুটছেন। কেউ এদিকে, কেউ ওদিকে। বসন খসে পড়ল, ভূষণ খসে পড়ল। ওঁরা ছুটলেন।

বীরভদ্র প্রবেশ করলেন সেই মহাযজ্ঞের ভূমিতে।

দক্ষ ভীত হয়েছেন। কিন্তু সামলে নিলেন। ক্রোধ প্রকাশ করে চিৎকার করে বললেনঃ কে তুমি ? কি চাও ? দেখছই বা কি অমন করে ?

বীরভদ্রের অধরপ্রান্তে স্মিত হাসি দেখা গেল। গম্ভীর স্বরে বললেনঃ আমরা শিবের অনুচর। এসেছি যজ্ঞভাগ নিতে। দাও।···মনে হচ্ছে রাখোনি। কিন্তু কেন! বল, নয় যুদ্ধ এবং তোমাদের মৃত্যু।

দক্ষ কেঁপে উঠলেন। দেবগণও। বুদ্ধি লোপ পেল ওঁদের। মন্ত্রদের বললেনঃ তোমরাই বল, আমরা বুঝছি না। যা বলার তোমরাই বল।

মন্ত্রগণ বললেনঃ তোমরা হতবুদ্ধি হয়েছ। মনও আচ্ছন্ন হয়েছে আঁধারে। যজ্ঞে শিব পাবেন প্রথম পূজা। কিন্তু তোমরা তা করছ না।

দেবগণ যজ্ঞের ভাগ দিলেন না। মন্ত্রগণ হিতকথা বলেছিলেন। কিন্তু বিফল হল। ওঁরা ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করলেন।

বীরভদ্র বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণকে বললেনঃ তোমরা দেখছি নিতান্তই অন্ধ হয়েছ। মন্ত্রদের কথা রাখলে না, আমাদেরও মান দিলে না। শক্তির বড়ই গর্ব হয়েছে। না হলে এরকম আচরণেই বা মতি হবে কেন ?

বীরভদ্রের ক্রোধ উদ্রিক্ত হল। তাঁর চোখের আগুনে যজ্ঞভূমি পুড়ে ছাই হল। গণেশ্বরেরাও বসে রইলেন না। হোতাদের গলায় দাঁড় পড়ল। যজ্ঞের পাত্র ভেঙ্গে চুর হল। অন্যান্য যা কিছু রইল সব বিসর্জিত হল গঙ্গার জলে।

অতবড় যজ্ঞ। আয়োজন হয়েছিল বিস্তর। একদিকে রাখা ছিল সুন্দর সুন্দর ভোজ্য। মাংস ছিল, পায়স ছিল, ছিল সরবত। কত কত রকম। কত কত তার পরিমাণ। গণেশ্বরদের মজা বাড়ল। তাঁরা খেলেন দেলেন, ছড়িয়ে ফেললেন। ফেলে ফেলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে স্ফুর্তিতে মেতে তাঁরা ভোজন করলেন।

তারপর তাঁরা মারমার কাটকাট করে ধেয়ে ফিরলেন। বজ্র, চক্র, শূল, প্রাস, পট্টিশ—বহুবিধ অস্ত্রের আস্ফালন। মুষল, অসি, টঙ্ক, ভিন্দিপাল, পরশ্বধ —বহুবিধ শস্ত্রের আস্ফালন। যজ্ঞভূমি হল রণভূমি। মহা শব্দে থেমে যাবার উপক্রম হল বুকের স্পন্দন।

গণেশ্বররা নাচছেন, গাইছেন, হাসছেন। কলস বেদি যা সব পড়ছে সম্মুখে সব গুঁড়িয়ে মিলিয়ে দিচ্ছিলেন ধুলোয়।

দেবতারা বিপর্যস্ত হতে হতে রক্তাক্ত শরীরে মাটিতে পড়ছিলেন। ছুটে পালাচ্ছিলেন এদিক ওদিক কিংবা সেদিকে। কেউ হয়ত রচনা করছিলেন বানের মুখে বালির বাঁধ।

গণেশ্বররা উন্মত্ত হয়েছেন। রক্ত পান করে তাঁরা হাসছিলেন হাঃ হাঃ। নেচে নেচে, দৌড়ে দৌড়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে শতরকমের প্রলাপ বকতে বকতে ওঁরা যুদ্ধ করছিলেন। কিংবা হয়ত খেলছিলেন যুদ্ধের খেলা।

মুহূর্তে মুহূর্তে শতরকমের খেয়াল এসে চাপছে প্রমথদের মাথায়। কেউ চাইলেন মেঘ উপড়ে নিয়ে আসতে, কেউ চাইলেন সূর্যকে মুঠোয় পুরতে, কেউ চাইলেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে।

আকাশপথে দেবগণকে ওঁরা তাড়া করে ফিরলেন। কেউ হয়ত আস্ত একখানি বাড়ি উপড়ে থুবড়িয়ে দিলেন মাটিতে। কিংবা ভাসিয়ে দিলেন জলে। বড় বড় বাড়ির দরজা জানলা ভেঙ্গে তছনছ করে ওঁরা যেন কুঁদে ফিরতে লাগলেন। বাতাস ভারী হয়ে উঠল। মেয়েদের আর্তনাদে বাতাস যেন করুণ ও ভয়ানক রসের আলাপে পূর্ণ হল।

ওদিকে বীরভদ্র রেগে যেন ফেটে পড়লেন। যাঁদের শাস্তি হবার কথা সমুচিত তাঁরা আছেন পালাবার তালে। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ পালাবার পথ খুঁজছেন। কিন্তু সেটি হবার নয়। বীরভদ্রের নজর পড়েছে।

বীরভদ্র হাতে ত্রিশূল তুলে নিলেন। উপর দিকে মুখ করে ফুৎকার দিতে থাকলেন। ঝলকে ঝলকে আগুন বেরুতে থাকল। ধেয়ে ফিরল পলায়িত দেবগণকে।

সরোবরে যেন হস্তী নেমেছে। মত্ত হস্তীর দাপে ক্ষুব্ধ সরোবর। বীরভদ্রের দাপে ক্ষুব্ধ দেবমণ্ডলী।

বীরভদ্র এক। দেবতাদের মনে হল সহস্র। প্রচণ্ড গতিতে এদিক ওদিক চতুর্দিক তাড়না করে ফিরছেন বীরভদ্র। দেবতাদের মনে হল বীরভদ্র সহস্র হয়েছেন।

বীরভদ্র উন্মত্ত। ভদ্রকালীও শূলের আঘাতে আঘাতে দেবতাদের মনে ত্রাস সঞ্চার করে ফিরছিলেন। রণতৎপর ভদ্রকালী, প্রলয়ের আগুন যেন।

সূর্য এবং একাদশ রুদ্রের উপর বর্ষিত হল বীরভদ্রের বাঁ পায়ের প্রচণ্ড এক আঘাত। অগ্নি আহত হলেন। অসির আঘাতে তিনি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে উঠলেন। যম কাবু হলেন, পট্টিশের আঘাতে। শূলে রুদ্র, মুদ্গরে বরুণ, পরিঘে নির্ঋতি এবং টঙ্কে বায়ু ছিন্ন হলেন ভিন্ন হলেন।

বেদমাতা ও সরস্বতীর সুন্দর মুখ মুহূর্তে রক্তাক্ত হল। বীরভদ্রের নখের আঘাতে ছিন্ন হল ওঁদের নাকের ডগা। অগ্নির হাত পড়ল কাটা। জিবে স্বাদ নিয়েছিলেন যজ্ঞের ঘিয়ের। জিবের ডগাটিও পড়ল কাটা। স্বাহাদেবীও পার পেলেন না। ডান নাকের পুট এবং বামস্তনের চুচুক বীরভদ্রের তীক্ষ্ন নখে ছিন্ন হল একেবারে। ভগদেবের আয়ত দুটি নয়ন। মুহূর্তে উৎপাটিত হল। পুষাদেবের মুখে একটি দাঁতও রইল না। মুক্তার মত অতগুলি দাঁত একে একে উপড়ে নিলেন বীরভদ্র। চন্দ্রমা কৃমির মত অসহায়ভাবে বীরভদ্রের পায়ের আঙ্গুলের পেষণে নিশ্চিহ্ন হলেন।

অতঃপর দক্ষ। দক্ষের মাথাটি কাটা পড়ল। ভদ্রকালীকে বীরভদ্রের

উপহার ঃ দক্ষের মুণ্ড। সুন্দর সুগোল, যেন তালফল। ভদ্রকালী আনন্দে সেটি নিয়ে লোফালুফি খেললেন, পায়ে মেরে মেরে গড়িয়ে গড়িয়ে কন্দুক খেলায় মেতে উঠলেন। ওদিকে দক্ষপত্নীও বাদ গেলেন না। তাঁর কপালে জুটল ভালমন্দ কিল চড় লাথি ও ঘুষি। তিনি লুটিয়ে পড়ে রইলেন।

কেউ বাদ গেলেন না। যাবেন না। সোম, প্রজাপতি, অঙ্গিরা, ভৃশাশ্ব, কাশ্যপ সবাই প্রচণ্ড প্রহারে কাবু হলেন। ঘাড়ে ধরে ঘুরিয়ে কিল ঘুষি ও গালমন্দ করে ছেড়ে দেওয়া হল এঁদের। কিন্তু হয়ত আরো বাকি ছিল। তাল ও বেতালরা এল এগিয়ে। এঁদেব স্ত্রী ও পুত্রবধূরা হল ধর্ষিত।

কোথা থেকে কি হল, মুহূর্তে দক্ষের যজ্ঞভূমি বীভৎস শ্মশানে পরিণত হল। দিকে দিকে রক্ত। ছিন্ন হাত পা অথবা মুণ্ড, রক্তাপ্লুত শরীর। দিকে দিকে চূর্ণবিচূর্ণ এবং ভস্মীভূত দ্রব্যসামগ্রী। দিকে দিকে কাতর ক্রন্দন।

অবশেষে যেখানে হোম হচ্ছিল সেখানে প্রবেশ করলেন বীরভদ্র। যজ্ঞ পুরুষ ভীত হলেন। মৃগের চেহারা নিয়ে পালাতে থাকলেন। বীরভদ্র ও ছুটলেন পিছন পিছন। ক্ষণে ক্ষণে শতেক বাণ ছুটছিল। মৃগরূপী যজ্ঞপুরুষ ছুটছেন। তিনি ভয়ে বিহ্বল, কম্পিত। ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসছে আর্তস্বর ঃ মলাম, গেলাম। কিন্তু পার পেলেন না ইনিও। অর্ধচন্দ্রের মত বাঁকা একটি বাণ সেই যজ্ঞপুরুষের শির ছিন্ন করল।

যজ্ঞের এতাদৃশ হেনস্থা। বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হলেন। যুদ্ধের জন্য তিনি অগ্রসর হলেন। আর নয়, এবার যুদ্ধ এবং সমুচিত শিক্ষা। গরুড়ের পিঠে চেপে বিষ্ণু অগ্রসর হলেন। জীবিত দেবতারাও এগিয়ে এলেন বিষ্ণুর সাহায্যে।

শৃগাল-পরিবৃত ব্যাঘ্রকে দেখে পশুরাজ সিংহ ভীত হন না। বীরভদ্রও দেবগণের সঙ্গে বিষ্ণুকে দেখে হাসতে থাকলেন।

বিষ্ণু অগ্রসর হয়ে আসছেন। অকস্মাৎ বীরভদ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হল একখানি মহারথ। অযুত সূর্যকে বিগলিত করে যেন সেই রথকে রঞ্জিত করা হয়েছে। বীরভদ্র স্তম্ভিত হলেন। সারথি স্বয়ং ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা বললেন ঃ শিব আজ্ঞা করেছেন। তাই আপনার জন্য দিব্যাস্ত্রে পূর্ণ এই রথ নিয়ে আমি এসেছি। আরোহণ করুন। রৈভ্য আশ্রমেয় কাছে তিনি রয়েছেন। আপনার পরাক্রমে তিনি প্রীত ও পুলকিত।

বীরভদ্র রথে উঠলেন। ভানুকম্প মহাশঙ্খ বাজালেন। মহাশঙ্খের মহানাদ। দেবগণ ভীত হলেন, আগুন জ্বলে উঠল তাঁদের পেটে।

মহাযুদ্ধ সমুপস্থিত। দিকে দিকে অগণিত যক্ষ, বিদ্যাধব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব। ওঁরা যুদ্ধ দেখবেন।

ওদিকে শতবাণের ঝাঁক নিক্ষেপ করতে করতে বিষ্ণু এগিয়ে আসছেন।

বীরভদ্র জৈত্র ধনু তুলে নিলেন। সহস্রবাণের ঝাঁক নিক্ষিপ্ত হবে জৈত্র

থেকে। একদা শিব সুমেরুকে ধনু করে যেমন করে সেই ধনুর জ্যা আকর্ষণ করেছিলেন অদ্য বীরভদ্রও তেমন করে জৈত্রের জ্যা আকর্ষণ করলেন। মহাশব্দ উত্থিত হল। পৃথিবী থর থর করে কেঁপে উঠল।

বীরভদ্র তূণে হাত ঢোকালেন। একটি বৃহৎ সর্প যেন বল্মীকেরমধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত। সর্পের মতই একটি শর তুলে নিলেন বীরভদ্র। বীরভদ্রের হাতে শর। বৃহৎ একটি সাপের মুখে ছোট একটি সাপ। বীরভদ্র শর নিক্ষেপ করলেন। বিষ্ণুর ললাট বিদ্ধ হল। বিষ্ণু আহত, ক্রোধে আরক্ত। বজ্রের মত মহা এক বাণে তিনি বীরভদ্রের দুই বাহু বিদ্ধ করলেন। বীরভদ্রের ধনু থেকেও ছুটল আর এক বাণ।—সমগ্র আকাশ চরাচর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শতসূর্যের প্রভা বিকীর্ণ করতে করতে সেই বাণ বিষ্ণুর বাহু বিদ্ধ করল।

বিষ্ণু ও বীরভদ্রের তুমুল যুদ্ধ। আকাশে পাখিরা ভয়ে ছটফট করে উঠল। আর্ত চিৎকারে বাতাসকে ভারী করে তুলল।

বীরভদ্রের আর একটি বাণ ছুটল। বাণের মুখে অগ্নি। বিষ্ণুর বুক বিদীর্ণ হল। যন্ত্রণায় তিনি চেতনা হারালেন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। আবার অমিত বিক্রমে মহামহা সব অস্ত্র বিষ্ণু নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত শরই নিবারিত হল মাঝ পথে। আবার এল ঝাঁকে ঝাঁকে। এবার বিষ্ণুনাম-আঁকা অমোঘ ও অব্যর্থ শর। কিন্তু এবারও প্রতিহত হল। ভদ্রনাম-আঁকা শর নিক্ষেপ করে মাঝপথেই বিষ্ণুর সমুদয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। উপরন্তু বিষ্ণুর শার্ঙ্গধনু ছিন্ন হল, গরুড়ের ডানাও পড়ল কাটা।

এবার যোগবল। যোগের বলে বিষ্ণু সহস্র সহস্র দেবতার সৃষ্টি করলেন। হাতে তাঁদের শঙ্খ চক্র ও গদা। কিন্তু বীরভদ্রের চোখের আগুনে মুহূর্তে সবাই ভস্মে পরিণত হলেন।

বিষ্ণুর ক্রোধ মাত্রা ছাড়াল। তিনি সুদর্শনচক্র উঠিয়ে বীরভদ্রকে বধ করতে উদ্যত হলেন। বীরভদ্র হাসলেন, মুহূর্তে স্তম্ভিত করলেন বিষ্ণুকে। বিষ্ণু পাথরে পর্যবসিত হয়েছেন। যেমন চক্র তুলেছিলেন তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেবগণ ধেয়ে এলেন। কিন্তু সামান্য অট্টহাসিতেই তাঁরা পাথর হলেন।

দেবতাদের শরীর অবশ হয়েছে। তবু প্রাণ রাখার তাগিদে তাঁরা পালাতে চেষ্টা করলেন! কিন্তু বাণ এল ঝাঁকে ঝাঁকে। মুখে আগুন ঝরাতে ঝরাতে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ এল। দেবতারা ছিন্ন হলেন, ভিন্ন হলেন।

মেঘ থেকে বর্ষিত হয় শিলা। ভূরি ভূরি শিলার বর্ষণে বিধ্বস্ত হয় পর্বত। বীরভদ্রের জৈত্র থেকে ভূরি ভূরি শর ছুটল। যেন শিলাবৃষ্টি। শর ছুটল, আগুন উদ্গীরণ করতে করতে অগণিত শর ছুটল। দেবগণ কাতর হলেন, বিধ্বস্ত হলেন। যেন পর্বতশ্রেণী, শিলাবর্ষণে বিধ্বস্ত। মুহূর্তের জন্য মনে

হয়েছিল বীরভদ্র সূর্য হয়েছেন, কিরণ হয়েছে তাঁর শর। সূর্যরশ্মিতে প্লাবিত পৃথিবী, বীরভদ্রের শরে প্লাবিত পৃথিবী।

যেদিকে দৃষ্টি যায় সেদিকেই শর। সেদিকেই আর্তস্বর।

দেবতারা পড়ে আছেন মাটিতে। কারও কাটা পড়েছে হাত, কারো পা, কারো মুণ্ড। ধরাশায়ী দেবমণ্ডলী। দেবতাদের শ্মশানক্ষেত্র, রক্তে রক্তে মেদমজ্জায় প্লাবিত রণক্ষেত্র।

দেবসমাজে অদ্য দারুণ দুর্দিন। অধিকাংশ দেবতাই আহত বা মৃত। ত্রাণ পেয়েছেন হয়ত দুএকজন। তাঁরা লুক্কায়িত পর্বতের গুহায়, জলে বা অরণ্যে।

শুম্ভবধের পর রক্তে রক্তে সিক্ত কৌশিকীর বীভৎস চেহারা হয়েছিল। অদ্য এই যজ্ঞভূমির রক্তাক্ত চেহারার সঙ্গেই কেবল তার তুলনা। যজ্ঞভূমিতে উৎপন্ন হল এক মহানদী।

মহা এক যুদ্ধের অবসান হল। পৃথিবী বিহ্বল। পৃথিবী কম্পিত। আবর্তে আবর্তে ক্ষুব্ধ সমুদ্র। ক্ষণে ক্ষণে উল্কাবৃষ্টি হতে লাগল। বড় বড় বৃক্ষ থেকে খসে খসে পড়ল বড় বড় শাখা। উতলা বাতাস, বিষাক্ত বাতাস।

ওদিকে আহত ও নিহত দেবমণ্ডলীতে সমাচ্ছন্ন যজ্ঞক্ষেত্র। একজন আহত দেব উঠতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। কেউ কাতরাতে কাতরাতে উঠে বসেছেন। চলবার চেষ্টা করছেন কেউ। চলছেন। কিন্তু অঙ্গে বসন নেই, ভূষণ নেই। লজ্জায় আবার তিনি মাটিতে মুখ লুকোলেন।

বহু দেবতা মোটা লোহার শিকলে বন্দী হলেন। বীরভদ্রের সারথি ব্রহ্মা। তিনি বললেনঃ আর কেন? এবার এদের ক্ষমা করুন।

বীরভদ্র শান্ত হলেন। দেবতারা সুযোগ পেলেন। স্তোত্র রচনায় নিপুণ ওঁদের জিহ্বা। ওঁরা স্তব রচনা করলেন। বললেনঃ অসতের সংসর্গে অন্ধকারের পথে হেঁটেছি। আপনি শাস্তি দিয়েছেন, আলোর পথে এসেছি। পথ হারিয়েছিলাম, বিপথে গিয়ে বিবরে পড়েছিলাম। আপনি পথে এনেছেন। আপনাকে নমস্কার। আপনিই আমাদের গতি, অতএব রক্ষা করুন।

বীরভদ্রের মন ভিজল। তিনি শিকলের বাঁধন থেকে ওঁদের মুক্তি দিলেন। কিন্তু যেতে হবে, শিবের কাছে যেতেই হবে। অতএব পরাজিত এবং বন্দী দেবগণকে নিয়ে তিনি চললেন শিব সমীপে।

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে শিবের সম্মুখে হাজির করা হল। ভীত ও কম্পিত কলেবরে ওঁরা মহেশ্বরকে প্রণাম করলেন।

শিব পার্বতীর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। দেবগণকে বললেনঃ ভয় রেখোনা কোন। আমি সব মার্জনা করেছি। না করলে এতক্ষণ জীবিত

থেকে এ পর্যন্ত আসার ভাগ্য অবশ্য তোমাদের হত না।

মুহূর্তের মধ্যে দেবগণের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। খুশির আবেগে আহত অবস্থাতেই ওঁরা নেচে উঠলেন।

ব্রহ্মা বললেনঃ আপনি ক্ষমার অবতার। না হলে এই গুরু অপরাধে ক্ষমা কখনোই সম্ভব নয়। আপনি তাই করেছেন। কিন্তু প্রভু এতই যখন করলেন তখন কিঞ্চিৎ বাকী রেখে কি লাভ? নিহত দেবগণের প্রাণ ফিরিয়ে দিন। এঁরা আহত, বিকৃতাঙ্গ। আপনাব আঘাত, অতএব ভূষণের সৌন্দর্য বিকিরিত হোক।

মহাদেব ব্রহ্মার কথায় ঈষৎ হাসলেন। বললেনঃ হোক, তাই হোক। তোমাব ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

দেবগণ জীবিত হলেন। ওঁদের ক্ষতচিহ্ন অলংকার হল। ওঁরা শতমুখে মহাদেবের স্তব করতে থাকলেন।

দক্ষও প্রাণ পেলেন। কিন্তু নিজের মুখ আর ফিরে পেলেন না। পেলেন বৃদ্ধ ছাগের মুণ্ড। দক্ষ ভয়ে ভয়ে স্তব করতে থাকলেন। মনে হল উনি প্রলাপ বকছেন।

মহাদেব হাসি রাখতে পারলেন না। হেসে ফেললেন। বললেনঃ হে দক্ষ, আর ভয় নেই।

অতঃপর দক্ষ পদ পেলেন গণপতির।

পার্বতী সস্নেহে বীরভদ্র ও ভদ্রকালীকে কোলে বসিয়ে আদর ও সহস্র আশীর্বাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

অবশেষে মহাদেব বললেনঃ সবই নিয়তির লীলা। তোমাদের অপরাধ আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। অতএব লজ্জা ও ভয় ছাড়। যেখানে যেমনটি ছিলে ঠিক তেমন তেমন সেখানেই ফিবে যাও।

দেবমণ্ডলীর মন থেকে মহা এক ভার নেমে গেল। অমেয় স্বস্তিতে ভরপুর হয়ে ওঁরা ফিযে চললেন॥

৫৬. কালী ও গৌরী

শিব থাকেন, পার্বতী থাকেন। বাস করেন, বিহার করেন, রমণ করেন। এ-হেন পুণ্যস্থান মন্দর পর্বত। শিব ও পার্বতীর পরম প্রিয় স্থান।

মন্দরের মহাভাগ্য। তপে তপে কালি হয়ে অবশেষে এই দিব্য আশীর্বাদ মন্দরের ভাগ্যে জুটেছে। শিব ও পার্বতীর পায়ের স্পর্শে মন্দরের শ্রী ও শোভা হয়েছে অন্যতর। অমেয় শোভা, অমেয় সৌন্দর্য। সহস্র মুখে শতকোটি বছর

ধরে বলেও বর্ণনা হয় না—মন্দরের এমন শোভা, এমন সৌন্দর্য।

নিঝরে নির্ঝরে মন্দর নিত্য বিধৌত। পর্বতের সাম্রাজ্যে বুঝিবা মন্দর সম্রাট। নির্ঝরেরা নিত্য তাই বন্দনা গান করে, সেবা করে, অভিষেক করে।

মন্দরের আকাশে চাঁদ উঠে। মনে হয় ও চাঁদ চাঁদ নয়। সম্রাটের মাথার ছত্র। সকালে সূর্য উঠে। মনে হয় মন্দরের সম্মুখে একখানি বিশাল আয়না। স্বীয় সৌন্দর্য দেখে পুলকে বিগলিত হবার জন্য মন্দর নিজের সম্মুখে বুঝিবা মেলে ধরেছে এক অলৌকিক আয়না।

বিশাল বিশাল বৃক্ষে সমাকীর্ণ মন্দর। বহুবিধ লতায় আচ্ছাদিত বৃক্ষ-মন্ডলী। বায়ু বয়, লতা দোলে—যেন বাহু। বায়ু বয়, পাতা দোলে—যেন করতল। সব মিলিয়ে মনে হয় বৃদ্ধ তপস্বী মাথায় ফুল ফেলে হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন।

অপূর্ব এক পর্বত এই মন্দর। সোজা খাড়া উঠে গেছে ঊর্ধ্বে। আকাশ ছোঁয়ার আকুলতা যেন তার সর্ব অঙ্গে। কখনো মনে হয়, মন্দর পাতালে প্রবিষ্ট হয়েছে। কখনো মনে হয়, পৃথিবীর বুক থেকে মন্দর ক্রমশ উত্থিত হয়ে আকাশ মুখো ধাবিত হয়েছে। মন্দরের চূড়া বহুদূর বিস্তৃত, সমতল। হয়ত পর্বত আকাশপথে বিহারে বেরিয়েছে, বেরিয়ে হয়ত বা নৃত্য করছে।

এখানে গুহা, ওখানে গুহা। বিরাট বিরাট। হাঁ বিস্তার করে মন্দরের বুকে অগণিত গুহা। গুহার অন্তরে চাপ চাপ অন্ধকার। মনে হয় মন্দর হাই তুলেছে, মুখ বন্ধ হয়নি আর। কিংবা নিয়তই হাই তুলে তুলে ক্লান্তি মোচন করছে। কখনো কখনো সেই গুহার মুখে দাঁড়িয়ে মনে হয় মন্দর পৃথিবীকে গ্রাস করতে চায় কিংবা নিমেষে পান করতে চায় সমুদ্রকে। ভিতরে চাপ চাপ অযুত অন্ধকার। মনে হয় ঐ দুঃসহ অন্ধকার বমন করে স্বস্তি পেতে চায় মন্দর। কিংবা মেঘ চাঁদ তারা মিলিয়ে গোটা আকাশটা গিলে খাবার ইচ্ছায় মন্দর হাঁ করেছে। এখুনি ছুটে গিয়ে গোটা আকাশটাকে হয়ত গিলে ফেলবে।

মন্দর পর্বত। স্নিগ্ধ বায়ুতে মনোরম, সৌন্দর্যে মনোহর। শিব থাকেন. পার্বতী থাকেন। মন্দর ধন্য, পুণ্য, কৃতকৃতার্থ।

ব্রহ্মা এসেছেন। এসেছেন শিবের কাছে। এসেছেন বিপদে আপন্ন হয়ে।

ব্রহ্মা বললেনঃ শুম্ভ ও নিশুম্ভ। দুই ভাই। তপ করেছিল। বর দিয়েছিলাম। বলেছিলাম পুরুষের হাতে তোমাদের মৃত্যু হবে না। ওরা প্রার্থনা করেছিল—পুরুষ সংসর্গ করবে না, অথচ জন্ম হবে একটি কন্যার। গর্ভপথেও জন্ম হবে না তাঁর। এমন এক কন্যা জন্মাবে এবং জন্মাবে পার্বতীর অংশে। আমরা সেই কন্যাকে দেখব, কামে আতুর হব, তিনি যুদ্ধ করবেন, বধ করবেন। আমি সে প্রার্থনা পূরণ করেছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি ওরা দেবতাদের পরাজিত করে সমগ্র জগৎকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে। তার বধ একান্তই দরকার। আপনি

উপায় করুন। নিন্দা করে বা অন্য কোন উপায়ে পার্বতীর রোষ জাগ্রত করে তাঁর থেকে উৎপন্ন করুন এক শক্তিরূপিনী নারীর। করুন, দেবতাদের দিন, নিহত হোক শুম্ভ ও নিশুম্ভ।

মহাদেব ব্রহ্মাকে অভয় দিলেন।

অতঃপর অবসর মুহূর্তে একান্তে মহাদেব দেবীকে ডাকলেন। ডাকলেন কালী নামে।

দেবীর গায়ে সোনার রঙ। তাঁকে কালী বলছেন শিব। দেবীর প্রচণ্ড রাগ হল। অভিমানে দুঃখে উত্তেজনায় দেবী আত্মহারা হলেন। বললেনঃ যদি কালো তো বেশ। আপনার মনোমত যখন নয় তখন মিথ্যে আমাকে আটকে রেখেছেন কেন? আমাতে যদি অরুচি তবে বিহার করেন কোন্ রুচিতে? আপনার অসাধ্য কিছুই নেই। আমাকে সম্ভোগ করে আপনার সুখও হয় না —কন্দর্পকে তো ছাই আগেই ছাই করে রেখেছেন। আমার জীবনই বৃথা।··· ঠিক আছে, আপনার মন রাখতে পারি এমন রঙ হোক তারপরই আসব, নয়ত এ পোড়া জীবন ত্যাগ করব।

পার্বতী বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেনঃ আপনি অনুমতি দিন, আর নয়। যাই, তপস্যা করি।

শিব ভীত হলেন। দেবীর পায়ে পড়লেন। বললেনঃ মিথ্যে রাগ করছ, অথচ আমি পরিহাস করে ও কথা বলেছি। তোমাকে ভালবাসি না এও কি সম্ভব? তুমি জগতের মাতা, আমি পিতা। ভালবাসা মিথ্যে হলে এমনটি কি হত?·· কন্দর্প কে? সামান্য মানুষের রতির জন্যই তার সৃষ্টি। আমাদের কাম অন্যরকম। কন্দর্পের সৃষ্টির আগেই তো এ জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। আমাকে মিথ্যে দুষছ। কন্দর্পকে দগ্ধ করেছি বলে নিতান্তই মিথ্যে করে দোষ দিচ্ছ। আসলে অন্য ব্যাপার। কন্দর্প ভেবেছিল আমিও বুঝি অন্য দেবতার মত। জারিজুরি খাটাতে এসেছিল। তাই তাকে ভস্ম করেছি। আমি-তুমি বিহার করি। করি জগতের হিতের জন্য। পরিহাসও করেছি সেই কারণে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব বুঝতে পারবে। মিথ্যে রাগ কর না। তুমি কি জান না তুমি আমার কাছে কত খানি!

দেবী বললেনঃ ওরকম মনরাখা কথা বহুবার শুনেছি। বহুবার আমার রাগ জল হয়েছে। আসলে আমি আপনার অপ্রিয়। স্বামীর অপ্রিয় হয়ে নারীর বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। পণ্ডিতরা বলেন, এ অবস্থায় যে নারী প্রাণত্যাগ করতে না পারে সে নিতান্তই মন্দ। আমার রঙ নিতান্তই কালো, নইলে এরকম ঠাট্টাই বা করবেন কেন? আপনি বাধা দেবেন না, আমি তপ করব, এ পোড়া রঙ ত্যাগ করব, নইলে এ জীবনই রাখব না। মিথ্যে মায়ায় আমাকে ভোলাবেন না।

মহাদেব বললেন ঃ সে তো আমি ইচ্ছে করলেই তোমার রঙ ধবধবে হতে পারে, তুমিও ইচ্ছে করলে পার। তপস্যায় কি কাজ ?

ঃ ওরকম আমি চাই না। আমি তপ করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করব, গৌরী হব।

ঃ ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব তো আমারই অনুগ্রহে। তাঁর জন্য তপস্যা করে কি এমন ফল পাবে ?

ঃ আপনার কথা মানি। কিন্তু আগে আপনার আদেশে আমি ব্রহ্মার তপস্যা করে সতী হয়েছিলাম। এবারও ব্রহ্মার তপস্যা করে আমি গৌরী হতে চাই, এতে দোষ কি ?

মহাদেব সামান্য হাসলেন। দেবতাদের মঙ্গল হবে এই কথা চিন্তা করে কিছু বললেন না। দেবীকে অনুমতি দিলেন।

স্বামীকে ছেড়ে যাবেন, ছেড়ে থাকবেন। দেবীর মনে অসীম বেদনা। কিন্তু শিবকে কিছু বুঝতে দিলেন না। হিমালয়ে চলে এলেন।

আগেও তপ করেছিলেন, এবারও করবেন। সেই একই জায়গায় এবারও দেবী তপস্যা করবেন। পিতামাতার সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের সব বললেন। ওঁরা দেবীকে বাধা দিলেন না। দেবী তপোবনে প্রবেশ করলেন।

দেবী তপস্বিনীর বেশ ধারণ করলেন। তারপর শুরু হল তাঁর তপ। নিয়ত স্বামীর চরণ ধ্যান করেন। বনের ফুলে বনের ফলে তিন সন্ধ্যা সেই তাঁরই পূজো করেন। তিনিই আসবেন, ব্রহ্মার রূপে তিনিই আসবেন, পূরণ করবেন মনের ইচ্ছা—দেবীর মনে নিয়ত এই চিন্তা।

তপে তপে দেবীর দিন কাটে। ধীরে ধীরে অনেকগুলি দিন অতিবাহিত হল।

একদিন দেবী একটি বাঘ দেখলেন। বাঘ এসেছিল আমিষের গন্ধ পেয়ে। কিন্তু ছবির মত স্থির হয়ে গেল। দেবী বুঝলেন, কিন্তু ভয় পেলেন না।

বাঘ দেখল এই একমাত্র খাদ্যবস্তু। এ ছাড়া গতি নেই। অতএব বসে রইল। মনে হল বাঘটি দেবীর উপাসনায় একেবারে মগ্ন।

পার্বতী ভাবলেন, বাঘটি তাঁর ভক্ত। অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য সে এসেছে। দেবীর কৃপা হল। বাঘ দেবীর কৃপা পেল। নষ্ট হল তার হিংস্র স্বভাব। সে নিজেকে বুঝল। দেবীকেও জানল। এবার সত্যি সত্যিই বাঘ দেবীর উপাসক হল। বিবিধ অনিষ্ট দূর করে দেবীকে সে নিরাপদে রাখল। দেবীর সেবায় সে সর্বস্ব সঁপে দিল।

দেবী নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তীব্র তপস্যায় তিনি তন্ময়।

ওদিকে দেবতারা দানবদের অত্যাচারে কাতর। ব্রহ্মার শরণ নিয়েছেন তাঁরা। অতএব ব্রহ্মা আর কালক্ষেপ করলেন না।

ব্রহ্মা এলেন দেবীর তপোবনে, সঙ্গে দেববৃন্দ। ব্রহ্মা দেবীকে প্রণাম নিবেদন করলেন। দেবীও সমাদরে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন।

কিছুই জানেন না এমন ভাব দেখিয়ে ব্রহ্মা বললেনঃ কিসের জন্য আপনার এই দুশ্চর তপস্যা। পরমেশ্বর আপনার স্বামী। সবই তো আপনার আয়ত্তে। তবু এই তপস্যা! হয়ত এ আপনার লীলামাত্র। কিন্তু ভেবে অবাক হচ্ছি, কি করে এতদিন সেই দেবাদিদেবকে ছেড়ে এই বিজন বনে আপনি আছেন?

দেবী বললেনঃ সৃষ্টির আদিপুরুষ তুমি। তুমি আমার প্রথম পুত্র। প্রজার বৃদ্ধির জন্য তোমার ললাট থেকে মহাদেবের উৎপত্তি। এদিক থেকে তুমি আমার শ্বশুর, গুরুজন। আবার হিমালয় আমার পিতা। তুমি হিমালয়েরও পিতা। আমার পিতামহ। কাজেই তোমাকে সব বলা যায় না। অন্তঃপুরে স্বামীর সঙ্গে কি ঘটেছে সে সব নাই বা শুনলে। আসলে আমি গৌরী হতে চাই। তাই এই তপ।

ব্রহ্মা বললেনঃ এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত কঠোর তপ করছেন? আশ্চর্য। এ তো আপনার ইচ্ছামাত্রেই হতে পারে। অবিশ্যি সবই আপনাব লীলা। যাই হোক এতে লোকের হিতই হল। এবার আমাব একটি প্রার্থনা পূরণ করুন।

ব্রহ্মা শুম্ভ ও নিশুম্ভের কথা বিবৃত করলেন। বললেনঃ আপনার হাতেই ওদের মৃত্যু। ছল করে আপনি এখানেই থাকুন। যে শক্তি সৃষ্টি করবেন তাতেই ওদের মৃত্যু হবে।

পার্বতী মুহূর্তে কালো চর্মের আবরণ ত্যাগ কবলেন। পার্বতী গৌরী হলেন। ওদিকে কালো চর্মের আবরণ থেকে উৎপন্ন হল কৌশিকী নামে এক কন্যা। কালো মেঘের মত তাঁর বর্ণ। আট বাহু। বাহুতে শঙ্খ, চক্র, ত্রিশূল। তিন নয়ন। মাথায় চাঁদ। দেবীর রূপে স্নিগ্ধতা, দেবীর রূপে ভয়াবহতা। দুই মিশিয়ে সৃষ্ট হলেন এক অপরূপ দেবী।

ব্রহ্মা হৃষ্ট হলেন। দেবীকে বহন করবার জন্য তিনি একটি সিংহ উপহার দিলেন।

এই সিংহবাহনা দেবীর শরের আঘাতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ ছিন্ন হল, ভিন্ন হল।

অবশেষে কন্দর্পের বাণে শুম্ভ ও নিশুম্ভের হৃদয় বিদ্ধ হল। শুম্ভ নিহত হল, নিশুম্ভও নিহত হল।

ও দিকে গৌরী ব্রহ্মাকে বললেনঃ এই বাঘের জন্য কিছু কব। তপস্যায় বহু সাহায্য করেছে, আমাতেই মন সঁপেছে, আমার ভক্ত। এর জন্য একটা কিছু কর। আমার ইচ্ছা একে অন্তঃপুরে রাখি, শিব দান করুন গণেশ্বরের

পদ। তুমি কি বল ? আপাতত ওকে অগ্রে রেখে সখীদের সঙ্গে আমি যেতে চাই। তুমি প্রজাপতি, তোমার আদেশ প্রার্থনা করি।

ব্রহ্মা হেসে উঠলেন। বললেনঃ দেখছি আপনি বাঘের প্রতি নিতান্ত মুগ্ধ। আসলে কিন্তু ওর ক্রূরতার শেষ নেই। যে মুখে বিষ সে মুখে বৃথা অমৃত মিঞ্চন করতে চাইছেন। তাছাড়া বাঘটি শুধু বাঘই নয়। আসলে ও এক নিশাচর। ইচ্ছেমত চেহারা নেয়। বনে বনে এই ভাবে ঘুরে কত যে তপস্বী ব্রাহ্মণ এবং নিরীহ পশুকে ও ভোজন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এর উপর অহেতুক কৃপা করে ফল নেই কোন। আপনারও কোন কাজ হবে না।

দেবী বললেনঃ তোমার কথা মানি। কিন্তু আশ্রয় নিয়েছে। ফেলি কি করে ?

ব্রহ্মা বললেনঃ ওর অতীতের ছবিই আমি বর্ণনা করেছি। বর্তমানে আপনাব প্রতি এর কি রকম ভক্তি জন্মেছে তা অবশ্য আমি জানিনা। ও যদি আপনার ভক্ত তাহলে ওর বিনাশ নেই। আপনার উপর ভক্তি জন্মেছে, ওতেই ওর পরমসিদ্ধি।

ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। দেবী পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দেবী যাবেন স্বামী-সন্দর্শনে। তপোবনে গাছপালা পশুপাখি যেন অশ্রুমোচন করতে থাকল। দেবী ধীরে ধীরে সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। মন্দর পর্বতের পথ আলোকিত করে দেবী গৌরী এলেন নিজের পুরে।

গৌরীকে দেখে মহাদেব যেন চিনতেই পারেন না। কেমন ভাবে যেন তাকিয়ে রইলেন। তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু সে ভাব ক্ষণেকের।

দেবী মহাদেবকে প্রণাম করলেন। মহাদেব তাঁকে ধরে ফেললেন। পরম আদরে আলিঙ্গন করলেন।

কোলে বসিয়ে মহাদেব মহাদেবীকে দেখবেন, প্রীতি জানাবেন। তিনি দেবীকে কোলে টেনেও নিলেন। কিন্তু দেবী এসে বসলেন পালঙ্কের উপর।

মহাদেব শুনলেন না। জোর করে দেবীকে টেনে এনে কোলে বসালেন। অল্প অল্প হাসি তাঁর মুখে। মুগ্ধ দুটো চোখ মেলে তিনি গৌরীকে দেখতে থাকলেন।

মহাদেব বললেনঃ আর তো রাগ নেই ? গেছে তো ? কি রাগই করেছিলে ! ভাঙ্গাতে পথ পাইনে। সত্যি একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি। ইচ্ছে করলেই তুমি যা খুশি তাই হতে পার। অথচ নিজের সেই পরম ভাব সে সময় তুমি কি করে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলে ? আমাদের মধ্যেও যদি এই রকম সাধারণ মানুষের মত মন কষাকষি চলে তাহলে যে জগৎ ভেসে যায়। আমি থাকি অগ্নির মাথায়, তুমি থাক সোমের মাথায়। আমরা অগ্নি সোমাত্মক। সেই তুমি

ও আমি যদি ছাড়াছাড়া হই তাহলে জগতের আশ্রয় দুলে উঠে। তোমাকে ছেড়ে আমার চলে না, তোমারও চলেনা আমাকে ছেড়ে। অথচ সেই ছাড়াছাড়ি হল এবং আমরা বিরহ সহ্য করেছি। যত ভাবছি ততই বিস্ময় মানছি। দেবতাদের কাজ সমাধা করার জন্য ঠাট্টা করেছিলাম, তুমি তা জানতেও, তথাপি রাগ করলে। কিন্তু কেন বলতো ? আমি অবশ্য জানি ত্রিলোকের রক্ষার জন্যই তোমার ঐ রোষ।

দেবী মনে মনে খুব লজ্জা পেলেন। কৌশিকীর জন্ম ছাড়া আর কিছুই বিবৃত করতে পারলেন না।

বললেন ঃ তাকে তো দেখেননি ! দেখলে অভিভূত হতেন। অমন কন্যা হয় না। বলে বীর্যে অনন্যা। ব্রহ্মা সবই হয়ত আপনার কাছে একসময় নিবেদন করবেন।

দেবীর আজ্ঞায় এই সময় সখীরা বাঘটিকে নিয়ে এলেন।

দেবী বললেন ঃ এর মত বড় ভক্ত আর হয় না। তপস্যার সময় শতেক উৎপাত থেকে এই-ই আমাকে রক্ষা করেছে। একে অনুগ্রহ করুন। আমার ইচ্ছা এর স্থান হয় অন্তঃপুরের দ্বারে।

বাঘ হল গণনায়ক। দেবী সোমরূপা বাঘের কাজে খুশি হলেন, মহাদেবও হলেন, নন্দীও। এর নাম হল তাই সোমনন্দী।

অতঃপর মহাদেব ধীরে ধীরে দেবীর অঙ্গে নানাবিধ অলংকার পরিয়ে দিতে দিতে বহুবিধ আদর ও প্রীতি জ্ঞাপন করতে করতে দিব্যসুখে অনেকখানি সময় অতিবাহিত করলেন।

দীর্ঘদিনের বিরহ প্রকাশের পথ পেয়ে যেন ত্রাণ পেল। সমগ্র চরাচর সুখে শান্তিতে প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জীবন হল মধুময় ।।

৫৭. দুধের জন্য তপস্যা

মুনি ব্যাঘ্রপাদ। তাঁর পুত্র উপমন্যু।

মুনির সংসার। অভাবের সংসার, অনটনের সংসার। দিন কাটে কায়ক্লেশে।

শিশু উপমন্যু। অভাব বোঝে না, বোঝার কথাও নয়। শুধু ক্ষুধায় কাতর হয়। কাঁদে, কাতর হয়।

অভাবের সংসার। শিশুর কান্নায় মা বিচলিত হন। তিনিও কাঁদেন। শিশুকে ভোলান। দুধ নেই, দুধ দিতে হবে। চোখের জলে ভেসে মা ছল খোঁজেন। পিটুলি গুলে জল হল সাদা, হল দুধ। মা দেন। চোখের জল

লুকিয়ে মা শিশুকে পিটুলিগোলা জল খাওয়ান। বলেন ঃ দুধ, দুধ, খাও।

শিশু দুধের স্বাদ জানে। অতি শৈশবে মাতুলালয়ে দুধ সে খেয়েছে। শিশু, কিন্তু বোঝে মায়ের দেওয়া দুধ দুধ নয়, অন্য কিছু। উপমন্যু কাঁদে। বলে ঃ দুধ নয়, দুধ খেতে এমন নয়। আমাকে দুধ দাও।

মায়ের বুকে বাঁধ দেওয়া অযুত কান্না। সন্তানের কান্নার সঙ্গে মিশল মায়ের বাঁধভাঙ্গা কান্নার দুর্বার প্রবাহ। আশ্রমের বায়ু আকুল হল।

মা বললেন ঃ নিতান্তই আমার পোড়া কপাল। তাই তোমাকে দুধ দিতে পারিনে। চালের গুঁড়ো গুলে মিথ্যে দুধে ভোলাতে চেয়েছি তোমাকে। কিন্তু কি করব? বনে থাকি, গরীবানার চূড়ান্ত। একবার আসল দুধের স্বাদ পেয়েছ। এখন যে তোমার মন উঠবে না তা জানি। কিন্তু কি করব? কাঁদছ? কাঁদ। কিন্তু ওতে আমার জ্বালা বাড়ছে, বুকটা খান খান হয়ে যেতে চাইছে। কপালে নেই, কোত্থেকে দেব বল। শিবের দয়া না পেলে ঐ খেয়েই তুষ্ট হতে হবে।

অতৃপ্ত উপমন্যু। শিশু উপমন্যু। কিন্তু মায়ের কান্নাভরা কথায় স্তব্ধ হয়ে গেছে একেবারে।

মা বললেন ঃ শিবকে কোনদিন পুজিনি। তিনি বিমুখ। তাই এই দীনদশা। ঘরে শিশু সন্তান, অথচ দুধ নেই এক ফোঁটা।

উপমন্যু শিশু, কিন্তু অসাধারণ। মায়ের কথায় উপমন্যু কাতর হল। সে বায়না করেছে, মা ব্যথা পেয়েছেন। এমন বায়না ভাল নয়। উপমন্যুর মনে শত অনুশোচনা ধিকি ধিকি করে জ্বলল।

বলল ঃ শোক ক'র না, দরকার নেই শোকের। শিব যদি থাকেন তবে দরকার নেই কোন শোকের। আমি তাঁর প্রসাদ পাব, লাভ করব দুধের সমুদ্র।

মায়ের মন কেঁপে গেল। বললেন ঃ ওকি কথা! যদি থাকেন কেন? শিব আছেন। শিবকে নিয়ে ওসব যদিটদি বলতে নেই। তিনি আছেন, মর্মে মর্মে আছেন। আছেন সর্বত্র। সবই তিনি গড়েছেন। দেবদানব মানুষ সবাই সেই তাঁরই সন্তান। তাঁরই সেবক। তিনি আছেন, তিনি প্রসন্ন হয়ে আছেন তাই আমরা আছি। নতুবা কবে সব শূন্যে মিলাত। তাই সবে মিলে তাঁর পুজো করি। জপি ঃ নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়।

মা মৌন রইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল গদগদ কণ্ঠে বললেন ঃ শতকোটি মহামন্ত্র। এক-একটি এক-একজনে খাটে। সব মন্ত্রই সবার জন্য নয়। কিন্তু 'নমঃ শিবায়' মন্ত্র সবাই জপতে পারে। এ এক অদ্ভুত মন্ত্র। জপ কর এ মন্ত্র, যে কেউ কর, পার পাবে। অন্য কোন মন্ত্র নয়, জপ কর 'নমঃ শিবায়'। সমস্ত অভীষ্টই তোমার সিদ্ধ হবে।

উপমন্যু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দুই গালে তার চোখের জলের রেখা। সরল বিশ্বাসে উপমন্যু মায়ের কথা শুনছিল। দুচোখ ভরে যেন শুনছিল।

মা বললেন ঃ অঘোরাস্ত্র এক মহাঅস্ত্র। শৈবদের রক্ষার জন্যই এই অস্ত্রের সৃষ্টি। আর এই অস্ত্র সৃষ্ট হয়েছে পাঁচ অক্ষরের ঐ মন্ত্র থেকে। অতএব এই মন্ত্র তুমি নাও। জপ কর। তোমার পিতা দিয়েছিলেন আমাকে। আমি দিলাম তোমাকে। জপ কর। পার পাবে।

উপমন্যু মন্ত্র পেল। পেল মায়ের কাছ থেকে। উপমন্যু মাকে প্রণাম করল। বলল ঃ অন্যথা করব না। যেমন বলেছ তেমনটিই করব।

উপমন্যু হিমালয়ে এল। কঠোর তপস্যায় মগ্ন হল।

আটখানি ইঁটে গৃহ নির্মিত হল। স্থাপিত হল সোনার শিবলিঙ্গ। বনের পাতায় ফুলে পাঁচ অক্ষরের মন্ত্রে উপমন্যু শিবের পূজো করে। সর্বক্ষণ তার মনে শিবচিন্তা, শিবধ্যান। আহার মাত্র বায়ু। কঠোর তপের তাপে উপমন্যু কৃশ হতে লাগল। কৃশ হতে হতে বালক তপস্যা করে চলল।

হিমালয়ের ঐ অঞ্চলে পিশাচের দৌরাত্ম্য ছিল। মরীচি শাপ দিয়েছিলেন। কয়েকজন মুনি পিশাচ বনেছিলেন। বাস করতেন ওখানেই।

ওঁরা দেখলেন বালক তপস্যা করছে। স্থির থাকতে পারলেন না তাঁরা। তপে বাধা সৃষ্টি না করলে শান্তি আসেনা তাঁদের। তাঁরা উপমন্যুকে পীড়ন করতে শুরু করলেন।

ভীত উপমন্যু, পীড়িত উপমন্যু, আর্ত উপমন্যু। কিন্তু কণ্ঠে 'নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়। পিশাচ হলেও মুনি ছিলেন। মন্ত্রের ধ্বনিতে তাঁদের হৃদয়ের পিশাচ মুখ লুকাল। তাঁরা উপমন্যুর সেবায় তৎপর হলেন।

তপস্যায় তপস্যায় উপমন্যু যেন সূর্য হল। জগৎ প্লাবিত হল। দেবতারা দেখলেন, বিস্ময় মানলেন। অবশেষে জানালেন বিষ্ণুকে।

বিষ্ণু চিন্তিত হলেন। বুঝলেন। জগৎ পুড়ছে। দাহ ছড়িয়ে তপস্বী উপমন্যু জ্বলছে। অতএব আর কালক্ষেপ নয়। বিষ্ণু চললেন মহাদেবের কাছে।

মন্দর পর্বত। বিষ্ণু এলেন। শিবের সম্মুখে করজোড়ে বিষ্ণু এসে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ দুধের জন্য তপস্যা। কিন্তু এখন চরাচর জ্বলছে। তপের তাপ হয়েছে কোটি সূর্যের মত। অতএব আপনি রক্ষা করুন।

শিব আগেই জেনেছিলেন। ঠিক করেছিলেন তিনি যাবেন, দেখা দেবেন উপমন্যুকে। যাবেন, কিন্তু শিববেশে নয়, ইন্দ্র সেজে। শিব ঠিক করেছিলেন ইন্দ্র সেজে উপমন্যু-সমীপে তিনি যাবেন।

শিব যাত্রা করলেন। শ্বেত হস্তীর উপর শিব। সাজ তাঁর ইন্দ্রের। শ্বেত-

হস্তীতে ইন্দ্রশিব। তিনি চললেন। সঙ্গে চলল সুর, অসুর, সিদ্ধ ও মহা মহা উরগগণ।

শিব থাকেন মন্দরে। চাঁদের সুধায় মন্দর নিত্য প্লাবিত হয়। ইন্দ্র এলেন উপমন্যুর আশ্রমে। মস্তকের উপর ছত্র। ইন্দ্রের শোভা, মন্দরে শিবের শোভা— যেন এক। ইন্দ্র, কিন্তু ইন্দ্র নন, যেন শিব।

উপমন্যু ইন্দ্রকে প্রণিপাত করে বলল: আপনি এসেছেন, যেন চলে চলে সুয এ.এন আমার কুটিরে। আমি ধন্য, আশ্রম-প্রাঙ্গণ পবিত্র।

উপমন্যুর সম্মুখে নবতর আর এক ইন্দ্র। তিনি কথা বললেন। পর্বতের গাত্রে কথা প্রতিধ্বনিত হল। গম গম করে উঠল মুনির আশ্রম।

: তপস্যায় আমাকে বিগলিত করেছ। এবার মনোমত বর প্রার্থনা কর।

: অন্য কিছু নয়, ভক্তি চাই, শুধু ভক্তি, শিবভক্তি। অটল অচল শিবভক্তি।

উপমন্যু পুনরায় তপে নিমগ্ন হল। নবতর আর এক ইন্দ্র। সহজে ছাড়বার পাত্র তিনি নন। আবার এলেন। পবিত্র ও প্রশান্ত তপস্যার স্থান। ইন্দ্র এলেন। ইন্দ্রের মুখে শিবের নিন্দা। শতমুখে শিবনিন্দা বর্ষিত হল। আশ্রমের বায়ু বিষাক্ত হল।

উপমন্যু অস্থির হয়ে উঠল। শিবের নিন্দা! শ্রবণে মহাপাপ। প্রাণত্যাগ করা বরং শ্রেয়। উপমন্যু উদ্যত হল। এ ছার প্রাণ সে ত্যাগ করবে।

চঞ্চল উপমন্যু। আরক্ত উপমন্যু। স্থির করল বধ করবে এই দুরাত্মা ইন্দ্রকে। দুধের জন্য তার তপ। মনে হল: সে ইচ্ছার মুখে ছাই। আপাতত কর্তব্য এই পাপীর নিধন।

উপমন্যু মন্ত্র উচ্চারণ করল। অঘোর অস্ত্র নির্মিত হল। মাত্র এক মুঠি ভস্ম। কিন্তু ভয়ংকর। উপমন্যু অস্ত্র নিক্ষেপ করল।

শিবনিন্দা শুনেছে। অতএব কি হবে এ পোড়া জীবনে? আত্মহননের উদ্দেশ্যে উপমন্যু এবার আগ্নেয়ী ধারণ করল।

ইন্দ্রের সাজ খসে পড়ল। মহাদেব আবির্ভূত হলেন। ত্বরিতে ছুটে গিয়ে উপমন্যুর আগ্নেয়ী নিবারণ করলেন। ভক্ত হবে আত্মঘাতী! মহাদেব নিবারণ করলেন। ওদিকে নন্দী শান্ত করলেন অঘোরাস্ত্র।

উপমন্যু বিমূঢ়, বিস্মিত, আনন্দে বিহ্বল। ভক্তিতে উদ্বেল। উপমন্যু কৃতার্থ হল। দেখল বৃষের পিঠে মহাদেব, সঙ্গে মহাদেবী, সঙ্গে গণেশবরগণ।

উপমন্যু দেখতে থাকল। সহসা তার কানে ভেসে এল দুন্দুভির ধ্বনি। দুন্দুভি বাজছে, সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে ওদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, উপমন্যুর গায়ে বৃষ্টি পড়ছে। উপমন্যু দেখল বৃষ্টি, জল পড়ছে না, পড়ছে ফুল।

উপমন্যু দেখল দশদিকে দেবমন্ডলী। ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা। সবাই এসে

দাঁড়িয়েছেন।

বালক তপস্বী। তার জন্য তোলা ছিল এত শত বিস্ময়, আনন্দ, বিহ্বলতা।

উপমন্যুর মনে হল, মাটিতে যেন আর পা নেই। সে দুলছে, নাচছে : ঢেউয়ের মাথায় মাথায় তার পা পড়ছে। সে দুলছে, নাচছে। যেদিকে চোখ যায় জল, জল আর জল। সমুদ্র! সমুদ্রে জল নয়, ভক্তি, বিগলিত ভক্তি। তারই ঢেউ, তারই মাথায় সে নাচছে, দুলছে।

উপমন্যু মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। প্রণতির আকৃতি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল প্রতিটি পেশীর স্পন্দনে।

মহাদেব এসে তুললেন। বুকে টেনে নিলেন পরম স্নেহে। মস্তক আঘ্রাণ করলেন।

মহাদেবের পাশে মহাদেবী। মহাদেব বললেন : তোমার পুত্র। উপমন্যু তোমার পুত্র।

দুখানি পদ্ম উপমন্যুর মাথায় বিন্যস্ত হল। অপার স্নেহ লাবণ্য হয়ে উপমন্যুর মস্তক-মধ্যে যেন প্রবিষ্ট হতে থাকল।

দেবীর কৃপায় উপমন্যু কুমারের পদ পেল। অব্যয় অক্ষয় সে পদ। দেবীর হাতে জমাট বাঁধা পিণ্ড পাকানো দুধের সমুদ্র।

কুবের এলেন। ধনদৌলত উপচে পড়ল। উপমন্যু দুধসাগর পেল, অর্থাৎ ঐশ্বর্য পেল। মহাদেব দিলেন জ্ঞান, পাশুপতব্রত, পাদুকাদ্বয়।

উপমন্যু হর্ষে উঠল। বৃহতের সাধনায় উপমন্যু মাণিক্য পেল।

নবতর মাধুর্যে নবতর শক্তিতে উপমন্যুর কণ্ঠে ধ্বনিত হল : নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়। মন্ত্র প্রাণ পেল। মন্ত্র চলন্ত, যেন রূপ পেল। আনন্দে উপমন্যুর আশ্রমপ্রকৃতি পুলকরোমাঞ্চে বারবার শিহরিত হল॥

৫৮. দেবগণের শক্তি পরীক্ষা

অবশেষে দেবগণ জয়ী হলেন। অসুরদের হারিয়ে ওরা ফিরে এসেছেন।

জয় হয়েছে। অতএব আনন্দ, আনন্দ এবং আনন্দ। স্বর্গে শুধু আনন্দ। যুদ্ধের শ্রান্তি অদ্য অপগত। দেবগণ পরিতৃপ্ত।

অবশেষে হর্ষের স্রোত একসময় স্তিমিত হয়ে এল। মন গেল ভিন্নতর বিষয়ে। দেবগণ জিতেছেন। কিন্তু কার প্রাপ্য কতখানি কৃতিত্ব? বিবাদ শুরু হল। দেবে দেবে বিবাদ।

ইন্দ্র বললেন : আমি জিতেছি।

অগ্নি বললেন ঃ রাখ রাখ, জিতেছি আসলে আমি।

বায়ু বললেন ঃ প্রকৃত জয়ী আমি।

এই রকম সবাই লিপ্ত হলেন সম্মান পাবার দ্বন্দ্বে। সবাই আত্মপ্রসাদে মগ্ন এবং অন্ধ।

ব্যাপারটি মহেশ্বরের কানে গেল। তিনি কিঞ্চিৎ মজা পেলেন। যক্ষের বেশে স্বয়ং মহাদেব এলেন ঘটনাস্থলে।

উনি বললেন ঃ বিবাদে প্রয়োজন নেই। তোমাদের কার বীর্যবত্তা কতখানি তা এখুনি প্রমাণিত হবে।

একগুচ্ছ তৃণ রাখলেন মাটির উপর। বললেন ঃ নাড়াও, পোড়াও—যিনি পারবেন তাঁকেই জয়ী বলে ধরা হবে।

ইন্দ্র রেগে অস্থির হলেন। কোথাকার কে এক যক্ষ! ইন্দ্রের সঙ্গে এসেছে পরিহাস করতে!

ইন্দ্র উপহাস করে খুব একচোট শুনিয়েও দিলেন। তারপর অগ্রসর হলেন। কিন্তু মুহূর্তে ইন্দ্রের মনোভাব বদলে গেল। যা ভেবেছিলেন আসলে ব্যাপারটি তা নয়। ইন্দ্র বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তৃণটিকে হাতে তোলা দূরের কথা মনে মনেও তুলতে পারলেন না তিনি।

অপমানে দেবরাজ লাল হলেন। বজ্র তুললেন। বজ্র পড়ল তৃণের উপর। ইন্দ্র ও দেবগণ হতভম্ব হলেন। বজ্র নিতান্তই যেন লজ্জা পেয়ে নিস্তেজ হয়ে একপাশে পড়ে রইল। তৃণটির কিছুই হল না।

ইন্দ্রের মুখ চূর্ণ হল। ম্লান ইন্দ্র অবনত মস্তকে কালোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর মাথার মধ্যে বিদ্যুতের চমকের মত বিস্ময় খেলে যাচ্ছিল।

অগ্নি এলেন এগিয়ে। প্রচণ্ড আগুন জ্বলে উঠল। লেলিহান শিখায় যেন সমগ্র চরাচর দগ্ধ হবে। কিন্তু অগ্নির অহংকারও চূর্ণ হল। সামান্য একগাছি তৃণকে তিনি কিছুই করতে পারলেন না।

বায়ু ধেয়ে এলেন। ঝঞ্ঝার প্রমত্ততা বিস্তার করে বায়ু এলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন তিনিও। তৃণটিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতেও তিনি পারলেন না।

সমস্ত দেবতা এলেন এগিয়ে। দেবশক্তির অপমানে সবাই আত্মহারা। সামান্য একগুচ্ছ তৃণ, অথচ তার মুখে ব্যর্থ হল দেবতাদের তাবৎ শক্তি! ওঁরা শতসহস্র অস্ত্রে চতুর্দিক অন্ধকার করে তুললেন। যেন প্রলয় উপস্থিত হয়েছে। সাগর উতলা হল, বায়ু পাগল হল, আগুন জ্বলল। কাতর কপোতের মত চরাচর কাঁপতে থাকল।

ইন্দ্র ক্রোধে অপমানে উত্তেজিত হয়ে সেই যক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কে তুমি!

চোখের পলক ফেলার সময়টুকুও পেরুল না। যক্ষ অন্তর্হিত হলেন।

দেবতারা বিমূঢ়। স্তব্ধ বিস্ময়ে ওঁরা তাকিয়ে রইলেন। মুহূর্তের মধ্যেই দেখলেন আকাশের প্রান্তে এক রমণী। দিব্য সাজে অলংকারে অনন্ত শোভা বিকীর্ণ করতে করতে সেই রমণী দেবমণ্ডলীর দৃষ্টি পথে পতিত হলেন। ক্রমে উদ্ভাসিত হতে থাকলেন।

দেবগণ বুঝলেন, ইনি উমা, পরমেশ্বরী। ও'রা এগিয়ে গেলেন। ওঁদের মনে তখনও বিস্ময়ের ঘনীভূত সেই মেঘখন্ড। ওঁরা সুধালেন ঃ ঐ যক্ষ কে ?

দেবীর মুখে মিষ্টি হাসির একটি রেশ খেলে গেল। বললেন ঃ উনিই সব কিছুর মূলে। তোমাদেরও অগোচর উনি। অন্তরালে থেকে ঐ মহান্ত পুরুষই সংসারের চাকাকে ঘোরাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত কিছু উঠছে, পড়ছে, গড়ছে ভাঙ্গছে।

দেবীও অন্তর্হিত হলেন। দেবগণ যেন তলিয়ে গিয়েছিলেন কোথায়। অবশেষে ভেসে উঠলেন। দেখলেন ঃ আলোর সমুদ্রে ওঁরা স্নান করছেন ॥

৫৯. শিবের লীলা

সৃষ্টি করবেন—শিবের মনে এই ইচ্ছা। তিনি সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা সৃষ্ট হলেন ঃ

ব্রহ্মা জন্ম নিলেন। তিনি এদিকে তাকালেন, ওদিকে তাকালেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। কোথায় ছিলেন, কোথা থেকে এলেন—এই প্রশ্নে ব্রহ্মা আকুল হলেন। কোথায় সেই পরম পিতা ? ব্রহ্মা সন্ধান করে ফিরলেন।

শিব দেখা দিলেন। বললেন ঃ সৃষ্টি কর। ব্রহ্মা পিতাকে দেখলেন। তাঁর আদেশ। অতএব সৃষ্টি করলেন সোমকে। সোম থেকে অতঃপর উপজাত হল স্বর্গ, ধরা, বহ্নি, সূর্য, যজ্ঞ, বিষ্ণু ও ইন্দ্র।

দেবতারা রুদ্রের পূজায় রুদ্রের স্তবে একাগ্র হলেন। শিবকে প্রসন্ন হতে হল। তিনি দেখা দিলেন। কিন্তু মনে অন্যতর অভিলাষ। শিব চাইলেন লীলায় মাততে।

দেবতাদের সম্মুখে শিব আবির্ভূত হলেন। দেবতারা শিবকে চিনতে পারলেন না। ওঁরা সুধালেন ঃ আপনি কে ? শিব বললেন ঃ আমি এ জগতের কারণ। আমিই পুরাতন এবং অদ্বিতীয়। আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাকে জ্ঞাত হলেই জীবের বন্ধন ছিন্ন হয়, জীব মুক্ত হয়।

দেবতারা দুহাত উপরে তুলে তপ করলেন। অবিরত শিবের স্তব ও মহিমা কীর্তনে তাঁরা শ্রান্তি মানলেন না। পাশুপতব্রতে একাগ্র হয়ে গায়ে ভস্ম মেখে

ওঁরা শিবকে পূজো করলেন।

শিব প্রসন্ন হলেন। তিনি দেখা দিলেন। দেবী উমা ও অন্যান্য অনুচররাও রইলেন শিবের সঙ্গে। দেবগণ শিবকে দেখলেন, উমাকে দেখলেন।

দেবগণ স্তব করতে থাকলেন। শিব বললেনঃ আমি তুষ্ট, যারপরনাই তুষ্ট। অতএব আর নয়।

দেবতারা বললেনঃ কি করে আপনাকে পূজা করব? সবাই কি অধিকারী আপনার পূজায়?

শিব হাসলেন। পার্বতীর দিকে একবার তাকালেন। দেবগণ দেখলেন আশ্চর্য দৃশ্য। অর্ধেক নর, অর্ধেক নারী—অতি ঘোর এক মূর্তি। পাশে রয়েছেন গ্রহ চন্দ্র তারা ও দেবগণ। দেবগণ দেখলেন মূর্তির আটবাহু, দেখলেন মূর্তি জ্বলছেন অমেয় তেজ ও শোভা বিকীর্ণ করে।

দেবগণ হতবাক হয়ে দেখলেন। বুঝলেন শিবে শিবে জগৎময়।

ওঁরা প্রার্থনা করলেনঃ আমাদের উপর আপনার প্রসন্নতা বর্ষিত হোক।

শিব ওঁদের জ্ঞান দিলেন। বেদের অমৃত নিঃসৃত হল শিবের মুখপথে॥

৬০. শিবলিঙ্গ

প্রলয়ে চরাচর ভরেছিল জলে জলে। সেই জলেই রচিত হয়েছে বিষ্ণুর শয্যা!

জলে বিষ্ণু শুয়ে আছেন। জলের শয্যায় নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিষ্ণু সুপ্ত।

এমন সময় ব্রহ্মা এলেন। চলতে চলতে ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন বিষ্ণুর শয্যার পাশে।

ব্রহ্মা বললেনঃ কে তুমি? শুয়ে আছ যে এমন করে?

ব্রহ্মা বিষ্ণুকে টেনে তুললেন। কিন্তু বিষ্ণু নিদ্রিতই রইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে ঘা কতক দিয়ে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে দিলেন।

বিষ্ণুর ঘুম ছুটে গেছে। আঘাতের বেদনায় তিনি রেগে টঙও হয়েছেন। কিন্তু সামলে নিলেন। মিষ্টি করে বললেনঃ বৎস, কোত্থেকে আসছ? এত ব্যাকুলই বা কেন?

ব্রহ্মার অন্তঃকরণ জ্বলে গেল। বললেনঃ কি মেলা বৎস বৎস করে চেঁচাচ্ছ! আমি তোমার শিষ্য নাকি? নিতান্তই কোন সহবত শেখোনি দেখছি। আমি বিশ্বের প্রভু। সৃষ্টি স্থিতি লয় সবই হয় আমারই ইঙ্গিতে। তুমিও আমার থেকে উৎপন্ন। আমারই ইচ্ছায় তুমি সৃষ্টি কর, আবার পালনের অধিকারও পেয়েছ। মনে হয় এসব কথা একদম ভুলে বসে আছ।

সম্মুখে পিতা, অথচ বলছ বৎস বৎস। ধন্য বটে! অবশ্য তোমার দোষও হয়ত এতে তেমন নেই। আমারই মায়ায় তুমি এ জাতীয় ঘোরে পড়েছ। যা হোক তোমার এ ঘোর কেটে যাবে। শীঘ্রই তুমি সুস্থ হবে।

বিষ্ণু বললেন: তোমার কথা আপাতত রাখ। আমিই জগদীশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের মালিক একমাত্র আমিই। অন্য কেউ ছিল না কোন কালে, হয়ওনি। কাজেই বেশি বকোনা। থাম।

ব্রহ্মা আত্মহারা হলেন। ঘুষি বাগিয়ে তিনি বিষ্ণুকে আক্রমণ করলেন। বিষ্ণুও ঘুষি ফিরিয়ে দিতে থাকলেন। ক্রমেই ওঁদের যুদ্ধ ঘোরতর হয়ে উঠল।

অকস্মাৎ ওঁরা স্তম্ভিত হলেন। দেখলেন ওঁদের মাঝখানে অনলের একটি স্তম্ভ। কোথা দিয়ে কি হল কেউ জানেন না। মাঝখানে এসে অনলের একটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে গেল। ওঁরা উপরে তাকালেন। ওঁরা নিচের দিকে তাকালেন। কিন্তু শুরু ও শেষ কিছুই দেখতে পেলেন না।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর রাগ পড়ে এল। বিস্ময়ের ঘোরে ওঁরা অভিভূত। অশান্ত জিজ্ঞাসা অশ্রান্তভাবে ওঁদের মস্তকে চমক বিস্তার করে ফিরতে লাগল।

অবশেষে ওঁরা কিঞ্চিৎ বুঝলেনও। ঠিক করলেন, দেখতে হবে কোথায় এর শুরু আর কোথায়ই বা এর শেষ।

ব্রহ্মা হংসের রূপ নিলেন। বিষ্ণু নিলেন বরাহের। দুজনই লাভ করলেন মন-রথের মত গতি। ব্রহ্মা ছুটলেন ঊর্ধ্বে, বিষ্ণু চললেন নিম্নে।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ছুটলেন। সহস্র বছর অতিবাহিত হল। কিন্তু শুরু বা শেষ কিছুই ওঁরা দেখতে পেলেন না। প্রচুর শ্রান্তি সংগ্রহ করে ব্রহ্মা ফিরে এলেন। দেখলেন বিষ্ণুও এসেছেন। ক্লান্তিতে বিষ্ণু অত্যন্ত কাহিল। চোখের পাতা দুটি প্রায় মুদে আসছে। কোনমতে তিনি যেন বসে আছেন।

দুজনেই ওঁরা বিমূঢ় বনে গেছেন। মনে ভয়, ভক্তি এবং প্রশ্নের খণ্ডচিহ্ন। কি এ? এই অদ্ভুত অনলের স্তম্ভ! কি এর রহস্য? ওঁরা মুহুর্মুহু এদিকে ওদিকে প্রণাম করতে থাকলেন।

অকস্মাৎ সমগ্র বায়ুমণ্ডলে গম্ভীর এক ধ্বনি কাঁপতে থাকল—ওঁ ওঁ ওঁ।

রজঃ ও তমোগুণের আস্তরণে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মন তখন আচ্ছন্ন। ওঁরা কিছুই বুঝলেন না।

ধীরে ধীরে ঐ একাক্ষর চার অক্ষরে বিভক্ত হল। অ, উ, ম এবং বিন্দু। অকার অধিষ্ঠিত হল লিঙ্গের দক্ষিণভাগে, উকার উত্তরে, মকার মধ্যে আর বিন্দুটি গেল মস্তকে। তবুও ব্রহ্মা বা বিষ্ণু কিছু বুঝলেন না।

অতঃপর অকারে প্রকাশিত হল ঋগ্বেদ, উকারে যজুর্বেদ, মকারে সামবেদ আর বিন্দুতে অথর্ববেদ। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু রয়ে গেলেন গাঢ়

তিমিরের মধ্যে।

ধীরে ধীরে সেই বেদেদের মুখে কত শত কথা ঝরল। অবশেষে মহাদেব বললেনঃ মিথ্যে বিবাদ করে মরছ। তোমাদের চোখ ফুটিয়ে দেওয়ার জন্যই এই লিঙ্গের রূপ নিয়ে আমি আবির্ভূত হয়েছি।

কিন্তু তথাপি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যেন আচ্ছন্নের মত শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

মহাদেব অনুগ্রহ করলেন। বেদের বাক্যসকল ধীরে ধীরে একের পর এক ক্ষোদিত হল লিঙ্গের দেহে। এবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যেন আলো পেলেন।

ব্রহ্মা বলতে লাগলেনঃ আসলে আমি অপরাধী নই। আপনিই এই ভ্রমের কারণ। আপনার সম্মুখে নির্ভয়ে কথা বলতে কেউই পারে না। অথচ আমাদের কলহ হয়েছে আপনারই সম্মুখে। অবশেষে সেই বিবাদের পরিণতিতে আপনাকে প্রণাম করছি। বিবাদ না হলে এই প্রণামের পুণ্য আমাদের অর্জিত হত না।

বিষ্ণু বললেনঃ আপনার মহিমার পার নেই। বর্ণনা করি তেমন শক্তিও ধরি না। এক্ষেত্রে স্তব্ধ হওয়াই হয়ত শ্রেয়। কিন্তু প্রভুর সম্মুখে দাসকে কিছু বলতেই হয়। তাই বলছি। সংকটে পড়েছিলাম। কি করা উচিত, কি বলা উচিত তা বুঝে উঠতে পারিনি। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনার মায়ায় প্রভাবিত হয়ে অহংকার জন্মেছিল। মন অন্ধকারে আবৃত হয়েছিল। আজ সমুচিত শিক্ষাই লাভ হয়েছে। আপনাব শুরু নেই, শেষও নেই। এ সত্য মর্মে মর্মে জানি। তথাপি এরই সন্ধান করেছি। মনে মনে তাই অতীব ভীত হয়ে পড়েছি।

মহাদেব সামান্য হাস্য করলেন। বললেনঃ আমারই মায়া বটে! মনে তাই বড়র অভিমান এবং ঐ অভিমান থেকেই মেতে উঠেছিলে বিবাদে। অবশেষে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াল। আমারই মায়া বটে। অথচ তোমাদের থেকেই জগৎ জাত। তোমরা আছ তাই জগৎ আছে এবং সেই তোমরাই বুদ্ধির বিকারে যুদ্ধে মেতে উঠলে। সৃষ্টি যেতে বসল। সেটি হোক এটি আমি চাই না। তাই এলাম। লিঙ্গের রূপে তোমাদের শান্ত করতে অনলস্তম্ভের মধ্য দিয়ে অনন্ত বিস্ময় আমি বিস্তীর্ণ করলাম।...তুমি ব্রহ্মা। তুমি বিষ্ণু। তোমাদের মধ্যে দ্বেষ। এটি অকাম্য। অতএব নাশ কর। ভয় ও বিষাদ ছেড়ে ঝেড়ে খাড়া হয়ে উঠ। কর্তব্য কর। আগে আমি তোমাদের মন্ত্ররত্ন দিয়েছিলাম। তোমরা জ্ঞানলাভ করেছিলে। এখন বুঝছি সে সব ভুলে বসে আছ। অথচ ওটি ভুললে সৃষ্টি যাবে রসাতলে। অতএব আবার সেই উপদেশ প্রদান করছি।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভাগ্যবান। বিস্মৃত হয়েও ওঁরা আবার জ্ঞানসংহিতার উপদেশ লাভ করলেন। ওঁরা মহাদেবকে প্রণাম করলেন। ওঁদের মনে আনন্দ

ও বরাভয়।

কিন্তু অকস্মাৎ প্রচুরতম বিস্ময় ঝড়ের হাওয়ার মত এসে ওঁদের আঘাত করল। ওঁদের সম্মুখ থেকে সেই আশ্চর্য জ্যোতির্ময় লিঙ্গ পলকে শূন্যে মিলাল। বিষ্ণু হাহাকার করে উঠলেন। ব্রহ্মা হাহাকার করে উঠলেন। বিষ্ণু বললেনঃ আশ্চর্য! ব্রহ্মা বললেনঃ আশ্চর্য!

মহাদেবের মহিমা ওঁরা হৃদয়ঙ্গম করলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিরোধ বিস্মৃত হলেন। দুজনেই আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। হর্ষে উদ্বেলিত ওঁদের চিত্ত। ওঁরা প্রস্থান করলেন। মন দিলেন সৃষ্টির কাজে।

লিঙ্গের মহিমায় যেন জগৎ রক্ষা পেল। লিঙ্গের পূজায় তাই দেব দানব ও মনুষ্যের উৎসাহের শেষ নেই। লিঙ্গপূজাঃ শিবপদে নিবেদিত যেন জগতের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য॥

৬১. উদ্ভাসিত জন্ম

নৈমিষারণ্যে জিজ্ঞাসু মুনিমণ্ডলী। বায়ু তাঁদের চোখ ফোটালেন। আলোয় আলোয় ভাসল তাঁদের মন।

উপমন্যু বলেছিলেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণের জ্ঞান হয়েছিল। সেইসব জ্ঞানের কথাই আবার নতুন করে বায়ু বললেন। বললেন জিজ্ঞাসু মুনিমণ্ডলীকে।

এক সন্ধ্যায় বায়ুর বলা শেষ হল! তিনি অন্তর্হিত হলেন।

মুনিরা তপ করেছেন, জ্ঞান পেয়েছেন। আলোকিত তাঁদের অন্তর।

তখনো সূর্য উঠি উঠি করছে। রাত্রির কালো কুয়াশা সবে কেটে আসছে। যজ্ঞ সমাপ্ত হল। মুনিরা উদ্যত হলেন অবভৃথ স্নানে।

মুনিরা স্নান করবেন। ব্রহ্মার আদেশ, সরস্বতী প্রবাহিত হলেন। মুনিরা দেখলেন সম্মুখে খুশিভরা এক নদী। নেচে নেচে চলেছে, গানে গানে ভেঙ্গে পড়ে পড়ে চলেছে। খুশিভরা মনে মুনিরা সেই খুশিভরা নদীতে স্নান করলেন, তর্পণ করলেন।

মুনিদের মনে পড়ল আগের কথা। ব্রহ্মা বলেছিলেন, অতএব এবার কাশীযাত্রার পালা। কাশী যাত্রা করতে হবে। ওঁরা করলেন।

মুনিরা পথ চলছেন। ক্রমে এল ভাগীরথী নদী। ভাগীরথীর তীর বরাবর প্রসারিত পথ। মুনিরা ভাগীরথীর পুণ্য জলে স্নান করলেন। তারপর কূলে কূলে ভাগীরথীর কুলুকুলু গানে খুশি হতে হতে খুশিতে ভরে ভরে ওঁরা চললেন।

ক্রমে কাশী এল। এবার গঙ্গা স্নান। অবিমুক্ত ক্ষেত্র, অতএব শিবলিঙ্গ

দর্শন ও পূজা। কোনটিই বাদ গেল না। মুনিরা সমস্ত সমাপন করে সবে যাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁদের থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। মুনিদের চোখ আকাশে নিবদ্ধ। ওঁদের চোখের পাতা নিমেষহারা। ওঁরা অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত জ্যোতি নিরীক্ষণ করলেন। মনে হল কোটি সূর্য জমাট বেঁধেছে। রোমাঞ্চিত হল ওঁদের শরীর ও মন। ওঁরা দেখতে থাকলেন। ওঁরা আরো দেখলেন। আরো অনেক বিস্ময় অবশিষ্ট ছিল। ওঁরা দেখলেন ঃ শতশত সিদ্ধ পাশুপত। ভস্মে ভস্মে তাঁদের শরীর অনুলিপ্ত। মুনিরা দেখলেন ঃ শতশত পাশুপত কোথা দিয়ে যেন এলেন, আসতে থাকলেন এবং অবশেষে লীন হলেন, হতে থাকলেন সেই জ্যোতির পিণ্ডে।

মুনিরা ব্রহ্মবনের পথে চললেন। তাঁদের মন পুলকিত অথচ ভারাক্রান্ত। কি ঐ আশ্চর্য জ্যোতি, কি ওর রহস্য—এই জিজ্ঞাসার ভারে ওঁরা আক্রান্ত। প্রতি পদক্ষেপে ঐ এক জিজ্ঞাসা অকম্পিত দীপশিখার মত তাঁদের মনে জেগে রইল। ওঁরা চলছেন। সম্মুখে পথ, প্রসারিত ব্রহ্মবনের দিকে।

এদিকে বায়ু এসে ব্রহ্মাকে সমস্ত নিবেদন করেছেন। বলেছেন নৈমিষারণ্যে মুনিদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। আলোকিত একটি পথের নিশানা তাঁদের তিনি দেখিয়েছেন। যথার্থই ওঁদের মন শিবময়।

ব্রহ্মা সব জেনেছেন। ব্রহ্মা সভায় উপস্থিত। আপাতত তিনি ব্যস্ত। নারদ ও তুম্বুরুর মধ্যে বিবাদ চলেছে। দুজনেই গানে পরম নিপুণ। কিন্তু সম্প্রতি বিবাদে রত। নারদ বলছেন ঃ আমি বড়। তুম্বুরু বলছেন ঃ আমার সমান হতে তোমার ঢের দেরি।…নিগূঢ় বিবাদ। বিচার করছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা রায় দিলেন, নারদ ও তুম্বুরু সমান সমান। ওঁদের মধ্যে আপাতত তাই শান্তি ও মৈত্রী হয়েছে।

ব্রহ্মা বসে আছেন। চতুর্দিকে বহু অপ্সরা ও গন্ধর্ব। নৃত্য ও গীত, গীত ও নৃত্য। ব্রহ্মা অনুরঞ্জিত মনে সভায় বসে আছেন।

বিবাদের বিচার সমাপ্ত। নারদ ব্রহ্মভবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। সঙ্গে অনুচরবর্গ, বহু গন্ধর্ব।

মুনিগণ দেখলেন ব্রহ্মভবন থেকে নারদ নিষ্ক্রান্ত হলেন। যেন মেঘ সরে গেল, সূর্য বেরিয়ে এল।

মুনিরা নারদকে সম্ভাষণ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এখন কি ব্রহ্মার অবসর ?

নারদের বড় তাড়া। শিবকে স্তব করবেন। সুরে সুরে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন। অতএব সংক্ষেপে বললেন ঃ যাও, এখন অবসর।

মুনিরা এলেন। দ্বারে দ্বারপাল। মুনিরা দ্বারপালদের বললেন ঃ ব্রহ্মার

সঙ্গে দেখা করব। অনুমতি চাই।

দ্বারপাল ভিতরে গেল। ফিরে এল অনুমতি নিয়ে।

ব্রহ্মগৃহ। সুখে আসীন ব্রহ্মা। মুনিরা দূর থেকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন।

ব্রহ্মা বললেনঃ বস।

মুনিরা বসলেন। ব্রহ্মা বললেনঃ সব শুনেছি। বায়ু বলেছেন, জেনেছি। ···বায়ু তো চলে এলেন। কিন্তু তারপর কি করলে? বল।

মুনিরা বলতে থাকলেন। মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হতে হতে হর্ষে বিস্ময়ে ভক্তিতে গদগদ হতে হতে তাঁরা সেই জ্যোতিদর্শনের অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।

ব্রহ্মা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেনঃ তোমরা ভাগ্য করেছ, তাই দেখেছ। সিদ্ধির দুয়ারে এসে তোমরা দাঁড়িয়েছ। তদ্গত হয়ে সেই তাঁর আরাধনা করেছ। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন। ঐ জ্যোতিদর্শন তারই সূচক। ঐ জ্যোতিই শিবলিঙ্গ। যে পথে পাশুপতগণ লীন হয়েছেন ঐ জ্যোতির অন্তরে অবশেষে তোমরাও যাবে ঐ পথে, লীন হবে তাঁতে, হবে মুক্ত। তোমরা ভাগ্যবান। সেই পরম মুহূর্ত সমাগত। তাই দেখেছ জ্যোতির অমন পিণ্ড। আপাতত তোমরা সুমেরুর দক্ষিণ শিখরে গমন কর। সেখানে আমার পুত্র সনৎকুমার রয়েছেন। নন্দী যাবেন, তিনি পথ চেয়ে ক্ষণ গুণছেন। তোমরা সেখানে যাও। সনৎকুমার যে ওখানে রয়েছেন তা এমনিতে নয়। সেও এক কাহিনীঃ পূর্বে সনৎকুমার অভিমানে পূর্ণ হয়েছিলেন। ভাবতেন যোগী-সমাজে তিনিই শ্রেষ্ঠ। অভিমানে অন্ধতা আসে। সনৎকুমার শিবকে দেখেও তাই সম্মান দেখাতে বিস্মৃত হয়েছিলেন। এতে নন্দীশ্বর ক্রুদ্ধ হন। সনৎ কুমারকে পরিণত করেন উটে। সনৎকুমারের মনে অশেষ অনুশোচনা ধিকি ধিকি করে জ্বলল। শিব ও শিবার বহু উপাসনা করে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করলেন। কিন্তু উটভাব আর দূর হয় না। আমাকে যেতে হল। অনেক অনুনয় ও বিনয় করতে হল। নন্দী খুশি হলেন। সনৎকুমারের উটভাব দূর করলেন। এদিকে মহাদেব ভাবলেন, শেষে কি ব্রহ্মার প্রথম পুত্র নিতান্তই মূঢ় হবে। সামান্য হেসে নন্দীকে বললেন, আমাকে জানত না বলেই অভিমানে ভরপুর হয়েছিল। ওকে প্রকৃততত্ত্ব জানাও। শিষ্য করে নাও। তোমার হাতেই ওকে আমি দিলাম। তুমি ওকে আলোর তত্ত্ব জানিয়ে আলোর বৃত্তে টেনে আন। দেখবে এককালে ও-ই আমার তত্ত্ব প্রচার করে বেড়াবে।···সনৎকুমারকে আমিই বলেছি। তাই সুমেরুর দক্ষিণ শিখরে নন্দীর তপস্যায় সে মগ্ন। নন্দী যাবেন, শীঘ্রই যাবেন। তাঁর যাওয়ার আগেই তোমরা সেখানে যাও।

মুনিরা ব্রহ্মার কথায় আরো পুলকিত হলেন। হর্ষে উদ্বেলিত হতে হতে

সুমেরুর দক্ষিণ শিখরে এসে তাঁরা পৌঁছুলেন।

মুনিরা দেখলেন, সম্মুখে রমণীয় সরোবর। স্কন্দ সরোবর। সাগরের মত বিরাট এই জলাশয়। ধারগুলি স্ফটিকে বাঁধানো। বহু ফুলে চারিদিকে প্রসন্ন এক সৌন্দর্য। ফুল, ধাতুর ফুল, সমস্ত রকমের ধাতুর ফুল। সোনার ফুল, হীরার ফুল, রূপার ফুল। চাঁদের মত চাঁদফুল তারার মত তারাফুল। সরোবরে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, ভেঙ্গে পড়ছে যেন অভ্রের গুঁড়ো ছড়িয়ে। হঠাৎ মনে হয় মাটিতে আকাশ এসেছে নেমে।

নীল পাথরে রচিত সোপান। আটদিকই সোপানে সোপানে বাঁধানো। কেউ জলে নেমেছেন, কেউ নামছেন, কেউ উঠছেন। সবাই এক আলোকিত পথের যাত্রী। কেউ জল নিয়ে যাচ্ছেন, কেউ ফুল তুলছেন। দেবতার পূজা হবে, তাই পুণ্য জল, এই সুন্দর ফুল।

জলের মধ্যে এখানে ওখানে জেগে রয়েছে শিলা। কেউ স্পর্শ বাঁচিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে পূজা বা তর্পণ করছেন। মুনিগণ বুঝলেন, এঁরা নিত্যই আসেন। স্নান, পূজা ও তর্পণে সরোবরের বুকে দোলা জাগিয়ে ওঁরা নিত্য পুণ্য করেন।

এদিকে ওদিকে রচিত হয়েছে সূর্যার্ঘ্য। স্থণ্ডিলেস্থণ্ডিলে ওঁরা সূর্যের পূজা করছেন।

পশুরাও বাদ যায়নি, পাখিরাও নয়। সরোবরে পশুপাখিরাও সমাগত। সরোবরের জলে নিমন্ত্রণের আহ্বানটি যেন সংলিপ্ত। তীরের গাছে গাছে কোকিলের কূজন। ঐ কূজনে যেন সরোবরেরই সরব নিমন্ত্রণ।

সরোবরে হাতিরা স্নান করছে। শুঁড়ে করে জল ছড়িয়ে ওরা শীতল হচ্ছে। হরিণহরিণী, অশ্বঅশ্বী তৃষ্ণায় আকুল হয়েছে। ভীড় করেছে সরোবরের শীতল কূলে।

দূরে দুটি বৃষ, সমরে উদ্যত। ওদিকে ময়ূরেরা জলপান করে উঠে আসছে। সরোবরে অমেয় শোভা। কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক এবং ভ্রমরের রবে সরোবর মুখরিত। তারা যেন ঐ সরোবরকে শতমুখে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছে।

এই সুন্দব সরব সরোবরের তীর। একটি কল্পতরু বৃক্ষ। একটি বেদী। হীরা ও মণির আলোয় ঝলমলানো একটি বেদী। মৃগচর্মের আসন। তার উপর সমাধিমগ্ন সনৎকুমার। চতুর্দিকে উপাসক যোগীগণ।

সনৎকুমার জাগ্রত হয়েছেন। সমাধির পরম নিদ্রা থেকে সনৎকুমারের শিশুর মত কচি শরীর জেগে উঠল।

মুনিরা কাছে গেলেন। সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করলেনঃ এসেছ, বেশ। বসো। কি কারণে আগমন?

মুনিরা বলতে শুরু করলেন। তাঁরা বর্ণনা করছেন। কিন্তু শেষ হল

না। হঠাৎ আকাশ যেন ফেটে পড়ল। দুন্দুভির ধ্বনিতে মুখরিত আকাশ যেন তাঁদের মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ল।

সবাই চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন যেন চলমান একটি সূর্য। এক অপূর্ব বিমান। বিমানে নন্দীশ্বর। বিমানের চতুর্দিকে অসংখ্য গণেশ্বর। অপ্সরা, সিদ্ধ, কিন্নরের সংগীতের তানে বিমুগ্ধ হয়ে চাঁদের মত একখানি চাঁদোয়ার তলে দেবী সুযশার সঙ্গে বসে আছেন স্বয়ং নন্দীকেশ্বর।

সনৎকুমার উঠে দাঁড়ালেন। কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদভাবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মনে হল তিনি যেন নিজেকে সমর্পণ করতে উদ্যত।

ধীরে ধীরে বিমান মাটিতে নেমে এল। নন্দী অবতরণ করলেন।

সনৎকুমার দণ্ডবৎ প্রণাম করে মুনিদের পরিচয় দিতে থাকলেন। বললেন ঃ ষটকুলে জন্ম। নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল তপ করেছেন। সম্প্রতি ব্রহ্মার আদেশে এঁরা এখানে এসেছেন। আপনার সেবা করে অশেষ পুণ্য অর্জন করতেই ওঁরা এসেছেন।

নন্দী মুনিদের দিকে তাকালেন। মুহূর্তে সর্ববন্ধন খসে পড়ল। ওঁরা মুক্ত হলেন। দীর্ঘ প্রসারিত একটি আলোকিত পথে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে মহা আলোর এক দিব্য পিণ্ডে ওঁরা লীন হলেন। অপার্থিব এক শান্তি অপার্থিব এক আনন্দের সমুদ্রে যেন ওঁরা ডুবে যেতে থাকলেন, থাকলেন, এবং ডুবলেন ।।

৬২. উপমন্যু ও কৃষ্ণ

সে সময়ে কেউ কোথাও ছিল না। চতুর্দিক নিথর নিস্পন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন। স্তব্ধ শরীরে নিস্পন্দ মনে উনি ভাবনায় ভারাক্রান্ত হয়ে বসে আছেন। পুত্র নেই, লাভ করতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? শ্রীকৃষ্ণের মনে উপায় সন্ধানের ব্যাকুল একাগ্রতা।

সহসা অসাড় বাতাসে যেন একটু একটু করে প্রাণের স্রোত বইল। মহর্ষি উপমন্যু এসে দাঁড়ালেন। শ্রীকৃষ্ণের মন দুলে উঠল। প্রদীপের অকম্পিত শিখাটি যেন সহসা কেঁপে কেঁপে নৃত্যের ছন্দ রচনা করল।

উপমন্যু অভ্যর্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ নিত্য কোন্ দেবতার উদ্দেশে রচনা করেন পূজার অর্ঘ্য?

মুহূর্তে উপমন্যুর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ল হর্ষের রঙ। আবেশে বিহ্বল তিনি বললেন ঃ কঠিন তপস্যায় অনেকদিন ব্যাপী অতন্দ্র হয়েছিলাম। মহাদেব তুষ্ট হয়েছিলেন, দেখা দিয়েছিলেন। আমি দেখলাম ঃ মহাদেব। পাশে

ত্রিশূল। অস্ত্রের অস্ত্র ত্রিশূল। মহা ভয়ংকর সেই ত্রিশূলের ফলায় ফলায় সংহত যেন সূর্যের দীপ্তি ও তেজ। সংহারের সময় এই অস্ত্রই জ্বলে উঠে অনন্ত তেজে। নিমেষে দগ্ধ হয় এ লোক, ও লোক, সে লোক। মান্ধাতা সসৈন্যে নিহত হয়েছিলেন, লবণাসুর ধ্বংস হয়েছিলেন। হয়েছিলেন এই ত্রিশূলেরই প্রতাপে। মহাদেব বসে আছেন। হাতে পরশু। পরশুরামের হাতে এই পরশুই বারবার ঝলসে উঠেছে, বারবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে। মহাদেবের হাতে সেই পরশু। মহাদেবের হাতে জ্বলছিল সুদর্শন চক্র। আকারে যেন পুরুষ। সহস্র মুখ, দুই সহস্র হাত, দুই সহস্র চরণ, দুই সহস্র চোখ। দেখলাম মহাদেব বসে আছেন। পাশে আরো আরো সব অস্ত্র ঃ পাশ, দণ্ড, অঙ্কুশ, গদা। মহাদেব বসে আছেন। বামে ব্রহ্মা। হংসযুক্ত দিব্যবিমানে চড়ে ব্রহ্মা রয়েছেন মহাদেবের পাশে। বিষ্ণুও রয়েছেন গরুড়ে চড়ে। আরো রয়েছেন স্কন্দদেব, নন্দী। আশে পাশে ভূতগণ, মাতৃগণ। মহাদেব বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে যেন মেলা বসেছে। মহাত্মারা স্তব করছেন। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ভক্তির আবেগে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। তবু আমি ওঁর স্তব করলাম। উনি সামান্য হেসে বললেন ঃ এত সব ভয়ংকরের অবতারণা করলাম। কিন্তু তুমি অবিচল রইলে। তুমি যথার্থই ভক্ত, নইলে ডুবে যেতে ভয়ের গভীরে। কিন্তু তা হয়নি। এক্ষেত্রে বরই তোমার প্রাপ্য। অবিলম্বে মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত কর।

আমি চাইলাম জ্ঞান, ভক্তি। বললাম ঃ আমার বংশের ধারায় যেন কখনো ছেদ না পড়ে। প্রত্যহ প্রচুর ক্ষীরে যেন আমার তৃপ্তি আসে। আশ্রমে বসেই যেন সান্নিধ্য পাই শ্রীশ্রীশঙ্করের।

কোটি সূর্যের মত যাঁর তেজ, সেই শঙ্করের কণ্ঠে প্রসন্নতার সুর বেজে উঠল। উনি বললেন ঃ যা চাইছ তা-ই পাবে। যখন যেখানে যা চাইবে তখন তখনই সেখানে তাই পাবে। শুধু স্মরণ, তাতেই আমি গিয়ে দাঁড়াব তোমার পাশে।

উপমন্যু হঠাৎ থেমে গেলেন। মুখ চোখে চরিতার্থতার অদ্ভুত এক আলো ছড়িয়ে পড়ল। গদগদ হয়ে এল তাঁর গলা। বললেন ঃ শত আরাধনায়ও যাঁর দেখা মেলা ভার সেই তাঁকে আমি দেখলাম। তাঁর প্রসাদ পেলাম। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ঃ তিনকাল। তিনকালের জ্ঞানে আমি উজ্জ্বল হলাম। তাই বলছিলাম আমি ধন্য। এ জগতে এত ধন্য আর কেউই হয়ত নেই।

মহাদেব অন্তর্হিত হলেন। আমার আশ্রমের চেহারা গেল বদলে। শোভায় শোভায় স্বর্গ নেমে এল আমার আশ্রমে। বাতাস বইল, শত সৌরভে আমোদিত হতে হতে বাতাস রইল। আশ্রমের আশেপাশে মুহূর্তে মুহূর্তে চোখে পড়ল কত কত ঋষি, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব। তাই বলছিলাম, দেবাদিদেবের কৃপার শেষ

নেই। আপনি ওঁকেই আরাধনা করুন। পুত্র কেন, তাঁর প্রসাদে সবই আসবে আপনার দোরে।

উপমন্যু শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। কি যেন বুঝতে চেষ্টা করলেন। শিবের কথায় উপমন্যু যেন নিরুৎসাহিত হতে জানেন না ঃ

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। মহাদেবের উপাসনা করে হল দুর্ধর্ষ। দেবতাদের উপরও প্রতিষ্ঠিত হল হিরণ্যকশিপুর আধিপত্য। পুত্র নন্দন। সেও পেল মহাদেবের প্রসাদ। ইন্দ্রের সঙ্গে নন্দন অযুত বৎসর ধরে যুদ্ধ করেছিল। বিষ্ণুর চক্র ইন্দ্রের বজ্র নন্দনের উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছিল নিস্তেজ। মহাদেবের করুণা পেয়েছে যে তার ক্ষয় নেই। অস্ত্রের ক্ষমতা কি তার অঙ্গ স্পর্শ করে।

অসুর বিদ্যুৎপ্রভও বিখ্যাত। ত্রৈলোক্যের অধিপতি হয়েছিল বিদ্যুৎপ্রভ। শত সহস্র বছর বজায় ছিল তার প্রতাপ। অযুত সহস্র পুত্র পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিল বিদ্যুৎপ্রভ। তপস্যায় মহাদেবকে বিদ্যুৎপ্রভ বিগলিত করেছিল। তাই তার এত সুখ এত ঐশ্বর্য। দৃষ্টান্তের তো শেষ নেই। কত শত দৃষ্টান্ত। দৈত্য শতমুখ পুরাণ পেয়েছিল। যাজ্ঞবল্ক্য জ্ঞান পেয়েছিলেন, বেদব্যাস হয়েছিলেন ত্রিকালজ্ঞ। বালখিল্য মুনিরা ইন্দ্রের কাছে পরাজিত হলেন। কিন্তু শিবের প্রসাদ যেই নামল সেই লাভ করলেন সোমকে, গরুড়কে। অত্রি-পত্নী অনসূয়া তিনশো বছর শিবপূজা করলেন। পেলেন দত্তাত্রেয়, চন্দ্র ও দুর্বাসার মত তিন তিন পুত্র। বিকর্ণ মুনির সিদ্ধিও এই শিবপ্রসাদেই। তাই বলছিলাম ওঁর আরাধনায় মনপ্রাণ সঁপলে শুধু পুত্র কেন সবই আসে ঘরের দোরে।

একবার শাকল্য নামে এক মুনি মহাদেবের আরাধনা শুরু করলেন। তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় দিন দিন তিনি কৃশ হলেন। নয়শো বছর ধরে তপের আগুনে ক্লিষ্ট হতে হতে তিনি শিবকে ডাকলেন। শিব এলেন। বললেন ঃ তুমি গ্রন্থ প্রণয়ন করবে। তাতেই তোমার খ্যাতি হবে ত্রৈলোক্য জোড়া। বেদের এক শাখার নাম ক্রক্। তুমি হবে তার সূত্রকর্তা।

আবার সত্যযুগে আমারই আশ্রমে তপস্যা করেছিলেন ঋষি সাবর্ণি। দুহাজার বছর কেটে যাবার পর শিব এসে দর্শন দিলেন। বললেন ঃ জরা ও মরণ তোমাকে স্পর্শ করবে না। গ্রন্থ রচনা কর, ওতেই তুমি বিখ্যাত হবে। তাই বলছিলাম, উনি দেবাদিদেব। আরাধনা যদি করতেই হয় ওঁকে করুন। পুত্র কেন, ভক্তের যাবতীয় মনোবঞ্ছা উনি পূরণ করেন। কত তো বললাম। কিন্তু আমার সাধ্য কি সব কথা বলি! হাজার হাজার বছর ধরে হাজার মুখে বলেও দেবাদিদেবের মহিমা ফুরোয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ সত্যই আপনি ধন্য। আপনার আশ্রমের পাশে শিব নিত্য

বিরাজ করেন। এমন পুণ্য এ জগতে আর কে করেছে? আমাকে কি উনি দেখা দেবেন? অনুগ্রহের ছোঁয়ায় কি ভরে উঠব?

উপমন্যু বললেনঃ ওঁর কৃপার অন্ত নেই। তপ করলে ওঁর প্রসাদ সমুদ্র হবে, আপনি তাতে ভাসবেন। আমি আপনাকে মন্ত্র দেব। দেরি হবে না। সত্বর শঙ্কর আপনার কাছে আসবেন। শুধু পুত্র কেন, লাভ হবে আরো কত কত মহার্ঘ রত্ন।

উপমন্যু শিবের কথায় আত্মহারা হয়েছিলেন। শুনতে শুনতে কৃষ্ণও সব ভুলেছিলেন। ওঁর মনে হলঃ আহা কথা নয়, যেন অমৃত।

দেখতে দেখতে আটটি দিন কেটে গেল। নবম দিনে কৃষ্ণ দীক্ষা পেলেন।

কৃষ্ণ তপস্যা শুরু করলেন। প্রথম মাস গেল। নির্জলা উপবাসে খিন্ন হয়ে কৃষ্ণ শিবের আরাধনায় ডুবে রইলেন। দ্বিতীয় মাসে মাঝে মাঝে গ্রহণ করতেন শুধু জল। তারপর তিনমাস শুধু বায়ুই হল তাঁর ভক্ষ্য। ক্রমে কৃষ্ণের লাভ হল চিত্তসমাধি। তারপর আরও কৃচ্ছ্রসাধন। পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে মাথার উপর দুহাত তুলে কৃষ্ণ তপস্যা করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ষোলটি মাস কেটে গেল। একদা এক বর্ষণমুখর দিনে মহাদেব এলেন ভক্তকে আশীর্বাদ করতে। কৃষ্ণ স্তবের মালায় মহাদেবকে বিভূষিত করলেন। ওদিকে আকাশ থেকে শতেক ফুল বর্ষিত হল কৃষ্ণের মাথায়।

মহাদেব, পাশে পার্বতী। মহাদেব বললেনঃ ইন্দ্রের উপর আমার সন্তোষের শেষ নেই। কিন্তু তোমার উপর তার থেকেও বেশি সন্তুষ্ট হয়েছি। ব্রত পালনে ভক্তির নৈবেদ্য রচনায তুমিই দেখছি শ্রেষ্ঠ। অতএব বর নাও। একে একে আটটি বর তুমি প্রার্থনা কর। আমি পূরণ করি। করে কৃতার্থ হই।

কৃষ্ণ বললেনঃ ধর্মে যেন নিয়ত আমার মতি থাকে। যশে ও বলে যেন হই সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনার প্রতি আমার ভক্তি হোক অচলা। আপনার নিয়ত সান্নিধ্যে আমি যেন ধন্য হই। প্রথম সন্তান যেন পুত্র হয়। গর্বিত শত্রুরা যেন আমার হাতে নিহত হয়। আর সর্বসময় যোগীরা যেন আমাকে প্রীতি করেন।

মহাদেব বললেনঃ মুনির শাপে সংবর্তক নামক আদিত্য মানুষ হয়ে জন্ম নেবেন। তিনি হবেন তোমার পুত্র। নাম পাবেন শাম্ব।

কৃষ্ণ পার্বতীকেও প্রসন্ন করলেন। পার্বতীও বর দিতে চাইলেন। দিলেনও। সেই বরের ফলেই ব্রাহ্মণের প্রতি কৃষ্ণের নিত্য প্রীতি। মাতাপিতাও কৃষ্ণের উপর পরম পরিতুষ্ট। কৃষ্ণ যত্রতত্র সর্বত্র ইচ্ছামত যেতে পারেন। কৃষ্ণের বংশধররা শৌর্যেবীর্যে অতুল। কৃষ্ণ শতযজ্ঞে ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেছিলেনঃ নিত্য সাত হাজার যতি ও অতিথি সৎকার করতে সমর্থ ছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে থেকে কৃষ্ণের আনন্দের শেষ ছিল না। সহস্র ভার্যা। এক কৃষ্ণ। তথাপি

এই এক সহস্রের প্রাণপ্রিয় হতে পেরেছিল। কৃষ্ণের ভার্যাদের শরীরে অঢেল সৌন্দর্য। উপভোগে কৃষ্ণের তৃপ্তির যেন অন্ত ছিল না। জীবের কাছে অন্ন জীবন সমান। জীবের কাছে কৃষ্ণ ছিলেন অন্নের থেকেও প্রিয়। এসবই পার্বতীর প্রসাদে কৃষ্ণ পেয়েছিলেন। পার্বতী দিতে চেয়েছিলেন, কৃষ্ণ চেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন।

চরিতার্থ কৃষ্ণ এলেন উপমন্যুর কাছে। সৌভাগ্যের কথা শতমুখে তিনি বর্ণনা করলেন। উপমন্যু ঝলমল করে উঠে বললেন ঃ ব্রহ্মলোকে থাকেন। নাম তণ্ডি। শিবকে স্তব করেন। অতঃপর শিবের বরে তণ্ডির তাবৎ ইচ্ছার পূরণ হয়েছিল। অদ্য তুমি চরিতার্থ। এবার নিশ্চিন্ত মনে গৃহে যাও। দেখবে কালে কালে সব কেমন ফ'লে উঠছে ।।

৬৩ নবজন্ম

খেতে দিতে পারেন না, পরতে দিতে পারেন না। অথচ পুত্রের পিতা। শিবের নাম করে সেই পিতা পুত্রকে দিয়ে এলেন গুরুর গৃহে। ঘরে রইলেন ওঁরা দুজনে।

কোনদিন কিছু জোটে, কোনদিন জোটে না। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে কোনরকমে কাটিয়ে দেন। কিন্তু ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে দিতেই যেন প্রাণ যায়। নিজেদেরই জোটে না কিছু, তার উপর ভিক্ষুকেব উৎপাত!

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বললেন ঃ ভিক্ষা নিতে কেউ এলে বল আমি বাড়ি নেই। দিতে তো কিছু পারব না। মিছি মিছি সামনে গিয়ে লজ্জা বাড়ানো।

ঃ বাড়িতেই তো রয়েছ। তবু বলব নেই ?

ঃ হোক মিথ্যে। তাই ব'ল।

যেখানে বাঘের ভয় থাকে সেখানেই যেন ত্বরিৎ পদে সন্ধ্যা নামে। বলতে না বলতেই অতিথি এসে দাঁড়ালেন দ্বারে।

ব্রাহ্মণীকে সামনে পেয়ে অতিথি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার পতি কোথায় ?

ঃ ধারে কাছে তো তাঁকে দেখছিনে। হয়ত নেই। কোথাও হয়ত গেছেন।

অতিথি হয়ে এসেছেন, কিন্তু তিনি ঋষি। দিব্য চোখ তাঁর। মিথ্যে বলে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

অতিথি বুঝলেন ব্রাহ্মণী মিথ্যে বলছেন। রেগে গিয়ে তিনি শাপ দিলেন ঃ যেখানে লুকিয়ে আছেন সেখানেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন।

পিতার মৃত্যু হয়েছে। পুত্র গালব এল ঘরে। গালব শুনল ঋষির নিষ্ঠুর

শাপের কথা। সে আর দাঁড়াল না একদণ্ডও।

শঙ্করের আরাধনা করে শাপের পাশ কাটিয়ে নিতেই হবে। এই তার পণ। গালব তপে বসল।

ক্রমে মহাদেবের কৃপায় গালব ধন্য হলেন। ওঁর পিতা নতুন জন্ম পেলেন।

পিতা গালবকে আশীর্বাদ করলেন। শঙ্করের প্রসন্ন চোখের আলোয় দুটি প্রাণে তৃপ্তির আবেশ নেমে এল॥

৬৪ অন্ধকাসুর

পার্বতী এলেন। পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে পার্বতী এলেন। মহাদেবের পিছনে পার্বতী। চুপি চুপি যেন দুখানি সোনার বেড়ি বাড়িয়ে তিনি মহাদেবের চোখ চেপে ধরলেন।

মহাদেব বুঝলেন। পদ্মের স্পর্শে চোখ বন্ধ হয়ে গেল। চোখ বুঁজে পার্বতীর খুশিভরা মনের ছোঁয়াটুকু তিনি উপভোগ করতে থাকলেন।

চোখ বন্ধ। সব অন্ধকার। চতুর্দিকে স্থাপিত হল অন্ধকারের রাজত্ব।

পার্বতীর হাতের তালু ঘেমে উঠল। শিবের তৃতীয় নয়নের আগুনে গরম হয়ে উঠল সেই ঘাম। পার্বতীর হাতের তালু যেন গর্ভ হল। মাত্র কয়েকটি ক্ষণের অবসর। ঐ গর্ভ থেকে নির্গত হল একজন মানুষ। অমাবস্যা যেন বন্দী তার অঙ্গে। তদুপরি পশুর মত কর্কশ রোমের অরণ্য। ঘোরতর কুৎসিত একজন মানুষের জন্ম হল। জন্মের সময় যে গান করেছিল। জন্মের সময় সে হাস্য করেছিল। জন্মের সময় সে রোদন করেছিল। গানে গানে হাস্যে হাস্যে রোদনে রোদনে বায়ুস্তর প্রকম্পিত করে ঘোরতর সেই মানুষটি জন্ম গ্রহণ করল। অন্ধকার থেকে জন্ম, শরীরের বর্ণে বিগলিত অন্ধকার, চোখেও নিত্য অন্ধকার।

মহাদেব হেসে বললেন: চোখ চেপে ঠাট্টা! তা মন্দ নয়। কিন্তু কিসের জন্য? ভয় খাওয়াতে চাও?

পার্বতী চোখ ছেড়ে দিলেন। তিনিও খুব হাসছিলেন। কিন্তু সামনে সেই ভয়ংকর মানুষটি। পার্বতী মহাদেবকে সুধোলেন: কে এ? কিসের জন্য এই ভয়ংকর সৃষ্টি? কেই বা এর পিতা?

মহাদেব বললেন: আমাদের পুত্র। আমাদের স্বেদ থেকে এর জন্ম। চোখ চেপে ধরেছিলে। সব তলিয়েছিল অন্ধকারে। সেই অন্ধকার থেকে এর জন্ম। নাম তাই অন্ধক। শক্তিতে বীর্যে অন্ধক অতি প্রচণ্ড। অশেষ ঐশ্বর্যে ওকে

আমি ভূষিত করব। দেখতে কুৎসিত, তাই বলে হেলা কর না। যত্ন কর, নন্দী বা অন্যান্য গণেশ্বরের হাত থেকে সতত একে রক্ষা করে রেখ। ভবিষ্যতে তাবৎ পরাক্রম এই অন্ধককেই আশ্রয় করবে।

পার্বতী মহাদেবের কথা রাখলেন। নিজের পুত্রের মত অন্ধককে আগলে রাখলেন।

ওদিকে কশ্যপের পুত্র হিরণ্যনেত্র তপস্যায় মগ্ন। হিরণ্যনেত্র পুত্র চান। তাই তাঁর শিবের তপ। ধীরে ধীরে অসুর হিরণ্যনেত্র তপের চরমে উঠলেন।

মহাদেব এলেন। বললেন: তপে তপে তুষ্ট করেছ। এবার ইচ্ছা ব্যক্ত কর।

হিরণ্যনেত্র বললেন: আমার ভ্রাতার প্রহ্লাদ প্রমুখ পাঁচটি বীর পুত্র রয়েছে। অথচ আমার পুত্রই নেই। আমার বিশাল রাজ্য! ভোগ করার কেউ নেই। মহৎ বংশ! বাতি দেওয়ার কেউ নেই। আমার ইহলোক অন্ধকার। পরলোকের দুয়ারও চিরকালের মত বন্ধ। কারণ, আমি পুত্রহীন। অতএব আমি পুত্র চাই। পুত্রার্থেই আমার তপ। ক্রীত পুত্রও পুত্র, দত্তক পুত্রও পুত্র—কিন্তু ঔরসপুত্রের মত পুত্র নেই। আমি তা-ই চাই।

মহাদেব বললেন: দৈব বিরূপ। তাই ঔরসপুত্র তোমার ভাগ্যে নেই। কিন্তু তাতে তুমি মুষড়ে পড় না। আমি তোমাকে পুত্র দেব। অপরাজিত এই পুত্রের নাম অন্ধক। গ্রহণ কর, সুখী হবে।

পরাক্রান্ত হিরণ্যনেত্র তপে মগ্ন ছিলেন। পুত্র পেলেন। তপ শেষ হয়েছে। অতএব আর কালক্ষেপ নয়। এবার যুদ্ধ।

হিরণ্যনেত্র দেবগণকে পরাজিত করলেন। পৃথিবীকে নিয়ে গেলেন রসাতলে।

দেবতা ও মুনিরা বিষ্ণুর শরণ নিলেন। বিষ্ণু বরাহের দেহ ধরলেন।

ধরিত্রীকে উদ্ধার করতে হবে। ধরিত্রী রসাতলে। বিষ্ণু বরাহের দেহ ধারণ করলেন।

বিষ্ণু এলেন রসাতলে। শতসহস্র দানবসৈন্য সেই বরাহের দাঁতে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করল। অবশেষে হিরণ্যনেত্রের মাথা কাটা পড়ল। ক্ষিপ্ত সুদর্শনচক্র হিরণ্যনেত্রের মাথা কাটল, দগ্ধ করল অযুত দানবসৈন্য।

অন্ধককে রাজা করা হল। বিষ্ণু অন্ধককে সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। ধরিত্রীও উদ্ধৃত হলেন।

পাতাল রাজ্যে অন্ধক। শাসন পালন সমস্তই নির্বাহ হচ্ছিল সুচারুরূপে।

পাতালরাজ্যে রাজা হিরণ্যকশিপু।

হিরণ্যকশিপু তপস্যা করলেন। ত্রিলোক জ্বলল সেই তপস্যার তাপে। ব্রহ্মা এলেন। হিরণ্যকশিপু বর প্রার্থনা করলেন: মৃত্যু আমাকে যেন তাড়া করে ফিরছে। আমি মৃত্যু চাই না। স্বর্গে বা মর্তে, দিনে বা রাত্রে শত্রুর

অস্ত্রে বা শস্ত্রে কোন প্রকারেই যেন আমার মৃত্যু না হয়।

ব্রহ্মা হঠাৎ চমকিত হলেন। ভয়ংকর বর! ব্রহ্মা হয়ত ভীতও হলেন। অবশেষে বললেনঃ খুশি যখন হয়েছি তখন তোমার অভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হবে। উঠ, তপ ত্যাগ কর। অমেয় ভোগ তোমার সম্মুখে। উঠ, আট কোটি ছিয়ানব্বই বৎসর দানবদের উপর আধিপত্য কর।

হিরণ্যকশিপুর মনে সুখ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তিনি সব পেয়েছেন। মনে মনে তাই পরিতোষ।

দানবের মনে পরিতোষ। ধর্মকথা ভেসে গেল। ত্রিলোক পরিণত হল নরকে। রাজা হিরণ্যকশিপু ত্রিলোক জয় করলেন।

দেবগণ ভীত ও ত্রস্ত। ওঁরা ক্ষীরসাগরের তীরে এসে বিষ্ণুর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। স্তবে স্তুতিতে ভুলিয়ে বিষ্ণুকে ওঁরা রাজী করালেন।

বিষ্ণু শুয়ে ছিলেন। দেবগণের অবস্থা দেখে উঠে বসলেন। বললেনঃ অত ভীত হবার মত কিছু নয়। আমি অভয় দিচ্ছি। সূর্য চন্দ্র ও অগ্নির তেজ সংহত করে সিংহমূর্তি ধারণ করে ঐ দুষ্ট দানবকে আমি বধ করব। এখন নিশ্চিন্ত হও।

বিষ্ণু অযথা সময় নষ্ট করলেন না। উনি সিংহের রূপ ধরলেন। ভয়ংকর এক সিংহ। কেশরে বিদ্যুৎ, অঙ্গে সূর্য, নখরে ও দন্তে কোটি বজ্র।

সূর্য ডুবে এল। সেই অদ্ভুত সিংহ প্রবেশ করল দানবপুরীতে। সিংহ আসছে। দানবরা এগিয়ে এল। যুদ্ধে একে একে মৃত্যু বরণ করল। সিংহ তখন পরাক্রম প্রকাশ করতে করতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বড় বড় দানব আসবে। একে একে নিহত হবে সেই সিংহের হাতে। সিংহ প্রতীক্ষা করতে থাকল।

দৈত্যরা ভাবল সিংহ। বনের সিংহ পথ ভুলে নগরীতে এসে পড়েছে। কিন্তু রাজপুত্র প্রহ্লাদ বুঝলেন। বুঝলেন এ সিংহ সিংহ নয়, বিষ্ণু। সিংহচর্মাবৃত বিষ্ণু।

প্রহ্লাদ বললেনঃ যুদ্ধে কাজ নেই, সর্বনাশ হবে। এ তো সিংহ নয়, সাক্ষাৎ বিষ্ণু। এঁর সঙ্গে যুদ্ধ আর মৃত্যু যে একই কথা। অতএব ক্ষান্ত দিন, ওঁর শরণ নিন।

হিরণ্যকশিপু ধমক দিয়ে পুত্রকে বললেনঃ থাম, নিতান্তই ভয় পেয়েছ। তাই এই সব বলছ। কোন বীরের মুখে এ সব কথা হাস্যকর।

হিরণ্যকশিপুর আদেশ ধ্বনিত হল, প্রতিধ্বনিত হলঃ সিংহকে বন্দী কর।

দৈত্যবীররা অগ্রসর হলেন। তাঁরা সিংহের নিকটবর্তী হলেন। হলেন এবং দগ্ধ হলেন। হিরণ্যকশিপু ছুটে এলেন। ঋষ্টি, পাশ, অঙ্কুশ ও আগ্নেয়াস্ত্রে

সুসজ্জিত হয়ে হিরণ্যকশিপু এগিয়ে এলেন।

সিংহের সঙ্গে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর যুদ্ধ। দেখতে দেখতে ব্রাহ্মদিন কেটে গেল। মহা মহা অস্ত্র নিক্ষেপ করেও দৈত্যরাজ সুবিধা করতে পারলেন না। বুঝলেন সহজে কাবু হবার নয় এই নৃসিংহ। সহসা দৈত্যরাজ হাজার হাজার বাহু প্রসারিত করলেন। কিন্তু বৃথা। যুদ্ধ চলেছে। চলেছেই। ক্রমে অস্ত্র ফুরিয়ে এল। সম্বল রইল মাত্র শূল।

হিরণ্যকশিপু যুদ্ধ করছেন। সহসা তাঁর মনে হল পর্বতের মত বিশাল কঠিন বাহু বাড়িয়ে কে যেন তাঁকে আকর্ষণ করে পেড়ে ফেলেছে। ভাববার অবকাশ মিলল না। পলকের মধ্যেই নৃসিংহের তীক্ষ্ন নখরে উৎপাটিত হল দৈত্যরাজের হৃৎপিণ্ড। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হল। দেব সমাজের এক মহা শত্রু নিপাত গেল। নৃসিংহরূপী বিষ্ণু দেখলেন প্রহ্লাদ অতি প্রণত। অতএব প্রহ্লাদ সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন।

অন্ধক বিহার করছেন। সঙ্গে আছেন অন্য ভাইয়েরা। ভাইয়েরা অন্ধককে বলল : রাজ্য নিয়ে তুমি কি করবে? রাজ্যের ন্যায্য অধিকারীও তুমি নও। হিরণ্যনেত্র নিতান্তই অল্পবুদ্ধি ছিলেন। তাই তপের কষ্ট স্বীকার করেও তোমার মত এই বীভৎস ও কুৎসিত পুত্র লাভ করেছেন। যা হোক পুত্র অবশ্য তিনি পেয়েছেন, তবে জন্ম দিয়েছেন অন্যে। এ অবস্থায় রাজ্য লাভ তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অন্ধক মনে মনে খুব আহত হয়েছেন। কোনরকম কিছু না বলে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। ঠিক করলেন তপস্যা করতে হবে। তপের শক্তিতেই সবার মুখ বন্ধ হবে। সবাই হবে দাসানুদাস।

সেই রাত্রেই অবোধ জননীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্ধক অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

নির্জন অরণ্য। তপস্যামগ্ন অন্ধক। এক পায়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটোকে খাড়া উপরে তুলে তিনি অবিরত মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। নিত্য নির্জলা উপবাস। অন্ধক অযুত বর্ষ ধরে কঠোর তপ করলেন। অবশেষে তিনি হোম করলেন। নিজের শরীর থেকে মাংস কেটে কেটে রক্তের সঙ্গে নিবেদন করলেন হোমের আগুনে। অন্ধকের হোম ও পূজা চলল। নিত্য নিবেদিত হয় মাংস ও রক্ত। শরীর শেষ হল। একরত্তি মাংসও রইল না। একবিন্দু রক্তও রইল না। অন্ধক হয়েছেন কঙ্কালসার। কিন্তু হোম ও পূজা স্থগিত থাকলে চলবে না। অন্ধক সশরীরে হোমের আগুনে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন।

দেবগণ ছুটে এলেন : আহা! করকি?

ব্রহ্মা বললেন : বাপু যথেষ্ট করেছ। এবার বর নাও।

অন্ধক বললেন : আমার রাজ্য অপহৃত। যারা অপহরণ করেছে সেই

প্রহ্লাদ ও অন্যান্য দানবরা আমার দাসত্ব করুক। আমার এই অন্ধত্বও দূর হোক। স্বর্গ পরিণত হোক আমার করদরাজ্যে। দেবদৈত্য, গন্ধর্বযক্ষ, উপগ ও মানুষ থেকে যেন আমার মৃত্যু না হয়। এমনকি নারায়ণও যেন আমাকে বধ করতে না পারেন।

ব্রহ্মা বললেন ঃ তোমার অভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হবে। কিন্তু নিজের বিনাশ ব্যাপারেও কিছু প্রার্থনা কর। কারণ জন্ম নিলে মৃত্যুকে স্বীকার করতেই হবে।

অন্ধক বললেন ঃ নারীকুলে যিনি অনন্যা, কায়মনোবাক্যে যিনি অগম্যা, যিনি আমার জননীর মত, সেই তাঁকে যদি কোনদিন কামনা করি তবেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মা বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এবার ক্ষান্ত দাও।

অন্ধক বললেন ঃ তপে শরীর হাড়সর্বস্ব হয়েছে। এ হালে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আপনি সদয় হয়ে আমার অঙ্গ স্পর্শ করুন। সবল ও সুগঠিত দেহ ফিরে পাই।

ব্রহ্মার স্পর্শ! অন্ধক শরীর পেলেন। অন্ধক চোখ পেলেন।

অন্ধক ফিরে এসেছেন স্বীয় রাজ্যে। প্রহ্লাদের কানে গেল অন্ধক এসেছেন। সুমহৎ বর লাভ করে অন্ধক এসেছেন। কোন দ্বিরুক্তি নয়। প্রহ্লাদ সমগ্র রাজ্য অন্ধককে অর্পণ করলেন। বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিলেন দাসত্ব।

অন্ধক স্বর্গ অভিযান করলেন। ইন্দ্র পরাজিত হলেন। স্বর্গ হল অন্ধকের করদরাজ্য। ক্রমে রাক্ষস মনুষ্য গন্ধর্ব যক্ষ সবাই অন্ধকের বশ্যতা স্বীকার করল। অন্ধক হলেন ত্রিলোকের অধীশ্বর।

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল থেকে বহু শত রম্যা রমণী রাজা অন্ধকের বিলাসের উপকরণ হিসেবে সংগৃহীত হল। অন্ধক রমণী সঙ্গে ব্যসনে মত্ত হলেন। রম্যা রমণী, রমণীর পানীয়। অন্ধক প্রমত্ত হলেন। কখনো পর্বতের চূড়োয় কখনো নদীর তটে সহস্র রমণী সঙ্গে সহস্র রঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে পড়ে অন্ধক প্রমোদরসে মগ্ন হয়ে রইলেন। ময় নির্মিত যানে আরোহণ করে সুরম্য গৃহের অলিন্দে বসে বা শুয়ে ভোগে ভোগে ধীরে ধীরে অযুত বৎসর অতিবাহিত হল।

অন্ধক চোখ পেয়েছিলেন, কিন্তু চোখ তাঁর ফোটেনি। পুণ্য কাজ কাকে বলে অযুত বৎসরের জীবনে তা তিনি জানেন নি। বেদ ব্রাহ্মণ, দেব ও গুরু-সমাজ নিয়ত হেলা পেয়ে অন্ধকের রাজ্যে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে পড়ে রইলেন।

একদা অন্ধক মন্দর পর্বতে এসে উপনীত হলেন। মন্দরের অমেয় শোভায় তিনি বিমুগ্ধ হলেন। মন্দর অন্ধকের মন হরণ করল। মন্দরই হল তাঁর বাসস্থান।

অন্ধকের তিন মন্ত্রী ঃ দুর্যোধন, বিঘস ও হস্তী। তিন মন্ত্রী মন্দর পর্বতের সানুদেশে নিত্য ভ্রমণ করেন। একদিন তাঁরা এক অভূতপূর্ব রত্ন আবিষ্কার করলেন। দেখলেন এক অনিন্দ্য রমণী। রূপে রূপে অপরূপা। সম্পূর্ণ অবর্ণনীয়।

ওঁরা উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে আবেগে বিগলিত হয়ে সেই রমণীর রূপ বর্ণনা করলেন। তিন মন্ত্রী সমস্বরে বলতে থাকলেন ঃ গুহা অথচ কি সুন্দর! বাঘের চামড়া পরেন, ভস্ম মাখেন—মুনি, অথচ শ্রীমণ্ডিত। মুনির মস্তকে জটার ভার, তদুপরি আধোখানি চাঁদ। মুনির অঙ্গে সাপের ভূষণ, কণ্ঠে মুণ্ডের মালা। মুনির হস্তে শূল, ধনু, খড়্গ। কাছাকাছি রয়েছেন আর এক ভয়ংকর পুরুষ। অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত। একটি বৃদ্ধ বলদও রয়েছে ধারেকাছে। আর আছে এক রমণী। এক অঙ্গে অত রূপ সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর অঙ্গে সেই অসম্ভবই লীলায়িত। শরীরে দিব্যছটা, সঙ্গে মিলেছে প্রবাল ও মণিমাণিক্যের ছটা। ছটায় ছটায় সে এক অপার্থিব ব্যাপার। আমরা দেখেছি। আমাদের চোখ সার্থক, আমাদের জীবন ও জন্ম সার্থক। এ জীবনে আর কিছু না দেখলেও ক্ষোভ নেই আমাদের। সব দেখার সার দেখাই যেন আমরা দেখে নিয়েছি। অমন ভার্যা যাঁর সেই মুনি ধন্য, ধন্য।

অন্ধক কামে অধীর হলেন। মুনির কাছে তিনি মন্ত্রীদের প্রেরণ করলেন।

তিন অমাত্য এলেন মুনির গুহায়। বললেন ঃ দৈত্যরাজ পাঠিয়েছেন। এই রমণী তাঁর অভিলষিত। কিন্তু এঁকে তুমি ভোগ করছ। এমন রূপবতী রমণী, অথচ তাকে ভোগ করছে তোমার মত কদাচারী এক ব্যক্তি। গায়ে ভস্ম মাখো, গলায় মুণ্ডের মালা পর, মাথায় জটা, জটায় গোঁজা বাঁকা চাঁদের মত হাড়ের খণ্ড, কোমরে জড়ানো সাপ। তোমার পক্ষে এমন রমণীর সঙ্গ করা নিতান্তই অনুচিত। বৃদ্ধ বলদে চেপে ঘোর, পান আহারও দেখছি নিতান্ত মন্দ। আবার ধনু, বাণ, খড়্গ এসবেরও জোগাড় রয়েছে। কদাচারী আর কাকে বলে! আমাদের রাজা বলেছেন, তুমি মুনি, তপ জপই তোমার কাজ। অস্ত্র শস্ত্র ও এতাদৃশ রমণী সম্ভোগ তোমার জন্য নয়। অতএব এঁকে ভালোয় ভালোয় উপঢৌকন দাও, নচেৎ মৃত্যুর নীল সমুদ্রে তোমার অবধারিত সমাধি।

মহাদেব কিঞ্চিৎ হাস্য করলেন। বললেন ঃ এই তরুণী আমার ভার্যা। ইনিই আমার সিদ্ধি। এঁরই প্রভাবে যন্ত্রতন্ত্র আমার অনায়াস অধিগতি। আমি কুৎসিত, কদাচারী—এতে কোন সন্দেহ নেই। ঠিকই বলেছ। তোমাদের রাজাকে বল, আমি পাশুপত ব্রত আচরণ করছি। তিনি রাক্ষস, কোন দ্রব্য যদি গ্রহণীয় বলে তিনি বিবেচনা করেন তাহলে তিনি যেন এখানে আগমন করেন ও গ্রহণ

করেন।

অমাত্যেরা বিস্মিত হলেন। গম্ভীর কণ্ঠ। কথাগুলি নির্গত হচ্ছিল সেই গম্ভীর কণ্ঠ থেকে। এরকম ধ্বনি তাঁরা জন্মে শোনেন নি।

অমাত্যেরা এসে অন্ধককে সমস্ত নিবেদন করলেন। ওঁরা বললেনঃ মুনি কিন্তু মনে হল বল ও বীর্যের আকর। আপনি এত বড় বীর, দৈত্যরাজ, অথচ উনি কোন আমলই দিলেন না। বরং বললেন, যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে দৈত্যরাজ যেন সশরীরে আসেন ও পরাক্রম প্রকাশ করেন।

অমাত্যেরা ক্ষণকাল মৌন রইলেন। পরে বললেনঃ আপনাকে কিছু উপদেশ দিই হেন ধৃষ্টতা আমাদের নেই। তবু মনে হয় ওঁর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নামা আপনার পক্ষে উচিত হবে না। কারণ, মনে হল মুনি অতি প্রচণ্ড এবং দুর্ধর্ষ। আপনার কথায় উনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত নন।

অন্ধক রাগে দিশেহারা হলেন। অমিত পরিমাণ সুরা পান করে বুঁদ হয়ে বসে ছিলেন। দুই চোখ হয়েছিল লালে লাল। মদে লাল, রাগে লাল। লালে লালে যেন আগুন ঝরল। খড়্গ হাতে নিয়ে দৈত্যরাজ অন্ধক ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

অন্ধক ভেবেছিলেন অস্ত্র হরণ করবেন। নিরস্ত্র মহাদেবকে পরাজিত করবেন সর্বাগ্রে। কিন্তু মতি বদলাল।

অন্ধক সেই গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন বিশ্বের তাবৎ সৌন্দর্য যেন বিগ্রহের আকার নিয়েছে। অন্ধক অন্ধ হলেন, সব বিস্মৃত হলেন। গৌরীকে হরণ করতে হবে—অন্ধকের মনে এই এক বাসনাই শতশিখা বিস্তার করে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

অন্ধক ধাবিত হলেন। কিন্তু গুহার মুখে নন্দীর অস্ত্রে প্রতিহত হয়ে অন্ধক ফিবে গেলেন। আবাব এলেন। আবার ফিরে গেলেন। এইভাবে বার বার যেন অন্ধক মাথা খুঁড়ে মরতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই প্রবেশের পথ পেলেন না।

পতঙ্গ আগুনেব দিকে ছোটে। মনে করে শতেক স্নিগ্ধতা অগ্নির অন্তরে। পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে, দগ্ধ হয়। অন্ধকও পতঙ্গ হলেন। কামবহ্নিতে বারবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু বারবারই ফিরে আসছিলেন দহন জ্বালা সংগ্রহ করে।

নন্দী চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কে তুমি? কেন এসেছ?

দৈত্যরাজ গোপন করলেন না। অতি সাদামাটা ভাবেই নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন।

নন্দী সমুচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হলেন! দৈত্যরজের খড়্গ খান খান হয়ে রণভূমিতে ছিটকে পড়ল। অন্ধক অস্ত্রহীন হলেন, অন্ধক ক্ষুধার্ত হলেন,

অন্ধক তৃষ্ণার্ত হলেন। শেষে কোন মতে পলায়ন করে ত্রাণ পাওয়া ছাড়া গতি রইল না। অন্ধক পলায়ন করলেন।

বিঘস এলেন, দুর্যোধন এলেন, হস্তী এলেন। অন্ধকের তিন অমাত্য এলেন ধেয়ে। প্রহ্লাদ এলেন, আরো এলেন বহু শত দৈত্যবীর। কিন্তু মুহূর্তমাত্রও তিষ্ঠোতে পারলেন না ; নন্দীকেশ্বরের দাপটে দৈত্যবীররা রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন।

বলি এলেন, বাণাসুর এলেন। ভঞ্জ, সুভঞ্জ, শম্বর, বৃত্র সবাই এসে সমবেত হলেন। কিন্তু, নন্দীকেশ্বরের প্রবল আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পরাজিত হলেন। মুহূর্তের মধ্যে মন্দর পর্বতের সেই সুন্দর প্রদেশ রক্ত মাংস ও মজ্জায় ভরে উঠল। বায়ু মাংসের পচা গন্ধে ভারী হল, রক্তে রণভূমি পরিণত হল হাবড়ে ; মাংসলোলুপ প্রাণীরা উন্মত্ত উল্লাসে রণভূমিতে বিচরণ করল। মন্দরের সেই সুন্দর প্রদেশ বীভৎস হয়ে উঠল। ভেরুণ্ড নামক প্রমথরা এল। নেচে নেচে পরিক্রমা করল রণভূমি। মন্দরের সেই সুন্দর প্রদেশ ভয়ংকর হয়ে উঠল।

মহাদেব পার্বতীকে বললেন ঃ পূর্বে পাশুপতব্রত করেছিলাম। ফল সঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি দানবদের পরাজিত করতে তা নিঃশেষ হয়েছে। বহু পুণ্য সঞ্চয় করেছিলাম। কিন্তু নিরন্তর তোমার সঙ্গ করছি—তাই বহুলাংশে সে সব ক্ষয় পেয়েছে। বর্তমানের এই বিগ্রহ এই ক্ষয়েরই জন্য। আবার তপে বসতে হবে। কঠোর নিয়ম পালন করে আবার উদ্‌যাপন করতে হবে পাশুপতব্রত। তাই আর হেথা নয়, অন্য কোথাও, অরণ্যে বা গিরিকন্দরে যাব, তপ করব, সঞ্চয় করব অযুত পুণ্য।···তুমি এখানেই থাক। পুত্র বীরক তোমাকে রক্ষা করবে। আমি ফিরব, ফেরা পর্যন্ত এই গুহাতেই থেকো। নির্ভয়ে থেকো। অন্য কোথাও যেও না।

মহাদেব গহন অরণ্যে প্রবেশ করলেন। শুরু হল তাঁর দুশ্চর ব্রত উদ্‌যাপন। সহস্র বৎসর ধরে তিনি মহা পাশুপতব্রত আচরণ করলেন।

এদিকে গুহা মধ্যে একাকিনী পার্বতী। বীরক আছে। কিন্তু পার্বতীর মনে শঙ্কা। যে কোন মুহূর্তে অন্ধক এসে হানা দিতে পারে। পার্বতী শঙ্কাতুর। পার্বতী প্রতীক্ষাতুর। কবে আসবেন শিব। কবে হবে তাঁর তপের শেষ। পার্বতীর দিন যেন আর কাটে না। মুহূর্ত অতিবাহিত হয়, পার্বতীর মনে হয় যেন এক যুগ।

অন্ধক বর পেয়েছিলেন। শক্তিতে তিনি পরম দুর্ধর্ষ। ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন। অন্ধক তাই গর্বে অত্যন্ত উদ্ধত। পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু অন্ধকের অহংকারের আগুন নিভল না, বরং জ্বলল দাউ দাউ করে। পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন। শত শিখা বিস্তার করে অন্ধকের মনে কামের আগুন প্রজ্বলিত হল।

বহ্নি মুখের মত সেই গুহামুখ। অন্ধক ধাবিত হলেন বহ্নিমুখে। অন্ধক পতঙ্গ হলেন।

নন্দীশ্বর অন্ধকের পরাক্রম প্রতিহত করে সেই গুহা রক্ষা করলেন, করতে থাকলেন। যুদ্ধে যুদ্ধে কেটে গেল পাঁচশো বছর।

খড়্গ, কুণ্ড, গদা, ভুষণ্ডী, নারাচ, শূল, তোমর ও ভিন্দিপাল। নানাবিধ অস্ত্রে সেই গুহার মুখ আচ্ছাদিত হল। পর্বত ও বৃক্ষকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন অন্ধক। পর্বতে বৃক্ষে বিবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রে গুহার মুখ সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হল। নন্দীকেশ্বর অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু এক সময়ে তিনিও আহত হয়ে সংজ্ঞা হারালেন।

নন্দী মূর্চ্ছিত। কিন্তু তবু দানবরা গুহায় প্রবেশের পথ পেল না কোন। শিব থাকেন, পরমেশ্বর থাকেন। দুর্ভেদ্য গুহার দ্বার। অন্ধকের সাধ্য কি প্রবেশ করে সেই গুহায়!

গুহা দুর্ভেদ্য। তবু পার্বতী ভীত হলেন। তিনি একাকী। শিব নেই। তিনি গেছেন বিজন অরণ্যে। সহায় মাত্র বীরক।

পার্বতী ভীত হলেন। স্মরণ করলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে। গুহায় একাকী পার্বতী। গুহায় একাকী রমণী। ব্রহ্মা এলেন, বিষ্ণু এলেন, ইন্দ্র এলেন। সিদ্ধ, নাগ ও গুহ্যকগণও এলেন। সমবেত হলেন গুহার অভ্যন্তরে। গুহায় একাকী রমণী। ওঁরা এলেন, এলেন রমণীর বেশে।

অসংখ্য রমণী বাজিয়ে দিলেন অসংখ্য ভেরী ও শঙ্খ। মহাধ্বনি। গুহার মধ্যে সেই মহাধ্বনি গমগম করে উঠল। গুহা কেঁপে উঠল। মনে হল প্রলয় সমুপস্থিত।

এদিকে নন্দী উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওদিকে সেনাপতি বীরক গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারে সারে বেরিয়ে এলেন বিরাট নারী-বাহিনী। ব্রাহ্মী শক্তির হাতে দণ্ড, বৈষ্ণবী ও সাঙ্কর্ষণী শক্তির হাতে শঙ্খ, গদা, পদ্ম, চক্র, ধনু ও লাঙ্গল। ওঁরা বেরিয়ে এলেন। ঐন্দ্রী শক্তি বেরিয়ে এলেন, হাতে বজ্র। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন আগ্নেয়ী, নির্ঋতি, যম, বারুণী, বায়বী, কৌবেরী ও গারুড়ী শক্তি। শত শত দেবী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

সম্মুখে দানবসৈন্যের সমুদ্র। ওঁরা কিঞ্চিৎ বিবর্ণ হলেন।

দানবরা দেখল সম্মুখে সেনাপতি বীরক। বীর্যের জ্বলন্ত বিগ্রহ। ওরা চমকিত হল।

যুদ্ধ চলল। দানবসৈন্য অভূতপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে যুদ্ধ করল। ওরা যুদ্ধ করল, পর্যুদস্ত হল, কিন্তু পলায়ন করল না। আমৃত্যু প্রচণ্ড শক্তিতে যুদ্ধ করল।

স্বয়ং দেবীও যুদ্ধে নেমেছেন। বীরক সেনাপতি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র তাবৎ

দেবমণ্ডলী এবং স্বয়ং দেবী পার্বতী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অন্ধক মহাব্যূহ রচনা করেছেন। অদ্ভুত কৌশলে তিনি যুদ্ধ করছেন। নন্দীকেশ্বর ব্যতিব্যস্ত। হঠাৎ তিনি দেখলেন তদ্‌গিল নামক এক দানব সৈন্য ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হচ্ছে। নন্দী বিরাট হাঁ করে তাড়া করলেন।

অকস্মাৎ সমস্ত স্তব্ধ হল। দেবাদিদেব মহাদেব এসেছেন। তপস্যা সমাপ্ত। তিনি এসেছেন। রোষে সহস্রশিখা বিস্তার করে তিনি জ্বলছিলেন। মহাদেব এলেন। দেবসৈন্যরা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। গৌরী হৃষ্ট হলেন। সমগ্র নারীসৈন্য মহেশ্বরকে প্রণতি জানালেন। মহেশ্বর পার্বতীকে আলিঙ্গন করে প্রবেশ করলেন গুহার গহ্বরে।

নারীবাহিনী যুদ্ধে ক্ষান্তি দিলেন। মহাদেবের আদেশ—তাঁরা প্রস্থান করলেন। দানব সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে নারীবাহিনী যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

নন্দী রইলেন গুহার দ্বারে। তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত। যুদ্ধ আপাতত স্তিমিত।

অকস্মাৎ বিঘস গুহার মধ্যে বেগে প্রবেশ করলেন। মহাদেবকে বললেন ঃ তুমি তাপসমাত্র। এই রমণী তোমার জন্য নয়। ভালোয় ভালোয় এঁকে দানবরাজ অন্ধককে উপহার না দিলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। মুনির সঙ্গে বিরোধ করা সঙ্গত নয়। কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ অন্যরকম। দানবগণের ঘোর শত্রু তুমি। দানবরাজ তোমাকে সত্বর বধ করবেন। অপহরণ করবেন এই নারীরত্ন। এখনো সময় আছে। এখনো তোমার সুমতি হলে দানবরাজ অন্ধক তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

মহাদেব ক্রোধে প্রজ্বলিত হলেন। কিন্তু কথায় প্রকাশ করলেন না। বললেন ঃ তোমার কথা যথার্থ। যারা শক্তিহীন, দারা ও ধনে তাদের অধিকার নেই। তোমার প্রভুকে জানিয়ো তিনি যেন এখানে আসেন, বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তারপর যা খুশি তাই করেন। আমিও যথাযথ কর্তব্য করতে ত্রুটি রাখব না।

বিঘস ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে হুংকার দিতে দিতে ফিরে এলেন। অন্ধক ব্যাপারটি বুঝলেন। বুঝলেন যুদ্ধই একমাত্র পথ।

মুহূর্তে অন্ধক গুহাদ্বারে এসে উপনীত হলেন। বাণে বাণে গুহার দরজা চূর্ণ করতে চাইলেন। বীরক ও পার্বতীকে লক্ষ্য করেও ছুটল বাণের ঝাঁক। দানবসৈন্য ভাঙ্গ ভাঙ্গ শব্দে পাহাড়ের চূড়া গাছ গাছালি ভেঙ্গে তছনছ করে ফিরতে লাগল।

মহাদেব বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন। ভূত ও প্রমথ গণকে স্মরণ করলেন। বিষ্ণু ও তাবৎ দেব সৈন্য, ভূত ও প্রমথগণ মহাদেবকে প্রণাম জানালেন। সবাই

যুদ্ধের সাজে সজ্জিত। মহাদেব বীরককে আহ্বান করলেন। মহাদেব বীরককে বরণ করলেন। বীরক সেনাপতি।

মুহূর্ত মধ্যে সমরক্ষেত্র মুখরিত হল। প্রমথরা অনন্ত দাপটে দানবসৈন্য প্রমথিত করলেন। অন্ধক বিঘসকে আদেশ পাঠালেন। বিঘস বিরাট হাঁ করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র সবাইকে গ্রাস করে ফেললেন। বাকী রইলেন বীরক। বীরক অসহায় বোধ করলেন। রণভূমিতে অবস্থান করা আপাতত অশ্রেয়। বীরক এলেন গুহায়। ম্রিয়মাণ বীরক এলেন শিবসমীপে।

বীরক বললেন ঃ একমাত্র আমি আছি। ব্রহ্মা বিষ্ণু বিঘসের পেটে। সূর্য চন্দ্র যম ইন্দ্র বিঘসের পেটে। বরুণ বায়ু এবং কুবেরও ওখানেই গতিলাভ করেছেন। তাতেও সেই দৈত্য শান্তি মানেনি। বিশাল হাঁ করে এগিয়ে আসছে। সমগ্র বিশ্ব ভক্ষণ করে হয়ত ব্যাটা শান্তি মানবে। আমি বিমূঢ়। ভেবে কোন কূলকিনারা মিলছে না। এখন আপনিই একমাত্র গতি। ...অন্ধক অপরাজেয়। আপনিও অপরাজেয়। অতএব আপনি পথ বলুন।...গতিতে অন্ধক প্রচণ্ড। বায়ু এবং মনও হার মানে। বিঘসও ভয়ংকর, বিষ্ণুকে পর্যন্ত গ্রাস করে বসে আছে। অতএব ব্যাপার অতি ঘোর। এককালে বশিষ্ঠ প্রমুখ সপ্তর্ষি বিঘসকে শাপ দিয়েছিলেন। তাই জীববধে তার উল্লাস। সে জীব বধ করে। ভোজন করে। ঋষিরা রুষ্ট হয়ে শাপ দিয়েছিলেন। বিঘস মিনতি করেছিল। ঋষিরা তুষ্ট হয়ে মুক্তির কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ তোমার কাছে পরাজিত হবেন। তারপর মুষ্টি ও বাণের প্রহারে তোমার মুখ থেঁতো হবে। তুমি মুক্ত হবে। সেই থেকে এই বিঘসের দৌরাত্ম্যের শেষ নেই। চন্দ্র ও সূর্যকে পর্যন্ত উদরসাৎ করেছে। গাঢ় কালো কুয়াশা! পৃথিবী যেন এই কুয়াশার সমুদ্রে নিমজ্জিত।

ওদিকে দৈত্যগুরু শুক্রের কাজও মাত্রা ছাড়িয়েছে। সঞ্জীবনী মন্ত্রের বলে তিনি যেন প্রাণ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। যেখানে যে দানব নিহত হয়েছে সেখানেই তিনি এসে তাকে বাঁচিয়ে তুলছেন।

যদি কিছু করেনই তাহলে এই বেলা করুন। মা ভবানীর কিছু একটা হলে আমরা নিতান্তই পথে বসব। জ্ঞানগম্যি বুদ্ধি সুদ্ধি শক্তি কিছুই আর আমাদের থাকবে না। এখনও সময় রয়েছে। কিছু একটা করুন।

মহাদেব ভাবলেন, বীরক উপযুক্ত পুত্র। সেই মতই কথা বলেছে।

মহাদেব তৎপর হলেন। ধ্যানের শক্তিতে নির্মিত হল তিনভুবন। মহাদেব সূর্যের কিরণের মত সোমাখ্য সামগান করলেন। অন্ধকার অপগত হল। মহাদেবের দন্তের আলোতে অন্ধকার ছত্রভঙ্গ হল।

আলোর তরঙ্গ উঠল। বীরবর নন্দীশ্বরও পুনরায় উত্থিত হলেন। লিপ্ত হলেন মহা ভয়ংকর যুদ্ধে। কিন্তু সশস্ত্র নন্দীকেও গতিলাভ করতে হল।

বিঘসের উদর প্রদেশ হল মহাসম্মীলনের এক ক্ষেত্র। ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য চন্দ্রের সঙ্গে নন্দী মিলিত হলেন।

মহাদেব অবাক হলেন। দৌরাত্ম্য ক্রমেই যেন বাড়ছে। বৃদ্ধ বৃষ। মহাদেব আরোহণ করলেন। ধীরে ধীরে বিঘস দৈত্যের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। মহাদেব মন্ত্র জপ করছিলেন। মহাদেবের অন্তরে গিলন-বিঘাতক মন্ত্রের ধ্বনি। মহাদেবের অন্তরে উদ্গিলনক মন্ত্রের ধ্বনি। জীর্ণ বৃষ। তদুপরি মহাদেব। মহাদেবের ধনু থেকে বাণ মোচিত হল। দেখতে দেখতে সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে নন্দী সেই দানবের মুখপথে বেরিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে ব্রহ্মা বিষ্ণু বেরিয়ে এলেন। সূর্য চন্দ্র বেরিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে বেরিয়ে এলেন যম ও ইন্দ্র, বরুণ ও বায়ু। এবং অবশেষে কুবের।

দেখতে দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রের বন্যা বইল। দেখতে দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রে শব্দের ঝড় বইল।

এদিকে ব্যস্ততার শেষ নেই শুক্রাচার্যের। শুক্রাচার্য এদিকে যাচ্ছেন ওদিকে যাচ্ছেন, ছুটছেন। এদিকে ওদিকে সেদিকে চতুর্দিকে ছড়াছড়ি। মৃতদেহ। দানবের মৃতদেহ। শুক্রাচার্য ছুটে বেড়াচ্ছেন। যেন প্রাণের হরির লুট দিয়ে ফিরছেন।

গণেরা শুক্রাচার্যকে বেঁধে ফেললেন। মহাদেবের পদতলে শুক্রাচার্যকে নিয়ে ফেলা হল। যেন কাতর একটি পশু। মহাদেব শুক্রাচার্যকে গ্রাস করলেন। আপদের শান্তি হল।

দেখতে দেখতে রণভূমি নিহত দানবের দেহে ভরে উঠল। শুক্র নেই। মহাদেবের উদরে আপাতত বিশ্রামের শান্তিতে সুপ্ত। দেখতে দেখতে রণভূমি হল দানবগণের শবভূমি। দেখতে দেখতে শবলোলুপ জন্তু জানোয়ারের রবে মুখরিত হল।

দানবসৈন্য পরাজিত ও পলায়িত। স্বর্গ ও মর্ত্যের ত্রিসীমায়ও রইল না কেউ। পর্বতের গুহায়, পাতালে, জলের অতল তলে পলায়িত ও ভীত দানবসৈন্য আশ্রয় নিল।

কিন্তু অন্ধক তখনো ক্ষান্তি মানেন নি। বীরকের সৈন্যবাহিনীর উপর অন্ধক খড়্গহস্ত হলেন। অত্যাচারে অত্যাচারে মারের চোটে বীরকের বাহিনী পর্যুদস্ত। বিষ্ণু এলেন এগিয়ে। গদার আঘাতে চোখে অন্ধকার দেখলেন অন্ধক। তবু অন্ধকের ক্ষান্তি নেই। সমানে অমিত বিক্রমে অন্ধক যুদ্ধ করে চললেন। বিষ্ণু ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন। নিশিত বাণে বিদ্ধ করলেন অন্ধককে। বাণে বাণে দৈত্যপতি বিদ্ধ হতে থাকলেন। তথাপি বিচলিত হলেন না অন্ধক। বরং রোষের আগুনে ঘিয়ের আহুতি পড়ল। দেবতারা প্রচণ্ডভাবে মার খেতে খেতে পরাজিত হলেন। অন্ধকের গর্জনে দিক্ সমূহ ফেটে পড়ল : কোথায়

সেই মহাদেব, আসুক, যুদ্ধ করুক, দেখি তার কত হিম্মৎ। অন্ধ রোষে অন্ধক তখন অন্ধ।

যুদ্ধের গতি ক্রমে প্রচণ্ডতর হল। ক্রমে অন্ধকের অস্ত্রশস্ত্রও ফুরিয়ে এল। অতঃপর মায়াযুদ্ধ। কিছুরই অভাব রইলনা। মায়ার বল! পলকে পলকে ভারে ভারে সৃষ্টি হল অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত।

বৃক্ষ, সর্প, অগ্নি, বজ্র ও মেঘ—মায়ায় উদ্ভাবিত হল ইত্যাকার সব অস্ত্র। অন্ধক মহাদেব ও পার্বতীকে অস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত করতে লাগলেন।

অন্ধক অবধ্য। বর পেয়েছিলেন। অন্ধক ধন্য। অদ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ধক দিশাহারা। তিনি অবধ্য। অতএব পরাক্রমে পরাক্রমে অন্ধক বারবার দেবগণকে অন্ধকার দেখিয়ে ছাড়লেন। নন্দী হার মানলেন। দেবগণ ভয়ে কম্পিত। মরিয়া হয়ে মহামহা সব ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়তে থাকলেন। রক্তে রক্তে ভাসল অন্ধকের শরীর।

রক্তের গঙ্গা বইল। কিন্তু বিপদ ঘনাল আরো ঘোর রূপে। এক একবিন্দু রক্তে একজন অন্ধকের জন্ম হতে লাগল। দেখতে দেখতে অন্ধকে অন্ধকে রণভূমি পূর্ণ হল। একে অন্ধকে রক্ষা নেই, তায় শতসহস্র অযুত অন্ধক। মহাদেব বিচলিত হলেন।

বিষ্ণু এলেন, নন্দী এলেন। মহাদেব তাঁদের ডেকেছেন। অদ্য এই সংকটের মুহূর্তে মহাদেব বিষ্ণু ও নন্দীর পরামর্শ চান।

অবশেষে মহাদেব ভয়ানক এক নারীর রূপ গ্রহণ করলেন। তার অনেক হাতে অনেক অস্ত্র। তিনি হাত বাড়ালেন। দিগন্ত প্রসারিত সেই হাত সমূহ। তাঁর শরীরে নির্গত হল অগণিত লোম। প্রতিটি লোম যেন এক একটি বিষাক্ত সর্প। ভয়ংকর এক নারীমূর্তি। অকস্মাৎ কোপে তিনি ফেটে পড়লেন। দক্ষিণাঙ্গ থেকে নির্গত হল দুই মহানাগ। নাগ পুঞ্জ পুঞ্জ বিষ উদ্গীরণ করল। সৃষ্ট হল অনন্ত বিষ। সৃষ্ট হল অপরিমেয় দহনজ্বালা।

মহাদেব নবতর অত্যদ্ভুত মূর্তিতে প্রকটিত। দেবতারা বিস্মিত আনন্দে সমস্ত দেখছেন। অকস্মাৎ তাঁদের বিস্ময় ও আনন্দ আরও গাঢ় হল। তাঁরা দেখলেন নবতর এই মূর্তির কর্ণপথে নিষ্ক্রান্ত হলেন এক মহাদেবী। দেবতারা স্তবে মুখর হলেন।

মহাদেবী। যেন মহাক্ষুধা হতে তাঁর জন্ম। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মহোৎসব। অজস্র শোণিতে প্রভূত মাংসেও যেন তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি আসছে না। মুহূর্তের মধ্যেই সমগ্র রণভূমি জনশূন্য হল। রইলেন একাকী অন্ধক। অযুত অন্ধক মুহূর্তে যেন বাষ্পীভূত হল। রইলেন একাকী অন্ধক। রক্তশূন্য বিবর্ণ অন্ধক।

অন্ধক রক্তশূন্য, বলশূন্য। কিন্তু তবু অন্ধক যুদ্ধ করতে থাকলেন।

অন্ধক ক্ষান্তি মানতে জানেন না। অন্ধক যুদ্ধ করলেন। হাত পা নখ মুখ সর্বশরীর দিয়ে অন্ধক যুদ্ধ করলেন।

শিবের ত্রিশূল প্রোথিত হল নিরস্ত্র অন্ধকের বুকে। ত্রিশূলে গাঁথা অন্ধকের বিবর্ণ শরীর। শিব ত্রিশূল আকাশে উঠালেন। ত্রিশূল খাড়া করে রেখে দিলেন। ত্রিশূলের আলে অন্ধকের দেহ। অন্ধক অবশেষে ছত্রের সৌন্দর্য বিকীর্ণ করতে করতে খোলা আকাশের তলায় বিরাজ করতে থাকলেন।

ত্রিশূলবিদ্ধ অন্ধক। দিন গেল, যেতে থাকল। সূর্যের কিরণে অন্ধকের দেহ শুকিয়ে কাঠ হল, হতে থাকল। তথাপি তাঁর প্রাণ নির্গত হল না। তিনি জীবিতই রইলেন। শূন্যে খোলা আকাশের তলায় ত্রিশূলের ডগায় ছত্রের সৌন্দর্য বিকীর্ণ করতে করতে বিশুষ্ক হয়েও অন্ধক প্রাণ ত্যাগ করলেন না।

দেবগণ পরিশ্রান্ত। তাঁরা শিবের স্তব করে প্রস্থান করলেন। পার্বতীর বিষণ্ণ চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সূর্যের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। বীরক মুক্ত ছিলেন। বিঘসের পেটে পচে মরেন নি। গুহায় নিশ্চিন্ত পার্বতী, বীরক, শিব। পার্বতীর বিষণ্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখে চন্দ্রের লাবণ্য ছড়িয়ে পড়েছে।।

৬৫. জন্মান্তর

তপস্যার শক্তি। মহাশক্তি। অন্ধক তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মা এসেছিলেন। বর দিয়েছিলেন। অন্ধকের বাহুতে মহাশক্তি ভর করেছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণু এমনকি মহেশ্বরও যথেষ্ট পর্যুদস্ত হলেন। অন্ধকের দাপটের সম্মুখে ওঁদের মিলিত শক্তিও প্রায় নিষ্ফল হতে বসেছিল। অবশেষে মহাদেবের ইচ্ছাতে অন্ধকের পরাক্রম স্তব্ধ হল। ত্রিশূলে বিদ্ধ হয়ে রৌদ্র কিরণে শুকিয়ে কাঠ হয়ে অন্ধককে আকাশে স্থির একটি ছত্রের করুণ সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে করে বেঁচে থাকতে হল। অন্ধক মরলেন না।

শুক্র অন্ধককে সহায়তা করেছিলেন। প্রাণ ছড়িয়ে বিদ্রোহের অদ্ভুত এক খেলায় শুক্র মত্ত হয়েছিলেন। অবশেষে শুক্রের বিশ্রাম রচিত হল মহাদেবের উদরে। মহাদেবের উদরে প্রলয়ের অনল। শুক্র সেখানে রইলেন, কিন্তু মরলেন না।

অন্ধক মরলেন না। শুক্র মরলেন না। অন্ধক গতি লাভ করলেন। শুক্র গতি লাভ করলেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে অন্ধককে রক্ষা করলেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে শুক্রকে রক্ষা করলেন। নতুন জীবনের প্রাতে ওঁরা একদা জেগে উঠলেন।

শুক্র মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানেন। শিবের জঠরে যেতে যেতে, শিবের জঠরে গিয়ে তিনি ঐ মন্ত্র জপেছিলেন। নিরন্তর জপেছিলেন। শুক্র মরলেন না। মহাদেবের লিঙ্গ পথে শুক্র রেতের আকারে নির্গত হলেন। গৌরী সেই রেত ধারণ করলেন। গৌরীর পুত্র হল।

পুত্রের প্রতি গৌরীর স্নেহ শতধারে বর্ষিত হল। মৃতকে প্রাণ দেওয়ার তত্ত্বে বহুবিধ আরো জ্ঞানে শুক্র আচার্য হয়ে উঠলেন। তারপর তিনহাজার বছর পেরুল। শুক্র আবার জন্ম নিলেন। মহেশ্বর জন্ম দিলেন। শুক্র অজর অমর হলেন। শুক্রের নবজন্ম। নবজন্মে শুক্র যেন শুক্র নন, দ্বিতীয় শঙ্কর।

ওদিকে শূলের আলে অন্ধক। নিরক্ত অন্ধক। সম্প্রতি রৌদ্রের জ্বালায় শুষ্ক কাষ্ঠবৎ। তথাপি অন্ধক উতলা হননি, কাতর হননি। মনে মনে শিবের ধ্যান। তিনি অনন্যমনা। হৃদয়ে যন্ত্রণা নয়, কাতরতা নয়, শিবের ধ্যান। অন্ধক হলেন শিবময়।

মহাদেব ভ্রমণ করছিলেন। সহসা অন্ধককে দেখলেন। বিস্ময়ের তাঁর অন্ত রইল না। তিনি এলেন। অন্ধককে শূল থেকে নামালেন। অমৃতে সিঞ্চন করলেন অন্ধকের দেহ।

বললেন ঃ তোমার তপস্যা অলৌকিক। দম, নিয়ম, শৌর্য ও ধৈর্য তোমাতে যা দেখলাম ত্রিভুবনে তা অতুল। তোমার মনের সমস্ত ইচ্ছাই অদ্য পূর্ণ করব। বর যদি দিতেই হয় তাহলে তুমিই আদর্শ পাত্র। যে তপ তুমি করেছ সে মত তপ এ যাবৎ অন্য কেউ অন্য কোন খানে করেনি। তিন সহস্র বৎসর। তুমি প্রাণ ধারণ করে আছ। বিশুষ্ক শরীরে শূলের আলে বিঁধে থেকে তুমি বেঁচে আছ। বর যদি না-ও নাও তথাপি তুমি চিরসুখী হবে।

অন্ধক ভয়ে কাঁপছিলেন। হাঁটু গেড়ে বসে জোড় হাতে তিনি বললেন ঃ মোহে পড়েছিলাম। আপনাকে তাই বুঝিনি। শত অকথ্য কথায় আপনাকে পীড়িত করেছি। কুৎসিত মনে পার্বতীর কথা ভেবেছি। ব্রহ্মার বরে চোখ পেয়েছি। কিন্তু মোহের ঘোরে অন্ধই রয়ে গেছি। আমি অনুতপ্ত। আমার একমাত্র প্রার্থনা মার্জনা। আমাকে মোহগর্ত থেকে আপনি উদ্ধার করুন।

অন্ধক দম নিলেন। একটু থেমে বললেন ঃ জগতের মাতা, আমারও মাতা। সেই পার্বতীকে আমি রুষ্ট করেছি। তিনি যদি প্রসন্ন না হন তাহলে আমার বাঁচা নিরর্থক। আমি নিতান্তই দীনহীন। দীন ও হীনের প্রতি ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর ক্রোধ শোভা পায় না। অতএব আমাকে তুলে নিন। জাগরিত করুন অন্য এক জীবনের প্রান্তে। বীরক আপনাদের পুত্র। আমিও বীরকের মত হতে চাই। থাকতে চাই আপনাদের সাহচর্যে। আমার শরীরের এই কৃষ্ণবর্ণ কুন্দের মত হোক। আমার মনে নামুক কুন্দের পবিত্রতা।

অন্ধক স্তব্ধ হলেন। নিমগ্ন হলেন পার্বতী ও পরমেশ্বরের ধ্যানে।

মহাদেবের নয়নে প্রসন্নতার অমৃত ঝরল।

অন্ধকের স্মৃতির দুয়ার উন্মুক্ত হল। জন্মসূত্রে পার্বতী তাঁর মাতা। শিব পিতা। একে একে অন্ধকের মনে সমস্ত বৃত্তান্ত যেন দূর আকাশপ্রান্ত থেকে ভেসে ভেসে আসতে লাগল। অপার্থিব আনন্দে অন্ধকের হৃদয় ভরে উঠল।

অন্ধক চোখ মেলে তাকালেন। সম্মুখে মাতা পার্বতী, পিতা শিব। প্রণামের বিনতিতে উল্লাসের রোমাঞ্চে অন্ধকের শরীর দুলে দুলে উঠল। অন্ধক জেগে উঠছেন। অন্ধকের চোখে আলোকের শত তরঙ্গভঙ্গ। অন্যতর এক জীবনের প্রান্তে অন্ধক জেগে উঠেছেন॥

৬৬. রুরুর অভিলাষ

নিজের চোখ। তাকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না রুরু। চোখ মুছলেন। চাইলেন। আবার দেখলেন। দেখলেন। পলক কাঁপল না, পড়ল না। দানব রুরু দেখলেন। দুচোখ ভরে দেখতে থাকলেন। কিংবা হয়ত দেখলেন না, পান করলেন। চোখের গণ্ডুষ ভরে রুরু আকণ্ঠ লাবণ্য পান করলেন।

লাবণ্য। একদেহে এত লাবণ্য! যৌবন। একদেহে যৌবনের এমন উচ্ছ্বাস!

মলয় পর্বতে রুরু দেবী পার্বতীকে দেখে মুগ্ধ হলেন। অবশেষে অভিলাষে পাগল হলেন।

পেতে হবে, পেতে হবে। অমন নারীকে না পেলে নয়। রুরুর মনে কামনার ভয়াবহ অস্থিরতা।

সূর্য মরীচি বোঝালেন। বোঝালেনঃ ও পাবার নয়। উনি যে জগতের জননী।

রুরুর বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তিনি তখন দিশা হারিয়েছেন।

পেতে হবে, তাকে পেতে হবে। তপস্যার শক্তিতে তাঁকে পেতে হবেই। রুরু তপস্যায় মগ্ন হলেন।

দিশাহারা রুরু দিশা হারিয়ে খেয়ে না খেয়ে তপস্যা করলেন। অযুত বৎসর ধরে নিদারুণ তপস্যা চলল। কোনদিকে মন নেই। মন যেন এঁটে রইল লাবণ্যের ঐ জীবন্ত বিগ্রহের সঙ্গে। তপস্যায় তপস্যায় রুরু পাষাণের মত নিথর হলেন।

ব্রহ্মাকে আসতেই হল। পদ্ম ও পলাশের বর্ণ ছড়িয়ে ব্রহ্মা এলেন রুরুর সম্মুখে।

বললেনঃ ঘোর তপে ডুবে আছ। কি এমন চাও যার জন্য এই দুশ্চর তপস্যা?

রুরু ব্রহ্মার কথায় চোখ খুললেন। ধ্যানের ঘোরে বারবার তাঁর চোখ মুদে এল। তিনি বললেনঃ পার্বতীকে চাই। আমার ভার্যা হয়ে হৃষ্টচিত্তে তিনি আমার ঘর করুন, শিব বশ মেনে আমার কথামত উঠুন বসুন—এইই আমার কাম্য। দেবগণ এতে রুষ্ট হবেন। কিন্তু আমার ক্ষতি যেন করতে না পারেন।

রুরু আরও বললেনঃ স্ত্রীরা স্বভাবতই মুগ্ধা। তাদের ধৈর্য সর্বদা কম্পিত। সর্বোপরি বীর্যহীন, অসহায়। এই স্ত্রীদের কাছে আমাকে যেন কখনো ভয় খেতে না হয়।

ব্রহ্মা হেসে উঠলেন। বললেনঃ চাইছ, কিন্তু পাবে না। কারণ এ পাবার নয়। পার্বতী জগতের জননী। ভুবনে ভুবনে কালে কালে তিনি পুজো পেয়ে আসছেন। সেই পার্বতীকে চাইছ ভার্যা হিসেবে! চাইছ, চাও। চাইতে বাধা নেই। কিন্তু পাবে না।

ব্রহ্মা একটু থামলেন। বললেনঃ শিব তাঁকে পেয়েছেন। কিন্তু সেও বড় সহজে নয়। সহজেই যদি পেতেন তাহলে কি আর শিবকে অন্য স্ত্রীতে উপগত হতে হয়? সহজেই যদি পেতেন তাহলে কি আর জাহ্নবী ইন্দুলেখা বা সন্ধ্যা দেবীর ঠাঁই হয় শিবের মাথায়? পার্বতী দুর্লভ। তাই শিবকে অন্য অন্য রমণীর মন রাখতে হয়, ভাল ভাল কথার মালা গেঁথে মরতে হয়। কাজেই যা চেয়েছ তা আর চেয়ো না। মুখেও এনো না। অত যদি সাধ তবে অপ্সরাদের সঙ্গে একটু মাখামাখি করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। মণিরত্নের উপর ভিখারীর লোভ হতেই পারে। লোভ হয়, দূর থেকে লোভীর মত তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ টাটিয়ে মরে। মণিরত্ন পায় না। যা পায় তার নাম মনঃকষ্ট। পার্বতীর প্রতি তোমার লোভ হয়েছে। হতেই পারে। যাও, দূর থেকে পার্বতীকে দেখ, সঙ্গে, ভয়ংকর মহেশ্বরকেও দেখতে পাবে। ওতে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। অতএব ক্ষান্ত দাও।

ব্রহ্মা আর অপেক্ষা করলেন না। আকাশে উঠে চলে গেলেন।

দানবরাজ রুরুর যেন জিদ চেপে গেল। আরও ভয়ংকর তপে তিনি মগ্ন হলেন। ক্রমে তাঁর তপস্যার তাপে মলয় পর্বত পুড়তে থাকল। তপস্যার হলকা গিয়ে শিবকেও স্পর্শ করল। শিব ভয় পেলেন। আর চিন্তা ভাবনা নয়। শিব মুহূর্তের মধ্যে পার্বতীকে নিয়ে মলয় পর্বত ছেড়ে পালাতে শুরু করলেন।

পার্বতী বললেনঃ বহ্নির ভয়ে কাতর কেন? আপনার অমেয় প্রভাব। নিরস্ত করুন। অযথা পলায়ন করছেন কেন?

শিব বললেনঃ তোমাকে পেতে চায়। তাই এই ভয়ংকর তপ। এ তাপ সেই তপের। যদি কিছু করতে পার তাহলে কর, দেরি ক'রনা। চরাচর পুড়ছে, আমি পুড়ছি। তোমাকে মিনতি করছি, রক্ষা কর। সেখানে যাও।

রূপে রূপে তাকে মোহিত কর। তাহলে নিয়ম ভঙ্গ হবে, তপের তাপও কমে আসবে। এমন বলছি বলে কোপ কর না। কারণ এ ছাড়া কোন পথ নেই। যদি থাকে তুমি দেখাও। যা হয় একটা কিছু কর।

পার্বতী ভয় পেলেন। পতির মির্নাত। হয়ত রক্ষা করতে পারবেন না। পার্বতীর মন কেঁপে উঠল।

পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়েছেন। একটা কিছু বিহিত করতে হবে। পার্বতী এলেন বিন্ধ্যপর্বতে।

অকস্মাৎ পার্বতী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হস্তীতে সিংহে যুদ্ধ। ঘোর যুদ্ধ। সিংহের ছোট শরীর। সুবিধা অনেক। নড়তে চড়তে সময় লাগে পলকমাত্র। হস্তীর বিশাল শরীর। নড়তে চড়তে কিঞ্চিৎ সময় যায়। কিন্তু একবার বাগে পেলে পশুরাজের মহিমা মুহূর্তে মিলাবে শূন্যে। সিংহ হস্তীর শরীরের মধ্যেই লুকিয়ে পড়ছে, বেরিয়ে আসছে, উদ্ব্যস্ত করে তুলছে হস্তীকে। দেবী পার্বতী এ যুদ্ধ দেখলেন। সিংহকে দেবী সংহার করলেন। সিংহের চামড়া ছাড়িয়ে নিলেন।

সিংহের চামড়া কোমরে জড়িয়ে দেবী পার্বতী নিম্নাঙ্গ আবৃত করলেন। রক্তে তাঁর কেশপাশ সিক্ত হল। চেহারা হল ভয়ংকর। উদর ঝুলে পড়েছে। আকার হল বীভৎস।

হুংকারে হুংকারে সমগ্র পর্বতভূমি প্রকম্পিত করতে করতে দেবী অগ্রসর হলেন। উপনীত হলেন সেই গুহার মুখে। দ্বার বন্ধ। দ্বার ভেঙ্গে পড়ল। দেবীর পদাঘাতে গুহাদ্বার ভগ্ন হল। দেবী হেসে উঠলেন। প্রলয়ের মেঘে গর্জন গুহার গাত্রে আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকল।

রুরু চোখ খুললেন। কিন্তু ভয়ে তাঁর চোখ বন্ধ হল।

দেবী বললেন ঃ যার জন্য তোমার তপস্যা সেই আমি গৌরী এসেছি। যা করতে হবে বল, করব। আর তপে কি কাজ? এবার ইচ্ছা ব্যক্ত কর। সংকোচে কি কাজ? ব্যক্ত কর।

ভরসা করে রুরু চোখ খুললেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সংজ্ঞা লোপ পেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রুরু সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন ঃ যা দেখছি তা জীবন্ত এক পিণ্ডীভূত কদর্যতা। তুমি কখনোই গৌরী নও। গৌরীর গায়ে সোনার রঙ, গৌরীর মুখে চাঁদের হাসি, গৌরীর শরীরে উচ্ছ্বসিত যৌবন। অথচ তুমি? ঘোর, অতিঘোর এবং কুৎসিত। আমি তোমাকে ডাকিনি, আমি তোমাকে চাইনি। তুমি যাও। এই মুহূর্তে দূর হও। নচেৎ প্রেরিত হবে যমালয়ে।

রুরু উত্তেজিত। রুরু কম্পিত। রুরু দিশাহারা। মুহূর্তে তিনি উঠে

দাঁড়ালেন। হাতে তুলে নিলেন গদা। আঘাত হানলেন দেবীর শরীরে। দেবী মুষ্টির আঘাতে ফিরিয়ে দিলেন গদার প্রহার। দানবরাজ রুরু জরজর হলেন মুষ্টির আঘাতে। যুদ্ধ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠল। দানবরাজ পাষাণ বৃষ্টি করলেন, অগ্নি বৃষ্টি করলেন। বৃক্ষ উৎপাটিত করে দেবীকে আঘাত করলেন। লেলিয়ে দিলেন ভয়ানক বিষাক্ত সব সাপ। দেবী ক্ষতবিক্ষত হলেন।

দানবরাজ রুরু। সিংহ ব্যাঘ্র তাঁর ভোজ্য। সেই হিংস্র দানবরাজ রুরু ছিন্ন হলেন দেবীর নখদন্তের আক্রমণে। রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে। রক্তের নদী প্রবাহিত হল।

রুরু মায়া বিস্তার করলেন। মুহূর্তে তাঁর বিন্দু বিন্দু রক্ত থেকে শত শত বরুরু জন্ম নিল। দেখতে দেখতে ভীষণ, বিকৃত এবং বীভৎস অসংখ্য দানবসৈন্য গর্জিয়ে উঠল।

দেবী পার্বতীও দেহ থেকে সৃষ্টি করলেন অসংখ্য স্ত্রীসৈন্য। সৈন্যে সৈন্যে বিন্ধ্য পর্বতের সেই প্রদেশ ভরে উঠল। অনন্ত ক্ষুধা নিয়ে যেন তাঁদের জন্ম। দানবসৈন্য নিঃশেষিত হতে থাকল। দেবী পার্বতীর স্ত্রী সৈন্যদের ক্ষুধার অনলে সমগ্র রুরু-বাহিনী যেন পলকে নিঃশেষিত হল।

দেবী প্রমত্তা। সংহারে প্রমত্তা। রুধির পানে প্রমত্তা। মায়াপানে প্রমত্তা। রুরুর তাবৎ মায়াজাল ছিন্ন হল। তবু যেন শেষ নেই। যুদ্ধ করতে থাকলেন অত্যদ্ভুত এক দানব। মায়ায় মায়ায় আচ্ছন্ন এবং মায়ায় মায়ায় আবৃত সেই দানব।

মায়াবী দানব মায়া বিছালেন। বায়ুর অনুকরণ করলেন। কখনো ব্রহ্মলোকে কখনো ত্রৈলোক্যে। কখনো এ লোকে কখনো ও লোকে। মায়াবী দানব মায়া ছড়িয়ে যুদ্ধ করছেন। বায়ুর গতিতে লোকে লোকে ছুটে বেড়িয়ে বেড়িয়ে যুদ্ধ করছেন। এই মর্ত্যে, এই পাতালে, এই স্বর্গে। পলকে লুকিয়ে পড়ছেন। অবশেষে জগতের চতুর্দিকে শুরু করলেন পরিক্রমা।

দেবী তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। দেবী অতি স্থূলরূপ ধারণ করলেন। বিক্রমে বিক্রমে দেবী অনন্যা হলেন। দীপ্তি ছড়ালেন প্রলয়ের সূর্যের মত। সে এক মহাবিশাল রূপ। ধারণার অগম্য। স্বয়ং ব্রহ্মা পারেননি। সামান্য লোমকূপের পরিমাণ—তাও পারেননি নির্ণয় করতে। মায়াবী দানব মুহূর্তে ঘুরে ফিরছিল স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। কিন্তু দেবীর এ পা থেকে ও পা পর্যন্ত যেতে গিয়ে অবশেষে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না। হাতের মুঠোয় ধরা পড়তেই তিনি মূর্চ্ছিত হলেন। দেবীর নখরে দানবরাজ রুরুর মাথা কাটা পড়ল।

বরুরুর শরীর রক্তে রক্তে প্লাবিত। রক্ত শুকিয়ে আসছে। সর্বগাত্রে রচিত হয়েছে সহস্র বুদ্বুদ। রুরুর শরীর ছিন্ন ও ভিন্ন। শিরা ও উপশিরা বেরিয়ে

পড়েছে। দেবী সেই বীভৎস শরীর চামড়া দিয়ে আবৃত করলেন। অবশেষে রুধির ও মাংস ভক্ষণ করে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে শান্তি মানলেন।

ওদিকে শিব প্রতীক্ষা করে রয়েছেন। গণে গণে পরিবৃত শিব পার্বতীর আগমন প্রতীক্ষায় ক্ষণ গুণছেন।

অবশেষে পার্বতী এলেন। হাতে ধরা দানবের মুণ্ড, রুধিরে পূর্ণ। পার্বতী শিবকে সেই রুধির পূর্ণ মুণ্ড উপহার দিলেন। খুশিতে ভরা পার্বতীর উপহারে শিবও ভরে উঠলেন খুশিতে। শিব পার্বতীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। খুশির ভরা কটাল। শিব বসলেন। কোলে রাখলেন রুধিরভরা সেই মুণ্ড। শিব পান করলেন। পার্বতীকেও পান করালেন। আকণ্ঠ পান করালেন। অবশেষে শেষটুকু নিজে নিঃশেষ করে পান করলেন।

মহাদেবের শরীরে রক্তেরক্তে মাখামাখি। মনে হল ঃ হিমালয়। ফুলে ফুলে ঢাকা কিংশুকের কুঞ্জ, কিংশুকের কুঞ্জে কুঞ্জে আচ্ছাদিত হিমালয়। মহাদেবের শরীরে রক্তের আবীর। পার্বতীর অনুরাগের অনুলেপন। মহাদেব নন, বুঝিবা কিংশুকের কুঞ্জে কুঞ্জে সমাবৃত হিমালয়।

মহাদেব ও পার্বতী। মহাদেবের প্রতি পার্বতীর অনুরাগ! স্বরূপ নির্ণয় করে কার সাধ্য? রহস্যের কুয়াশায় আবৃত হয়ে মহাদেবের প্রতি পার্বতীর অনুরাগ লীলায়িত হল অন্যতর ছন্দে, অন্যতর প্রকাশ-সুষমায়। পার্বতী মহাদেবকে উপহার দিলেন সেই সিংহচর্ম। মহাদেব পরিধান করলেন। দেবীও পরলেন, পরলেন দানবের চর্ম। দানবের চর্মে অঙ্গ ঢেকে দেবী সখীদের সঙ্গে বিলাসে মেতে উঠলেন।

ব্রহ্মা এলেন। এলেন সুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, কিন্নর ঋষিরা। স্তবে স্তবে দেবী পরিতুষ্ট হলেন।

দেবীর অঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে খসে পড়ল ভীষণতার আবরণ। চন্দ্র যেন মুখ লুকিয়েছিলেন। এবার হাসির জ্যোৎস্না ছড়িয়ে ভেসে উঠলেন। বিগলিত হয়ে প্রবাহিত হলেন দেবীর অঙ্গে।।

৬৭. পীড়িত মহাদেব

শিব এসেছেন বাণাসুর-নগরে। শোণের তীরে শিব। সঙ্গে আছেন দেবতারা, অসুরেরা। শিব লীলা করলেন, বিলাস করলেন। শোণের সুন্দর তীর শিবের লীলায় আরো আরো সুন্দর হয়ে উঠল। শোণের জলতরঙ্গ—সঙ্গে মিশল গন্ধর্বদের গান। শোণের বুকে ঢেউয়ের ছন্দ, সঙ্গে মিশল অপ্সরাদের

নাচের বোল। শোণের তীরে সুন্দর মূর্তি পেল, শোণের তীরে সুন্দর ভাষা পেল, শোণের তীরে সুন্দর গতি পেল, ভঙ্গি পেল, পেল ছন্দ।

জগতের ঈশ্বর এসেছেন। মুনিরা এলেন। স্তবে ও আবৃত্তিতে রচিত হল নৈবেদ্য। ঋষিরা জ্বালিয়ে দিলেন হোমের আগুন। শিব এসেছেন। এই তো সময়।

শোণের তীরও যেন নদী হল। উল্লাস ও আনন্দের নদী। শোণ নদী, তার তীর। তীর নয়—আনন্দের নদী, উল্লাসের নদী। উল্লাস ও আনন্দের শত তরঙ্গের সহস্র ভঙ্গে সেই তীরনদী বইল।

প্রমথরা বারবার কেঁপে কেঁপে উঠল। শরীরে তাদের খুশির শিহরণ, শরীরে তারই কাঁপন।

সিদ্ধরা এলেন। দেখলেন শঙ্করের সম্বন্ধিনী রতিকে। শোণের তীরে প্রমূর্ত রতি।

অদ্য এই মুহূর্তে নাস্তিকরা বিষণ্ণ, শত্রুরা পাণ্ডুর। মহাদেব এসেছেন। সম্মুখে ব্রাহ্মী প্রমুখ মাতৃগণ।

শিব এসেছেন। এনেছেন বরাভয়। সংসারী মানুষের মনে নেমে এসেছে নিবৃত্তির শান্তি।

অপ্সরারা নাচে নাচে উতলা। মনে মনে উতলা মুনি ও সিদ্ধরা। ছয় ঋতু এসেছেন। শোণের তীরে ফুলের সাজ। শোণের বাতাস গন্ধে মাতাল। মৃগরা বেরিয়ে এসেছে। বনভূমির পোষাক ছেড়ে মৃগরা বেরিয়ে এসেছে শোণের তীরে কিসের টানে কে জানে? কোকিলেরা তান ধরেছে। তানে তানে মনে মনে টান পড়েছে। কামের টান, মোহে আবিষ্ট হবার টান।

উতলা শোণ, উতলা শোণের তীর, উতলা শিব। খুশি খুশি শিব, মাতোয়ারা শিব। নন্দীর প্রতি উতলা শিবের আদেশ ধ্বনিত হল: কৈলাসে যাও। গৌরীকে গিয়ে বল উনি যেন আসেন, সেজে গুজে মনোরম রূপে আসেন।

সেই দণ্ডেই নন্দী এলেন কৈলাসে। গৌরীকে বললেন: শিব বলেছেন, চলুন। সাদামাটা ভাবে নয়, সেজে গুজে চলুন। দেরি নয়, দেরি হলে শিব বলবেন নন্দী কর্মের নয়। অতএব চলুন।

দেবী গৌরী মনোময় সাজে মনোনিবেশ করলেন। মনের মত বেগে নন্দী ফিরে এলেন। বললেন: আসছেন। বলেছি। সেজে অতি সত্বর তিনি আসছেন।

শিব অধীর হলেন। কোন কথা শোনার মত ধৈর্য তাঁর নেই। বললেন: একা কেন? তিনি কৈ? যাও, নিয়ে এস।

থতমত খেয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে নন্দী আবার এলেন। দেবীকে বললেন:

মহাদেব আপনাকে দেখতে চান। সুন্দর বেশে সুন্দর রূপে আপনাকে তিনি এই দণ্ডে পেতে চান।

মহাদেব পীড়িত। কামের আক্রমণে তিনি কাতর। তাই অকালে গৌরী স্মরণ।

এদিকে অপ্সরাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। মহাদেব পীড়িত। অপ্সরারা পরস্পর বলাবলি করলেন : উনি কামারি, কিন্তু সম্প্রতি কামের বাণে জরজর। গৌরী ছিলেন, নচেৎ কামের সাধ্য কি? গৌরী ছিলেন, তাই ওঁকে আশ্রয় করে কামদেব কাতর করে তুলেছেন মহাদেবকে। রূপে লাবণ্যে বিলাসের কলায় পার্বতী অতুল। তাছাড়া পার্বতী ছাড়া কারই বা ভরসা হবে ওঁকে ছুঁতে?

কুষ্মাণ্ডের কন্যা চিত্রলেখা বললেন : পারি। আমি পারি। খুব পারি। পার্বতীর রূপ ধরব। স্পর্শ করব। উনি পুলকে শিহরিতও হবেন। তোমাদের কেউ নন্দীর রূপ নাও, দেখ পারি কিনা। দেবীর সখীদের ভূমিকা নিতে তো যে কেউ পারবে।

উর্বশী বললেন : আমি নন্দী হব।

বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করে উর্বশী হলেন নন্দীশ্বর। অপ্সরারা যেন ভরসা পেলেন। সবাই চেহারা বদলে নিলেন। ঘৃতাচী হলেন কালী। বিশ্বাচী চণ্ডিকা, প্রম্লোচী সাবিত্রী। মেনকা হলেন গায়ত্রী। সহজন্যা জয়া। পুঞ্জি-কস্থলী সাজলেন বিজয়ের আদলে। ক্রতুস্থলী নিলেন বিনায়কের আদল।

সাজবদল হল। কার সাধ্য নকল বলে ঠাহর করে। সব নিখুঁত, পরিপাটি।

এবার চিত্রলেখার পালা। বৈষ্ণব আত্মযোগে, সাজার কৌশলে, অনুকরণের নৈপুণ্যে চিত্রলেখা হলেন পার্বতী। শরীরের নিম্ন মধ্য ঊর্ধ্ব—কোথাও খুঁত নেই। চিত্রলেখা হলেন হুবহু এক পার্বতী। রক্ত পদ্মের মত দুখানি পা—নখে নখে চন্দ্রের কিরণ। তাতে নূপুর। নূপুরে স্বর্গীয় সুর। জঙ্ঘায়, কটিদেশে, বক্ষে, মুখের আদলে গৌরীই যেন চিত্রলেখার শরীরে নেমে এসেছেন।

ওদিকে নন্দীকেশ্বর কৈলাসে গেলেন। প্রমথরাও সঙ্গ নিয়েছেন। এবার চিত্রলেখার অবসর।

নকল নন্দী নকল গৌরীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন শিবসকাশে। নন্দী কটাক্ষে বিদ্ধ করলেন মহাদেবকে। বললেন : গৌরী এসেছেন। তাঁকে এনেছি। মাতৃগণও এসেছেন।

শিব শয্যা ছেড়ে পা ফেলে এগিয়ে এলেন। হাত ধরে গৌরীকে নিয়ে বসালেন শয্যায়।

দেবদৈত্য মুনি ঋষি সবাই এসেছেন আগ বাড়িয়ে। পার্বতী এসেছেন।

স্তবে স্তবে ওঁরা উদ্বেল হলেন।

শয্যায় মহাদেব এবং পার্বতী। নানাবিধ লীলায় বিলাসে ওঁরা মগ্ন হলেন। চতুর্দিকে মাতৃগণের গান ও নাচ। ওঁরা হাসছিলেন, জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছিল সেই হাসিতে। ওঁরা আনন্দে কাঁদছিলেন, গান ভেঙ্গে পড়ছিল সেই কান্নায়। শিব ও পার্বতী লীলারসে নিমজ্জিত। তাঁদের উপভোগ আরও গূঢ় হল ও দের নাচে গানে এবং হাস্যে।

কোন ত্রুটি রইল না। নকল গৌরী ও মাতৃগণের অভিনয়কে অভিনয় বলে মনে হল না। কেউ বুঝতেও পারলেন না। স্বয়ং শিবই পারলেন না, অন্যের কথা তো দূরের।

গৌরী এলেন। অনুচরবর্গে পরিবৃত দেবী গৌরী এলেন শিবের কাছে। কিন্তু ওঁরা হতবাক হলেন। এখানেও যে আর এক পার্বতী, এখানেও যে এক এক করে তাবৎ অনুচর। সকলেই স্তম্ভিত। আসলে নকলে ভেদ করতে পারল না কেউ।

মহাদেবের পার্শ্বে পার্বতী। তিনি হেসে উঠলেন। অপ্সরারাও হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসরাও হেসে গড়িয়ে গেল। আনন্দের সাগরে যেন অকস্মাৎ ঝড় উঠেছে। তাই এত শব্দ।

মহাদেব কিঞ্চিৎ মজা পেলেন। তিনি দেখলেন পাশে পার্বতী নেই। চলে যাচ্ছেন। মহাদেব দেখলেন উনি পার্বতী নন, চিত্রলেখা। মহাদেব দেখলেন সাজ খসে পড়ছে। আনন্দসাগরের দোলায় দুলতে দুলতে মাতৃগণ ও পার্বতীর অনুচরদের অঙ্গ থেকে সাজ খসে পড়ছে। বেরিয়ে পড়ছেন এক-একজন অপ্সরা।

মহাদেব পীড়িত হয়েছিলেন। মুহূর্তের প্রতীক্ষাতেও এসে জুটছিল অযুত শ্রান্তি। মহাদেবের পীড়া বেড়েই চলেছিল। এঁরা সেজে এসেছিলেন। ভালই। কিছু শ্রান্তি হরণ করেছেন। কিছু খুশি উপহার দিয়েছেন।

মহাদেব এসে পার্বতীকে গ্রহণ করলেন। ওঁরা এলেন নদীর তটে। সেখানেই পার্বতী এবং পরমেশ্বর লীলায় মত্ত হলেন। আর্ত পরমেশ্বর এবার পরিতৃপ্ত। পরমেশ্বব রসের সাগরে ভেসেছেন, পার্বতী ভাসিয়েছেন। ওঁরা দুলে দুলে ভেসে চললেন॥

৬৮. উষার সাধ

বাণের কন্যা উষা। শোণের তীরে উষা এসেছে। কি কাজে কে জানে। শোণের তীরে উষা ঘুরছিল। হঠাৎ সে চমকিত হল। উষার চোখে অদ্ভুত

একটি ছবি দুলছে। দুলে দুলে স্থির হয়ে গেল সেই ছবি। ঊষা দেখল এক অপূর্ব দৃশ্য ঃ পার্বতী ও শিব, ডুবে আছেন রভসরসে।

ঊষার মনে ইচ্ছা জাগল। সেও যদি পারত অমন মগ্ন হতে! ঊষার মনে কামনা, স্বামী-সাহচর্য লাভের বাসনা।

পার্বতী পুণ্যবতী। তাই তাঁর এমন ভাগ্য। জগতে এমন করে যাঁরা লীলায় মেতে অনেক শত মুহূর্ত যাপন করতে পারেন তাঁদের জন্ম সত্যিই সার্থক। ঊষার জীবনে এমন দিন কি আসবে?

ঊষা অসুরের কন্যা, কিন্তু নিয়মের বশবর্তী। ঊষা উপবাস করল। সংযত মনে পার্বতীর আরাধনা করল।

পার্বতী সব বুঝলেন। বুঝলেন ঃ ঊষার মনে বেদনা। সেই বেদনাতেই তার পার্বতীস্মরণ।

পার্বতী বললেন ঃ রমণীয় এই শোণের তীরে আমরা দুজনে লীলার আনন্দ উপভোগ করছি। তুমিও করবে। এমন করেই করবে। সেদিনের আর দেরি নেই, এল বলে।

ঊষা মনে মনে ভাবল ঃ আমার যা পোড়া ভাগ্য তাতে কি আর সিঁকে ছিঁড়বে? উনি বলছেন! হয়ত বলছেন বলতে হয় বলে।

পার্বতী ঊষার মনের কথা বুঝলেন। বললেন ঃ আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রি অতি ভয়ংকর। সেই রাত্রে তুমি উপবাসে খিন্ন হয়ে ভিতর মহলে অচেতন হয়ে ঘুমুবে। স্বপ্ন দেখবে। সেই স্বপ্নের মধ্যে একজন পুরুষ আসবেন, তোমাকে উপভোগ করবেন। দেবতারা তাঁকেই স্থির করেছেন তোমার স্বামী বলে। তুমি যেও। তাঁর সঙ্গে অবলীলায় চলে যেও। ছোট থেকে অনেক পুণ্য করেছ, মনে মনে বিষ্ণুকে ডেকেছ। সেই তাঁরই কৃপা হয়েছে। চোখ তুলে চেয়েছেন তিনি। এবার তোমার সাধ পুরবে।

ঊষা রাঙা হয়ে উঠেছিল। চোখ নামিয়ে চুপ করে সে শুনে গেল। কিছু বলবার উপায় তার ছিল না। ওসব কথা শুনে ঊষার মত মেয়ে কিছু বলতে পারেনা। কিন্তু মনে মনে ভাবল ঃ তাই যেন হয়। হে ঠাকুর, তাই যেন হয়।

পার্বতী ও পরমেশ্বরের লীলা অবসিত হল। ধীরে ধীরে শোণের তীর নির্জন হয়ে এল। শোণের তীর দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে আকুল হল। পার্বতী এসেছিলেন। শিব এসেছিলেন। তাঁরা লীলা করেছিলেন এই শোণের তীরে। সঙ্গে এসেছিলেন সমগ্র দেবমন্ডলী, শিবের পরাক্রান্ত অনুচর বাহিনী। শিব চলে গেছেন, পার্বতী গেছেন, ওঁরাও গেছেন। শোণের তীর পুণ্য কুড়িয়ে ফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন শুধু শূন্যতা, এখন শুধু বিষণ্ণতা।

বাণাসুর এলেন শিবসমীপে। বললেন ঃ শক্তিশালী সহস্রবাহু দিয়েছেন। কিন্তু কাজে আসছেনা। যুদ্ধটুদ্ধ নাহলে এ বাহুর ভার বয়ে আমি কি করব।

ইদানীং তাই বড় মনমরা হয়ে পড়েছি। এককালে যম ও অগ্নি আমার বশ্য হয়েছিলেন। বরুণ হয়েছিলেন আমার গোপাল। কুবের হয়েছিলেন হাতিশালার সর্দার। নির্ঋতি বনেছিলেন সৈরিন্ধ্রী। ইন্দ্রও যুদ্ধে হেরে কর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন একেবারে চুপচাপ। হাতগুলো যেন ক্রমেই অবশ হয়ে পড়ছে। আপনার অজানা তো কিছুই নেই। সবই জানছেন, বুঝছেন, দেখতে পাচ্ছেন। অতএব বলুন, যদ্ধ টুদ্ধ কি শীঘ্রই হবে? সে যুদ্ধে কি সহস্রবাহুর মর্যাদা রাখতে পারব? না একে একে দেহ থেকে ছিন্ন হবে, হব ভারমুক্ত।

বাণের কথায় মহাদেব যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হলেন। কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না। হঠাৎ হা-হা-হা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। বাণের শরীরের সমস্ত যন্ত্রগুলো যেন জোর এক ঝাঁকুনি খেল।

মহাদেব বললেনঃ বড়ই উদ্ধত হয়েছ, এতটা ভাল নয়। যুদ্ধ চাও, পাবে। অতি ঘোর সেই যুদ্ধে তোমার দর্প চূর্ণ হবে। হাতের বোঝাও নেমে যাবে। এক এক করে নলকাঠের মত কেটে কেটে পড়বে। তোমার অস্ত্রাগারের উপর ধ্বজা স্থাপিত রয়েছে। একটি ময়ূর, তার উপর মানুষের শির। একদিন দেখবে ঐ শির খসে পড়েছে। বায়ু নেই, কিছু নেই, কিন্তু খসে পড়েছে ঐ মাথা। সেদিন বুঝবে সংগ্রাম ঘনিয়ে এসেছে। যুদ্ধ পাবে, যুদ্ধের মত যুদ্ধ সেদিন তুমি পাবে। আরো পাবে, যুদ্ধের থেকেও আরও ভয়ানক অভিজ্ঞতা সেদিন তুমি অর্জন করবে।

মহাদেব ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু রাজা বাণ খুশিই হলেন। অঞ্জলি ভরে ফুল নিয়ে তিনি দেবাদিদেবকে পূজা করলেন। অতঃপর ফিরে এলেন নিজের রাজধানীতে।

বাণ রাজধানীতে এসেছেন। এসেই প্রবেশ করলেন অস্ত্রাগারে। সেখানেই দেখা অমাত্য কুণ্ডলের সঙ্গে। বাণ উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়লেন। বললেনঃ শিব বলেছেন। অতএব আর দেরি নয়। আনন্দ কর, আনন্দ কর।

কিছুক্ষণ পরেই বাণাসুরের নজরে পড়লঃ ভগ্নধ্বজ। বাণ স্থির থাকতে পারলেন না। সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বাণের বাহিনী সজ্জিত হল। যুদ্ধ হবে, অতএব জয়ের জন্য যজ্ঞ। তাও হল। যুদ্ধ হবে, মদ্য চাই। ব্যবস্থা হয়েছে। সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে পরিদর্শন করে তবে বাণ ক্ষান্ত দিলেন।

যুদ্ধ হবে, বাণ প্রস্তুত। কিন্তু বাণ চিন্তান্বিতও। শিব বলেছেন। তাহলে কি সত্যিই তাঁর সহস্রবাহু একে একে করুণভাবে ছিন্ন হবে? যাইই হোক যেই আসুক তাকে দুর্ধর্ষ ও শ্রেষ্ঠ বীর হতে হবে। নচেৎ সম্ভব নয়। যত যাই করুন তিনিও কি তাকে পার পেতে দেবেন। চোখা চোখা অস্ত্র রয়েছে তাঁর তূণে। অতএব মাথাটি যুদ্ধে খুইয়ে তাকে ক্ষান্ত দিতে হবেই। বাণ

অস্থির হয়েছেন, কিন্তু এইসব চিন্তা করে বুঝ দিচ্ছিলেন মনকে।

অবশেষে এল বৈশাখ মাস। কন্যা ঊষা। ঊষা উপবাস করে, স্নান করে, পূজো করে বিষ্ণুর। নিত্যই করে। এইভাবে বৈশাখের দিনগুলি অতিবাহিত হতে থাকল।

এক গভীর রাত্রে ঊষা স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নেই উদ্রিক্ত হল তার কাম।

পার্বতী প্রস্তুতই ছিলেন। মায়ার বলে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে তিনি আনিয়ে নিলেন। অনিরুদ্ধ এলেন বাণপুরে। তাঁর সম্মুখে একগুচ্ছ প্রফুল্ল কুসুম। অনিরুদ্ধ মোহিত হলেন। মনে জাগল উপভোগের অস্থির বাসনা। ধীরে ধীরে অনিরুদ্ধ এগিয়ে এলেন। স্পর্শ করলেন, বুকে টেনে নিলেন। এক গুচ্ছ প্রফুল্ল কুসুম। স্পর্শে অযুত পুলক। কিন্তু কুসুমের স্তবকে ছিল কণ্টক। অনিরুদ্ধ ব্যাহত হলেন। জাগরিত ঊষা ভয়ে কেঁদেকেটে অস্থির হল। প্রাণপণে বাধা দিল। কিন্তু অনিরুদ্ধর আবেগ অবরুদ্ধ হল না। তিনি বীর। তদুপরি পুরুষ। গায়ে অযুত বল। অনিরুদ্ধ বল প্রকাশ করলেন। কোমল কুসুম স্তবক নিষ্ঠুরভাবে দলিত হল।

পার্বতী প্রস্তুত ছিলেন। মায়ার বলে নিমেষ মধ্যেই অনিরুদ্ধ দ্বারকায় পৌঁছে গেলেন।

ঊষা বুঝি বা পাগল হল। রোদনে রোদনে ঊষা বারবার ভেঙ্গে পড়ল। সখীরা ব্যাকুল। কি হল—সখীদের মনে জিজ্ঞাসা। অবশেষে ঊষা স্বপ্নের কথা বলল। বলল : এ জীবনে আর কি হবে ?

কিন্তু ঊষা অকস্মাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। বেশ যেন শান্ত এবং সুস্থ।

ঊষার মনে হল, কানে কানে কে যেন কথা বলল। হয়ত বায়ু কথা বলল। ঊষা শুনল : শীল নষ্ট হয়েছে, কিন্তু কোন দোষ হয়নি। ঐ পুরুষ তোমারই স্বামী হবেন। স্বামী এসে মিলেছেন। দোষ কি এতে ? তাছাড়া এ তো পার্বতীর বিধান। আগের কথা মনে কর। মনে কি নেই ?

ঊষার স্মৃতির দুয়ার খুলে গেল। ঊষার মনে পড়ল। ঊষার মুখ ঝলমল করে উঠল। যত মনে পড়ল ততই ঝলমল করে উঠল ঊষার মুখ।

ঊষার মধ্যে আমূল বদল এসেছে। সখীরা কিঞ্চিৎ বিস্মিতও হল। কান্নাকাটি, জীবনে কি কাজ, রাখব না আর এমন পোড়া জীবন—এসব যার কাছ থেকে কয় পল পূর্বেও শোনা গিয়েছিল সেই রাজকুমারী ঝলমলিয়ে উঠেছেন।

ঊষার প্রিয়তম সহচরী চিত্রলেখা। চিত্রলেখা আরো অবাক হল। ঊষা চিত্রলেখার কাছটিতে এল। হাবে ভাবে অন্তরঙ্গতার মাখামাখি। খুব মোলায়েম করে গদ গদ ভাষায় ঊষা বলল : পার্বতী কিন্তু বলেছিলেন। এমনটি যে হবে তা কিন্তু উনি বলেছিলেন। বলেছিলেন উনিই নাকি আমার স্বামী হবেন।

এই মুহূর্তে উষা কিঞ্চিৎ লাল হল। কিন্তু সেভাব তার কয়েক নিমেষের। বলল ঃ ছলকলায় কূট কৌশলে তোর জুড়ি মেলা তো ভার। এবার দেখব কত তোর দৌড়। একটা ব্যবস্থা কর না ভাই। লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে কি মজাই হয়। কর না ভাই একটা উপায়। নে না একটু খোঁজ। কোন্ বংশের কে এমন উনি যে আমার মন এভাবে চুরি করে নিয়ে চট করে সটকে পড়লেন ?

চিত্রলেখা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ভাবল ঃ রাজকুমারীর মনে মনে এত রঙ ! পেটে পেটে এত কথা !

চিত্রলেখা বলল ঃ স্বপ্নে দেখেছ। তাও দেখেছ তুমি। আমি তো কিছুই জানি না। কি করে কি করব বল ?

উষা ভয়ানক মুষড়ে পড়ল। ভাবল ঃ এর চেয়ে ঢের ভাল মরণ। সেই চেষ্টাই সে করবে।

উষার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল। মনে রঙ লাগলে এমনটিই নাকি হয়।

উষার দশা দেখে চিত্রলেখা ভয় পেল। অনেক বোঝাল। কিন্তু যে মনে রঙ ধরে সে মন কোন বুঝই নাকি মানে না।

চিত্রলেখা অবশ্য বসে ছিল না। কিছু একটা করছিল ! প্রিয়তম সহচরীরা নাকি এমনই হয়।

বিশাল একখানি বস্ত্রে চিত্রলেখা চিত্র লিখলেন। সে চিত্রে তিন ভুবন ছবি হয়ে যেন কথা বলাবলি করছে।

সাতদিন কেটে গেল। উষার দশা দিনদিন মন্দমন্দ করে মন্দই হচ্ছিল। কিন্তু সেই ম্রিয়মাণ উষা সপ্তম দিনে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মেঘে যেন সূর্য ঢাকা পড়েছিল। মেঘ সরে গেছে। এবার ম্লান উষা রোদে হেসে উঠল।

উষার সম্মুখে চিত্রলেখার সেই চিত্র। পরম আগ্রহে পরম মনোযোগে উষা সেই ছবি দেখতে থাকল। ঊর্ধ্বশ্বাসে তার চোখ যেন কাকে খুঁজে খুঁজে দৌড়ে ফিরল ঐ ছবির উপর দিয়ে। ছুটে ছুটে অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে বিগলিত হয়ে উষা বলল ঃ এই তো এই তো !…কিন্তু ইনি কে ?

চিত্রলেখা বলল ঃ উনি অনিরুদ্ধ।

তারপর ধীরে ধীরে অনিরুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত চিত্রলেখা বর্ণনা করল।

উষা বলল ঃ আর পারছিনে ভাই। এবার সত্যিই মরে যাব। তুই একটা উপায় কর।

চিত্রলেখা যোগ জানে। যোগের বিদ্যায় সে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল।

নিমেষ মধ্যে চিত্রলেখা এল দ্বারকায়। এদিকে ওদিকে একটু খুঁজতে হল। অবশেষে দেখল ঃ অন্তঃপুরের উদ্যানে অনিরুদ্ধ মদে বিহ্বল হয়ে রয়েছেন।

ধারে কাছে কয়েকজন লীলা সঙ্গিনীও আছেন।

যোগের প্রভাব। জোর প্রভাব। কালো একটি কাপড়ে অনিরুদ্ধ ঢাকা পড়লেন। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই খটবাসুদ্ধ অনিরুদ্ধকে তুলে নিয়ে চলে এল শোণিতপুরে।

ঊষা প্রতীক্ষা করেই ছিল। বিরহে ঊষা সন্তপ্ত। বিরহের ঘোরে ঊষা অসুস্থ। অকস্মাৎ সে দেখল ঃ সম্মুখে সেই মনচোর। দারুণ আনন্দে ঊষা দিশা হারাল। কিঞ্চিৎ ভয়ও পেল। ভয় অবশ্য ক্ষণেকের। এল আর গেল। ভয় কেটে গেল। ঊষা অনিরুদ্ধকে নিয়ে লীলায় মত্ত হল। সুখে সুখে ঊষা পরম পরিতৃপ্ত। বিরহের অনল যেন চাঁদের কিরণ হল।

অন্তঃপুরের মেয়েরা দেখল। সবাই আঁতকে উঠল। রাজার অন্তঃপুরে অপরিচিত এক পুরুষ! সম্ভোগে লিপ্ত! লিপ্ত রাজকুমারীর সঙ্গে!

দৌবারিকরা খবর পেল। পেয়েই ছুটে এল। স্বচক্ষে দেখল। ব্যাপার সত্য। তারা ছুটল রাজা বাণের কাছে। বলল ঃ এক বলবান পুরুষ কৌশলে প্রবেশ করেছে বাজকুমারীর অন্তঃপুরে। আপনি আসুন, দেখুন, বিহিত করুন।

বাণ বিস্ময় মানলেন। তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন। দেখলেন ঃ দিব্য এক যুবক রাজকুমারীর সঙ্গে লীলায় রত।

বাণ ক্রোধে কেঁপে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখে কোন কথা সরল না।

অতঃপর বাণ রাজার কর্তব্য করলেন। দশ সহস্র সৈন্যকে আদেশ দিলেন ঃ বধ কর। কুলের মুখে কালি দিয়েছে। অতএব বধ কর। সাহসে বলে বীর্যে এবং ধৈর্যে মনে হয় ছোকরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু দ্বিধা নয়। ওকে বন্দী করে ভয়ংকর কারায় নিক্ষেপ কর, কিংবা এই দণ্ডে বধ কর।

দশ সহস্র সৈন্য গর্জন করতে করতে এগিয়ে গেল। অন্তঃপুর হল রণক্ষেত্র। অনিরুদ্ধ দেখলেন তিনিই লক্ষ্য। মুদগর হাতে বেরিয়ে এলেন। সমস্ত সৈন্য বিনাশ করে অনিরুদ্ধ পুনর্বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

বাণ ক্ষিপ্ত হলেন। লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু অনিরুদ্ধ মহাবীর। বাণের তা অবিদিত। লক্ষ সৈন্যের দশা হল পূর্বের দশ সহস্রেরই মত।

এবার বাণ স্বয়ং এলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহুত হলেন অনিরুদ্ধ। মুহূর্তে বীর অনিরুদ্ধের খড়্গে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। বাণের দশ হাজার অশ্ব, রথ ও সৈন্য বিনষ্ট হল। বাণ এক মহা অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু মধ্য পথেই সে অস্ত্রের গতি ফিরিয়ে দিলেন অনিরুদ্ধ। অস্ত্র গিয়ে বাজল বাণের বুকে। বাণ মূর্চ্ছিত হলেন। মন্ত্রী বিচলিত হলেন। বীজন করলেন, নানাভাবে সেবা করলেন। অবশেষে মূর্চ্ছিত বাণ চোখ মেলে চাইলেন এবং ক্ষণমাত্রও বিলম্ব

করলেন না। মহা বেগে পলায়ন করলেন।

অনিরুদ্ধ চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। অটল অচলের মত অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন শত্রুর পুরে।

বাণ পলায়ন করলেন। কিন্তু নিরস্ত হলেন না। কপট যুদ্ধে অনিরুদ্ধকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। অবশেষে অনিরুদ্ধ নাগ পাশে আবদ্ধ হলেন। নিক্ষিপ্ত হলেন লৌহপিঞ্জরে।

বিচার সভায় বাণের রায় ধ্বনিত হল ঃ আমার কুলে কলঙ্ক লেপন করেছে। অতএব এই দণ্ডে ওর শির খসিয়ে দাও। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও কেটে বিলিয়ে দাও। রাক্ষসরা মহোৎসবে মেতে উঠুক। হয়ত রাক্ষসেও ওর মাংস স্পর্শ করবে না। কারণ ও নিতান্তই নরকের কীট। ওর উপযুক্ত শাস্তি জলশূন্য কূপে পচে মরা। তাই কর। এই দণ্ডে কর।

মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড ধার্মিক বলে খ্যাত। বাণের আদেশে তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হলেন। বিনয়ে বিগলিত হয়ে তিনি বললেন ঃ এটি হয়ত উচিত হবে না। কারণ রূপলাবণ্য ও পরাক্রম দেখে মনে হচ্ছে এ ব্যক্তি অসাধারণ কেউ। পরাক্রমে বিষ্ণু, সাহসে যেন রুদ্র। একে যদি এভাবে সাজা দেওয়া হয় তাহলে হয়ত আমরা সবংশে নিহত হব। শাপের বন্ধনে ও দংশনে বিশেষ কাতর, তথাপি আমাদের গণ্য করছে নিতান্ত তৃণবৎ।

কুষ্মাণ্ড এবার অনিরুদ্ধের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ কি তোমার পরিচয় ? কেই বা তোমাকে এখানে এনেছে ? সমস্ত আনুপূর্বিক বিবৃত কর। দানবরাজকে স্তব কর। বল যে তুমি পরাজিত হয়েছ। বল। বলে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অন্যথায় মুক্তি অসম্ভব।

অনিরুদ্ধ বললেন ঃ ক্ষত্রিয়দের চরিত্র কিঞ্চিৎও জানো না। পরের পিণ্ড খেয়ে জীবনযাপন করছ, জানবেই বা কি করে! সেইজন্য উপদেশ বিলোতে এসেছ। বীররা শত্রুর কাছে কখনো দৈন্যপ্রকাশ করেন না, পলায়নও করেন না। তার আগেই তাঁরা মৃত্যু বরণ করেন। শত্রুর সম্মুখে দৈন্য প্রকাশ করার থেকে মৃত্যু অনেক বেশি শ্রেয় এবং সম্মানজনক। তাছাড়া মৃত্যুর উপর কারও হাত নেই। মৃত্যু দৈবাধীন। তুমি আমার শত্রুপক্ষীয়। আমার এ অবস্থায় এ ভাবে উপদেশ দেওয়া তোমার অকর্তব্য। অতএব চুপ কর। বাজে বাক্য খরচ করো না। তিন ভুবন যাঁর দর্শনের আশায় বহির্দ্বারে করজোড়ে ভীতচিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে সেই তাঁকে বলছ ক্ষমা প্রার্থনা করতে! তোমাদের রাজার সহস্র-বাহুর ঐ অরণ্য যখন বিনষ্ট হবে তখনই আমার পরিচয় জানতে পারবে। আপাতত আর নয়।

অমাত্যের পরামর্শ। বাণ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। অনিরুদ্ধ বন্দীই রইলেন। কিন্তু মনে হল বাণ অত্যন্ত অশান্ত। সভা থেকে বেরিয়েই তিনি

এলেন ভিতর মহলে। তারপর মদে মদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যেন কিসের জ্বালা জুড়োতে চাইলেন।

অনিরুদ্ধ বন্দী। তিনি কাতর। কিন্তু নাগের পাশে নন, ঊষার বিরহে। অনিরুদ্ধ অস্থির হলেন। মনে মনে স্মরণ করলেন দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গাকে। প্রার্থনা করলেন: আমি দুর্গতিগ্রস্ত, আমি ক্লিষ্ট। আপনিই গতি, অতএব রক্ষা করুন।

দুর্গা প্রসন্ন হলেন। কালীর রূপে তিনি এলেন। জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দশী। গভীর রাত্রিতে কালী এলেন। তাঁর মুষ্টির আঘাতে পায়ের আঘাতে সেই লোহার পিঞ্জর গুঁড়িয়ে গেল। নাগরূপী শরগুলি ভস্ম হল পলকে। অনিরুদ্ধ মুক্ত হলেন।

অনিরুদ্ধের আর তর সইল না। সেই দণ্ডেই এসে উপস্থিত হলেন, প্রিয়ার সন্নিধানে। দেবীর কৃপায় সবই সম্ভব হল। ঊষার সংসর্গে অনিরুদ্ধ পুনর্বার মগ্ন হলেন।

এদিকে দ্বারকায় রাজার অন্তঃপুরে কান্নার রোল উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ ছুটে এলেন। ওদিকে নারদ এসে নিবেদন করলেন সমস্ত সংবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ আর বিলম্ব করলেন না। গরুড়কে স্মরণ করলেন। গরুড় এলেন। বলভদ্র ও প্রদ্যুম্নও এলেন। গরুড়ের পিঠে চেপে ওঁরা এলেন শোণিতপুরে।

শোণিতপুরের আকাশে কালবৈশাখীর কালো মেঘ ঘনীভূত হল। অগ্নি, যম এবং হর এলেন এগিয়ে। এলেন ত্রিমুখ এবং ত্রিপাদজ্বর। এলেন প্রমথগণ। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ওঁরা বাণাসুরকে রক্ষা করতে থাকলেন। অসংখ্য বিবস্ত্রা নারী যুদ্ধ করলেন। নগ্ন শরীরের সৌন্দর্য দেখিয়ে দেখিয়ে ওঁরা যুদ্ধ করলেন। কৃষ্ণপক্ষের সৈন্যদের বীর্য স্তম্ভিত হল।

মাহেশ্বর জ্বরে কৃষ্ণ আক্রান্ত হলেন। স্বীয় জ্বরে তিনি মাহেশ্বর জ্বরকে আঘাত করতে লাগলেন। গরুড় সহস্রমূর্তি পরিগ্রহ করলেন। সাগরের জল পান করে এসে সেই জলে এবং হাওয়ায় বহ্নিকে নির্বাপিত করলেন। তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে কার্তিকের ময়ূর হল ক্ষতবিক্ষত। রুদ্রেরাও পরাজিত হলেন।

এবার বাণের পালা। তিনি ধেয়ে এলেন। অদ্য বাণও কৃষ্ণে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। অশ্ব ছুটিয়ে বাণ এলেন। আহ্বান করলেন কৃষ্ণকে।

শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র ক্ষেপণ করলেন। চক্রে একে একে বাণের সহস্র হাত নলকাঠের মত কাটা পড়ল। সুদর্শনচক্র এবার উদ্যত হল বাণের মস্তক ছেদনে।

মহাদেব দুহাত তুলে এগিয়ে এলেন। বললেন: আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু শুনুন, বাণকে বধ করবেন না। সুদর্শনচক্র ফিরিয়ে নিন। বাণকে আমি অমরত্ব দিয়েছি। আমি যা দিয়েছি, তা আপনারও দেওয়া। ভেবে দেখুন। তপঃসিদ্ধ বাণের উদ্দেশে যে দান এককালে দেওয়া হয়েছে সেই

দানের মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। অতএব হে প্রভু, আপনি প্রসন্ন হোন।

বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণ তত্ত্বকথা বুঝলেন। সুদর্শনচক্র ফিরিয়ে নিলেন।

কৃষ্ণ এলেন অন্তঃপুরে। অনিরুদ্ধ মুক্ত হলেন। অনিরুদ্ধকে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। সঙ্গে চললেন ঊষা ও চিত্রলেখা।

ফেরার পথে বরুণ এসেছিলেন কৃষ্ণের পথে কাঁটা দিতে। কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। কৃষ্ণ এলেন দ্বারকায়। সঙ্গে অনিরুদ্ধ, ঊষা ও চিত্রলেখা। দ্বারকার অন্তঃপুরে এল কলহাসি ও গানের বন্যা।

ওদিকে শোণিতপুরে রাজা বাণ রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছেন।

নন্দী বাণকে বললেনঃ তোমার দশা খুবই সঙ্গীন। তবু যদি এই অবস্থাতেই শিবের সম্মুখে নৃত্য করতে পার তাহলে তোমার মনের ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। শিব নৃত্যপাগল। ওতে উনি সব ভোলেন।

বাণের শরীরে একটি হাতও নেই। তবু তিনি নৃত্যে নৃত্যে উতলা হলেন। বহুতর ভঙ্গীতে বাণ নৃত্য করলেন। মাথা ঘুরিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেচে নেচে যেন বাণ পাগল হলেন। ভূতল রক্তে ভিজে পিছল হল।

শিব বাণের নাচে খুশি হলেন। বললেনঃ যে নাচ দেখিয়েছ তা অলৌকিক। আমি খুব খুশি হয়েছি। এবার তোমার অভীষ্ট জ্ঞাপন কর। স্বচ্ছন্দে কর।

বাণ বললেনঃ আমার ক্ষত আরোগ্য হোক। যুদ্ধে মৃত্যু হলে যেন পাই গণপতির পদ। আমার মৃত্যুর পর ঊষার পুত্র শোণিতপুরের অধিপতি হলে আমি আনন্দ মানব। বিষ্ণু কুপিত হয়েছেন। ওঁর হাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়। ওঁতে আমার ভক্তি হোক অচলা। দেবগণের সঙ্গে কোন শত্রুতা আমি চাই না। দানবজীবনে আর আমার রুচি নেই। হৃদয়ে নামুক বিষ্ণুমন্ত্র। জপে জপে ওতেই যেন শান্তি পাই।

মহাদেব তথাস্তু বলে অন্তর্ধান করলেন।

কালক্রমে বাণের সমস্ত ইচ্ছাই ফলবতী হল একে একে। নৃত্যপাগল মহাদেব বাণের নৃত্যে পরিতোষ মেনেছিলেন। বাণ দানব। বাণ উদ্ধত হয়েছিলেন। কিন্তু বাণ শিবের ভক্ত, বিষ্ণুর ভক্ত। বাণের মনে তাই একদা সত্যের দীপশিখা জ্বলেছিল। অনির্বাণ সেই দীপশিখার আলোয় পথের অন্ধকার দূর হয়েছিল। বাণ গিয়ে পৌঁছেছিলেন পথের প্রান্তে, অভিষিক্ত হয়েছিলেন গণপতির অক্ষয় পদে।।

৬৯. কামচরিত

মহাদেবও বিচলিত হয়েছিলেন। বেদনায় বেদনায় আত্মহারা হয়েছিলেন।

কামের মহিমা তাই অপার। মোহ বিস্তার করেন, বেদনা বিস্তার করেন। চিত্তে চিত্তে নামে বিহ্বল আবেশ।

মুনিরা বিস্ময় মেনেছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব, তিনিও হলেন বিমথিত। সূত তাই বললেন ঃ কামের প্রভাব বড় উগ্র। মুক্ত থাকে কার সাধ্য? সৃষ্টির মূলে কাম, সর্বকর্মের মূলে কাম। সর্বত্র শুধু কাম এবং কাম। কাম নেই ঃ কর্ম নেই। কাম নেই ঃ আনন্দ নেই। শব্দের সাধ্য কি স্বরূপ বর্ণনা করে কামের? বুদ্ধি? আনে মাত্র সামান্য প্রতীতি। কামের ব্যয় নেই, কাম আনন্দঘন। কাম ঃ কোথাও শুদ্ধ কাম, কোথাও কাম এবং প্রবৃত্তি। রূপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। কিন্তু মাঝে মাঝে ইনি ধারণ করেন স্থূলরূপ। একদা ধারণ করেছিলেন। করেছিলেন ব্রহ্মার পুত্র রূপে। অপরূপ ও অত্যদ্ভুত সেই কামমূর্তি। চারবাহু। বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। চারমুখ। মুখে রত্নের সাজ, সোনার সাজ, ফুলের সাজ। চতুর্দিকে শ্রী ও সৌন্দর্যের হাট। চতুর্দিকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্তি, শান্তি, পুষ্টি ও পক্ষীশ্বর। পরিবৃত কামদেব। রূপে রূপে পরিবৃত এক অপরূপ।

কৃতযুগের পূর্বে কামদেবই মূর্ত হলেন প্রদ্যুম্নরূপে। শ্যামের বর্ণ প্রদ্যুম্নের শরীরে। পূর্ণিমার চাঁদ তাঁর মুখের আদলে। লোচনে লালের প্রস্ফুটিত লাবণ্য। কালো কালো সুন্দর সুন্দর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুলের ভার তাঁর মাথায়। আর শরীরে মণির অলংকার, রত্নের অলংকার, সোনার অলংকার। সর্বদাই তিনি সুসজ্জিত। সজ্জিত বসনে ভূষণে, সজ্জিত অস্ত্রে-শস্ত্রে। পাশে পাশে ভদ্রাসুভদ্রা, পাশে পাশে লক্ষ্মী রুক্মিণী এবং পাশে পাশে রতি। প্রদ্যুম্নের সঙ্গে ওঁরা নিত্য থাকেন, ক্ষীরসাগরের উতলা বাতাস মোহে মেদুর করেন।

মহাদেব তপে ডুবে আছেন। দেবগণ দেখলেন দেবাদিদেবের তপোভঙ্গ না ঘটালেই নয়। ওঁরা এলেন। এলেন কামদেবের কাছে। কামদেব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছুটলেন।

চন্দ্রপ্রভা নগরীতে তপোনিরত মহাদেব। কামদেব এলেন সেই নগরীতে। কামদেব এলেন দেবাদিদেবের তপস্যাস্থানে।

মহাদেব অন্তর্যামী। তিনি চোখ খুললেন। নিকটেই কামদেব। মহাদেব দেখলেন। সুধোলেন ঃ তুমি কে?

কামদেব বললেন ঃ এখুনি তা জানতে পারবেন।

ঃ কেন এসেছ?

ঃ আপনাকে মোহিত করতে।

ঃ কেমন করে?

ঃ বলপ্রয়োগে।

ঃ আমাকে বলপ্রয়োগে মোহিত করবে ! কেমন সে বল ?

ঃ পুষ্পবাণ, এই পুষ্পবাণ দিয়ে।

কামদেব পুষ্পবাণ মোচনে উদ্যত হলেন। মহাদেব মুহূর্তমধ্যে ভীষণ হয়ে উঠলেন। তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে ছুটল বহ্নি। কামদেব ভস্মীভূত হলেন।

শোকে আতুর হলেন রতি। পতি ভস্ম হয়েছেন। মহাদেবের স্তবে স্তবে রতির হৃদয় উদ্বেল হল। মহাদেব বললেন ঃ দ্বাপর যুগের শেষে পতির সঙ্গে আবার তুমি মিলিত হবে। ময়দানবের ঘরে তুমি জন্ম নেবে, শম্বরাসুরকে বঞ্চনা করে লাভ করবে পতিকে।

রতি শোকে বিহ্বল হয়েছিলেন। আত্মহননের ইচ্ছায় দিশা হারিয়েছিলেন। মহাদেব বর দিলেন। রতি শান্ত হলেন।

কামদেব তনু হারালেন। কিন্তু সেই তনু নতুন করে আবার পেলেন। রুক্মিনীর পুত্র হল। কামদেব নতুন তনু পেলেন। কিন্তু পুরাতন। কামদেবের সেই পুরাতন শরীরই আবার কায়া পেল।

মায়া জানে শম্বর অসুর। রুক্মিণীর এই অনিন্দ্যসুন্দর পুত্রটিকে সে হরণ করল। শম্বরের অন্তঃপুরে অপুত্রক মায়াবতী। মায়াবতী পুত্র পেলেন। শম্বর উপহার দিল। অপহৃত শিশুকে দিল মায়াবতীর কোলে। ধীরে ধীরে শিশু একদা যুবক হল। শম্বর কোন কারণে সেই যুবকের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিহত হল। অন্য জন্মে রতি, এ জন্মে মায়াবতী। মায়াদেবী কামদেবকে পেলেন। শম্বরের রাজ্যেই সুখে কাল কাটালেন। কৃষ্ণ ছিলেন সহায়। কামদেব ও রতি নতুন করে নতুন জীবন শুরু করলেন।

আর একবারের কথা। দ্বারকার উদ্যানে প্রদ্যুম্ন লীলায় মগ্ন। মায়ার বলে দানব শুম্ভ তাঁকে হরণ করল। নিয়ে গেল ভ্রাতার কাছে। বললঃ তুমি খাবে, তাই এই পশুটিকে নিয়ে এসেছি। নাও। খাও।

নিশুম্ভ প্রদ্যুম্নকে গ্রহণ করল। কিন্তু অকস্মাৎ নিক্ষেপ করল দূর শূন্যে। প্রদ্যুম্নের শরীর ঘুরতে ঘুরতে ভয়ংকর বেগে উঠে গেল আকাশে। তারপর প্রদ্যুম্ন পড়তে থাকলেন। অবশেষে এসে পড়লেন পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত নিশুম্ভ নগরীতে।

প্রদ্যুম্ন আছড়ে পড়লেন ভূপৃষ্ঠে। বেগে উঠেছিলেন, বেগে পড়লেন। কিন্তু প্রদ্যুম্ন হয়ত ভেলকি জানতেন। ওঁর কিছু হল না। পড়লেন। পড়েই উঠলেন। উঠেই এদিক ওদিক দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন।

প্রদ্যুম্ন ইতস্তত ঘুরছিলেন। হঠাৎ ওঁর চোখ নিস্পলক হল। মুগ্ধতার ঘোরে চোখ বিস্ফারিত হল। প্রদ্যুম্ন দেখলেন ঃ এক কন্যা, দানবকন্যা। সুন্দর যেন উজাড় হয়েছেন দানবকন্যার অঙ্গে। প্রদ্যুম্নের মন অস্থির হল, একাগ্রও হল। দানবকন্যার চিন্তাতে প্রদ্যুম্নের মন অকম্পিত হল। প্রবল ইচ্ছা, প্রবল

একাগ্রতা—সাধ পূরল। লক্ষ্মী নামক সেই দানবকন্যাকে ক্ষত্রধর্ম অনুসারে বিবাহ করে বীরবর প্রদ্যুম্ন পলায়ন করলেন বিন্ধ্যপর্বতে।

কন্যা নেই, কে একজন অপহরণ করেছে। দানবরাজের কানে একথা উঠল। তিনি মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করলেন। মুহূর্তেই অস্থির বিক্রমে বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রদ্যুম্ন পরাজিত হলেন, বন্দী হলেন, আনীত হলেন নিশুম্ভ নগরে। অবশেষে বিতস্তানদীর সুন্দরতীরে হিমালয়ের শীর্ষে এক বজ্রপঞ্জরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলেন। বিতস্তার সুন্দর তীর। হিমালয়ের রমণীয় শৃঙ্গ। সেখানে বজ্রপঞ্জর, নাগপাশ, অগণিত প্রহরী। প্রদ্যুম্ন কাতর হলেন। পাশেই লক্ষ্মী। প্রদ্যুম্ন যন্ত্রণায় নীল হলেন।

উপায় নেই। কাতর হতে হতেও প্রদ্যুম্ন একাগ্র করে বাঁধলেন মনকে। স্মরণ করলেন দেবী দুর্গাকে।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা এলেন। ভক্ত স্মরণ করেছে। না এসে তিনি পারেন না। এলেন। দুর্গা এলেন। নাশ করবেন প্রদ্যুম্নের দুর্গতি।

পঞ্জর অতি দৃঢ়, বজ্রপঞ্জর। দেবী বিফল হলেন। প্রবেশ করতে চেষ্টা করেও দেবী দুর্গা প্রতিহত হলেন। বুঝলেন সহজে হবার নয়। দুর্গা সাজ বদল করলেন। দুর্গা দুর্গা রইলেন না। হলেন সারিকা। রূপে ফুল ঝরল, কণ্ঠে ঝরল মধু।

লক্ষ্মী মুগ্ধ হলেন। একজন প্রহরীকে লক্ষ্মী বললেনঃ যদি আমাদের ভালবাস তাহলে ঐ সারিকাকে এনে দাও। আমি খুশি হই, আমার প্রভুও বিনোদ মানুন।

প্রহরী লক্ষ্মীর কথা রাখল। লক্ষ্মী সারিকা পেলেন।

পঞ্জরের জানলার পাশে একটি ছিদ্র ছিল। সারিকা সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করল। সারিকা বাতাসে মিলিয়ে গেল। পঞ্জরমধ্যে প্রকটিত হলেন দেবী দুর্গা। বজ্রপঞ্জর ভেঙ্গে পড়ল। গোপকন্যার বেশে দুর্গা অদ্য দানবলনে উল্লসিত। বীরবর প্রদ্যুম্নও হাতে পেলেন শুম্ভের গদা। কাতারে কাতারে দানবসৈন্য সেই গদার প্রহারে প্রাণ হারাল। শুম্ভ ও নিশুম্ভ হতচকিত হল। ভাসল বিস্ময়ের সাগরে।

শুম্ভ ছুটে এল। নিশুম্ভ ছুটে এল। দেবীর গোপকন্যার দিব্যবেশ। শুম্ভ ও নিশুম্ভ মুগ্ধ হল। তদুপরি কামদেবের অব্যর্থ বাণ। কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে শুম্ভ ও নিশুম্ভ হল পাগলের প্রায়।

শুম্ভ বললঃ এ আমার। নজর দিও না। ভাল হবে না।

নিশুম্ভ বললঃ বেশি ব'কো না। এ কন্যা আমার। লোভ কর না। করলে মরবে।

দেবী বললেনঃ প্রদ্যুম্ন ক্ষাত্রিয়ের ধর্ম আচরণ করেছেন। লাভ করেছেন

তোমাদের কন্যা। আমাকেও তোমরা সেই মত লাভ করতে পার। কিন্তু পার কেবল একজনই। কর, আমি কৃতার্থ হই। কিন্তু বড় সাধ তোমাদের পরাক্রম দেখার। একটু দেখালে ক্ষতি কি?

শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। দেবীর কৌশলে দুজনেই দুজনের গদার আঘাতে প্রাণ হারিয়ে বসল।

দুর্গার কৃপায় প্রদ্যুম্ন ও লক্ষ্মী দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

সূত অবশেষে বললেনঃ কামদেবের চরিত্র শোনার মত। তাঁর মহিমার শেষ নেই। গূঢ় রহস্যে উনি আবৃত। বস্তুত মানুষের চিত্তে বিকার আনতেই ওঁর জন্ম।।

৭০. কামকবলিত বিষ্ণু

কাম দুর্বার। কাম অপ্রতিহত। কামে মনে মনে নামে অমেয় আবেশ।

মনে কাম আসে। প্রভাব বিস্তার করে। অস্থির চঞ্চলতায় কাঁপতে কাঁপতে মন নিমজ্জিত হয় বিহ্বলতার নীল সাগরে।

কামের রাজ্যে দেবতা নেই, মানুষ নেই, দানব নেই। কামের রাজ্যে আশ্চর্য এক সাম্য। স্বয়ং ভগবানও সেখানে ভগবান নন। সবার যে হাল তাঁরও সেই হাল।

অবতাররূপে বারবার তিনি ধরায় নেমে আসেন। শাসন করেন, দমন করেন। প্রতাপে প্রতাপে কেঁপে উঠে তিন ভুবন। ভগবান বিষ্ণু তিনি। কিন্তু পার পাননি। কামের বাণে জরজর হয়ে অনেক শত মুহূর্ত সেই মহান্ত পুরুষ বিষ্ণুকেও বিমথিত হতে হয়। ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণুর বুকে তাই লক্ষ্মী।

প্রাচীনকালে দেব দানবে মিলে সমুদ্র মন্হন করেছিলেন। ওঁরা জরার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, মরণের ভয়ে কাতর হয়েছিলেন। তাই নেমেছিলেন সমুদ্র মন্হনে, অমৃত আহরণের সাধনায়।

সমুদ্র মন্হিত হল। অতল জলের তল থেকে শ্রীদেবী উঠলেন। চন্দ্র উঠলেন। ধন্বন্তরি উঠলেন। ক্রমে ক্রমে উঠল পারিজাত তরু, উচ্চৈঃশ্রবা, কামধেনু এবং পীযূষ। অলৌকিক লুকিয়ে ছিল জলের তলে। দেবদানবের অঙ্গে পুলকের স্বেদ নির্গত হল। ওঁরা ক্ষান্ত দিলেন না। উৎসাহে অঙ্গ থেকে ক্লান্তি ঝরে গেল। সমুদ্র মন্হিতই হতে থাকল। এবারও বিস্ময়। ভয়ংকর বিস্ময়। সমুদ্র থেকে উঠল কালকূট।

সমুদ্র মন্হন। কিন্তু সমুদ্রমন্হন নয়, অলৌকিক বিস্ময়মন্হন। অমৃত উঠেছিল। ছিঁটে ফোঁটা ছিটকে পড়েছিল এধার-ওধার। সামান্যই ছিঁটে ফোঁটা

কিন্তু মাটি হল না। বহুশত ফোঁটা থেকে জন্ম নিল বহুশত কন্যা। অঙ্গে অঙ্গে ফেটে ফেটে পড়ছে ঝরে ঝরে পড়ছে লাবণ্য। সাগরতীরে রচিত হল আর এক সাগর—লাবণ্যের সাগর। অমৃতে জরা যায়, মরণ যায়। লাবণ্যের সাগরে যেন অমৃতের ঢেউ উঠছে। অমৃত পানে জরামরণের পরাজয়। কিন্তু এই ঢেউ দর্শনেই যে জরা মুখ লুকায়, মরণ পলায় অযুত যোজন দূরে।

দেববানবের মনে কামনার দোলা। লোকসমূহ যেন ভাসল কামমেশানো অমৃতের সাগরে। দেবদানব পুলকিত হচ্ছেন, ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন। কিন্তু মন্থন চলল। অবশেষে উঠল অমৃত। মন্থনের চরম ফল উঠে এল। মন্থন শেষ হল।

সমুদ্রমন্থনে পরম সব সামগ্রী উঠেছে। মন্থন শেষ। এবার পালা ভাগবাটোয়ারার। মহাদেব এলেন। কালকূট নিলেন, চন্দ্র নিলেন। ইন্দ্র এলেন। পারিজাত নিলেন। সূর্য এলেন। গ্রহণ করলেন উচ্চৈঃশ্রবা। বিষ্ণু নিলেন কৌস্তুভ। ধন্বন্তরি হলেন সকলের।

কিন্তু অমৃত নিয়ে লাগল গোল। দেবতারা চান। দানবরাও চায়। ভীষণ গোল। অবশেষে লড়াই। প্রলয়ের কোল পর্যন্ত গড়াল লড়াই।

অমিত শক্তি দৈত্যদের। তারা কম যায় না। সোমদেব অপহৃত হলেন।

লাবণ্যে লাবণ্যে মোহে মোহে মাখামাখি। বিষ্ণু ধরলেন মোহিনী মূর্তি। তিনি ছল করলেন, মোহ বিছালেন, সোমদেবকে উদ্ধার করলেন।

দেবতারা হর্ষে উদ্বেল হলেন। পানে ভোজনে মাতোয়ারা হলেন। দেবগণ দেখলেন বিষ্ণুর মোহিনী সাজ। দেবমনও বিমুগ্ধ হল। ওঁরা বলে উঠলেন ঃ আপনি, আপনিই পরিবেশন করুন।

মোহিনী বিষ্ণুর হাতে উঠল অমৃতের হাঁড়ি।

দেবতারা মত্ত। দানবরা সুযোগ পেল নজর দিল সেই কন্যাগণের প্রতি। অমৃত পেল না। অমৃতের ছিঁটে ফোঁটায় যাদের জন্ম তাদের দিকেই অগত্যা হাত বাড়াল। পুষিয়ে নিতে তারা উৎসুক হল। দানবরা কন্যাগণকে হরণ করল। রাখল ময়ের হাতে গড়া সুরক্ষিত এক পুরে।

আপাতত নিশ্চিন্ত। এবার স্বচ্ছন্দে যাওয়া যেতে পারে। দানবরা যুদ্ধে নির্গত হল। অমৃত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মনে মনে তাই যুদ্ধ, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ। অমন সব রমণী আনা হল, রাখা হল স্বর্গতুল্য পুরে, কিন্তু দানবদের মন একচুলও টলল না। রমণী সঙ্গে মত্ত হবার সময় সে নয়। দানবরা প্রতিজ্ঞা করল যদি জয় তবেই ভোগের উল্লাস। যদি পরাজয় তাহলে এসব রমণী তারা স্পর্শও করবে না।

অকস্মাৎ শঙ্খের নিনাদে আকাশে বাতাসে ভয়ংকরের নিমন্ত্রণ ফেটে পড়ল। দেবতারা বুঝলেন দানবরা আসছে। যুদ্ধার্থে ওরা এগিয়ে আসছে।

মুহূর্তে দেবতারা সজ্জিত হলেন। মুখোমুখি হলেন দানবদের। বিষ্ণুর তেজে দেবতাদের বীর্যে দানব সমাজের বিপর্যয় ঘনিয়ে এল। পালে পালে দানব নিহত হল। পঙ্গপালের মত ওরা আগুনে পুড়ে মুহূর্তে ছাই হল। দুএকজন যারা রেহাই পেল তারা পড়িমরি করে ছুটল। কিন্তু রেহাই তাদের মিলল না। বিষ্ণু সুদর্শন উঁচিয়ে তাড়া করে ফিরলেন। বিষ্ণু তাড়া করে ছুটছেন, ছুটছেন। ছুটতে ছুটতে এলেন পাতালে।

বিষ্ণু পাতালে এলেন। দেখলেন সেখানে রয়েছে অমৃতের সেই কন্যাগণ। বিষ্ণুর সুদর্শন উদ্যতই রইল। তিনি নয়ন বিস্ফারিত করে দেখলেন, দেখলেন আর দেখলেন। বিমুগ্ধ বিষ্ণুর দুই চোখে ফুটে উঠল লাবণ্য-লেহনের অসীম স্পৃহা।

অমৃতকন্যারা ভীত হল। কিন্তু মুগ্ধও হল। সম্মুখে ভগবান বিষ্ণু। রূপের ডালি। ওদের কুমারীমন বিবশ হল। বিষ্ণু বিহ্বল, ওরাও বিহ্বল। বিষ্ণুর মনে কামনা, ওদেরও মনে কামনা। ওদের সঙ্গে বিষ্ণুর বিবাহ হল। বিষ্ণু সমস্ত বিস্মৃত হলেন। অমৃতকন্যাদের সঙ্গ করে ধীরে ধীরে বিষ্ণু সেই সঙ্গসুখের আবেশেই একেবারে ডুবে গেলেন।

বিষ্ণুর সঙ্গসুখ বিফল হল না। বহু শত পুত্র জন্ম নিল। বিষ্ণুর রক্ত তাদের শিরায়। সবাই হল পরাক্রান্ত ও দুর্ধর্ষ। ওরা বসে রইল না। বসে থাকলে পরাক্রম লজ্জা পায়, মুখ লুকায়, অবশেষে ছেড়ে চলে যায়। ওদের পরাক্রমে মহীতল কাঁপতে থাকল।

এদিকে বিষ্ণু নেই। স্বর্গ যায় যায়। সৃষ্টি ডোবে ডোবে। ব্রহ্মা শিবকে বললেন : বিষ্ণু নেই। সব যায় যায় দশা। তাঁকে আনয়ন করুন।

শিব বৃষের রূপ নিয়ে ভয়ানক রব করতে করতে পাতালে এসে উপনীত হলেন। বৃষের রব। অথচ তাতে মিশ্রিত এত ভয়! অমৃতকন্যাদের বুকে কাঁপন ধরল। বৃষ রব তোলে, পুর কেঁপে উঠে। মনে হয় গুঁড়িয়ে যাবে ধুলোয়।

বিষ্ণুপুত্ররা পরাক্রান্ত। তারা ডর মানল না। সামান্য ষাঁড়। তার ডাক। হয়ত ডাকটা কিঞ্চিৎ প্রচণ্ড। বিষ্ণুপুত্ররা রাগে গর গর করে উঠল। অস্ত্রে শস্ত্রে সেজে ওরা এগিয়ে এল। কিন্তু মুহূর্তেই বুঝল : এ বৃষ বৃষ নয়, অন্য কিছু। বৃষের সামান্য শিঙ, দাঁত ও খুর। তার সম্মুখেই বিষ্ণুপুত্ররা দাঁড়াতে পারল না। শিঙে ফেঁড়ে, দাঁতে ছিঁড়ে, খুরে দলে সেই মহাবৃষ দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গর্জনে গর্জনে পাতাল ফাটিয়ে ফেলবার উপক্রম করল।

পুত্ররা গেল। বিষ্ণু বসে থাকতে পারেন না। এগিয়ে এলেন। দিব্য শরে দিব্য শস্ত্রে তিনি বৃষকে নিহত করতে চাইলেন। কিন্তু সমস্ত শর সমস্ত শস্ত্র

সেই বৃষ একে একে গ্রাস করে ফেলল। বিষ্ণু বুঝলেন ঃ এ বৃষ নয়, মহাদেব। গম্ভীর স্বরে বিষ্ণু বললেন ঃ ক্ষমা করুন।

শিব বললেন ঃ আপনি সৃষ্টির কারণ। অথচ সম্প্রতি সৃষ্টি ছাড়া। এ স্থানের মমতা ত্যাগ করুন। স্বর্গে গমন করুন।

বিষ্ণু লজ্জা পেলেন। বললেন ঃ এখানে আমার চক্র রয়ে গেছে। নিয়েই যাচ্ছি।

শিব বললেন ঃ ও চক্র থাক। এখানেই থাক। এখানে থেকে দানবদের মাথা কাটুক। আপাতত আমি অন্য চক্র দিচ্ছি। এ চক্র আরো মারাত্মক।

বিষ্ণু হৃষ্ট হলেন। স্বর্গে এলেন। দেবগণকে বললেন ঃ ওখানে অমৃতের কন্যারা রয়েছেন। ওখানে যৌবনের জোয়ার। যার খুশি সেই যেতে পার, অবগাহন করতে পার ঐ জোয়ারের জলে।

দেবগণ সেই দণ্ডেই পাতালে যেতে উদ্যত হলেন। ওঁরা বললেন ঃ বিষ্ণু অতি উত্তম। তাঁর সব কিছুই রম্য। কি রম্যকথাই না তিনি বলেছেন। আহা বিষ্ণুর মহিমা যথার্থই অশেষ।

শিব সব শুনলেন। ক্রোধে তিনি ফেটে পড়লেন। বললেন ঃ শান্ত মুনি এবং আমার অংশজ দানবরা ছাড়া যে যাবে ওখানে সেই হবে নিহত।

দেবতাদের বড় সাধে শিব বাদ সাধলেন। ওঁরা বিষণ্ণ হয়ে ফিরে এলেন।

শিব বড়ই আনমনা হয়ে পড়লেন। পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন ঃ আনমনে কি এত চিন্তা করছেন ?

শিব বললেন ঃ পাতালে অনেক কামিনী আছে। তাদের যা রূপ তা আমিও কোনদিন অন্য কোনখানে দেখিনি।

পার্বতী বললেন ঃ আপনি যে আপনি সেই তিনিও যখন বিস্ময়ে ডুবেছেন তখন বুঝতে পারছি সে রূপ বড় সামান্য নয়। যদি অনুমতি করেন তবে এ দাসী সেখানে একবার যেতে পারে, নয়নমন জুড়িয়ে জন্ম ও জীবন সার্থক করে আসতে পারে।

শিব বললেন ঃ যাও।

আয়নায় মুখের ছবি, ছবি যেন প্রবেশ করল আয়নায়। পার্বতী বিলের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

পার্বতী পাতালে এলেন। অমৃতকন্যারা ভাবল ঃ কি আশ্চর্য! শেষে কি পাতালের আকাশে সূর্য উঠল। নচেৎ এত আলো আসে কোথা থেকে ?

পার্বতী সম্মুখে। চতুর্দিকে রচিত হয়েছে আলোর বলয়। অমৃতকন্যারা প্রথমে দেখতেই পেল না পার্বতীকে। ভাবল ঃ আলো, এত আলো এল কোথা থেকে ? দেখতে পেলে পার্বতীকে ওরা সম্মান দেখাতে ভুলত না।

পার্বতী বললেন ঃ রূপের ডালি সাজিয়ে বসে আছ। তোমাদের এত রূপ

সব যেতে বসেছে বিফলে। কেউ নেই যে তোমাদের সমাদর করে। অথচ পুরুষের স্পর্শেই নারীর রূপে সার্থকতা। নারীর অঙ্গে ঐ জন্যেই অযুত লাবণ্য।

কন্যারা ভাবল ঃ আহা, ইনি কে এমন ? কথাগুলি কি সুন্দর !

কন্যারা চিন্তায় একাগ্র হল। বুঝল ইনিই পার্বতী।

মুহূর্তে ওরা নতজানু হয়ে পার্বতীর স্তবে মুখর হল।

পার্বতী বললেন ঃ দেবতারা সব আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিব শাপ দিয়ে রেখেছেন। তাই তাঁরা আসেননি, তোমাদের রূপ সফলও হয়নি। আমার অনেক পুত্র ও শিবের বহু অনুচর মানুষের জন্ম নিয়েছেন। তাঁরা সকলেই জ্ঞানী ও গুণী, সর্বোপরি তপস্বী। রূপে এবং যৌবনেও তাঁরা তোমাদের খুশির কারণ হতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে সংসর্গ কর। এমন যৌবন কালি কর না।

সূত বললেন ঃ বিষ্ণু যে কিভাবে কামে বিমুগ্ধ হয়ে অনেক শত বছর কেমনভাবে কাটিয়েছিলেন এ থেকেই তা কিঞ্চিৎ বুঝবে। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। তাঁর আশ অত সহজে মেটেনি। একবার দৈত্যদের বধ করে তাদের স্ত্রীদের হরণ করে এই পাতালে বসেই বিষ্ণু বহুভাবে বিহারের সুখ ভোগ করেছিলেন। ত্রেতা যুগে উনি রাম হলেন। জানকীর সঙ্গে তেমন করে সঙ্গ করা তাঁর হয়নি। নিতান্তই অতৃপ্ত রইলেন। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবার জন্ম নিলেন। বাল্যবয়স থেকেই গোপকন্যাদের সঙ্গে বনে বনে বিহারে লিপ্ত হলেন। দশলক্ষ পুত্রও লাভ করলেন। তারপর এল যৌবনবয়স। বিবাহ হল রুক্মিণীর সঙ্গে। জন্ম হল প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি পুত্রের। কিন্তু এতেও কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু চরিতার্থ হলেন না। প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরের রাজা নরকাসুরকে নিহত করলেন। নরকের ছিল ষোলহাজার পত্নী। বিষ্ণু তাদের হরণ করে নিয়ে এলেন। বিবাহ করলেন। লাভ করলেন নয় হাজার পুত্র। তারও পর রাধাকে নিয়ে তিনি মেতে উঠেন। কিন্তু দেখা গেল অন্যের স্ত্রীর প্রতি বিষ্ণুর আসক্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। অবশ্য এরকম হতেই পারে। কারণ কামিনীও হবে, অনুরক্ত স্ত্রীও হবে—একই সঙ্গে এমনটি পাওয়া বড় সহজ নয়।

একটু থেমে সূত বলে চললেন ঃ অনেকে মুক্তিকেই সার বলে মানেন। বলেন, মুক্তি হলে সুখ আসে। কিন্তু মুক্তি এলে পাথর বনতে হয়। কোন অনুভূতিই আর থাকে না তখন। অনুভূতি থাকলে তবে তো হবে সুখের অনুভূতি ! যুবকযুবতীরা যখন মন দেওয়া-নেওয়া ক'রে বসে থাকে তখন কুলমানের প্রতি কোন মনই তাদের থাকে না। ব্রহ্মা গুরুদেরও গুরু। জনক বেদবেদাঙ্গে পরম পণ্ডিত। তাঁরাও পার্বতীর বিবাহের সময় পার্বতীর চরণ

দুখানি দেখেই অসংযত হয়ে পড়েছিলেন। কামের বশে এঁদেরই এই হাল। অন্যের কথা আর কি বলব!

৭১. লিঙ্গ পুজা

আদিতে মাত্র এক। আদিতে মাত্র রুদ্রদেব। সাদায় সাদায় লালে লালে নীলে নীলে মাখামাখি। রুদ্রদেবের গায়ে সেই শুরুতে এই তিন রঙের লাবণ্যই এসে লেগেছিল। লাল, সাদা, নীল। নীলের দ্যুতিই যেন মাঝে মাঝে ছাপিয়ে উঠত। হার মানত লাল সাদা।

সেই একেবারে শুরুতে শুধু রুদ্র। বিশাল ও চওড়া মুখে শোভা হয়ে ফুটে থাকত চওড়া চওড়া দাঁতের পাঁতি। তিনি তখন শান্ত ও দান্ত। তিনি তখন একান্ত নিস্পৃহ।

এরপর দুই হলেন। জন্ম নিলেন বিষ্ণু। রুদ্র বললেনঃ সৃষ্টি কর। জন্ম নিলেন ব্রহ্মা। সত্ত্বগুণে আবৃত বিষ্ণু। রজোগুণে আবৃত ব্রহ্মা। ওঁরা সৃষ্টির আনন্দে বিহ্বল হলেন।

ধর্মকর্ম আহার নির্ধারণ করে রুদ্র ঢলে পড়লেন। মহানিদ্রা কোল বাড়িয়ে তাঁকে ধারণ করলেন।

অবশেষে রুদ্রদেব জেগে উঠলেন। রুদ্রদেব চোখ তুলে চারিধার নজর করলেন। দেখলেন চরাচর পরিপূর্ণ। কোথাও একচুল ফাঁক নেই। সর্বত্র জোড়ায় জোড়ায় নারী ও পুরুষ।

রুদ্রদেব যেন খুশি হতে পারলেন না। ভাবলেনঃ দরকার নেই, দরকার ছিলও না এর।

বিরক্ত ও কুপিত রুদ্রদেব আপন অঙ্গ থেকে যোগবলে বিচ্ছিন্ন করলেন লিঙ্গ-শরীরটিকে। রুদ্রদেব! তাঁর জ্যোতির্লিঙ্গ! ভূমিতে পড়েছে লুটিয়ে। কিন্তু আগুনের শিখা নির্গত হতে লাগল ঐ লিঙ্গ থেকে। ক্রমে ব্যাপ্ত হল সেই অনলের শিখা। মনে হল ত্রিভুবন যেন গাঁথা ঐ ব্যাপ্ত অনলের স্তম্ভে।

রুদ্রের রাগ পড়ে এল। তিনি চলে গেলেন। কিন্তু লিঙ্গ পড়ে রইল। আদি মধ্য ও অন্ত শূন্য সেই প্রদীপ্ত লিঙ্গ বহুকাল ধরে সেখানে পড়ে রইল।

একদিন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লেন সেই লিঙ্গের সম্মুখে। ওঁরা চমকিত হলেন। বুঝতে চেষ্টা করলেন। লিঙ্গ অথচ প্রদীপ্ত! যার তার হতে পারে না। কিন্তু কার?

ব্রহ্মা ভাবলেনঃ জানতে হবে। নইলে মান যাবে।

বিষ্ণুও ভাবলেনঃ না জানলে মান নিয়ে টানাটানি।

ওঁরা দুজনেই ছুটলেন। আদি জানতে হবে। অন্ত জানতে হবে। ওঁরা চললেন, চললেন। কিন্তু সর্বত্রই এক। না আদি না অন্ত—কোনই কিনারা মিলল না। দুজনেই অশেষ অবসাদের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে ফিরে এলেন। সাগরতীরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এলিয়ে পড়েছেন।

অকস্মাৎ অবসাদের বোঝা কেটে গেল। ওঁরা শুনলেন ঃ এ লিঙ্গ শিবের। কোপে অধীর হয়ে নিজের লিঙ্গ নিজেই উনি ত্যাগ করেছেন। একে পুজো কর। সিদ্ধি আসবে।

কথা যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়ল। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হতবাক হয়ে শুনলেন। ওঁরা পুজো করলেন বিশাল ও প্রদীপ্ত সেই লিঙ্গের। শিবের প্রসন্নতা নেমে এল ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরে। ওঁরা এসে দাঁড়ালেন পরমসিদ্ধির তীরে।

৭২. শিবের বিপত্তি

সামান্য তামাসা। কিন্তু তাতেই গড়াল বহুদূর।

শিব পার্বতীকে কালো বলে ফেলেছেন। পার্বতী রাগে অভিমানে ফুঁসে উঠলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন তপস্যা করবেন। রঙ ফিরিয়ে হবেন গৌরী।

পার্বতী চলে গেলেন। কিন্তু শিবের স্বভাব নিতান্তই মন্দ। তাই নিশ্চিন্ত মনে কোথাও যাবার জো তাঁর নেই। তবু যেতে হবে। যাবেনও। সখী উন্দাম কুসুমকে পার্বতী ডাকলেন। পুত্র বীরককেও ডাকলেন। বললেন ঃ ওঁকে দেখো। যা স্বভাব তাতে বিশ্বাস নেই। কেউ এলেই হল, রতিক্রিয়ায় মেতে উঠবেন। এমনিতেই তো জাহ্নবী জাহ্নবী করে মনটা খুইয়ে বসে আছেন। ওঁকে বিশ্বাস নেই। সন্ধ্যারাগের মত ওঁর ভালবাসা। এই আছে এই নেই। লালে লালে ভালবাসায় জ্বলে উঠলেন। মুহূর্তে কোথায় যে সব মিলায়।

উন্দামকুসুম ও বীরক দেবীকে বিদায় দিলেন। ওঁদের আহারনিদ্রা ঘুচে গেল। সর্বক্ষণ দ্বারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়ে দিয়ে অবসন্ন হয়েও ওঁরা শ্রান্তি মানলেন না।

ওদিকে বিপদের ঘোঁট পাকিয়ে উঠল। আড়ী নামে এক দৈত্য তপস্যা করে ব্রহ্মাকে খুশি করে অমরত্ব চেয়ে বসল। ব্রহ্মা এতটা ভাবেননি। চাইল তো চাইল একেবারে অমরত্ব। ব্রহ্মা হাঁ করে রইলেন খানিকক্ষণ। একটু ভেবে নিয়ে বললেন ঃ একেবারে সরাসরি অমরত্ব তো বড় মারাত্মক ব্যাপার। ওতো দেবার নয়। তুমি বরং কাছাকাছি কিছু একটা চাও। যাতে যাতে অমর হওয়া যায় সেই সব চাও। দেব। পাবে।

আড়ী বলল ঃ ঠিক আছে, তাই দিন। যখন দেবরাজ পুষ্কর মেঘের দ্বারা

বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে সমস্ত ভরিয়ে তুলবেন, ঝড় বইবে প্রমত্ত বেগে, ময়ূরেরা নাচতে থাকবে পেখম তুলে আর আমি ধরব তিনরূপ সেই সময় যেন ঘনায় আমার মৃত্যু।

ব্রহ্মা রাজী হলেন। আড়ী আনন্দে হল উথাল পাথাল। প্রচুর মদ খেয়ে রীতিমত টও হয়ে সে হিমালয়ে এসে উপস্থিত হল।

আড়ী দেখল ঃ ঐ তো শিবের গুহা। ঐ তো পার্বতীর গৃহ। আড়ী আরও হৃষ্ট হল। সে আশপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। প্রবেশ করতে হবে ঐ গুহায়—আড়ীর মনে এই চিন্তা। কিন্তু দ্বারে সতর্ক বীরক, সতর্ক উদ্দামকুসুম।

আড়ী ছল করে ওঁদের কাছে একথা সে কথা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল। শুনলও অনেক কথা। আড়ী বুঝল সুন্দরী স্ত্রীলোককে মহাদেব কিঞ্চিৎ অধিক ভালবাসেন।

আড়ী নিজের চেহারা ছেড়ে সাপের চেহারা গ্রহণ করল। গুহায় প্রবেশ করল কোন এক ফাঁকে। তারপর মোহ ছড়িয়ে বাঁধল উদ্দামকুসুম ও বীরককে। মুহূর্তে আড়ীর সাপের সাজ খসে পড়ল। কোথা দিয়ে কি হল কেউ জানলনা। গুহা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখা গেল গুহামধ্যে দাঁড়িয়ে দেবী গৌরী।

গৌরীর সাজে সেজে গৌরীর মত করে আড়ী শিবকে বলল ঃ থাকতে না পেরে চলে এসেছি। কামদেবের জ্বলাতনে আমি অস্থির। তাই ছুটে এসেছি। আপনি কামদেবকে পরাজিত করে আমাকে সুস্থ করুন। এক মুহূর্তের তরও আমার সইছে না। অতএব কিছু না কিছু করুন। দেখুন কেমন গৌরী হয়েছি। এবার অন্তত আপনার আনন্দ বাড়বে।

মহাদেব বিগলিত হয়ে চোখ খুললেন। গদগদ হয়ে এবার তিনি গৌরীকে আলিঙ্গন করলেন। আদরে আদরে মহাদেব গৌরীকে অস্থির করে তুললেন। অবশেষে তাঁর উচ্ছ্বাস বাঁধনহারা হল। তাঁর প্রোজ্জ্বল লিঙ্গ পথের সন্ধান করল।

মহাদেবেব মনে সংশয়ের কোন ছায়া ছিল না। দেবী গৌরীর সঙ্গেই যেন তিনি লীলায় মত্ত হয়েছেন। আবেগে অধীর, তবু শংকায় কেমন যেন আতুব।

দানব আড়ী। সাজ নিয়েছে দেবীর। মহাদেব মিলনের উল্লাসে মগ্ন। আড়ী সুযোগ বুঝল। যোনিব অভ্যন্তরেই সৃষ্টি করল দণ্ড ও মুষল। যোনির গাত্রসমূহ হল বজ্রের মত কঠিন। এবার মহাদেবের লিঙ্গ ছিন্ন হবে। আড়ী মনে মনে আনন্দিত হল।

কিন্তু মহাদেব মায়া বুঝেছেন। শূল ও পশুপত অস্ত্র উৎপাদন করে সমস্ত দানবিক কৌশল ব্যর্থ করলেন। অবশেষে মহাদেব বিযুক্ত হলেন। গৌরীব

মূর্তি বিলীন হল ঃ আড়ী প্রকাশিত হল। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আড়ী আক্রমণ করল মহাদেবকে। সিংহ যেন গজরাজকে নিহত করল। মহাদেব আড়ীকে বধ করলেন।

মহাদেব বীরককে ডেকে বললেনঃ দেখ, কি কাণ্ড। বীরক আঁতকে উঠলেন। এত সতর্কতা! তবু এই দুর্ঘটনা? বীরক বুঝলেন স্ত্রীজাতি বিশ্বাসের যোগ্য নয়।

আড়ী মরল। কিন্তু মরতে মরতেও শাসিয়ে বলে গেলঃ আমার থেকেও বলে বীর্যে আমার ভ্রাতা বড়! এবার সে আসবে। গৌরীর রূপে ছলনা করে তোমাকে নিহত করবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হল আর এক গৌরী। মহাদেব খুশই রুষ্ট হলেন। ভাবলেনঃ পার্বতীর সঙ্গে দেখছি কোন ভেদই নেই। তথাপি এ পার্বতী নয়। যা হোক ভাল করে না দেখে বলা যাচ্ছে না কিছু। মহাদেব সেই কামিনীকে নিয়ে ব্যাপৃত হলেন।

উদ্দামকুসুম আর থাকতে পারলেন না। ছুটে এলেন পার্বতীর কাছে। বললেনঃ তোমার পতিকে রক্ষা করে কার সাধ্য! একবার গেল, কিন্তু আবার। কে না কে একজন কামিনীকে নিয়ে হাজির করেছে বীরক। মহাদেবও তেমনি। লাবণ্যের ছটায় ছটফট করে উঠলেন। ছি ছি, কি লজ্জা! আমার সামনেই? ওসব কি সামনে থেকে দেখা যায়, না সওয়া যায়! তুমি যা হোক বিহিত কর।

পার্বতী বীরকের উপর খুবই রেগে গেলেন। পূবমুখো আচমন করে বীরককে অভিশাপ দিলেনঃ আমি জানি না, অথচ আমার পতির কাছে কে না কে এক রমণীকে এনে হাজির করিয়েছ। আমার পতিকে তোমার রক্ষা করার কথা। কিন্তু অন্যথা করেছ। অতএব তুমি পৃথিবীতে জন্ম নেবে। জন্ম জরা ও মৃত্যুর কবলে পড়ে যন্ত্রণায় কাতর হবে।

দেবী অস্থির হলেন। উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়ে তাঁর মন দুলে উঠল। তেজে তেজে তাঁর মন উদ্দীপ্ত হল। দেবী হলেন ভয়ংকর।

পার্বতী পড়িমরি করে ছুটে এলেন। দেখলেন বীরক তেমনই বিনীত, শিব নিরপরাধ।

বীরক পার্বতীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বললেনঃ আপনার ভাগ্যের বলেই দেবাদিদেবের কোন অকল্যাণ ঘটেনি, নইলে ভারী ভয়ানক একটা কিছু ঘটে যেত। আড়ী নামে এক দৈত্য এসেছিল। মায়া বিছিয়ে বধ করতে চেয়েছিল শিবকে। কিন্তু শেষমেষ নিজেই মারা পড়েছে।

পার্বতী মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন। বীরক দোষ করেনি কিছু। কিন্তু রাগের বশে তাকে শেপে ফেলেছেন। দেবী লজ্জিতও হলেন। এমন রাগ

শোভা পায় না তাঁর।

বহুক্ষণ পরে পার্বতী বীরককে বললেনঃ ভুল করে শাপ দিয়ে ফেলেছি। পৃথিবীতে তুমি শিলাদ নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র হবে। তবে মাত্র বারো বছর পরই তোমার দুর্ভাগ্যের শেষ হবে। আবার আসবে শিবলোকে।

পার্বতী এসেছেন। কিন্তু মহাদেব যেন বিশ্বাস মানতে পারছেন না। ভাবলেন এও বুঝি দানবের ছদ্মবেশ।

মুহূর্তে মহাদেব ভয়ংকর হয়ে উঠলেন। উদ্যত হলেন দানববধে। ক্ষণে ক্ষণে মহাদেবের রূপ বদল হতে লাগল। সহস্র সহস্র মূর্তিতে তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু সবই পার্বতী গ্রাস করে ফেললেন। অবশেষে দেবী তারারূপে প্রকটিত হলেন।

মহাদেবের মন থেকে আশংকার কালো ছায়াখানি অপসৃত হল। তিনি দেবীর রূপের ছটায় বিমোহিত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে এলেন। মিলনের পিপাসায় মহাদেবের বুক যেন ফাটফাট হল। তিনি দেবীর সঙ্গে মিলিত হলেন। সুধা পানে যেন শিব উন্মত্ত হলেন, অধীর হলেন। দেবীর শরীর থেকে তাবৎ সুধা নিঙড়ে পান করেও যেন তাঁর তৃপ্তি হল না। তিনি পানে পানে পাগল হলেন॥

৭৩. কামোন্মত্ত শিব

পার্বতী দূরে ছিলেন। অনেক দিন বাদে তিনি এলেন। শিবের অবরুদ্ধ আবেগ উন্মুক্ত হল। পাগলা ঝোরার মত তাঁর আবেগ বাঁধ ভেঙ্গে সব কিছু ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। পার্বতীর উচ্ছ্বসিত যৌবন একখণ্ড নুড়ির মত গুঁড়িয়ে গেল। উন্মথিত শিব দিগম্বর হয়ে প্রবেশ করলেন দেবদারুবনে। দেবদারুবনের মুনিরা প্রমাদ গণলেন। ঘরের লক্ষ্মীরা ঘর ছেড়ে প্রমত্ত হলেন। শরীরের পাত্রে ধরে দিলেন অমৃত সুধা। শিব পান করলেন। কিন্তু মহাতৃষা মিটল না।

শিব এসেছেন দেবদারুবনে। গলায় তাঁর তুষারের হার। অঙ্গে লিপ্ত ভস্ম। যেন চাঁদকে চূর্ণ করা হয়েছে, যেন শঙ্খকে চূর্ণ করা হয়েছে। চাঁদের চূর্ণে শঙ্খের চূর্ণে প্রসাধিত হয়েছে শিবের শরীর। সর্ব অঙ্গে লাবণ্যের ঈষৎ ঈষৎ হাসি।

শিবের মাথায় কালো ও কুঞ্চিত চুলের গুচ্ছ। কয়েক গুচ্ছ গড়িয়ে পড়েছে মুখেও। কালো চুলে ঢাকা শিবের মুখ, ভ্রমরে ঢাকা সাদা পদ্ম। দুটি বাঁকা ভ্রূ। নীচে দুটি নীল তারা। সে তারায় চঞ্চলতার আলো, সে তারায়

অনুরাগের রঙ। মুখে ছোট ছোট মিহি দাড়ি, কানে কুণ্ডল।

মুনিপত্নীরা দেখলেন। মুগ্ধ হলেন। বিবশ হলেন। অপরূপ, সুন্দর, মূর্ত যৌবন। সর্ব অঙ্গে সাদা ও কালোর মেশামেশি। হাতের তালুতে জবার রক্তরাগ। পায়ের তালুতে ফাটোফাটো রক্তজবার বর্ণ।

শিব আছেন। সঙ্গে আছেন প্রমথরা। দেবদারুবন আনন্দে আনন্দে উদ্বেল হল। শিব গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন। মংহুর প্রভৃতি দশরকম গানই রূপ পেল তাঁর কণ্ঠে। মন্দ্র ও তার সপ্তকের চোদ্দস্বর দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে বয়ে গেল। তিন প্রকার যতি ও বিভিন্ন লয়ে বইল সেই স্রোত। আটরকম রসাঙ্গে, একুশরকম মূর্চ্ছনায় উনপঞ্চাশ রকম তালে ও নানারকম কণ্ঠতানে ঝরল সুরের মাণিক!

দেবদারুবনে কামিনীরা সুরে সুরে পাগল হলেন। সাতস্বর, তিন গ্রাম এবং বত্রিশ রকম মহারাগ এসেও মিশেছে। এমন সুরেই চনমনিয়ে উঠে প্রাণ। চৌষট্টি বর্ণের অনন্তভাষায় রচিত সে গান। এ কালের উপযোগী সে কালের উপযোগী মিশ্র এক ভাষায় রচিত সে গান। শিবের কণ্ঠের হেন গান। সঙ্গে বীণা প্রভৃতি চাররকম বাদ্যের বাদন, নৃত্যের দোলা বোল, হাস্যের ঝর্ণাধ্বনি। এমন সুরেই চনমনিয়ে উঠে প্রাণ।

শিব গান করছিলেন। করতে করতে শিব নৃত্য করছিলেন, হাস্য করছিলেন, মধ্যে মধ্যে লম্ফ দিয়ে বিস্তার করছিলেন চমক।

উন্মত্ত শিব। সঙ্গে প্রমথগণ। সঙ্গীতে নৃত্যে হাসিতে মাতোয়ারা শিব।

শিব নাচছেন, নাচতে নাচতে নজরে পড়ল বনের ফল। শিব ফল খেতে মেতে উঠলেন। শিব ফল খেলেন, ফুল তুললেন, পাতা ছিঁড়লেন। ফুলে পাতায় নতুন সাজে সাজ করলেন। অকস্মাৎ শুরু করলেন তাণ্ডব নৃত্য। এদিকে ওদিকে যারা ছিল, দেখছিল, তারা অবাক বিস্ময়ে চমৎকৃত হয়ে চেয়ে রইল।

শিব এলেন নদীর তীরে। নেচে নেচে অবশেষে একেবারে নদীর তীরে। সেখানে দেখালেন সহস্র প্রকার আসন। শিবের ছত্রিশ প্রকার চাহনি। কিন্তু এই নদীর তীরে ছত্রিশ হল অপূর্ব এক এক।

নারায়ণ এসেছেন। তিনিও দেখছেন শিবের কাণ্ড। রসবেত্তা নারায়ণ। শিব রসবেত্তাকে রস দেখালেন। নয় রস মূর্তি পেল।

পার্বতীও ছিলেন। ছিলেন শিবের পিছন পিছন। নিতম্বের ভারে পয়োধরের ঔদ্ধত্যে তাঁর চলনে অন্যতর ছন্দ। মিহি কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ তাঁর আবৃত। মাথায় লাল কাপড়ের উষ্ণীষ। অঙ্গে ফুলের শত আভরণ। হাতে অশোক ফুলের মালা। পার্বতী শিবকে ধরে আছেন। পিছন পিছন চলছেন। আকাশ : বিদ্যুৎচমক, নীলমেঘ, তারার মালা, মধ্যে চন্দ্র। পার্বতী

চলছেন ঃ এমনতর এক আকাশের মধ্যে যেন এক চন্দ্র।

গোপিকার রূপ ধরে মাতৃগণ ছিলেন। পার্বতী দেখলেন ঃ স্বামী অন্য রমণীতে কেমন অনুরক্ত, অন্য রমণীতে তাঁর কেমন উল্লাস। পার্বতী দেখলেন ঃ মুনির পত্নী, অথচ বালাই নেই শীলতার। শিবের প্ররোচনা, তথাপি ধৈর্য নষ্ট হল না। সাধ্বী শব্দের মহিমা পার্বতী প্রত্যক্ষ করলেন।

অপরূপ রূপ নিয়ে শিব মুনিদের ঘরে ভিক্ষা মেগে ফিরছেন। কথায় হাবেভাবে চোখের তারায় লুকানো যেন পুষ্পশর। চোখে চোখে কত কথা কত ইঙ্গিত। মুনি পত্নীরা উতলা হলেন। ওঁরা সব বেরিয়ে পড়লেন। কেউ বা ছুটলেন স্বামীর ভালবাসা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে, কেউ বা স্বামীর মন না পেয়ে জ্বালায় পড়ে। আবার কেউ চললেন স্বামীর অনুমতি নিয়েই।

এক নির্লজ্জ পুরুষ এসেছে বনে। চেহারায় মন মুগ্ধ হয়, হাবেভাবে চাউনিতে মন যায় মন খোয়াতে। দ্বারে দ্বারে সেই পুরুষ ভিক্ষা মেগে ফিরছেন। বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলেই আতুর হল। পিছু নিল শিবের। একমাত্র অরুন্ধতী রইলেন নির্বিকার।

কামে আতুর এক পাল রমণী। তারা চলছিল, পড়ছিল, আবার চলছিল। তারা হাসছিল, গাযে গড়িয়ে পড়ছিল, কখনো বা কাঁদছিল। মনে বিকার। মনে কামনা। অথচ সম্মুখে শুধু মরীচিকার ছল। তারা শিবকে শাপশাপান্ত করে রাগ ঢালল। কোন সময় দীর্ঘশ্বাসে আকুল হল। পাকে প্রকারে নানা-ভাবে তারা শিবকে কাছে টানতে চাইল। কখনো সুন্দর প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে কখনো চোখের তারায় কামনার ভাষা ফুটিয়ে তারা চেষ্টা করল। কিন্তু যন্ত্রণা বেড়েই চলল। সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল দুঃসহ দহন। আর পারল না। তারা একে একে ত্যাগ করল বসন।

মুনিপত্নীগণ শিবকে ভোলাতে চাইল। কথার মালায় চাইল শিবকে ভোলাতে।

একজন বলল ঃ কিসের ব্রত তোমার ? মানুষ তপ করে সুখে এবং স্বস্তিতে ভোগ করার জন্য। অথচ তুমি যেন কেমন। কোন কিছুতেই যেন গা নেই। সম্মুখে আমরা। আমাদের সম্মুখে তুমি—একজন যুবক। অথচ তুমি শীতল মনে শীতল চোখে তাকিয়ে রয়েছ। কেমন ব্রত তোমার ?

অন্য একজন বলল ঃ পরস্ত্রী অতীব রম্যবস্তু। যুবকেরা এটি সম্যক বোঝে। অথচ তুমি যেন কেমন। তোমার সঙ্গ আমাদের কাম্য। আমরা চাইছি অথচ তুমি চাইছ না। মানুষ কাজ করে। করে ভোগের জন্য। অথচ তুমি না চাও কাজ না চাও ভোগ। আমরা পরস্ত্রী, তোমাকে চাইছি। অনেক পুণ্য করেছ বলেই চাইছি। অথচ তুমি চাইছ না। এতো বোকার আচরণ। তাই তোমার এমন ধরণধারণ।

তৃতীয় একজন বলল ঃ ভাবছ আমরা শরমের কপালে আগুন জেবলেছি। অমন ভেবোনা। ভুল করবে। এখন বৈশাখমাস। তুমি পরমপুরুষ, সেই তুমি বনে এসেছ। কত কণ্ট হয়েছে কে জানে। বৈশাখ মাসে তুমি এসেছ বনে। আমাদের শরম কি করে থাকে বল ?

চতুর্থজন বলল ঃ অন্যের দ্বারা আমরা উপভুক্ত। কিন্তু আমাদের অভিলাষ তাতে মেটেনি। সাধ আছে, আশও আছে। তোমাকে তৃপ্ত করবার মত সাধ্যও আছে। দেখই না চেয়ে। ভিক্ষার ঝুলি না হয় দিলেই ফেলে। চোখ না হয় খুললেই। তাতে লজ্জা কি? আমরা তপস্বিনী? তাতে তোমার কি? আমরা বিবস্ত্রা বা সবস্ত্রা তাতেই বা তোমার কি? তোমার চোখ আছে। খুলবে। দুচোখ ভরে দেখবে। হয়ত বলবে আমরা উপভুক্ত। তা সত্যি। কিন্তু দেখই না নিটোল লাবণ্যে কেমন জবলজবল করছি।

আর একজন বলল ঃ তুমি অনুগ্রহ কর। সত্যিই আমরা বঞ্চিত। আমাদের স্বামী আছে। কিন্তু না থাকার মত। হয় তারা বুড়ো, নয় রোগা হাড়সর্বস্ব কিংবা পরম সাধুসন্ত। আর আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ। শ্রাবণের নদী কেঁদে কেঁদে বৃথা বয়ে চলেছে।···ভয়েরও তোমার কিছু নেই। স্বামীদের কথা বলছ? ওঁরা নড়বড়ে। রাজা? এ বনে কোন রাজা নেই। ঐ দেখ কি সুন্দর ঝর্ণা, কি সুন্দর সুন্দর সব কুঞ্জ।

আগ বাড়িয়ে এল একজন। বলল ঃ আর ঐ দেখ দূরে জীর্ণশীর্ণ তপস্বীদের। পেটে অন্ন নেই। ক্ষুধায় কাতর। পিপাসায় কাতর। তবু ওঁরা জ্ঞানবিতরণে অক্লান্ত। সব ভুলেছেন ঐ নেশায়। আমাদের বিড়ম্বনার কথা একবার চিন্তা কর।

কথা কেড়ে নিয়ে আর একজন বলল ঃ গুরু খুশি হলেন, গৌতমের আশ্রমে যজ্ঞ করলেন। সামবেদে বর্ণিত আছে সেই যজ্ঞের নিয়ম। গুরু মহাযজ্ঞ করলেন সেইমতই। তুমি নিশ্চয়ই এসব জান! মহাযজ্ঞ। স্ত্রী হলেন অগ্নি, উপস্থ হল সমিৎ। স্ত্রী কথা বলেন, সেই কথাই ধূম। শরীরে যা ধারণ করেন তাই অঙ্গার। আর সেই সময়কার আনন্দ হল স্ফুলিঙ্গ। বিবুধ যাঁরা তাঁরা ঐ যোষিদগ্নিতেই রেতঃ ক্ষেপণ করেন। বৃথা সময় বয়ে যায়। কৃপা কর। এতেই মিলবে বহু কিছু। এমন পাওয়ার ভাগ্য কজনের হয়? হাতে পাচ্ছ, নেওয়াটাই বুদ্ধির।

শিব বললেন ঃ বিষ্ণুর দক্ষিণনেত্রই আমাদের গুরু। সমস্ত চরাচরের লালন করেন ইনিই। বলা হয় উনি এবং আমি অভেদ। উনি থাকেন আকাশে, যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ আমি ভোজন করি। যে খাদ্য দোষের যে পানীয় দোষের তাতে আমার অরুচি। যদি ভোজনে বসি প্রতিবার তবে আলাদা করে গ্রাস তুলি। তা-ই আমাকে দেবে। আমি আচমন করি, নতুন করে আবার জল

দেবে। কোন মুনির স্ত্রী আমাকে ঘি-ভাত, ক্ষীর, শাক, ফলমূল দেবে; একজন বসু দেবে কাপড়, পান ও স্নানের জল। এমনভাবে আমাকে দিলে আমি পরিতোষ মানি। ডানহাতই আমার খাবারের পাত্র। আদর নয়, সম্মান নয়, হেলাফেলা করলেই আমি খুশি। গাছের কোটরে শুই, পাশে থাকেন এই শবরী। ইনিই আমার আগুন। সৃষ্টি রাখতে এই আগুনেই আমি বাঁধ ফেলি। জীবের সবরকম দেওয়াই দিই আমি। অতএব দেরি নয়। যাও। যাকে বরণীয় বলে মনে মনে মানো তার কাছে যাও। সুখী হবে।

ঋষিপত্নীরা শিবের কথায় মজা পেল। ওঁকে আটকে রাখল। হাসির কথায় খুশির কথায় ওরা মুহূর্তে মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ল। ওরা বলল: পাগল আর কাকে বলে। আমরা স্ত্রীলোক। শাস্ত্র আওড়াচ্ছ আমাদের কাছে। কিন্তু বৃথা। পুরুষ মনে মনে অন্য রমণীকে কামনা করে। তোমরা ভাব স্ত্রীরা এই বহুচারী পুরুষকে চায় না। আসলে কিন্তু উলটো। পুরুষ এই রকম কামুক হবে তবেই না আমাদের স্ফূর্তি। নিজেই চিন্তা করে দেখ না! ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে এই শবরী কেন রয়েছেন? তোমার ভাগ্য অবশ্য খুবই ভাল। না হলে কি এমন সুন্দরী স্ত্রী কপালে জুটত? ভাগ্য করেছ গো। ভাগ্যবানের সঙ্গ করাও ভাগ্যের। সেই ভাগ্য কি আমাদের হবে?

তাপসের বেশে শিব। তিনি শুনলেন। ঋষিপত্নীদের কামনার কথা তিনি বুঝলেন। মনে মনে খুশিও হলেন অত্যন্ত।

প্রসন্ন তাপস ঘরে ঘরে যান। ঋষিপত্নীরা কামে আতুর হয়। প্রসন্ন তাপস ঘরে ঘরে যান। পিছনে পিছনে ফেরে ঘরছাড়া উতলা একপাল ঋষিপত্নী।

ঋষিপত্নীরা নগ্ন তাপসের পিছনে পিছনে চলছে। তাঁর মন চেয়ে ছোঁয়া চেয়ে মনভুলানো নানা কথায় ওরা বনভূমি মুখর করে তুলল।

মুনিদের টনক নড়ল। তাঁরা দেখলেন উলঙ্গ এক তাপস। পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাবৎ মুনিপত্নী। ওঁরা ছুটে এলেন। নিজ নিজ পত্নীকে ধরলেন। কর কি কর কি! ছি ছি! ওঁরা পত্নীদের আটকে রাখতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। পত্নীরা তখন উতলা। শিরায় শিরায় তখন তাদের আগুনের স্রোত। মন জরজর, শরীরও তথৈবচ।

মুনিরা সইতে পারলেন না। রেগে অন্ধ হলেন। যে যা পেলেন হাতের কাছে তাই নিয়ে গেলেন ধেয়ে। কেউ দণ্ড, কেউ গাছের ডাল, কেউ পাথরের খণ্ড, কেউ কমণ্ডলু, কেউ কণ্টক, কেউ বা কোন আয়ুধ নিয়ে সেই নগ্ন তাপসকে আক্রমণ করলেন। কেউ শুধু হাতেই প্রহার করলেন। কেউ বিদ্ধ করলেন খরবাক্যে। কেউ গায়ে ছেড়ে দিলেন সর্প।

মুনিদের পত্নীরা বন পথে চলে চলে বনে বনে শ্রান্ত। ওদের গলা বুজে এল। ওদের শরীর অচল হয়ে এল। ওরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লুটিয়ে

পড়েও কোন মতে বল্কলে বা হরিণের চামড়ায় বা কাপড়ে শরীর ঢাকল। কিন্তু জ্বালা জুড়োল না। মুনিরা যত্ন করলেন। কিন্তু শিরায় শিরায় আগুনের স্রোত আরও জ্বালা ছড়িয়ে ওদের পাগল করে তুলল। ওরা আবার ছুটল। ধুলোয় মৌন অপমানে লুটিয়ে রইল বল্কল, হরিণের চামড়া, কাপড়।

ওদিকে শিবের শরীর রক্তে ভাসছে। মুনিদের আক্রমণে তাঁর এখানে ছিঁড়েছে ওখানে কেটেছে। রক্তে ভাসছে শিবের শরীর।

বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমের দ্বারে দাঁড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত শিব ধীরে ধীরে অরুন্ধতীকে ডেকে বলতে লাগলেন: আমি শঙ্কর। তোমার অতিথি। এস। দেখ আমার কোমল শরীর কেমন মানিয়েছে ক্ষত চিহ্ন অলংকারে।

ধীরে ধীরে শিব তাঁর সমস্ত অঙ্গের ক্ষত অরুন্ধতীকে দেখালেন। অরুন্ধতীর মনে বন্যা নামল পুত্রস্নেহের। আহত অতিথি। সে তো পুত্রবৎ। পুত্রের বিক্ষত দেহ। মাতা অরুন্ধতী মনে মনে কেঁদে উঠলেন। শীতল জল আনলেন। শিবের সমস্ত ক্ষত পরিষ্কার করলেন। কামধেনুর ঘিয়ে মালিশ করলেন সেইসব ক্ষত স্থান। আবার শীতল জলের ধারা। শিবের শরীর পরিচ্ছন্ন হল। এবার বিবিধ অঙ্গরাগে, ফুলে ও গন্ধ দ্রব্যে শিবকে তিনি সাজিয়ে দিলেন। অতঃপর ভোজন। দামী আসন পড়ল। ধূপ পুড়ল, গন্ধ ছড়াল। পাদ্য এল, চামর দুলল, সাজিয়ে দেওয়া হল অনেক থালাবাটি। এদিকে গরম পায়সের থালা, ওদিকে কত কত খাদ্যবস্তু। জল দেওয়া হল, ঘি দেওয়া হল, দেওয়া হল দই, ক্ষীর, রকমারি ফলমূল এবং মাংস। অরুন্ধতী সাজিয়ে দিলেন। সেবা করলেন শিবের।

শিব পরিতৃপ্ত। অরুন্ধতী তাঁকে খাইয়ে তৃপ্ত করেছেন। অরুন্ধতী তাঁকে পুত্র বলেছেন। সেবাও করেছেন সেইমত। অবশেষে শিবকে বললেন: এবার তুমি যাও। যেখানে মন চায় সেখানে যাও।

শিব বললেন: তোমার পতি বৃদ্ধ জীর্ণশীর্ণ। তোমার পতি ক্ষমাশীল। তাঁর দেহে যৌবন নেমে আসুক, তাঁর দেহ হোক দেবতার মত অজর, দেবতার মত সুন্দর।

আবার বনের পথ। আবার চারিদিক থেকে রমণীরা এল ঝাঁক বেঁধে। পথে যেন একটি চলন্ত ফুল। ভ্রমরেরা ছুটে এসেছে, ছেঁকে ধরেছে। রমণী ভ্রমর। তাদের গুঞ্জনে কামনার ধ্বনি।

নিজের স্ত্রীরা কামনা করছে অন্য এক পুরুষকে। বনবাসী ঋষিরা আবার ছুটে এলেন মার মার কাট কাট করে। প্রহারে প্রহারে শিবের শরীর জরজর হল। কিন্তু তেমন গা করলেন না তিনি। হেসে হেসে শত রঙ্গ ছড়িয়ে খুশিতে ভেঙ্গে পড়ে পড়ে তিনি চললেন।

ধীরে ধীরে বারোটি বছর কেটে গেল। কতজনে কত শত অস্ত্রে তাঁকে

কাটল ছিঁড়ল, গালমন্দ করল কত। কিন্তু শিব অবিচল। সব সয়ে গেলেন হাসিমুখে। মার এল, শিব ফিরিয়ে দিলেন না। মুষলধারে গালমন্দ বর্ষণ হল, শিব ফিরিয়ে দিলেন না।

ধীরে ধীরে মুনিদের অস্ত্র ফুরিয়ে গেল। ভৃগু ও অন্য কয়েকজন তাপস রাগে গরগর করতে থাকলেন। ওঁরা অভিশাপ দিলেনঃ তাপসের বেশ, কিন্তু তুমি কদাপি তাপস নও। সব তোমার ছল। লাম্পট্যেরও সীমা আছে। কিন্তু তুমি সীমা ছাড়িয়েছ। এ বনে রাজা নেই। থাকলে তোমার বেলেল্লাপনার সাজা হত। লিঙ্গ কেটে দেওয়াই উচিত শাস্তি। যে গুরুপত্নীতে রত তার প্রায়শ্চিত্ত নিজ হাতে নিজের লিঙ্গ ছেদ করা। অণ্ডসমেত সেই লিঙ্গ দুহাতে অঞ্জলি করে ধরে মরণের জন্য দক্ষিণদিকে গমন করাই তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। তুমি আমাদের লক্ষ্মীছাড়া করেছ। আমাদের স্ত্রীদের মজিয়েছ। তোমার লিঙ্গ এই দণ্ডে খসে পড়ুক।

মুনিরা নানাবিধ শস্ত্র ও দণ্ড তুলে নিলেন। ধেয়ে গেলেন শিবের প্রতি। মার মার রবে মুনিরা ছুটে গেলেন।

শিবের লিঙ্গ খসে পড়ল। পাতিত হল সতীর দেহে। বহু যোজন বিস্তীর্ণ সেই সুন্দর লিঙ্গ বনের মধ্যে পড়ে রইল। পড়ে থেকে জ্বলতে থাকল।

কিন্তু এদিকে জগৎ আবৃত হল তমে। তম নামল প্রকৃতির লোকে। তম নামল হৃদয়ে হৃদয়ে।

অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে বললেনঃ আঘাতে আঘাতে জরজর হলেন, কিন্তু মুখে রা কাটলেন না। উনি নিশ্চয়ই মহাদেব। শবরীর বেশে নিয়ত যিনি ছিলেন ওঁর পাশে পাশে তিনি নিশ্চয়ই আমার ভগিনী। অন্য যে সব স্ত্রী ছিলেন তাঁরাই মাতৃগণ, পুরুষরা প্রমথগণ।

অরুন্ধতী ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। অতঃপর বললেনঃ আমরা বহু পুণ্য অর্জন করেছি। সেই পুণ্যে শিবের জরজর অঙ্গ সুন্দর ও সুস্থ হয়ে উঠুক। তোমার অনন্ত তেজ। সে তেজে জগৎ আবার আলোর সমুদ্রে ভেসে উঠুক।

সহধর্মিণীর কথা বশিষ্ঠের মনে ধরল। তিনি ধ্যানে বসলেন। বুঝলেন অরুন্ধতীর অনুমান সত্য। খুশি হয়ে বললেনঃ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

দেখতে দেখতে মহাদেবের অঙ্গ থেকে তাবৎ ক্ষত দূর হল। যথাস্থানে স্থাপিত হল সেই লিঙ্গ। মহাদেব বনমধ্যে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে ফিরলেন। দেখতে দেখতে অন্ধকার দেবদারুবনে নেমে এল আলোর বন্যা।

মুনিরা বোবা বনেছেন। বিস্ময়ে তাঁরা আবিষ্ট হলেন। তাঁরা বুঝলেন নগ্ন এই তাপসই স্বয়ং দেবাদিদেব। মুনিদের মনে রাগ রইল না। নেমে এল

ভক্তির আবেশ। ওঁরা স্তব করলেন।

মুনিদের স্তবে দেবদারুবনের আবহ বদলে গেল। আকাশ থেকে কে যেন কথা বললেন। মুনিরা শুনলেন। আকাশের বাণী অর্থময় হল ঃ ঐ লিঙ্গই সিদ্ধি দিতে পারে। শঙ্করের প্রতিমা পূজোর চেয়ে লিঙ্গপূজো ঢের বেশি পুণ্যপ্রদ। অতএব প্রার্থনা কর। কর ।।

৭৪. ইন্দ্রের কাণ্ড

কামনা আগুন হল। ইন্দ্রের মন জ্বলল।

তিনলোক বশে আসবে, সুখের সাগরে ডুব দেবেন, সেখানে হয়তো মণি আছে, রত্ন আছে বহু শত। ইন্দ্রের মনে কামনার আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলল।

ইন্দ্র প্রতাপ ছড়ালেন। জয়ের পর জয় যেন আগ বাড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করল। শচী প্রমুখ অপ্সরাদের নিত্য সান্নিধ্যে বহু শত মুগ্ধ প্রহর অতিবাহিত হল। কিন্তু ইন্দ্রের মনে আগুন জ্বলছে। তিনি যেন আক্রান্ত জ্বরে। মনে অতৃপ্তির দুঃসহ জ্বালা। ইন্দ্র অধীর হলেন। ইন্দ্র প্রলুব্ধ হলেন। পরাক্রান্ত ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা স্বীকার করলেন।

ইন্দ্রের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ল গৌতমমুনির পর্ণকুটিরে। সেখানে আছেন মুনির পত্নী অহল্যা। রূপে যৌবনে অনন্যা অহল্যা। ইন্দ্রের লোভের আগুনে মুনির স্বর্গ জ্বলে পুড়ে ছাই হল।

গৌতমের শান্তির নীড়। জপে তপে ওঁর দিন কাটে। অহল্যার সেবায় ওঁর মন ভরে। একদা এই ছোট্ট কুটিরে লুব্ধ ইন্দ্র চোরের মত গুটি গুটি এলেন।

গৌতম ছিলেন না। উনি গেছেন স্নানে। ইন্দ্র গৌতমের চেহারা নিলেন। এলেন কুটিরে। কুটিরে একা অহল্যা। ইন্দ্র তাঁকে ভোগ করলেন। অনন্যা অহল্যার স্পর্শে তিনি বিভোর হলেন।

এদিকে মুনির স্নান সারা হয়েছে। ফলমূল সংগ্রহ করে তিনি কুটিরে ফিরে এলেন।

মুহূর্তে গৌতম ক্রোধে অধীর হলেন। অহল্যা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এই এক, ঐ আর এক। একে একে দুই। দুই স্বামী! অহল্যা কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। বোবা ভয়ে ওঁর মন কাঁপতে থাকল। শরীর হল নিথর নিস্পন্দ।

এমনটি হবে ইন্দ্র ভাবেননি। তিনি লজ্জিত হলেন, ভীত হলেন। লজ্জায় ভয়ে ইন্দ্র জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গৌতম বললেন ঃ ছল করে আমার পত্নীকে তুমি উপভোগ করেছ। তোমার অণ্ড খসে পড়ুক।

গৌতমের অভিশাপও উচ্চারিত হল, সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত হল ব্রহ্মদণ্ড। ব্রহ্মদণ্ডের প্রহারে ইন্দ্র জরজর হলেন।

কোন মতে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে এলেন। অণ্ডহীন ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে এলেন। দেবতারা দেখলেন এক নতুন ইন্দ্রকে। অতিশয় কৃশ শরীর, তদুপরি কুকুরের এক মুণ্ড। সর্বগাত্রে সহস্র যোনি চিহ্ন। দেবতারা যাহোক একটা ব্যবস্থা করলেন। রাজা ইন্দ্র বীর্যহীন হবেন এটি তাঁদের কাম্য নয়। মেষের অণ্ড সংযুক্ত হল ইন্দ্রের শরীরে।

কিন্তু গৌতমের ক্রোধ সহজে নিষ্কৃতি দিল না। তিন কোটি বৎসর ইন্দ্র লঙ্কাতে রাবণের বন্দীশালায় আবদ্ধ রইলেন। ইন্দ্রের স্থানের স্থিরতাও নষ্ট হল চিরতরে।

গৌতমের ক্রোধে অহল্যাদেবীও পার পেলেন না। তিনি দগ্ধ হলেন। পরিণত হলেন নিথর পাথরে। বহুদিন পরে নারায়ণরূপী রামের স্পর্শে পাথরের ঘুম ভাঙল।

বিকৃত শরীরে ইন্দ্রকে ভুগতে হল অনেক। মহাদেব করুণা করলেন। তাই। নইলে দেবরাজ ইন্দ্র শরীরের শোকেই হয়ত সারা হতেন।

হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেলেন। কিন্তু ভুলতেও দেরি হল না। ইন্দ্র কামের বশে আবার আকুল হলেন।

জনমেজয়ের ভার্যা বপুষ্টমা। ইন্দ্রের মন বপুষ্টমার লাবণ্যে টলমল করে উঠল। ইন্দ্র মানুষের শরীর নিলেন। কিন্তু বপুষ্টমার স্পর্শ তিনি পেলেন না। অথচ অধীর ইন্দ্র, আকুল তাঁর ইন্দ্রিয়।

জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এই সময়েই। যজ্ঞশালার এক পাশে রাখা ছিল মৃত অশ্ব। আকুলেন্দ্রিয় ইন্দ্র সেই অশ্বেই প্রবিষ্ট হলেন। যজ্ঞ নষ্ট হল। নিমেষের জন্য মন ভরল, কিন্তু পর মুহূর্ত থেকেই আবেগে টনটন করে উঠল। অনেক উপায় করলেন, অনেক আরাধনা করলেন, বুক ফাটফাট হল। কিন্তু লাবণ্যের সমুদ্রের জল ইন্দ্র স্পর্শ করতে পারলেন না।

কাম অতি দুর্জয়। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা। বজ্র তাঁর অস্ত্র। এককালে বড় বড় শত সহস্র পর্বতের পাখা ছেদন করে ইন্দ্র কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। মহা পরাক্রান্ত তিনি ; কিন্তু কামের আক্রমণে মহা পরাক্রান্ত স্বর্গাধিপতি এই ইন্দ্র বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। এমন সব কাণ্ড করেছিলেন যা বলতে রসনাও কুণ্ঠিত হয়॥

৭৫. কামকবলে অগ্নি ও বায়ু

সপ্তর্ষিদের শিবা প্রভৃতি পত্নী। অগ্নি দেখলেন। লুব্ধ হলেন। কামে আতুর হলেন।

অগ্নির ধৈর্য নষ্ট হল। উন্মত্ত অগ্নি বনমধ্যে প্রবেশ করলেন।

নিবিড় অরণ্য। কৃত্তিকা নামে ছয়জন স্ত্রী অগ্নিকে শাপ থেকে রক্ষা করলেন। সপ্তর্ষিদের পত্নীর রূপ নিলেন। ছলকলায় অগ্নি ভুললেন। উত্তেজিত হলেন। অবশেষে ভেঙ্গে পড়লেন।

গরুড়রূপা কৃত্তিকা শ্বেতাচল পর্বতের নির্জন শিখরে সোনার এক কলসের মধ্যে অগ্নির রেতঃ ক্ষেপ করলেন। জন্ম নিলেন কার্তিকেয়। ছয় কৃত্তিকার পুত্র, ছয় মুখ। কার্তিকেয়ের জন্ম হল।

সপ্তর্ষির অন্যতম বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের সাধ্বী স্ত্রী অরুন্ধতী। কৃত্তিকারা ছজনের রূপ ধরেছিলেন। নিতে পারেন নি শুধু অরুন্ধতীর রূপ।

বনমধ্যে অগ্নি প্রমত্ত হয়েছিলেন। নিজপত্নী স্বাহাদেবীর সঙ্গেও বিলাসে তিনি আত্মহারা হলেন। কিন্তু মনে জেগে রইল অশান্ত অতৃপ্তি।

অগ্নি ব্রাহ্মণের রূপ নিলেন। এলেন কর্ণাটদেশে। সেখানে সুন্দরী কন্যা আছে। অতএব অগ্নি এলেন। মনোমধ্যে একটি সাপ ফণা তুলে অতন্দ্র হয়ে জেগে রইল।

অগ্নি মাহিষ্মতী পুরীতে এসে উপনীত হলেন। রাজা নীল বুঝলেন অগ্নির অভিপ্রায় কুটিল। অগ্নি বন্দী হলেন। পরিণত হলেন ভৃত্যে। অবশেষে প্রাকার থেকে নিক্ষিপ্ত হলেন। কিন্তু তাতে আরো উজ্জ্বল হলেন। সাপ আরও উদ্ধত হল।

বায়ুও কম যাননি। তিনি জগতের প্রাণ, যোগীশ্রেষ্ঠ। ঊনপঞ্চাশ রূপে বায়ু ইন্দ্রের রাজত্ব ভোগ করেছিলেন। সেই বায়ুও বিচলিত হলেন। কুশনাভের শতকন্যার অশেষ লাবণ্য দর্শন করে জগতের প্রাণ বায়ু আনচান করে উঠলেন।

রাজা কুশনাভ। একশো কন্যা তাঁর। অঙ্গে অঙ্গে তাদের অপূর্ব উচ্ছ্বাস। বায়ুর মনে নেশার রঙ লাগল। তিনি এলোমেলো বইলেন।

বায়ুর মনে ইচ্ছার তরঙ্গ উঠল। পেতে হবে, পেতে হবে। একটু ছোঁয়া পেতে হবেই। নইলে বৃথা যায় জীবন।

বায়ু ছল খোঁজেন, সুযোগ খোঁজেন। নির্জনে গিয়ে কত ছলাকলা ছড়ালেন। কিন্তু বৃথা। লজ্জায় ওরা জড়সড়। ভয়ে ওরা কম্পিত। বায়ুর ছলাকলা লুটিয়ে রইল ধুলোয়।

অবশেষে বায়ু মুখ খুললেন। মিষ্টি করে বললেনঃ আমি বায়ু। তিন ভুবনে আমার পুজো চলে। আমি দেবতা বায়ু। আমার জরা নেই। আমার মৃত্যু নেই। আমি পরম আত্মা। আমি জীবেরও আত্মা। আমার থেকেই জগৎ জাত, আমার থেকেই অমৃত উৎপন্ন। আমি তোমাদের দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কাছে এস। এস। সামান্য প্রার্থনা পূরণ কর। তোমরা কত সুন্দর। এস। তোমাদের সৌন্দর্য সার্থক হোক। এস। আমি বায়ু। তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি। ফিরিও না।

শতকন্যা আস্তে আস্তে কথা বলল। ওদের কথা লজ্জায় জড়িয়ে এল। ওরা বললঃ তুমি যেই হও যাই কর তা দিয়ে আমরা কি করব? আমরা পিতার অধীন। ইচ্ছে হল, তুমি বললে, আর আমরা নিজেদের দান করলাম এ তো হবার নয়।

বায়ু কুপিত হলেন। কুটিল গতিতে ওদের শরীরের মধ্য দিয়ে উনি প্রবাহিত হলেন। একশো কন্যার শরীর রোগে রোগে কুঁকড়ে গেল। কুব্জ হয়ে একশো শরীরী বহন করল জ্বলন্ত অসুন্দরের গ্লানি।

কিন্তু ওরা ভাগ্য করেছিল। ব্রহ্মার পুত্রের হাতে সমর্পিত হয়ে ফিরে পেল আবার পূর্বের শ্রী।

কন্যা কুব্জা এক নগরের নাম। কুশনাভ এদেরই জন্য পূর্বদেশে নির্মাণ করেছিলেন এই মহাপুরী।

অচরিতার্থ অগ্নি। অচরিতার্থ বায়ু। সন্তাপে সন্তাপে ওরা অন্ধ হয়েছিলেন। পা বাড়ালেন আরও কুটিল আরও হিংস্র আরও গহন অরণ্যের পথে॥

৭৬. কামকবলে সূর্য চন্দ্র ও মিত্রাবরুণ

সূর্যঃ দুটি চোখ, আগুনের দুটি কুণ্ড। সর্বাঙ্গে রোম, আগুনের রোম, প্রলয়ের আগুনের শিখার মত রোম।

সূর্যঃ বিরাট শ্মশ্রু। বিদ্যুৎ সেখানে বন্দী।

সূর্যঃ ব্রহ্মাও পুজো করেন। যোগীরা ধ্যান করেন।

ব্রহ্মার কন্যা সংজ্ঞা। সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা। সূর্য সংজ্ঞার রূপে মুগ্ধ। কিন্তু সংজ্ঞাকে তিনি পেলেন না। অথচ তাঁর মনে স্পর্শ পাবার কামনা।

সূর্য কথার পর কথা সাজালেন। মিষ্টি করে, আরও মিষ্টি করে কত কথা বললেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত করে কামনার কথাটি সাজিয়ে দিলেন। কিন্তু সূর্য প্রচণ্ড। সংজ্ঞা তাঁকে ছুঁতে ভরসা পেলেন না। পারলেনও না।

সূর্য বললেন ঃ তুমি যা বলবে আমি তা-ই করব।

সংজ্ঞা হাসলেন। বললেন ঃ অত তেজ! কিঞ্চিৎ কমাও। তীক্ষ্ন শানে উঠ। আমার পিতা তোমাকে তক্ষণ করবেন। তুমি শোধিত হবে, তেজও কিঞ্চিৎ কমবে। তখন আমি তোমায় ভালবাসব। কাছে যাব।

সূর্য বললেন ঃ তাই করব।

সূর্য শানে উঠলেন। ব্রহ্মা দেবতা ও অসুরের সাহায্য নিলেন। শোধিত করলেন সূর্যকে। কিন্তু হিতে হল বিপরীত। তেজ বেড়ে হল শতগুণ। সূর্যের গুঁড়ো থেকে তৈরি হল বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র। তৈরি হল আরও বহুতর দিব্য অস্ত্র।

সংজ্ঞা এবার দারুণ ভয় পেলেন। পতিকে ছেড়ে তিনি পলায়ন করলেন। অশ্বিনীর রূপ ধরে সংজ্ঞা পলায়ন করলেন। সূর্যও নাছোড়বান্দা। অশ্বের রূপ নিয়ে তিনিও ছুটলেন। জোর করে সেই অশ্বিনীকে তিনি উপভোগ করবেনই।

সূর্য কামে তখন নিতান্তই আর্ত। সংজ্ঞাও আর্ত। তিনি মিলনের পথ গোপন করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লেন। অশ্বরূপী সূর্যের প্রচুর রেতঃ পতিত হল। সংজ্ঞা নাসাপুটে গ্রহণ করলেন সেই রেতঃ। জন্ম হল রেবন্ত নামে এক পুত্রের।

কিন্তু সূর্য পরিতৃপ্ত মানতে পারলেন না। আবেদন নিবেদন করলেন। সংজ্ঞাকে বললেন ঃ এস এস।

সংজ্ঞা ছল করে নিজের ছায়া তৈরি করে সূর্যকে মোহিত করলেন। সূর্য সেই ছায়াতেই উপগত হলেন। সংজ্ঞা এই অবসরে সরে পড়লেন। ছায়ার সঙ্গে সূর্যের সংসর্গ নিস্ফল হল না। জন্ম হল যমের, জন্ম হল যমুনার।

ওদিকে সূর্য আহূত হলেন। কুন্তীনামে এক কন্যা তাঁর সংসর্গ প্রার্থনা করলেন। সূর্য কুন্তীকে কবচকুণ্ডলধারী এক পুত্র দান করলেন।

চন্দ্র ঃ সমুদ্রমন্হনে চন্দ্র উঠেছিলেন। অনসূয়ার পুত্র রূপেও তিনি জন্ম নিয়েছিলেন।

চন্দ্র ঃ সুন্দর, স্নিগ্ধ। বলে বীর্যে অতুল। নরনারী, ওষধি ও ব্রাহ্মণদের উপর তাঁর আধিপত্য। রাজসূয় যজ্ঞ! চন্দ্র তাও করেছিলেন। পত্নীরূপে লাভ করেছিলেন অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্রকে। চন্দ্র আহ্লাদে বিগলিত হলেন। কিন্তু কামের কবলে পড়ে চন্দ্রের মনে ঘোর নামল। চন্দ্র রোহিণীর প্রতি বড় বেশি আসক্ত হয়ে পড়লেন। দক্ষ শাপ দিলেন। চন্দ্রের হল রাজযক্ষ্মা। কৃষ্ণপক্ষ আসে। চন্দ্র ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকেন।

চন্দ্রের কামনা কিন্তু বেড়েই চলল। বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করলেন। তৃপ্তি এল না। চন্দ্র তারার জন্য যুদ্ধ করলেন। তারাকে ত্যাগও

করলেন। তারার গর্ভে জন্ম হল বুধের। চন্দ্রের সঙ্গ করাতেই তারার গর্ভে বুধের উৎপত্তি। চন্দ্র বুধকে গ্রহণ করলেন।

নারায়ণের ঊরু থেকে জন্ম। ইন্দ্রের আজ্ঞায় চলেন ফেরেন। নাম উর্বশী। প্রচণ্ড সুন্দরী।

তপস্যার তেজে বিখ্যাত মিত্রাবরুণ। ওঁরা উর্বশীকে দেখলেন। তপস্যার তেজ ও শক্তি ভেসে গেল। মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হল। পরে মিত্র ও বরুণ উভয়েই জলভরা কলসের মধ্যে রেতঃ নিক্ষেপ করলেন। জন্ম হল বশিষ্ঠের। জন্ম হল অগস্ত্যের।

দেবতাদের সবাই বিপুল শক্তি ধরেন। অদ্ভুত ও আশ্চর্য তাঁদের ক্ষমতা। কিন্তু কামের কবলে পতিত হয়ে সবাই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসেন।

কাম দুর্জয়। মনে মনে তাঁর বাস। মনে মনে তাঁর আধিপত্য॥

৭৭. বেদনার্ত ঋষিসমাজ

কাম দুর্জয়। কাম দুর্বার। কামের বাণ ছোট। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। মর্ম বিদ্ধ করে ক্ষান্তি মানে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেউ ত্রাণ পাননি। মুনি ঋষিদের যোগের শক্তি। তাও গেছে ভেসে। ওঁরাও ত্রাণ পাননি। বেদনায় বেদনায় আর্ত হয়েছেন। অবশেষে এ পথে ও পথে কিংবা সে 'পথে তাঁদের দুরন্ত আবেগ পথ করে নিয়েছে। স্বস্তি এসেছে। এসেছে, কিন্তু গুণে দিতে হয়েছে অনেক মাশুল।

ব্রহ্মা। দক্ষ। নারদ। বৈরাগ্যে বৈরাগ্যে, ধৈর্যে ধৈর্যে, শাস্ত্রের শাসনে শাসনে নিয়ন্ত্রিত তাঁদের মন। কিন্তু ওঁরাও একদা বিচলিত হলেন। বিদ্যুৎ পর্ণার রূপে ওঁদের মন জ্বলে উঠল। আসক্তি নেই একরত্তি, কাম নেই ছিঁটে ফোঁটা। এমন মেয়ে বিদ্যুৎপর্ণা। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মা অস্থির হলেন, দক্ষ অস্থির হলেন. নারদও সমস্ত শান্তি বিসর্জন দিয়ে মনে মনে জ্বলতে থাকলেন। বিদ্যুৎপর্ণা প্রমাদ গণলেন। কপিলা গোরুর চেহারা নিয়ে পলায়ন করলেন। অসহ্য হলকায় প্রজ্বলিত আগুনের পিণ্ড ছুটে আসছে তাঁকে লেহন করতে। তিনি পলায়ন করলেন।

বিদ্যুৎপর্ণার অভিশম্পাত বর্ষিত হল। ব্রহ্মা বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা এক অশ্বার অনুগমন করলেন। কিন্তু প্রশমিত হলেন না। নিজের কন্যা। সরস্বতী। ব্রহ্মা সরস্বতীকেই অবলম্বন করলেন। পালে পালে সৃষ্ট হল প্রজা। কখনো শুধু মন কাজ করল। কখনো শুধু শরীর চলল। কখনো মাত্র এতটুকু ছোঁয়া। কাতারে কাতারে বেড়ে চলল প্রজা।

মরীচির পুত্র কশ্যপ। দক্ষ তাঁকে উপঢৌকন দিলেন তেরটি কন্যা। বাণ বিদ্ধ কশ্যপ। তেরটি কন্যার গর্ভে জন্ম নিল বহুতর প্রজা।

অগস্ত্য এক মহাযোগীর নাম। অগস্ত্য সমুদ্র পান করেছিলেন। অগস্ত্য বিন্ধ্য পর্বতের সমুচ্চ দর্প নাশ করেছিলেন। অগস্ত্য বাতাপি নামক এক দৈত্যকে ভক্ষণ করেছিলেন। যোগে যোগে মুনি অগস্ত্য অনন্য হয়েছিলেন। অহরহ তাঁর অঙ্গ থেকে বিকীর্ণ হত প্রলয়ের আগুনের মত প্রচন্ড তেজ। সেই তিনিও সেই মহান অগস্ত্যও বনলেন ভৃত্য। পত্নীর ভৃত্য। লোপামুদ্রার ভৃত্য।

মুনি শমীক। ব্রহ্মচর্য ব্রত তাঁর। তপ করেন, জপ করেন, ব্রত করেন। মুনি শমীক। একদা আকাশ থেকে বাতাসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ধ্বনিত হল ঃ ওগো প্রিয়তম, এস। তোমাকে আমি ভালবাসি। পেতে চাই। আমাকে নাও।

যেন মধু ধ্বনিত হল। শমীকের মন দুলে উঠল। ভাবলেন ঃ আহা আহা! এ মধু নারীকণ্ঠেরই নির্ঘাৎ। শমীকের রেতঃ স্খলিত হল। স্খলিত হল শুকনো ঘাসের উপর। সেখান থেকে চালিত হল সেই রমণীতে। পুত্র জন্মাল। ষাঁড়ের মত মুখ, মাথায় শিঙ, রাগে নিত্য আত্মহারা। পুত্র জন্মাল। কুরুপতি পরীক্ষিৎ ভস্ম হয়েছিলেন। ভস্ম করেছিলেন শমীকেরই এই পুত্র।

ভৃগুকুলের আকাশে যেন পূর্ণিমার একখানি চাঁদ। তপস্বী রুরু। রুরু প্রমদ্বরাকে লাভ করলেন। কিন্তু বিধি বাম। সাপের বিষে প্রমদ্বরার মৃত্যু হল। বাঁশী ভেঙ্গে গেল। মিলনের সুর খেলা করে করে ফিরবে। কিন্তু বাঁশী ভেঙ্গে গেল। রুরু যন্ত্রণায় জরজর হলেন। জীবনে আর কি প্রয়োজন! রুরু জীবন রাখতে চাইলেন না। পাগলের মত তিনি বনে প্রবেশ করলেন।

অকস্মাৎ রুরু চমকিত হলেন। দেবতা কথা বলছেন। রুরু শুনলেন দৈববাণী ঃ নিজের আয়ুর অর্ধেক দিলে প্রমদ্বরা বেঁচে উঠবে।

রুরু আরও চমকিত হলেন। দ্বিধা নয়, সংশয়ও নয়। সেই দণ্ডেই রুরু সম্মত হলেন। প্রমদ্বরা বেঁচে উঠলেন। রুরু আহ্লাদে নেচে উঠলেন। কিসের আনন্দে তা জানেন একমাত্র কামদেব।

ঋষি চ্যবনও বিখ্যাত ভুবনে। নাকের ডগায় দৃষ্টি স্থির রেখে উনি নিয়ত ধ্যান করেন, যোগ করেন। ধীরে ধীরে তাঁর শরীরের চারি ধারে উঁইয়ের ঢিপি উঠল। চ্যবন উঁইঢিপির মধ্যে বিলীন হলেন। একদা বর্ষাকালে প্রচুর বর্ষণে সেই মাটি গলে গলে পড়ছিল। চ্যবন দেখলেন দুটি মুগ্ধ চোখ মেলে কে এক কুমারী তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শর্যাতির কন্যা সুকন্যা। সুকন্যা চ্যবনের দুটি চোখে বৈদুর্যমণি দেখেছিলেন। ও দুটি ওঁর চাই। ঋষি চ্যবন দেখলেন মুগ্ধ চোখের চাহনি। ঋষি। সম্মুখে কুমারীকন্যা। ঋষি আসন ছেড়ে এগিয়ে গেলেন। রাজা তাঁর দুটি চোখ উপড়ে নিলেন। দান করলেন কন্যাকে।

চ্যবন চোখ ফিরে পেয়েছিলেন। যৌবনও পেয়েছিলেন। সুকন্যার সঙ্গে প্রমোদে রত হবার সুযোগও পেয়েছিলেন। এবং পেয়েছিলেন অশ্বিনীকুমারের প্রসাদে।

ক্ষীরোদ সমুদ্রের জলে থাকেন, যোগ করেন। যোগে যোগে শরীর কৃশ হয়েছে। যোগে যোগে শরীরে রয়েছে শুধু স্নায়ু শুধু অস্থি। এই পরম যোগীর নাম গরুড়। পাখিদের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানে জ্ঞানে আলোকিত এঁর অন্তর। আলোয় ওঁর সর্ব অঙ্গে প্রশান্তির অপূর্ব শ্রী। কূর্মের মত অপরূপ গ্রীবা। ছোট হয়ে আসে, বড় হয়, আবার ইচ্ছামত ছোট হয়। অপরূপ এঁর গ্রীবা। ইনি গরুড়। পত্নী মৎসী।

মৎসীর সঙ্গে অগণিত মৎস্য। খুশিতে সবাই উজ্জ্বল। গরুড় দেখলেন। ওঁর মনে বাসনার জন্ম হল। কুমারীকন্যার এতটুকু ছোঁয়া পাবার জন্য গরুড়ের মন কাঙাল হল। উনি জল ছেড়ে উঠলেন। সুধন্বার পুরে এসে উপনীত হলেন।

ঋষি এসেছেন দ্বারে। বিধেয় পূজা। সুধন্বা ঋষিকে পূজা করলেন। আপ্যায়িত হয়ে ঋষি উপবেশন করলেন। সুধন্বা বললেন: আমার অশেষ সৌভাগ্য। তাই আপনি এসেছেন। কিছু কি প্রয়োজন আছে? ব্যক্ত করুন তবে।

গরুড় আহ্লাদে ভাসলেন। বিগলিত হয়ে বললেন: আমার পিতা কশ্যপ। মাতা বিনতা। এসেছি ভিক্ষা নিতে। যদি তোমার কন্যা থাকে কোন তাহলে আমি প্রার্থী। এই মাত্র ভিক্ষা।

সুধন্বা গরুড়ের শরীরের উপর একবার চোখ বুলিয়ে দমে গেলেন। ঋষি। প্রত্যাখ্যানে নির্ঘাৎ শাপশাপান্ত করবেন। সুধন্বা ভয়ে কাতর হলেন। কিন্তু বুদ্ধি হারালেন না। বললেন: পঞ্চাশটি কন্যা আমার আছে। তারা অপরূপা। আমি পিতা বটে। কিন্তু তাদের মনেব উপর আমার কোন হাত নেই। তারা যাকে খুশি হয়ে বরণ করবে তারই হাতে তাদের তুলে দেব। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি বরং অন্তঃপুরে যান। কোন কন্যা যদি আপনাকে বরণ কবে তবে অবশ্যই তাকে আপনি পাবেন।

মহাযোগী গরুড়। যোগের বলে হলেন অনিন্দ্যসুন্দর। অতঃপর প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে। সুধন্বার কন্যারা দেখল, মুগ্ধ হল, অস্থির হল, আত্ম-সমর্পণ করল।

সুধন্বা কথা রাখলেন। বিবাহ হল। বিবাহের সময় শুক্র প্রভৃতি তাবৎ গ্রহ স্বক্ষেত্রে উচ্চস্থানে ও ত্রিকোণে থেকে লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে ও দশমে প্রসন্ন আলো ফেললেন। সুখ ও আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। প্রমোদে ভরে গরুড় উড়ে চললেন।

আর একজনকে দেখে আর একবার গরুড় চঞ্চল হয়েছিলেন। তিনি

বৈশ্বানরের কন্যা শাণ্ডিলী। শাণ্ডিলীর তখন উঠতি বয়েস। তিনি হাসেন, মুক্তো ঝরে সে হাসিতে। তিনি হাসেন, ঝর্ণার গান ভেঙ্গে পড়ে সে হাসিতে।

গরুড়ের সাধ হল। শাণ্ডিলী থাকেন হিমালয়ের গুহায়। গরুড় শাণ্ডিলীকে স্বর্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। শাণ্ডিলী গরুড়ের মন জেনে রুষ্ট হলেন। গরুড়ের ডানা পুড়ে ছাই হল। পরে কি কারণে হয়ত শাণ্ডিলীর মন বিগলিত হল। গরুড়ের পোড়া ডানা হল সোনার ডানা।

মুনি বিভাণ্ডকের মনও একদা বিকল হয়েছিল। উনি মুনি। তপস্যা করেন। মুখে লম্বা দাড়ি। মাথায় জটার ভার। হাতে পায়ে বড় বড় ধারালো নখ। শরীর নুয়ে পড়েছে। ক্ষুধায় পিপাসায় তপস্যার তাপে জীর্ণ শরীর। কিন্তু ঐ শরীর বেদনায় বিকল হল।

বিভাণ্ডক নদীতে স্নানে নেমেছেন। দূরে এক রমণী। রমণী তরুণী। শরীরে টলটল করছে লাবণ্য। দূরে থেকে বিভাণ্ডক তাকে দেখলেন। দেখা-মাত্রই মুনির তপস্যা ভেসে গেল। নদীর জলে মিশল ক্ষরিত শুক্র। মুনির শুক্র স্রোতের জলে ভেসে গেল। তারপর অপরূপ এক যোগাযোগ। এক মৃগী। পিপাসায় বুক ফাটছিল। নদীতে এসে নামল। জলে ভেসে আসছিল মুনির রেতঃ। মৃগী পান করল সেই জল। মৃগীর গর্ভে বিভাণ্ডকের এক পুত্র হল। মাথায় তার শিঙ। নাম ঋষ্যশৃঙ্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার কাছে থেকে বেদ পড়েন, ব্রহ্মচারীর ব্রত আচরণ করেন। পিতার সঙ্গেই থাকেন নিত্য। সংযত আহার, শাস্ত্রচর্চা, ব্রতপালন। নারীর রমণীয়তা সম্পর্কে ঋষ্যশৃঙ্গ সম্পূর্ণ আঁধারেই থেকে গিয়েছিলেন। লোম-পাদের রাজ্যে বৃষ্টি নেই। সব যায় যায়। ঋষ্যশৃঙ্গ এলে অনাবৃষ্টির অভিশাপ নাকি কাটবে। গণিকারা ছলাকলা ছড়িয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে এল লোমপাদের রাজ্যে। শোনা যায় মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ সেই গণিকাদের পূজায় তনুমন ও প্রাণ সঁপেছিলেন।

নিষ্ঠাবান গোতম। যোগে নিষ্ঠা, ধ্যানে নিষ্ঠা। দোষেভরা সংসার। মুনি গোতম সে সব ক্ষয় করেছিলেন। গোতম বনে থাকেন, যোগ করেন, ধ্যান করেন। অসংযম কাকে বলে গোতম তা একেবারে ভুলেছিলেন। তপস্যায় তপস্যায় ধীরে ধীরে দারুণ শক্তি পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। মুনি গোতম দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। মুনি গোতম প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ইন্দ্রের অন্তরাত্মা কেঁপে গেল। তিনি ছল খুঁজলেন। তপস্যা মাটি করতে হবে। করতে হবে। চিন্তায় কাতর হয়ে নতুন কোন ছল খুঁজে পেলেন না। অবশেষে এক অপ্সরাকেই নিয়োগ করলেন।

তখন বসন্ত। গোতমের আশ্রমের বাতাসে যেন কার ব্যাকুলতা। গাছে গাছে ফুল। গাছে গাছে ফুটে উঠার বেদনা।

এই বসন্ত সময়ে গৌতমের আশ্রমে এসে হাজির হলেন এক অপ্সরা। বসন্তের বাতাসে অপ্সরার বস্ত্র উড়ে গেল। উড়তে উড়তে গিয়ে পড়ল গৌতমেরই সামনে। বসন্তের বাতাস অপ্সরার নগ্ন অঙ্গে রেখে গেল সোহাগের অজস্র স্পর্শ। অপ্সরা ছুটতে থাকলেন। কাপড় উড়ছে। বসন্ত বাতাসে আকুলিত অপ্সরাও ছুটছেন!

সম্মুখে একখণ্ড বস্ত্র এসে উড়ে পড়ল। গৌতম দেখলেন। গৌতম আরো দেখলেন।

মুনি! এতকালের সংযম! কিন্তু ভেসে গেল। বসন্তের সেই ব্যাকুল প্রহরে মুনি গৌতমের ইন্দ্রিয়গ্রামে ঝংকার উঠল। গৌতমের সংযম বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে গেল। অপ্সরার ব্যাকুলতাও ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে হতে অবশেষে একেবারে স্তিমিত হয়ে এল। পরিতৃপ্ত গৌতমও। গৌতমের রেতঃ এক দ্রোণীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। জন্ম হয়েছিল বিখ্যাত দ্রোণাচার্যের।

কাম দুর্জয়। কাম দুর্বার। বারবার জনেজনে কামের জয় ঘোষিত হয়েছে। মনে মনে তাঁর বাস। মনে মনে অযুত ব্যথা জাগিয়ে অযুত আনন্দ এবং অযুত বিষণ্ণতার জন্ম দিয়েই এঁর শান্তি ॥

৭৮. অমৃত ধারা

অবশেষে অমৃতের ধারা নেমে এল। কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে গেল। অবশেষে অমৃতের ধারা নেমে এল।

মানী ঋষি। ক্রুর ঋষি। নাম রৈভ্য। তদীয় তনয় পরাবসু।

মহামুনি ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজের পুত্র যবক্রীত।

একদা যবক্রীত সংযম হারিয়েছিলেন। গহন বন। সেখানে গেছেন যবক্রীত। সেখানে গিয়ে পড়েছেন পরাবসুর তরুণী পত্নী। যবক্রীত মুগ্ধ হলেন। আচ্ছন্ন হলেন। সংযম ভুললেন। প্রার্থনা জানালেন। পরস্ত্রীকে হতে বললেন নিজের স্ত্রী।

রৈভ্য রেগে খুন হলেন। মাথার জটা কেটে আগুনে আহুতি দিলেন। তৈরি হল এক কৃত্যা। কৃত্যার প্রতি রৈভ্যের আদেশ ধ্বনিত হলঃ যবক্রীতকে গ্রাস কর।

কৃত্যা ছুটল। সাজ নিল পরাবসুর পত্নীর। যবক্রীত ছিলেন অগ্নিশালায়। দেখলেন সম্মুখে পরাবসুর স্ত্রী। কণ্ঠে তাঁর আহ্বানঃ এস। এই তো অবসর।

যবক্রীত ভুললেন। আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন। তিনি ছুটলেন।

আবার সেই গহন বন।

অকস্মাৎ যবক্রীত চমকিত হলেন। কোথায় গেল সেই চাঁদ। সম্মুখে এক রাক্ষস। হাতে শূল। বিজন সেই বনে যবক্রীত নিহত হলেন।

বৃদ্ধ ভরদ্বাজ পুত্রের দেখা পেলেন। পুত্র পড়ে আছে। । ভরদ্বাজ যেন বরফ স্পর্শ করলেন। শরীর রক্তে ভেসেছিল। তরল রক্ত এখন জমাট বেঁধেছে। লাল হয়েছে কালো।

ভরদ্বাজ সব বুঝলেন। রৈভ্য তাঁর মিত্র। সেই রৈভ্য করেছেন এই কাজ। ভরদ্বাজ রাগে শোক ভুললেন। রৈভ্যকে ডেকে এনে পুত্রের নিস্পন্দ শরীরটাকে দেখালেন। বললেন: তোমারও মৃত্যু হবে, আর হবে নিজেরই পুত্রের হাতে।

রাগ প্রকাশের পথ পেল। এবার শোকের পালা। ভরদ্বাজ আগুন জ্বাললেন। পুত্রের সৎকার করলেন। চিতার আগুন তখনো লকলক করছিল। শোকার্ত ভরদ্বাজ প্রবেশ করলেন সেই অগ্নিতে। দুটি দেহ পুড়ে ছাই হল।

বনভূমিতে সন্ধ্যা নেমে আসছে। পরাবসু ফিরছিলেন। রাজার যজ্ঞ সেরে তিনি গৃহে ফিরছিলেন। পরাবসুর মন সেদিন অশান্ত। রাগে গরগর করতে করতে বনের পথে পরাবসু গৃহে ফিরছিলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রৈভ্য ছিলেন গিরিতটে। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। জঙ্গলাকীর্ণ গিরিতট। রৈভ্য ফিরছিলেন। কৃষ্ণসারের চর্মে শরীর ঢেকে রৈভ্য ফিরছিলেন।

পরাবসু ফিরছিলেন। রৈভ্য ফিরছিলেন। পরাবসু দেখলেন মৃগ। বাণে বিদ্ধ করলেন। বনভূমিতে তখন গাঢ় অন্ধকার। পরাবসু ছুটে এলেন। আগুনে দগ্ধ করবেন নিহত মৃগটিকে। আগুন জ্বলল। এবার আগুনে চড়াবার পালা। পরাবসু দেখলেন কৃষ্ণসারের চর্মে আবৃত পিতাকে। পরাবসু নিথর হলেন। স্তম্ভিত হলেন। ভীত হলেন। ওদিকে আগুন জ্বলছে। পরাবসু পিতার শরীর ভস্মীভূত করলেন।

পিতাকে বধ করেছেন। মহা পাপের কাজ করেছেন। পরাবসু অশান্ত, অনুতপ্ত। এবার বাকি প্রায়শ্চিত্ত।

পরের দিন প্রভাত বেলায় পরাবসু যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করলেন। ভাইকে বললেন: ভুল করে পিতাকে হনন করেছি। তুমি বললে আমি যেতে পারি। গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করি। নামিয়ে আসি পাপের ভার।

পরাবসু অবাক হয়ে শুনলেন। তাঁর ভাই বলছেন: তুমি যজ্ঞ করছিলে, তুমি যজ্ঞই কর। আমি যাই।

পরাবসুর ভ্রাতা বনে গমন করলেন। তপে তপে ব্রহ্ম হত্যার পাপ বিধৌত হল। অবশেষে ফেরার পথে পা বাড়ালেন।

এদিকে যজ্ঞ চলছে। দক্ষিণাদানের সময় হয়েছে। পরাবসুর ভ্রাতা প্রবেশ

করলেন যজ্ঞভূমিতে।

পরাবসু পরিবর্তিত হয়েছেন। বিচিত্র পলিতে আবৃত হয়েছে পরাবসুর চিত্ত। ভ্রাতাকে দেখে তিনি ফুঁসে উঠলেন, তেড়ে এলেন। বললেনঃ পিতাকে হত্যা করেছ। পাপী তুমি। যজ্ঞ ভূমিতে কেন? যাও দূর হও।
পরাবসুর কথায় তাঁর ভ্রাতা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মাথাটা যেন ঘুরে উঠল তাঁর।

মুনির শ্রান্ত পুত্রকে নিয়ে রাজপুরুষেরা বধ করতে উদ্যত হল। বিমূঢ় মুনিপুত্র অগ্নি, ইন্দ্র ও যমকে স্মরণ করলেন। বলতে লাগলেনঃ বধ করুন আমাকে। আমি যদি পিতাকে হত্যা করে থাকি তবে তাই করুন। কিন্তু যদি না করে থাকি, যদি হোমে দানে গুরুসেবায় কোনদিন তনুমন সঁপে থাকি তবে অমৃতের ধারা নেমে আসুক। ওঁরা জীবিত হয়ে উঠুন।

কোথা দিয়ে কি হল কেউ জানল না। ভরদ্বাজ জীবিত হলেন। যবক্রীত জীবিত হলেন, রৈভ্য জীবিত হলেন। দেবতার প্রসন্নতায় অমৃতের ধারা নেমে এল। ওঁরা নতুন এক প্রাতে যেন জেগে উঠলেন॥

৭৯. কামসন্তাপ

সূর্য এলেন মরলোকে। ব্রহ্মা বলেছেন। সূর্য জন্ম নিলেন। মরলোকে রাজার জন্ম। সূর্য হলেন বসুরাজা। আকাশে তিনি বিচরণ করেন। সিংহ ব্যাঘ্র, তস্কর ও তাবৎ দুষ্টলোককে তিনি নিয়ত সংহার করেন। রথে রথে আকাশে তিনি বিচরণ করেন। সদা হাতে থাকে শ্যেনপক্ষী।

রাজা থাকেন আকাশে। দূরে। পৃথিবী থেকে বহু দূরে। রাজা থাকেন রথে। ঘোরেন আকাশে আকাশে।

বসন্ত এল। স্ত্রীরা দূরে, অনেক দূরে। বসন্তে রাজা অস্থির হলেন। রাজার রেতঃ স্খলিত হল। পলাশের পাতায় সেই রেতঃ রাজা ধরে রাখলেন। রাজা পুত্র চান। পলাশের পাতায় ধরা শুক্রের আঘ্রাণেই স্ত্রীদের গর্ভ হতে পারে। রাজা শ্যেনকে পাঠালেন অযোধ্যায় সেখানে থাকেন রাণীরা।

পলাশের পাতায় ধরা শুক্র। শ্যেনের মুখে ধরা সেই পত্রপুট। শ্যেন ছুটে চলল। রাজার দূত বাতাস কেটে ছুটে চলেছে।

শ্যেন চলেছে। চঞ্চুতে তার সেই পত্রপুট। অন্য এক শ্যেন দেখল। ভাবল বুঝি বা মাংস। কেড়ে নিতে চাইল। এও কম যায় না। কাড়াকাড়ি, মারামারি। মাত্র পাতার আবরণ। পাতা ছিঁড়ল। রেতঃ পতিত হল জলে। রেতঃ ভেসে গেল জলে।

স্বর্গের রমণী গিরিকা। ব্রহ্মশাপে তিনি হয়েছেন মৎস্য। রেতঃ ভেসে গেল জলে। অবশেষে বিশ্রাম রচিত হল এই মৎস্যের গর্ভে। মৎস্যের গর্ভ হল।

একদা জালে পড়ল এই মৎস্য। এল দাশরাজের গৃহে। কোটা হল। মৎস্যের গর্ভ থেকে বেরুল এক পুত্র এবং এক কন্যা।

দাশরাজা এলেন বসু রাজার কাছে। তিনি এসেছেন কর দিতে। রাজা কর পেলেন। বিচিত্র কর: এক সুন্দর কুমার। বিধাতার চক্র। বসু রাজা পেলেন কর। কর পেলেন নিজের পুত্রকেই। রাজা আনন্দে বিগলিত হলেন। পুত্রকে অভিষিক্ত করলেন সিংহাসনে।

কন্যাটি বাড়তে থাকল দাশরাজার ঘরে। কন্যার অঙ্গে নীল পদ্মের বর্ণ। ইনিই যমুনা নদী। ইনিই পরে মানুষের রূপ নিয়ে ছিলেন। সত্যবতী নামে দাশরাজার ঘরে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলেন। পরাশরের জন্য সত্যবতী বেড়ে উঠছিলেন। সে আর এক কাহিনী:

একদা পরাশর যমুনার তীরে এসে দাঁড়ালেন। যমুনার নীল জল তাঁর মনে মায়া বিছাল। ইচ্ছার বহু বর্ণে পরাশরের মন রঞ্জিত হল। ভাবলেন: যমুনা যদি যুবতী হত তাহলে তিনি তার সঙ্গে খেলা করতেন।

মুনি পরাশর। তাঁর মনে জেগেছে ইচ্ছা। ইন্দ্র বুঝলেন। নদীকে বললেন: মুনি চাইছেন। ওঁর ইচ্ছা পূরণ কর।

যমুনা সম্মত হলেন। তারপরই তিনি প্রবেশ করলেন মৎস্যের উদরে। তারপরই ভূমিষ্ঠ হলেন দাশরাজের গৃহে। নদী হল নারী। যমুনা হলেন সত্যবতী।

দাশরাজের কন্যা সত্যবতী। পিতার ইচ্ছায় সত্যবতী যমুনার জলে নৌকা বেয়ে বেয়ে নিত্য ক্লান্ত হন। এই সময়েই একদিন পরাশর সত্যবতীকে দেখেন। দেখামাত্রই মুনি মুগ্ধ হলেন। বর দিলেন শতশত। সত্যবতীর শরীরে নামল স্বর্গের সৌরভ। সত্যবতী পেলেন চিরকন্যাত্ব।

কিন্তু পরাশরের মনে বিস্তারিত হয়েছে কামসন্তাপ। নীহারে নীহারে রচিত হল এক মন্দির। সেখানেই পরাশর সত্যবতীকে পেলেন। সেখানেই পরাশরের সাধ পূরল। সত্যবতী পূরণ করলেন। অতঃপর সত্যবতী জন্ম দিলেন ব্যাসদেবের।

ক্ষত্রিয়কুলে ব্যাসদেবের এক ভ্রাতা ছিল। তার উপর মৃত্যু অকরুণ হয়েছিলেন। নিঃসন্তানই রয়ে গেলেন ব্যাসভ্রাতার পত্নী। ব্যাসদেব অনুগ্রহ করলেন। জন্ম হল ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ তিন পুত্রের। ব্যাস ও অগ্নি। অরণী মন্থন করলেন। জন্ম হল শুকের।

নাম বামশিরা। মুনি। গলায় মুণ্ডের মালা। বামশিরা ছুটছেন। তিনি

যাবেন পাতালে। সেখানে আছে এক অপূর্ব খড়্গ। বামশিরা সেই খড়্গ হরণ করবেন। একবার যদি হাতে ধরেন সেই খড়্গ তাহলে মুনি বামশিরা হবেন বিদ্যাধরদের রাজা।

বামশিরা জপ করলেন, হোম কবলেন, সমাধি করলেন। পঞ্চরঙ্গ সূত্র, খাদির শঙ্কু শর ও মন্ত্রতন্ত্রে পাতাল পুড়তে থাকল। নাগগণ পুড়তে থাকল। নাগগণ ছুটে এল খড়্গ হাতে। তারা ত্রাণ চায়। মুনির হাতে তারা খড়্গ তুলে দিল।

বামশিরা খড়্গ পেলেন। কিন্তু রাখতে পারলেন না। সম্মুখে দেখলেন এক অপরূপাকে। সম্মুখে দেখলেন অনাবৃত মূর্ত সমচ্ছ এক যৌবন।

বামশিরার শিরায় শিরায় রক্ত নেচে উঠল। নেচে নেচে পাগল হল। বামশিরা ভাবলেনঃ খড়্গ অসার। কি হবে এ দিয়ে? সুন্দরের ঐ সমুদ্রে আচমন করাই শ্রেয়।

হোম অসম্পূর্ণ রইল। আহুতিদানের মন্ত্র গেল থেমে।

বামশিরা জ্বলন্ত সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। সন্তরণে সন্তরণে অযুত উল্লাস অযুত হাস্য বিগলিত হল।

সর্পগণ নিরাপদ হল। এবার শোধ তুলবার পালা। সর্পপত্নীরা বারণ করল শতবার। কিন্তু মানা শোনার ধৈর্য সর্পদের ছিল না। তারা মুনি বামশিরাকে পুড়িয়ে শেষ করল।

কত শত অঘটন। সবের পশ্চাতে কামদেবের হাসি। চরিতার্থতার হাসি।

বিশ্বামিত্র বিশ্ববিখ্যাত। বশিষ্ঠের অমেয় ঐশ্বর্য। তীব্র ঈর্ষায় বিশ্বামিত্র জ্বললেন। ব্রাহ্মণের এত শক্তি! বিশ্বামিত্রের জিদ চাপলঃ তিনিও হবেন ব্রাহ্মণ। তাঁর তপস্যায় দেবতারাও ভীত হলেন। তপে তপে বিশ্বামিত্রের শরীরে কিছু রইল না। মনে হত চর্মাবৃত নরকঙ্কাল। এই বিখ্যাত বিশ্বামিত্রও একদিন মেনকার রূপের জালে জড়িয়ে পড়লেন।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ ছিল দুর্জেয়। তাবৎ দৈত্যদানব হার মেনেছিল। এমনকি দেবতারাও এঁটে উঠতে পারেননি। কিন্তু কামদেবের মায়ায় চণ্ডিকাকে দর্শন করে দুর্ধর্ষ শুম্ভ ও নিশুম্ভ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে নিহত হল।

শুম্ভ ও নিশুম্ভের পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। ওদেরও হয়েছিল ঐ একই হাল। তিলোত্তমাকে দেখে ওরা ভিরমি খেল। তারপর সুন্দ তেড়ে এল উপসুন্দকে। বললঃ এ আমার, তোমার নয়। উপসুন্দ তেড়ে এল সুন্দকে। বললঃ খবরদার, ছুঁয়েছ কি মরেছ। আমার জিনিস নিয়ে টানাটানি কর না। কথা কাটাকাটি। মারামারি। ওরাও মরল।

দণ্ডকারণ্যের এক রাজা। নাম ঐক্ষ্বাক। ইন্দ্রলোক হার মানে। ঐক্ষ্বাকের রাজ্য এমনই। কিন্তু কামের বশ্য হয়েই তাঁকে বিনষ্ট হতে হল একেবারে।

শুক্রাচার্যের প্রিয় কন্যা। সূর্যপ্রভা। ঐক্ষ্বাক ঐ কন্যাকে বশ করলেন, ভোগ করলেন। শুক্রাচার্যের রাগ আগুন হল। ঐক্ষ্বাকের রাজ্য পুড়ল, ঐক্ষ্বাকও পুড়লেন সেই সঙ্গে। জ্বলে জ্বলে সমস্ত কিছু ছাই হল। সাতদিন ধরে বর্ষিত হল পাংশু।

শত শত অঘটন। সবার পশ্চাতেই কামদেবের হাসি। চরিতার্থতার হাসি।।

৮০. রাবণ ও কুম্ভকর্ণ

মাতা পুষ্পোৎকটা। পিতা মুনি বিশ্রবা। পুত্র রাবণ। জগজ্জয়ী পরাক্রান্ত রাবণ।

দশমুখ, বিশ হাত, চার চরণ। রাবণের আকার বিচিত্র। ভীষণ।

জগৎ তাঁর বশ মেনেছিল। ইন্দ্র বন্দী হয়েছিলেন তাঁর কারাগারে। রাবণের পরাক্রম ভীষণ।

পক্ষিজীবী ব্যাধ। সহায় শ্যেন। শত শত পাখিতে শিকারের ঝুলি ভর্তি হয়। ব্যাধের কাছে শ্যেন। রাবণের কাছে পুত্র মেঘনাদ। মহাবলী মেঘনাদ। রাবণের সহায়। রাবণ ত্রৈলোক্যের রাজা হলেন। স্বর্গের বহু বহু লাবণ্যের বিগ্রহকে লাভ করলেন। স্বর্গ লুণ্ঠনে মেঘনাদ সহায়। লাভঃ দেবপত্নী।

রাবণের পত্নী ছিল। নাম মন্দোদরী। ময় দানবের কন্যা মন্দোদরী। কিন্তু পরপত্নীতেই রাবণ উৎসাহী ছিলেন সমধিক। কামমোহে ভীষণ অসহায়।

কামদেব ভস্মীভূত হলেন। রতি নতুন জন্ম নিলেন। ময়ের ঘর আলো করে জন্ম নিল এক আলোর প্রতিমা, আর সেই আলোয় ভুলল শম্বরাসুর। রতিকে শম্বর হরণ করল।

কিন্তু রতি মায়া জানেন। মায়ায় গড়লেন রতিরূপিণী কাঠের এক প্রতিমা। যোগের বলে কাঠের প্রতিমা নড়ল চড়ল, ছল ছড়িয়ে কথা বলল, লাস্য বিছিয়ে নাচল। শম্বরাসুর মোহে গদগদ হলেন।

রাবণ এই কন্যাকে দেখলেন। ভাবলেন এ নির্ঘাৎ মায়াবতী। তাঁর চোখে কামনার একটি সাপ চকচক করে উঠল। রাবণ উতলা হলেন। হরণই লাভের পথ—রাবণ চিন্তা করলেন।

পাতালে শম্বরের গৃহ। বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছেন। রত্নে রত্নে ঝলমলানো অনিন্দ্য এক গৃহ। স্বর্গও হার মানে। স্বর্গের চেয়ে শম্বরের গৃহে সুখ নাকি আটগুণ বেশি। লুব্ধ রাবণ পাতালে প্রবেশ করলেন।

পাতালমধ্যে শম্বরের পুর। ময়ের মায়াঘেরা সেই পুর। রাবণ প্রবেশ করলেন। ঘোর মায়ায় রাবণ হাবুডুবু খেতে লাগলেন। বজ্র গুলে লেপন করে নির্মিত হয়েছে সেই মার্গ! রাবণ সেই মার্গ মধ্যে পড়ে বিদীর্ণ হতে থাকলেন। বিগলিত বজ্রে কাদা হয়েছে। রাবণের সৈন্যরা সেই কাদায় পড়ে ডুবল।

লোহার সব মানুষ। ধেয়ে এল অস্ত্র নিয়ে। পাথরে তৈরি দ্বারপাল। ধেয়ে এল অস্ত্র নিয়ে। রাবণ মারে মারে জরজর হলেন।

ক্রমে সমস্ত কথা মন্দোদরীর কানে উঠল। দুঃখে ও রাগে মন্দোদরী পাগল হলেন। কোথায় যাবেন? কি করবেন? কাকে বলবেন? ভেবে মন্দোদরী দিশাহারা। পিতা ময়। তাঁকে হয়ত বলা যায়। গতিও একটা হয়। কিন্তু এসব কি বলার! বিশেষ করে পিতাকে! তবু মন্দোদরী বললেন। মরিয়া হয়ে মাথা হেঁট করে স্বামীর অপকীর্তির কথা মন্দোদরী পিতা ময়কে কোন মতে নিবেদন করলেন।

ময় বিগলিত হলেন। কন্যার মুখ চেয়ে এক অদ্ভুত মায়া রচনা করলেন। রাবণ মুক্ত পেলেন। তাঁর সৈন্যরাও ত্রাণ পেল। ময় রাবণকে আশ্বাস দিলেন। রাবণ লজ্জায় মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লজ্জায় এতটুকু হয়েছেন রাবণ। তদুপরি পেট জ্বলছে, বুক ফাটছে।

মায়াবতীর সুযোগ হল। তিনি উপহাসে নৃশংস হলেন। বললেনঃ তুমি না রাজা। কিন্তু দশরকম সাপের মত দশটি মুখ কেন? পশুর মত চার চারখানি চরণই বা কিসের জন্য? তুমি না রাজা! দেখতে অবশ্য রাজাদের মতই। অমন পিশাচের মত সৌন্দর্য! আহা রাজাদেরও কি অমন রূপ হয়!

মায়াবতী এবার সহজ সুর ধরলেনঃ দেবতারাও আমাকে লাভ করতে পারেন না। অথচ স্পর্ধা করে তুমি এসেছিলে। তোমার ঘরে স্ত্রীও রয়েছে। আমি অন্য স্ত্রী। অথচ লোভ করে ছুটে এলে। হাতি ঘোড়া কিছু কি পেলে? অন্য স্ত্রীতে অনেক সুখ—এমন চিন্তা বোকারামেরাই করে। ওহে বোকারাম, নিজের স্ত্রী আর পরস্ত্রীতে তফাৎ নেই তেমন। লাভের মধ্যে পরস্ত্রীতে রত হলে কিঞ্চিৎ আয়ু ক্ষয় হয়। শুক্রই আয়ু, শুক্রই জীবন। কামুকতায় শুক্রক্ষয়, আয়ুক্ষয়। তোমাদের কাছে পরস্ত্রী অতি উপাদেয়। কিন্তু তাতে যে সুখ হয় তা তার ভয়ানক পরিণামের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এবার যাও। যা করেছ এমন যেন আর কর না। স্ত্রীলোককে কিঞ্চিৎ ভয় ডর কর। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি বড় মারাত্মক। ওরা মায়া জানে। বহুতর মায়ায়, ছলায় কলায় ওরা পুরুষ ভুলিয়ে বোকা বানায়। অতএব এ পথ কখনো আর মাড়িয়ো না। যাও।

এতাদৃশ বাক্যযন্ত্রণা সইতে সইতে রাবণ পৃথিবীতে এসে উপনীত

হলেন।

রাবণ পৃথিবীতেই ঘোরেন ফেরেন। একদা আবার গোল বাধল। এবার আঙ্গিরসের কন্যা বেদবতীকে দেখে রাবণের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হল। রাবণ বেদবতীকে আক্রমণ করলেন।

বেদবতী পরম রূপবতী। বেদবতী ব্রহ্মচারিণী। রাবণের আক্রমণে অসহায় বেদবতী ক্রন্দন করে উঠলেন। বাধা দিলেন। কিন্তু বাণের মুখে বালির বাঁধ ভেঙ্গে গেল। বেদবতী নিজের শরীরকে পুড়িয়ে ফেললেন।

জনকের যজ্ঞভূমিতে এই বেদবতীই জন্ম নিলেন। রাবণ বধই তাঁর কাম্য। বেদবতী হলেন রামচন্দ্রের পত্নী।

ক্ষীরোদসাগরের শয্যায় বিরহকাতর বিষ্ণু। বেদবতী নেই। বিষ্ণু ক্রমশই আতুর হয়ে পড়ছিলেন।

রামের পত্নী হিসেবে দুটি পুত্র প্রসব করে বেদবতী পৃথিবীতলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মন পড়েছিল স্বামীর শয্যাপার্শ্বে। পাতালের তলে প্রবেশ করবার সময় বেদবতীর মনে ক্ষীরোদসাগরের সেই অনন্তশয্যার বেদনাই বারবার ভেসে উঠেছে।

ভ্রাতার পুত্র। তদীয় বধূ। রম্ভা। রাবণ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। বরং বল প্রকাশ করেছিলেন।

কৈলাস পর্বতে সন্ধ্যা নেমে এসেছে! রাবণ প্রচুর সুরা পান করেছেন। পদ্মপলাশের মত দুটি চোখ। রাবণ দেখলেন। রাবণের শিরায় শিরায় সে সন্ধ্যায় সুরা প্রবাহিত হয়েছিল। রাবণ বলপ্রকাশ করলেন।

কুবেরের পুত্র নলকুবর অভিশম্পাত দিলেনঃ অন্যে রত যে স্ত্রী তাকে তুমি কখনোই ভোগ করতে পারবে না। করলে সেই মুহূর্তেই পুড়ে ছাই হবে।

ঘটনাস্থল আবার পাতাল। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েছেন প্রবল পরাক্রান্ত রাবণ। পাতালে এলেন। রাবণ দেখলেন এক মহান্ত পুরুষকে। পুরুষের গায়ে ভ্রমরের বর্ণ আর চোখে রক্তের। সারা গায়ে আগুনের শিখার মত রোম। জটায় বিদ্যুতের লতা। বিষের আগুনে রচিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত সেই পুরুষ বসে রয়েছেন। আর পাশে রয়েছেন সাগরের কন্যা লক্ষ্মী। রাবণ লক্ষ্মীর শ্রীতে কামার্ত হলেন। হরণে উদ্যতও হলেন। কিন্তু ঐ পুরুষের নিশ্বাসের বাতাসে রাবণ ছিটকে পড়লেন শতযোজন দূরে।

রাবণ ক্ষণকাল ঝিম মেরে বসে রইলেন। তারপর বললেনঃ হে ঈশ্বর, বারংবার তোমারই হাতে যেন আমার মৃত্যু হয়।

ঈশ্বর বললেনঃ তাই হবে।

বলিকে মুক্ত করতে হবে। রাবণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দ্বারে বিষ্ণু। হাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম। ভয়ে রাবণ পালিয়ে এলেন। রাবণ

পাতাল ত্যাগ করলেন। মনে বিষণ্ণতার অমেয় ভার।

বনবাসী রাম। বল্কল পরেন। শাক, জল, মাংস, ফল ও মূল আহার করেন। পিতা ত্যাগ করেছেন, মাতা ত্যাগ করেছেন। ধূলোতে বালিতে বনের কাঁটায় তিনি নিত্য ক্ষতবিক্ষত। এই বনবাসী রামচন্দ্রের ভার্যা সীতা। রাম বনবাসী, দরিদ্র। কিন্তু ধনীও। ধনী সীতার ভালবাসায়।

নিতম্বিনী সীতা। বসন মাত্র বল্কল। রাবণের চোখে এবারও একটি সাপ লক লক করে উঠল।

রাক্ষসের অধম মারীচ। রাবণ তার সাহায্য নিলেন। মারীচ হল হরিণ। হরিণের শরীর সোনার, শিঙ প্রবালের। হরিণের চোখে বৈদূর্যমণি, ক্ষুরে পদ্মরাগমণি। মারীচ হল মায়া-হরিণ।

অদূরেই রামের কুটির। হরিণ এল ধারে কাছে। সীতা দেখলেন। লুব্ধ হলেন। রামকে মিনতি করলেন। রাম ছুটলেন হরিণের পিছনে। হরিণ ছুটল। রামের শরও লক্ষ্য সন্ধানে অব্যর্থ। বাণবিদ্ধ হরিণের কণ্ঠ চিরে মারীচের আর্তনাদ ধ্বনিত হল। মরতে মরতে মারীচ রাবণকে জানিয়ে গেল : ভাই, আমি মরতে বসেছি।

সীতা চঞ্চল হলেন। কানে ভেসে এল : ভাই···। নিশ্চয়ই বনমধ্যে বিপদে পড়েছেন। তাই লক্ষ্মণকে তাঁর আহ্বান। সীতা লক্ষ্মণকে রামের খোঁজে পাঠালেন।

কুটিরে রাম নেই। কুটিরে লক্ষ্মণ নেই। কুটিরে একা সীতা। তপস্বীর বেশে ধীরে ধীরে রাবণ এগিয়ে এলেন। অতঃপর রাবণের সীতাহরণ, রামের যুদ্ধ, রাবণবধ ও সীতা উদ্ধার।

বিশাল মুখ। সে মুখের মধ্যে প্রলয়ের আগুনের মত লকলকে এক জিহ্বা। প্রচুর মাংস ও প্রচুর মদ যাঁর নিত্য খোরাক সেই কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত। অথচ সময় উপস্থিত। ভয়ানক কুম্ভকর্ণকে এবার জাগ্রত করতেই হয়। নচেৎ ভেসে যায় রাবণের মান ও সম্মান। রথের অশ্বের কোন শব্দেই কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হলেন না। খড়্গ, মুদগর, অগ্নি নিয়ে তাড়না করা হল। কুম্ভকর্ণ নিদ্রিতই রয়ে গেলেন। পর্বত বৃক্ষ জল কোন আক্রমণেই ঐ মহানিদ্রাভঙ্গ হল না। অবশেষে এলেন স্ত্রীলোকেরা। তাঁরা আক্রমণ করলেন। সুন্দর সুন্দর মোলায়েম হাতের মারে, সুন্দর সুন্দর উন্নত স্তনের আঘাতে কুম্ভকর্ণ জেগে উঠলেন।

রাবণ ও কুম্ভকর্ণ। দুজনেই পরম পরাক্রান্ত। কিন্তু কামের বিরুদ্ধে সমান অসহায়।

রাজা দশরথ মানুষের শরীরেই স্বর্গে যেতে পারতেন। পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য স্বর্গ থেকে তিনি তিল এনেছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর কাছে

তিনি অসহায়। পুত্র ত্যাগ করলেন, প্রাণ ত্যাগ করলেন। শ্রীরামচন্দ্রও কামে মোহিত হয়ে বালীবধ করলেন। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রাক্ষস। কাম সেখানে জয়লাভ করতেই পারে। কিন্তু দশরথ ও বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রও চরিত্র খুইয়ে ছিলেন। তাই বলা হয়, কামের বাস মনে মনে। তাই দেবাদিদেবের অবস্থান লিঙ্গে। তাই লিঙ্গপুজোর অত মাহাত্ম্য।

মুনিরাও আকাশবাণী শুনেছিলেনঃ লিঙ্গের পুজা কর। লিঙ্গের পুজা কর। লিঙ্গের পুজা কর॥

৮১. শিব প্রসাদ

স্বর্গ। হয়ত স্বর্গ নয়, আনন্দের সরোবর। গৌতমী এই সরোবরে ভেসেছেন। ভেসে ভেসে খেলা করছেন। কিন্তু অকস্মাৎ গৌতমীর খেলা থেমে গেল। স্বর্গে রূপের ছড়াছড়ি। কিন্তু গৌতমী সম্মুখে যা দেখছেন তার তুলনা স্বর্গে মেলাও ভার। গৌতমীর সম্মুখে সূর্যের পত্নী সুমতি।

গৌতমী অবশেষে না সুধিয়ে পারলেন না। সুমতিকে বললেনঃ স্বর্গে কত কত দেবতা রয়েছেন! কিন্তু তোমার মতন অমন রূপ তোমার মতন অমন বসন তো নজরে পড়ল না। তুমি এসেছ। এসে দাঁড়িয়েছ। চারিধারে ছড়িয়ে পড়েছে অপূর্ব এক সৌরভ। তোমার পতিও অতুল। পতিতে পত্নীতে এমন মিল কখনো তো দেখিনি! কিসের ফলে তোমাদের এমনভাগ্য? কি এমন তপ বা জপ করেছ যার ফল এত অপূর্ব!

সুমতি বললেনঃ আমার স্বামীর পূর্বপুরুষ যজ্ঞ করে শিবকে পুজো করেছিলেন। এই কন্যারাজ্য তারই দৌলতে পাওয়া। সেই যজ্ঞে শিবকে যখন বরণ করা হয় তখন আমি তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলাম। তাই স্বর্গে বাস করছি। তীর্থের জলে শিবকে আমি স্নান করাতাম। অঙ্গে তাই এই কান্তি। ঘি দিয়েও তাঁকে স্নান করিয়েছি। মনে তাই প্রসন্নতা। মনে তাই অঢেল আনন্দ। শরীরে অঢেল সৌন্দর্য। সকলের মনে পাতা রয়েছে ভালবাসার আসন। যেমন দেখছ আমার, ঠিক তেমন তেমনি আছে আমার স্বামীর। এই বসনভূষণ, এই রত্ন-অনুলেপন আমারও আছে, তাঁরও আছে। সবই শিবের প্রসাদ।

সুমতি একটু থামলেন। কি যেন ভাবলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেনঃ শিবলিঙ্গের সামনে খুব ভাল খাবার একবার নিবেদন করেছিলাম। তাই যেখানেই যাই সেখানেই আমার মন তৃপ্তিতে ভরে উঠে। আমি পুজো করতাম। তাই এই উত্তম প্রদেশে আমরা বাস করছি। শিবলিঙ্গের পুজোয়

তনু মন ও প্রাণ সঁপলে সবই মেলে। কোন সাধই অপূর্ণ থাকে না

৮২. পুরাণ মহিমা

ধর্মরাজের সঙ্গে সনৎকুমার দেখা করতে এসেছেন। নানাবিধ স্তবে ধর্মরাজ প্রীত হলেন। বললেনঃ বস।

সনৎকুমার বসলেন। কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু সুযোগ পেলেন না। অদ্ভুত এক ব্যাপার দেখে হতবাক হয়ে বসে রইলেন।

সনৎকুমার একখানি অপূর্ব বিমান দেখলেন। সোনা দিয়ে তৈরি সে বিমান। এখানে ওখানে বসানো মণিমুক্তা। কিঙ্কিণীজালে শোভিত বৈদূর্যময় বেদিযুক্ত সেই বিমানে আরোহণ করে এক পুরুষ এসে নামলেন।

ধর্মরাজ ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিজের একেবারে কাছটিতে বসালেন।

বললেনঃ আসুন, আসুন। পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো? এখন এখানেই বসুন। ব্রহ্মার কাছে যাবেন পরে।

কথা শেষ হতে না হতেই আর একখানি বিমান এল। আর একজন পুরুষ এলেন।

এবারও বিগলিত হলেন ধর্মরাজ। অশেষ সম্ভ্রমে এঁকেও তিনি বসালেন।

সনৎকুমার ভয়ানক অবাক হলেন। স্বয়ং ধর্মরাজ বিনত! কে এরা?

তারপর এক সময় সুযোগ বুঝে ধর্মরাজকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ওঁরা কি এমন কাজ করেছেন যার ফলে আপনি এত প্রসন্ন? আপনি ধর্মরাজ। সর্বলোকে আপনাকে পূজা করে। এমনকি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও আপনাকে পূজা করেন। সেই আপনি বিনত হলেন! হলেন ওঁদের সামনে! কে এমন ওঁরা?

যম বললেনঃ ওঁরা পৃথিবীর লোক। অতিশয় পুণ্য করেছেন। তাই এখানে এসেছেন। আমি মান দিয়েছি।

কয়েকটি মৌন মুহূর্ত কেটে গেল।

যম বললেনঃ বৈদিশ এক নগরের নাম। সেখানে বাস করতেন রাজা ধরাপাল। একবার পার্বতী তাঁর এক অনুচরকে শাপ দিয়েছিলেন। পার্বতী বলেছিলেন, আমি ছিলাম না। সেই সুযোগে অন্য রমণীর সঙ্গে শিবের মিলন ঘটিয়েছ! বারো বছর শিয়াল হয়ে বনে বনে তুমি ঘুরবে। প্রায়শ্চিত্ত করবে।

কাকুতি করাতে পার্বতী বলেছিলেনঃ এ দশা কাটবে বিতস্তা ও বেত্রবতীর সঙ্গমে।

শিয়াল এল দুই নদীর সঙ্গমে। অনশনে অনশনে কৃশ হয়ে ক্রমে সেই

শিয়াল মারা গেল। মরা শরীরটা পড়ে রইল। বেরিয়ে এল এক অপরূপ শরীর। অপরূপ শরীর গিয়ে মিলল শিবের সঙ্গে।

বিতস্তা ও বেত্রবতীর সঙ্গমে অদ্ভুত এই ব্যাপারটি একজন মানুষ বিস্ফারিত দুচোখ মেলে দেখেছিল। মানুষটি হল ধরাপাল।

রাজা ধরাপাল ঐ পবিত্র স্থানে শিবের মন্দির গড়ে তুললেন। রাজা ধরাপাল সেই মন্দিরে নিত্য পুজো করতেন। শিব পুজোয় মন্দিরের দেখাশুনোয় তিনি মন সঁপে দিলেন। শুধু শিব নন। সমস্ত দেবতাই পুজো পেলেন। পূজিত হল পুরাণগ্রন্থ। পূজিত হলেন পুরাণ পাঠক ব্রাহ্মণও।

একদা ধরাপাল এক ব্রাহ্মণের সম্মুখে বিনয়ে অবনত হলেন। ব্রাহ্মণ পুরাণ বলেন। লোকে শুনে মুগ্ধ হয়। ধরাপাল বললেন: শিবের মন্দির করেছি। শত শত লোক আসে, মন্দির দর্শন করে। তারা বড়ই উৎসুক। আপনি যদি মাসিক শত স্বর্ণনিষ্ক বৃত্তি নিয়ে নিত্য এদের পুরাণ শোনান, আমি তবে কৃতার্থ হই। বছর ঘুরলে আরও অর্থ দান করব।

ব্রাহ্মণ সম্মত হলেন।

শিবমন্দিরে নিত্য বহুশত লোক জমায়েত হয়। ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করেন।

ধীরে ধীরে ছটি মাস কেটে গেল। বছরও ঘুরল না। রাজা ধরাপাল দেহ রাখলেন। মহাদেব বললেন, বিমান পাঠাও। আমি পাঠালাম। উনি এলেন।

পুরাণ দেবগণের অতি প্রিয়। পুরাণ শ্রবণে ওঁদের অশেষ সন্তোষ। ধূপ ধুনো জেবলে ফুল ছড়িয়ে বলি দিয়ে গ্রাম ও নগর দান করে পুজো করলেও ওরা অত খুশি হন না। [illegible] অশেষ প্রীতি। সর্বকামিক শ্রাদ্ধেও অত আনন্দ আমার হয় না। সত্যিকথা বলতে কি পুরাণ শুনলে আমি সব চেয়ে বেশি আহ্লাদ পাই। অমন জিনিস আর হয় না।

যম বলে চললেন। পরে যিনি এলেন তিনিও বাস করতেন ঐ একই পুরে। এককালে এর হাত দিয়ে কিছু গলত না। পরে ওঁর সৎসঙ্গ হয়। পুরাণ শোনেন। খুশি হয়ে সোনার মাষ দান করেন পুরাণের পাঠককে। পুণ্য কাজ বলতে উনি মাত্র এটিই করেছেন। অথচ এখন আমিও ওঁকে পুজো করে মরছি।

সনৎকুমার যমের মুখে সব শুনলেন। ওখান থেকে বেরিয়ে উনি গেলেন ব্রহ্মার কাছে। সনৎকুমারের মনে তখনো সামান্য সংশয় লেগে ছিল। পুরাণের এত মহিমা! এও কি সম্ভব?

সনৎকুমার ব্রহ্মাকে বললেন: যম বললেন। তবু আপনি বলুন। যা শুনেছি তা কি সত্যি?

ব্রহ্মা বললেন: ধর্মরাজের কথা মিথ্যা নয়। তোমার ভাগ্য, তাই অমন

দুই পুণ্যবানের দেখা পেয়েছ। এতে তোমারও পুণ্য বাড়ল। আমার পঞ্চম মুখ থেকেই ইতিহাস ও পুরাণ নিঃসৃত। পুরাণ আমার বড় প্রিয়। বেদবেদাঙ্গও আমার অত প্রিয় নয়। চতুর্বেদে যা অতি গূঢ় ভাবে বলা আছে পুরাণেও তাই বলেছি। কিন্তু বলেছি সরল করে। সাধারণ মানুষের মনেও যাতে বেদের তত্ত্ব প্রবেশের পথ পায় তার জন্যই আমার পুরাণ বলা। পুরাণ শুনলে পরমের সাক্ষাৎ মেলে। পুরাণ শোনালেও তাঁকে পাওয়া যায়। এমনকি পুরাণ যিনি পড়েন তাঁকে দক্ষিণা দিলেও মেলে ব্রহ্মপদ। বলাও হয়ঃ তীর্থের সেরা কেদার, ব্রতের সেরা মহাব্রত, পর্বতের রাজা সুমেরু, পাখির রাজা গরুড়, নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাদেব, আর পাত্রের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ পাত্র যিনি পুরাণ বলেন।

সনৎকুমার বললেনঃ আহা! আহা! আহা!

৮৩. দানের ফল

রাজা চিত্ররথ মনে মনে কেবলই বিস্ময় মানলেন। সামান্য রাজা তিনি। অথচ সুখের পর সুখ আগ বাড়িয়ে তাঁকে যেন আলিঙ্গন করল।

সামান্য রাজা চিত্ররথ। অথচ সপ্তদ্বীপা পৃথিবী হল পদানত। সামান্য তাঁর বল। অথচ ইন্দ্র হার মানলেন। স্বর্গেও স্থাপিত হল তাঁর শাসন।

বিশাল রাজত্ব। অঢেল রাজকোষ। রাজ্যে অমেয় সুখ, অমেয় শান্তি। অভাব নেই কোন কিছুরই। কত শত হস্তী অশ্ব ও রথ। ষাট ষাট হাজার পুত্র! কিছুরই তাঁর অভাব নেই। প্রজারা চিত্ররথ বলতে অজ্ঞান। তাদের দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। চারিপারে সুখের যেন ছড়াছড়ি। সবোপরি চিত্ররথ এমন এক অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীর স্বামী, স্বামীই যাঁর ধ্যান এবং জ্ঞান।

চিত্ররথ মনে মনে কেবলই বিস্ময় মানলেন। এত সুখ! এত আনন্দ! এমন কোন মহৎ কাজ তো তিনি করেননি। তবে কিসের দৌলতে তাঁর এত সুখ, এত আনন্দ? রাজা চিত্ররথ পাতি পাতি করে এরই উত্তর খুঁজলেন। মনে মনে বুঝলেনও নির্ঘাৎ পূর্বজন্মেরই কোন কাজের ফল। এ জন্মে তাই এত সুখ।

চিত্ররথের পরজন্মের কথা মনে পড়ল। এ জন্ম না হয় গেল। আগের জন্মের পুণ্য ভাঙ্গিয়ে এ জন্মে না হয় অঢেল সুখ তিনি কুড়োলেন। কিন্তু পরজন্ম? এ জন্মে তাই কিছু কিছু ভাল কাজ অবশ্যই করা দরকার। কিন্তু কি করবেন? কি করলে পরজন্মও হবে এমন সুখের?

চিত্ররথ বশিষ্ঠের কাছে এলেন। বললেনঃ আপনার প্রসাদে আমি পরম

সুখী। রূপে গুণে স্বাস্থ্যে আমি ভাগ্যবান। বিশাল রাজত্বে কোথাও এতটুকুও দুঃখ নেই। বলে বীর্যে স্বর্গ পর্যন্ত অধীন হয়েছে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, অতগুলি উপযুক্ত পুত্র। আমার ভাগ্য অতি শুভ। কিন্তু এত যে পেলাম তা কোন্ পুণ্যকর্মে ? খুঁজে খুঁজে আমার মস্তিষ্ক পরিশ্রান্ত। তাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।

বশিষ্ঠ চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন : পূর্বজন্মে নীচকুলে তোমার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তুমি কিছু ভাল কাজ করেছিলে। অবন্তী নগরে এক রাজা ছিলেন। নাম ধর্মপাল। ধর্মে তাঁর বিশেষ মতি ছিল। সেই নগরের কোন এক নীচ কুলে তুমি বাস করতে। তোমার যা ধর্ম তুমি তা ঠিকঠিকই করতে। একবার বহু বছর ধরে অবন্তীতে বৃষ্টি হল না। দেখা দিল ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। তুমি বনে চলে গেলে। সঙ্গে তোমার স্ত্রীও গেলেন। বনের ফলে বনের মূলে কোনমতে তোমরা দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলে। কিন্তু অবশেষে ওতেও আর কুলিয়ে উঠল না। বাধ্য হয়ে বনের কাঠ কেটে কুড়িয়ে তোমরা বিক্রি করতে। একদা তোমরা দুজনে কাঠের বোঝা নিয়ে নগরে এলে। পথে পথে হেঁকে ফিরলে। কিন্তু কেউই কিনল না।

সারাদিন চলে চলে তোমরা শ্রান্ত হয়েছিলে। ক্রমে শীতের বেলা পড়ে এল। সন্ধ্যা হল।

কাছেই এক বণিকের বাড়িতে হোম হচ্ছিল। তোমরা ক্লান্ত পায়ে সেখানে ঢুকলে। বোঝা রেখে বসলে। পেটে জ্বালা, শরীরে শ্রান্তি, বাইরে নিষ্ঠুর শীত। তোমরা কাঠগুলি জ্বেলে শীত তাড়ালে। সে দিন ছিল মাঘী পূর্ণিমা। সে রাত্রেই গ্রহণ লেগেছিল চন্দ্রের। বণিক সারাদিন উপোস করে ছিলেন। অবশেষে বিষ্ণুর পুজো সেরে তিনি একশো স্বর্ণপৃথ্বী দান করলেন।

তুমি চণ্ডাল ছিলে। কিন্তু ঐ দান দেখলে। মনে মনে তোমাদের দুঃখ হল : পুণ্য করিনি কোন। কি করে এমনটি হবে! আহা যদি হওয়া যেত।

ওতেই তোমার অশেষ পুণ্য হয়েছিল। তাই এই রাজ্য, তাই এই সুখ। অতএব আর দেরী নয়। এখন থেকেই দান করতে থাকো। কেবল দান কর। দান কর। স্বর্ণ পৃথ্বী দান করলে স্বর্গ আসে আগ বাড়িয়ে। স্বর্ণ পৃথ্বী দান কর। ও দান দেখলেও স্বর্গ। দেখে দানের সংকল্পতেও অযুত পুণ্য।

বশিষ্ঠ থামলেন। চিত্ররথের চোখে মুখে উৎসাহ ফেটে পড়ছিল। বশিষ্ঠ উৎসাহিত হয়ে বললেন : সে আর এক কাহিনী। বলছি, শোন :

ত্রৈলোক্যজোড়া নাম। রাজা পৃথু। ত্রৈলোক্যজোড়া রাজত্ব। পৃথুর রাজত্বে সূর্য অস্ত যেত না। পৃথুর শাসনে ধর্ম সম্মানিত হয়েছিল। কোথাও এক কণা কষ্ট ছিল না। দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, পিশাচ সবার মুখেই পৃথুর

প্রশংসা। মুনিরাও উচ্ছ্বাসে বিগলিত হয়ে শতমুখে রাজা পৃথুর নাম করতেন।

পৃথিবী উঁচু নীচু ছিল। ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে পৃথু পৃথিবী সমতল করলেন। পৃথিবীর মানুষের মনে পাপ রইল না এক বিন্দুও। রূপেগুণে বলে প্রতাপে অতুলনীয় এক রাজার নাম পৃথু।

পৃথুর পত্নী যত দেখেন ততই অবাক হন। বিস্ময় ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে তিনি ভাবেন পরজন্মের কথা। এ জন্মে পেয়েছেন। পরজন্মেও কি পাবেন? কি করলে পরজন্মেও সুখের সাগরে ঠিক এমন করেই ভাসতে পারবেন?

রাজমহিষীর মনে চিন্তার আবর্ত রচিত হয়। অবশেষে স্বামীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

পৃথু এমন করে আগে চিন্তা করেননি। তিনিও গোলে পড়লেন। শরণ নিলেন ব্রাহ্মণদের। সবই ওঁরা জানেন। ঠিক ঠিক ওঁরাই বলতে পারবেন।

পৃথু ব্রাহ্মণদের কাছে এলেন। বললেন: আমার উপরে যদি খুশি হয়ে থাকেন তাহলে একটি কথা সুধোই। দেখে তো মনে হয় আপনারা আপাতত প্রসন্নই আছেন। উত্তর পাবার এই হয়ত উপযুক্ত সময়।

মুনিরা বললেন: নিশ্চয়ই। সুধাও। অবশ্যই উত্তর পাবে। পৃথু বললেন: আগের জন্মে কি এমন ভাল কাজ করেছি যার ফলে এ জন্মে এত সুখ এত ঐশ্বর্য? আমি কে ছিলাম? আমার স্ত্রীই বা কে ছিলেন?

মুনিরা মরীচিকে বললেন: তুমিই যোগ্য পাত্র। রাজার কৌতূহল তুমিই নিরসন কর।

মরীচি যোগ অবলম্বন করলেন। মরীচির মনের পর্দায় পৃথুর পূর্ব বৃত্তান্ত ছবি হয়ে ভাসল।

মরীচি পৃথুকে বললেন: তুমি শূদ্র ছিলে। হিংসায় তোমার মন পূর্ণ ছিল। তোমার পত্নী তোমাতেই ছিলেন অতিশয় অনুরক্ত। সর্বদা তোমার সেবাতেই ওঁর দিন কাটত। একসময়ে তোমার পয়সাকড়ি কিছুই রইল না। তুমি হলে অন্যের দাস। পত্নীকেও এই সময় তুমি ত্যাগ করেছিলে। কিন্তু উনি তোমাকে ত্যাগ করেননি। একদিন এক ধনীর বিষ্ণু মন্দিরে তুমি স্বর্ণ পৃথ্বী বয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। সঙ্গে তোমার পত্নীও ছিলেন।

সেই ধনী পুণ্যবান। পুণ্য অর্জনের জন্য নিত্য তিনি চেষ্টা করতেন। তোমরা সেই ধনীর বাড়ি ঝাঁট দিলে, ধুলে, তকতকে করে তুললে। তারপর ঐ পুণ্যবান ব্যক্তির সেবায় তদগত হলে। তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট হল। তুমি আলোকিত হলে। তিনি সোনার ধেনু দান করলেন। তুমি দেখলে। ও জন্মে এই পুণ্য করেছিলে। এ জন্মে তাই সুখ পেয়েছ অঢেল। সোনার পৃথিবী দান করা অতীব পুণ্যের। দেখাও পুণ্যের। মনে মনে দানের ইচ্ছা করাও

পুণ্যের।

রাজা চিত্ররথ তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। কি এক আনন্দের বেদনায় তাঁর বুক টনটন করে উঠল। ধীরে ধীরে তিনি ভিতরমহলে প্রবেশ করলেন ॥

৮৪. শতানীকের নিরয়বাস

জম্বুদ্বীপের আকাশে যেন চন্দ্রের উদয় হল। জম্বুদ্বীপ আলোর অমৃতে নিত্য নেয়ে উঠত। রাজা সহস্রানীকের রূপ এমনই।

জম্বুদ্বীপের আকাশে যেন প্রখর সূর্য। প্রতাপে প্রতাপে সহস্রানীক ঠিক এমনতর।

সহস্রানীকের শাসনে খুঁত ছিল না কোন। প্রজারা বলত পিতার যোগ্য সন্তান। কিন্তু ব্রাহ্মণরা বলতেন অন্য কথা।

সহস্রানীকের প্রজারা তাদের এ রাজার কথা বলতে বলতে চলে যেত আগের রাজার কথায় এ রাজার পিতা শতানীকের কথায়। শতানীকের কথা তারা শতমুখে বলত। শতানীক যেমন তেমন একজন রাজা নন। বীর, কিন্তু বেদের তত্ত্বে তাঁর অন্তর ছিল আলোকিত। ধর্মকাজে অতিথির সেবায় অমন রাজা নাকি মেলা ভার। ভোগ করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর, কিন্তু দানের হাতটিও ছিল অত্যন্ত দরাজ।

প্রজারা শতানীকের কথায় উচ্ছ্বসিত হত। ব্রাহ্মণরাও শতানীকের কথায় গদগদ হতেন। কিন্তু সহস্রানীকের কথায় ব্রাহ্মণরা বিবর্ণমুখে চুপ করে বসে থাকতেন। বললেও বলতেন অন্যকথা।

সহস্রানীকের রাজত্ব চলল। ব্রাহ্মণদের দিন কাটে, কিন্তু বিমর্ষতা কাটে না। অনেকগুলি বছর ধীরে ধীরে যেন গ্লানিভরা পা ফেলে ফেলে কেটে গেল। অবশেষে ব্রাহ্মণরা পা বাড়ালেন রাজার দরবারে।

সহস্রানীকের দরবারে ব্রাহ্মণরা এলেন দরবার করতে। রাজা বিগলিত হয়ে তাঁদের আপ্যায়ন করলেন। ওঁরা খুশি হলেন। কিন্তু অভিযোগের কথাটি ভুললেন না। বললেন: তোমার পিতা ব্রাহ্মণদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতেন। তাঁর বদান্যতায় আমরা সুখে ছিলাম। দান অবশ্য তুমিও কর। কিন্তু ব্রাহ্মণদের বেলায় তোমার মুঠো খুলতে চায় না। বহু ব্রাহ্মণ বহু সয়ে অবশেষে অন্যত্র গমন করেছেন। এখন আমরাই পড়ে আছি। ঠিক করেছি আমরাও চলে যাব। খাওয়া জোটে না, পরা জোটে না—এমন পোড়া রাজ্যে পড়ে থেকে কি লাভ?

রাজা সহস্রানীক কিঞ্চিৎ হাস্য করলেন। বললেন: ব্রাহ্মণদের দান করা

অতীব পুণ্যের। পরলোকে সুখের আর পার থাকে না। আমি এ জানি। আমার পিতা ব্রাহ্মণদের দুহাতে দান করতেন। হিসেবমত তাঁর স্বর্গেই স্থান হবার কথা। কিন্তু তিনি কি রকম স্বর্গে সম্প্রতি বাস করছেন সেইটে যদি আমাকে বর্ণনা করেন তবে খুশি হই।

ব্রাহ্মণদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। রাজার প্রশ্ন বড় কঠিন। ওঁরা মাথা হেঁট করে চলে এলেন। বলে এলেন: পরে বলব।

ব্রাহ্মণরা সবাই মিলিত হলেন। কি করে জানা যায় মৃত রাজার কথা? কি করে? সবাই আলোচনা করলেন। বহুদিন ধরে বহু আলোচনা করে ওঁরা শ্রান্ত হলেন। কিন্তু ফল না কিছুই।

ব্রাহ্মণরা চিন্তায় ভারাক্রান্ত। দারিদ্র্যেও বিশেষ পীড়িত। রাজ্যে হোম বন্ধ হল।

হোম নেই। সূর্যের তৃপ্তি নেই। বৃষ্টি বন্ধ হয়। রাজ্যে নামে দুর্ভিক্ষ। রাজার সুশাসন, অথচ দুর্ভিক্ষ হবে। এটি ভাবতেও খারাপ লাগে সূর্যের। কিন্তু উপায়ও নেই। আগুনে আহুতি পড়ে না, সূর্য পান না, বৃষ্টি হবে না, অন্নও উৎপন্ন হবে না। সূর্য কি আর করতে পারেন? অবশেষে ভেবে ভেবে সূর্য নেমে এলেন। এলেন ব্রাহ্মণদেরই কাছে।

ব্রাহ্মণের বেশে সূর্য নেমে এলেন। ব্রাহ্মণদের বললেন: দেখছি বড়ই বিষণ্ণ হয়ে আছ। কিন্তু কেন? নিত্যকর্মও দেখছি ছেড়েছ। ওতে মঙ্গল নেই কোন। *নিত্য কর্ম ছাড়লে কোন আশাই পূর্ণ হয় না।*

অতএব ছেড় না। যত যাই কর না কেন নিত্যকর্ম ছেড়েছ কি ডুবেছ। পঞ্চযজ্ঞ নিত্যকর্ম। ওটি ছাড়া কখনোই কর্তব্য নয়। রাজা শতানীকের কথা ভাবছ? তাঁর কথা যিনি বলতে পারেন তিনি এই নগরেই আছেন।

ব্রাহ্মণরা যেন দিশা পেলেন। ওঁরা খুঁজে খুঁজে ফিরলেন: কোথায় সে? কোথায় সে? কিন্তু কোথাও তাকে পেলেন না। ওঁদের শ্রান্ত মুখে হাসি ফুটল।

ওঁরা দেখলেন কে যেন তপস্যায় ডুবে রয়েছেন। হাত মাথার উপর তুলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কে যেন তপস্যায় মগ্ন। ব্রাহ্মণরা দেখলেন। বুঝলেন উনিই ভার্গব।

ব্রাহ্মণরা প্রণতি জানিয়ে ভার্গবকে ঘিরে বসে রইলেন। জপ শেষ হলেই ওঁরা ওঁকে ধরবেন।

দিন গেল। সূর্য পাটে বসল। ভার্গবের জপ শেষ হল। ভার্গব দেবতাদের তর্পণ করলেন। ভার্গব পিতৃগণের তর্পণ করলেন। এবার অবসর। ভার্গব ভাগ্য মানলেন। অদ্য তাঁর কুটিরে সমাগত হয়েছেন অনেকগুলি ব্রাহ্মণ। ভার্গব ব্রাহ্মণদের মান দিলেন। পাদ্যে অর্ঘ্যে ফলেমূলে ব্রাহ্মণরা

পরিতৃপ্ত হলেন।

ভার্গব সুধালেন ঃ মদীয় কুটিরে কি হেতু আপনাদের এই আগমন ?

ব্রাহ্মণেরা বললেন ঃ রাজা সহস্রানীক ব্রাহ্মণদের তেমন দেখেন না। আমরা বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু নিতান্ত বেয়াড়ার মত রাজা বেয়াড়া এক প্রশ্ন করে বসলেন। আমরা তার উত্তরদিতে পারিনি। এখন উপায় আপনি। আপনি আমাদের মুখ রাখুন।

ভার্গবের মনে দ্বিধা এল। একবার ভাবলেন ঃ নিতান্তই জ্বালাতন। চুলোয় যাক। মগ্ন হই তপে।

আবার ভাবলেন ঃ আহা বিপদে পড়ে আমাকে স্মরণ করেছে। ওদের বিপদে আমার যত্ন নেওয়া উচিত।

ভার্গবের মনে দ্বিতীয় পক্ষই জয়যুক্ত হল। রাজার পিতার অবস্থা জানতে ভার্গব বহির্গত হলেন।

ভার্গব দক্ষিণমুখে যাত্রা করলেন। সূর্য এলেন আগবাড়িয়ে পথ দেখাতে। সূর্য ছুটলেন। প্রচণ্ড গতিতে সূর্য আগে ছুটতে থাকলেন। ভার্গবও ছুটলেন। যোগের প্রভাবে সূর্যের পিছু পিছু সমান তালে ছুটে চললেন। দেখতে দেখতে যমমার্গের আশিহাজার যোজন পথ ফুরিয়ে এল। দুঃসহ সে পথ। জল নেই, অন্ন নেই, গাছগাছালি কিছু নেই। শুধু শীত, শুধু প্রচণ্ড বাতাস, শুধু অংধকার। সাংঘাতিক সেই পথে ভার্গব ছুটে চললেন। এর পরই একে একে আটাশ কোটি নরক। সূর্য সেই নরকে প্রবেশ করলেন। ভার্গবও প্রবেশ করলেন। পথ চলেছে। দুদিকে শুধু কাতর আর্তনাদ। ভার্গব চলেছেন। এধারে বাতাস ভারাক্রান্ত, ওধারে বাতাস ভারাক্রান্ত। ভারাক্রান্ত বাতাসের চাপে ভার্গব অস্থির হলেন। অকস্মাৎ ভার্গবের পথ রুদ্ধ হল। সম্মুখে লাঠি হাতে এক ব্রাহ্মণ। পথ আটকে সে বলল ঃ যাচ্ছ কোথায় ? আমার দক্ষিণা ? দিতে চেয়েছিলে। কিন্তু দাওনি ! দাও। নইলে পথ পাবে না।

ভার্গব প্রথমটায় থতমত খেলেন। মনে করতে চেষ্টা করলেন। অনেক কষ্টে মনে পড়ল। বহুদিন আগে এক পুরাণ দেবেন এমন কথা তিনি এই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন।

ভার্গব বললেন ঃ এখন কোত্থেকে দেব ? পথ ছাড়। পরে দেব।

ব্রাহ্মণ বলল ঃ এ মর্ত্য নয়। পরে দেবার পাট এখানে নেই। অতএব চুকিয়ে ফেল।

ঃ দেখছই তো কাছে কিছুই নেই। কি দেব ?

ঃ আছে। তোমার পুণ্য আছে। তারই অর্ধেক দাও।

ঃ অর্ধেক দেব। তাকি হয় কখনো !

সূর্য এসে মিটিয়ে দিলেন। ছ আনায় রফা হল। ব্রাহ্মণ ছ আনা পুণ্য নিয়ে চলে গেল।

ভার্গব পথ পেলেন। চলতে থাকলেন। কিন্তু আবার এসে জুটল আর এক আপদ। এবার এক গোপাল। গোরু রেখেছিল। পাঁচগণ্ডা কড়ি পেত। সামান্য। ভার্গব ভুলে গিয়েছিলেন। গোপাল লজ্জায় চাইতে পারেনি। কিন্তু এবার সে নাছোড়বান্দা। সেও আদায় করে নিল ভার্গবের ছ আনা পুণ্য। একে একে অনেকে এল। ধোপা, দর্জি, পাণ্ডা—সবাই এল। আদায় করে নিল কড়ায় গণ্ডায়। কাছে কিছু নেই। পুণ্য দিয়েই শুধতে হল ঋণ। ভার্গবের পুণ্যের থলি একেবারে খালি হল। কিছু নেই। তিনি আর চলতে পারেন না। সূর্য চলছেন। ভার্গব চলতে পারলেন না। পিছনে পড়ে রইলেন। সূর্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন ঃ ধর। এস।

ভার্গবকে সূর্য নিরয়ে নিয়ে এলেন। সেখানে রাজা শতানীক পচে মরছিলেন।

পুণ্যবান রাজা শতানীক পচে মরছেন কলসের মধ্যে! ভার্গব বিস্ময়ে আঁতকে উঠলেন। সামান্য সামলে নিয়ে সুধোলেন ঃ অত দান করেছেন, ধ্যান করেছেন। আপনার তো থাকার কথা স্বর্গে। অথচ পচে মরছেন এখানে! কি এমন কুকর্ম করেছিলেন ?

শতানীক বললেন ঃ দান করেছি তা ঠিক। কিন্তু করেছি শোষণের পয়সা দিয়ে। প্রজাদের কষ্ট দিয়ে আদায় হয়েছে। আমি তাই দান করেছি। প্রজাদের কষ্টে আগুন উঠেছিল। সেই আগুনে আমি এখন পুড়ে ছাই হচ্ছি। দেখে মনে হয় আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। যদি ঠিক বুঝে থাকি তাহলে আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আমার পুত্রকে বলবেন সে যেন সাধুর সঙ্গ করে। তাহলেই এই জ্বালা থেকে আমি ত্রাণ পাই।

ভার্গব বিচলিত হলেন। তাঁর মনে সদিচ্ছা জাগল। সূর্যকে তিনি সুধোলেন ঃ সাধুও যা তীর্থও তা। সাধু দেখলে পুণ্য, তীর্থ দেখলে পুণ্য। যারা কখনো পুণ্য করেনি সাধুসন্ন্যাসী দেখে তাদের মনে ভক্তি আসে না। পাপের ক্ষয় না হলে দানে ধ্যানে মন মজেও না। এখানে সবাই আপনাকে দেখে সুখী হচ্ছে। আপনি যে দেবতা তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি আপনার পাশে পাশেই রয়েছি। কিন্তু আমি তো কোন সুখ পাচ্ছি নে। পৃথিবীতে এমন ধর্ম কি নেই যার বলে পাপ নষ্ট হয়, স্বর্গ আসে কোল দিতে? যারা সংসারেই একান্ত জড়িয়ে পড়ে, ধর্মকর্ম করতে পারেনা, মোক্ষ কি তাদের কাছে অচেনাই থাকে চিরকাল ?

সূর্য বললেন ঃ চৈত্রমাসেই বছর শুরু। পুণ্যমাস চৈত্র। ঐ মাসে দেবতারা পৃথিবীতে নেমে আসেন। শিবও আসেন, গৌরীও আসেন। পৃথিবী ওঁদের

লীলায় মুখর হয়। কৃষ্ণা চতুর্দশী বা শুক্লা চতুর্দশী দুটিই পুণ্যতিথি। ঐ দিন উপবাস করে শিবকে ধেনু উৎসর্গ করবে। ব্রাহ্মণকে দান করবে। করলে স্বর্গ আসে ঘরের দুয়ারে।

ভার্গব সহস্রানীককে এই গূঢ় কথাটি নিবেদন করলেন। রাজা খুশি হলেন। বললেনঃ আপনি আমার রাজ্য দেখুন, আমি চেষ্টা দেখি কিছু উপার্জনের।

সহস্রানীক বিদেশে গমন করলেন। যেতে যেতে রাজা দেখলেন পুকুর কাটা হচ্ছে। সেখানে তিনি কাজ পেলেন। বহুদিন খেটে বেশ কিছু জমল। রাজা হিসেব করলেন। দেখলেন একটি গোরুর দাম তিনি উপার্জন করেছেন। গোরু কিনে কিছু সোনাও কেনা যাবে। অতএব রাজা রাজ্যে ফিরে এলেন।

ভার্গবের কথা মেনে সমস্ত ব্রতই তিনি পালন করলেন। পিতা শতানীক মুক্ত হলেন। নিরয়ের যন্ত্রণা তাঁর ঘুচল। আশীর্বাদের ফুল ছড়িয়ে রাজা শতানীক নিরয়ের জ্বালাময় অন্ধকার থেকে স্বর্গের স্নিগ্ধ আলোর মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন। মরলোকে পুত্র সহস্রানীকের মন প্রসন্নতার সৌরভে পরিপূরিত হল। তাঁর জন্যও তৈরি হয়ে গেল স্বর্গের সোনার সিঁড়ি।

মহাব্রত। মহাফল ॥

৮৫. পরশুরাম

পুত্র নেই। শান্তি নেই। অশান্ত রাজা কুশিক।

পুত্র নেই। কিন্তু পেতে হবে। তপস্যায় পাওয়া যায়। কুশিক ইচ্ছা করলেনঃ পেতে হবে। যেমন তেমন পুত্র নয়, অনন্য পুত্র। বলেবীর্যে অনন্য।

কুশিক প্রচণ্ড তপস্যায় মগ্ন হলেন। অনন্য প্রার্থনা, অনন্য তপ। স্বর্গের রাজাকেও আসতে হল নেমে।

ইন্দ্র এলেন। কুশিকের পুত্র হয়ে নিজে নিলেন জন্ম। নাম পেলেন গাধি।

রাজা গাধি। কন্যা সত্যবতী। পিতা কন্যার বিবাহ দিলেন। ঋচীক হলেন গাধির জামাতা।

ঋচীক ও সত্যবতী। তপস্বী ও তদীয় পত্নী। পুত্র চাই। পুত্র বিনা জন্ম বৃথা। ঋচীকের মনে মহৎ কামনা। অনুষ্ঠিত হল মহা এক যজ্ঞ। তৈরি হল চরু।

ঋচীক চরু গ্রহণ করে পত্নী সত্যবতীর হাতে তুলে দিয়ে বললেনঃ খেও, পুত্র হবে। তুমি খেও। তোমার মাতাকেও দিও। আধাআধি করে দুজনে

খেও। গাধিরাজার ঔরসে তোমার মাতার এক পরম বীর পুত্র হবে। ক্ষত্রিয়-কুলের এক রত্নের মাতা হবেন তিনি। আর তোমার হবে পরম ব্রাহ্মণ এক পুত্র। শমে দমে এবং তপে সে পুত্র হবে আর এক রত্ন।

ঋচীকের কর্তব্য আপাতত সমাপ্ত। এবার তপোবনের আহ্বান, বৃহত্তের আহ্বান। তপস্যার আগুন জ্বলে উঠল।

ওদিকে রাজা গাধি তীর্থ করতে বেরিয়েছেন। কুড়িয়ে কুড়িয়ে ফিরছেন রেণু রেণু পুণ্য। সঙ্গে আছেন সহধর্মিণী, সত্যবতীর মাতা।

তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে ওঁরা জামাতার আশ্রমে এসে উপনীত হলেন। সত্যবতী খুশিতে নেচে উঠলেন। মা এসেছেন। তাঁকে চরু দিতে হবে। সত্যবতী দুটি চরু এনেই মায়ের সামনে রাখলেন। বললেন: এটি আমার, এটি তোমার।

মাতা নিজেরটি তুললেন। দিলেন মেয়ের হাতে। মাতা মেয়েরটি তুলে নিলেন। পরম পরিতুষ্ট হয়ে সেইটিই ভোজন করলেন।

সত্যবতী গর্ভে সন্তান ধারণ করেছেন। তাঁর শরীর জ্বলজ্বল করল! তাঁর রূপে ঘোরতর কিসের এক ছায়া যেন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল।

অঘটন ঘটেছে। ঋচীক ধ্যানে জানলেন। এসে সত্যবতীকে বললেন: তোমার মা তোমাকে ঠকিয়েছেন। চরু বদল করে তোমারটি খেয়ে বসেছেন উনি। অথচ ঐ চরুতেই আমি তপস্যার সমস্ত ফল অর্পণ করেছিলাম। তোমার ভাইই হবে প্রদীপ্ত আগুনের মত। ক্রুর কর্মেই মজবে তার মন।

সত্যবতীর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। বললেন: অমন করে বল না।

ঋচীক বললেন: তোমার পুত্র, আমারও পুত্র। চরু কল্পনা করেছিলাম মনোমত। কিন্তু তোমার মায়ের কারসাজিতেই সব উলটে গেল। সাধ্যই না হবে তাই-ই বলছি।

সত্যবতী বললেন: তোমার শক্তি তপের শক্তি। তুলনা নেই। ইচ্ছে হলে অন্যতর এক জগৎও তুমি সৃষ্টি করতে পার। তাই কর না গো! ইচ্ছে কর, পুত্র হোক অন্যরকম—আমাদের মনোমত।

: মন্ত্র পড়েছি, আগুন দেলেছি, চরু তৈরি করেছি। সে তো মিথ্যে হবার নয়। হবেই।

: যেমন চরু তেমন পৌত্র হোক! পুত্র নয়। পুত্র হোক মনের মত। তুমি তেমনটিই কর। যে করে হোক কর।

: পুত্রও যা পৌত্রও তা। একই কথা। নেহাৎ তুমি যখন অত করে বলছ তখন তাইই হবে।

অবশেষে সময় হল। সত্যবতীর পুত্র হল। সত্যবতীর মাতারও পুত্র হল। সত্যবতীর হল জমদগ্নি। আর মাতার হল বিশ্বামিত্র।

ঋচীকের চরু মিথ্যা হবার নয়। ফলে জমদগ্নির হল পরশুরাম নামক এক পুত্র।

একদা কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুনের দাপে চারিদিকে জ্বলে উঠল আগুন। অর্জুনের হাজার বাহু। অর্জুন বর পেয়েছিলেন। বরের প্রসাদে তাঁর শরে অগ্নির অধিষ্ঠান হয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর অর্জুনের শরে জ্বলে পুড়ে ছাই হল। আশ্রমও রেহাই পেলনা। আশ্রমের অরণ্য পুড়ল, বরুণের গৃহ পুড়ল। মহর্ষি আপস্তম্ব ছুটে এলেন। তাঁর আশ্রম দাউ দাউ করে জ্বলছে। আপস্তম্ব রাগে দুঃখে শাপ দিলেন ঃ তোমার ঐ উন্নত মস্তক একদা ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে। পরশুরাম আসবেন। মুণ্ডপাত করবেন তোমার।

পরশুরাম শিবের শিষ্য। শত শত অস্ত্রে পূর্ণ তাঁর তূণ। শিবের প্রসাদে পরশুরামের অখণ্ড প্রতাপ।

অর্জুনের শেষ ঘনিয়ে এল। একদা জমদগ্নির আশ্রমে রাজা অর্জুনের আবির্ভাব ঘটল। জমদগ্নি রাজার পূজা পেলেন। অর্জুন ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। এক পাশে ছিল জমদগ্নির হোমধেনু। দিব্য ধেনু। অর্জুন লুব্ধ হলেন। ভাবলেন অমন ধেনুই তাঁর চাই। অমন ধেনু আশ্রমে কি মানায়!

অর্জুন বললেন ঃ আপনাকে বহু ধেনু আমি দিচ্ছি। কিন্তু এইটি আমার চাই।

জমদগ্নি বললেন ঃ সে হয় না।

রাজার ইচ্ছা। ঋষির অনিচ্ছা। রাজা বাহুবলে ঋষির অনিচ্ছাকে অতিক্রম করতে চাইলেন। জমদগ্নি নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরশুরাম ছিলেন বনমধ্যে। তিনি বেরিয়ে এলেন। অর্জুনের সহস্রবাহু ছিন্ন হল।

পরশুরাম অর্জুনকে নিরস্ত্র করে সোজা চলে এলেন মহেন্দ্র পর্বতে। সেখানে চলল তাঁর তপস্যা। একদা তিনি শিবের কাছে গমন করলেন।

পরশুরাম নেই। আশ্রমে অসহায় জমদগ্নি। অর্জুনের পুত্ররা জমদগ্নির আশ্রম তছনছ করল। আঘাতে আঘাতে জমদগ্নি নিহত হলেন।

পরশুরাম ফিরলেন। পিতার শরীরে ক্ষতের পর ক্ষত। পরশুরাম শিউরে উঠলেন। রাগে তাঁর কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হল। পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করলেন যত আঘাতে পিতার মৃত্যু হয়েছে ঠিক ততবার তিনি পৃথিবীকে করবেন নিঃক্ষত্রিয়।

পরশুরাম প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন। বারংবার পৃথিবীর মাটি ক্ষত্রিয়ের রক্তে লাল হয়েছিল। পরশুরামের পাপ হয়েছিল। কিন্তু সে পাপ দূর হয়েছিল।

পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রইল না একজনও। ওঁদের পত্নীরা আশ্রয় নিলেন

আশ্রমে। ঋষিদের সান্নিধ্যে সেইসব পত্নীতে আবার বহু বহু ক্ষত্রিয়ের জন্ম হল। পরশুরাম তপস্যায় ডুবে। কিন্তু পিতার ক্ষতবিক্ষত শরীরের স্মৃতি তাঁকে আবার শক্তি যোগাল। ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে ভুবন ভরেছে। পরশুরাম এলেন। একজন ক্ষত্রিয়ও বেঁচে রইল না।

পরশুরাম তপস্যায় বসবেন। কিন্তু পৃথিবী পালন করতে হবে। ব্রাহ্মণদের হাতে পৃথিবীর ভার তুলে দিয়ে পরশুরাম তপস্যায় ডুবে গেলেন। আবার ক্ষত্রিয়বংশের উত্থান, আবার পরশুরামের উত্থান। বধে বধে অযুত পাপে পরশুরাম কাতর হলেন। পাপ দূর করতে হবে। একুশবার পৃথিবী দান করলেন। কশ্যপকে দক্ষিণা দিলেন ধেনু। তপস্যা করলেন। নিয়ম করলেন। কিন্তু পাপের ক্ষয় হল না।

পরশুরাম অবশেষে কশ্যপকে সুধোলেন ঃ উপায় কি নেই কোন ?

কশ্যপ বললেন ঃ তুলা পুরুষ দান কর। ক্ষয় হবে তাবৎ পাপ।

পরশুরাম তুলায় আরোহণ করলেন। ওদিকে চাপানো হল স্বর্ণ।

পরশুরাম বললেন ঃ যে পাপ এ যাবৎ করেছি সে পাপ নষ্ট হোক। তুলাপুরুষ ও মহাদেব একই। মহাদেব সেই পাপ নষ্ট করুন। আমার যা ওজন সেই ওজনের সমান যে স্বর্ণ তুলাতে অর্পণ করা হয়েছে তার সঙ্গেই আমার তাবৎ পাপ দূর হোক। আমি বিধৌত হই। পুণ্যের সাগর আসুক এগিয়ে।

সমস্ত স্বর্ণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হল। পরশুরামের ঠাঁই হল স্বর্গে।

দানের দান তুলাপুরুষ দান। পরশুরামের অত পাপ। তুলাপুরুষের কল্যাণে সব ভার নেমে গেল। পাপকে মিলল ত্রাণ, আলোয় ভাসা স্বর্গ এল এগিয়ে, ফুলে ধোয়া স্বর্গ এল এগিয়ে। কোল বাড়িয়ে যেন তুলে নিল কোলের সন্তানে॥

৮৬. অনন্তদেব

শিব। ব্যোম। বায়ু। অগ্নি। জল। ধরা। একের পর এক। অবশেষে ধরা প্রভৃতি পঞ্চভূতে মিলেমিশে একাকার হল। উৎপন্ন হল বিশাল এক অণ্ডের।

সময়ের স্রোত বইল। অণ্ডটি রইল। অবশেষে একদিন অণ্ডটি দুভাগে ফেটে গেল। বেরিয়ে এলেন ব্রহ্মা।

অণ্ড ছিল জলে। সেখানেই দুভাগে ফেটে গেল। এক অর্ধ গেল জলের

তলে। সেই তলেই সাত পাতাল, সাত ঊর্ধ্বভুবন।

অণ্ডের এক অংশ রইল জলের গভীরে। ব্রহ্মা বলেছিলেন। বিষ্ণু একেই মাথায় করে ধরে রইলেন। উনিই অনন্তনাগ, উনিই শেষ নাগ। উনি কেমন, উনি কি—এ কথার উত্তর নেই কোন।

স্বস্তিকের আকার তাঁর। অঙ্গে অমলভূষণ। সহস্রমস্তকে সহস্রমণি। মণি থেকে আলো ঠিকরে পড়ে। আলোয় আলোয় ভরে এদিক ওদিক চতুর্দিক। চোখে আগুনের ভাঁটা। সে ভাঁটা ঘুরছে, মদে ঘুরছে। মাথায় কিরীট, গলায় মালা, কানে কুণ্ডল। সাদা হারে লাল কাপড়ে রচিত তাঁর সজ্জা। সন্ধ্যা নামে। গঙ্গা বয়। তিনি জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকেন। মনে হয় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কৈলাস পর্বত। ইনি অনন্ত। ইনি বিষ্ণু। হাতে এঁর লাঙ্গল, হাতে এঁর মুষল। বরুণকন্যারা এঁরই শক্তির কণা। কন্যারা, কণা কণা শক্তিরা ঐ মহাশক্তির উপাসনায় নিত্য তুষ্ট হন। কল্পের শেষ আসে। ওঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সংকর্ষণ-স্বরূপ রুদ্র। বেরিয়ে আসে যেন আগুনের শিখা। শিখার মাথায় বিষের নীল আভা। তিন জগৎ তিনি গ্রাস করেন।

পাতালতলে শেষ নাগ। মাথায় পৃথিবী। মাথায় একদানা সর্ষপ। মাথায় জড়ানো একটি ছোট্ট মালা।

কে ইনি? কেমন এর শক্তি? নির্ণয় করে কার সাধ্য?

অনন্তদেব শ্রান্ত হন। হয়ত কোন সময় হাই তোলেন। অমনি থরথর, কেঁপে উঠে পৃথিবী।

নাগবধূদের হাতের হরিচন্দনের অনুলেপন। ওঁর নিশ্বাসের বায়ুতে ছিটকে সে অনুলেপন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দিকসমূহ সৌরভে ভরে উঠে। দিকসমূহ অনুলেপনে অঙ্গের রাগ বাড়িয়ে তোলে, আমোদিত হয়।

লোকসমূহ মাথায় ধরে রেখেছেন। অখণ্ড এঁর পরাক্রম। পরিমাপ করে মর্ম বোঝে হেন সাধ্যও নেই কারও।

সাত পাতাল। পরম রম্যস্থান সপ্তপাতাল। পাতাল, সুতল, বিতল, নিতল, মহৎ সুতল, অগ্র্যসুতল ও রসাতল—সুখের আলোয় ভাসে সাত পাতাল। রত্ন ছড়ানো সাত পাতালে। এখানে রত্নের প্রাসাদ, ওখানে সোনার ভূমি। দৈত্যদানব ভাগ্যবান, নাগ ও রাক্ষস—এরাও ভাগ্যবান। এরা বাস করে এমন সুন্দর জায়গায়।

পাতাল সুন্দর। স্বর্গও হার মানে। নারদও বলেছিলেন পাতালের কাছে স্বর্গ লাগে না। এখানে মণিরত্ন থেকে নিয়ত অযুত আহ্লাদ গলে গলে পড়ছে। এখানে এদিকে দেবকন্যা, ওদিকে দেবকন্যা। অল্প অল্প করে মৃদুমন্দ চলনে ওঁরা চলে বেড়ান। স্বর্গে নয়, এমন জায়গাতেই মন বসে।

দিনে সূর্য নেই, রাতে চন্দ্র নেই, অথচ আলোয় আলোয় পাতাল ভেসে

যায়। শীত নেই, গরম নেই, কষ্ট নেই। আছে শুধু প্রমোদের রসে ভেসে যাওয়া। সময় যায়, কিন্তু বোঝা যায় না। শুধু বসন্ত নয়, সদাসর্বদা কোকিলের মধুমধু বোল, পদ্মে পদ্মে ভরা নদী সরোবর, গানে গানে বিহ্বল বাতাস। এমন যে পাতাল তার প্রশংসায় নারদ তো পঞ্চমুখ হবেনই॥

৮৭. নারী মঙ্গল

এ লোকে, ও লোকে, সে লোকে, লোকে লোকে নারদের গতায়াত। নারদ চলেছেন। চলতে চলতে একদা নারদের মনে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বিদ্যুৎ হল অচঞ্চল।

নারীরা কেমন, কি প্রকার তাদের মতিগতি ঃ নারদের মনে প্রশ্নের এই বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে অচঞ্চল জ্যোতিতে জ্বলতে লাগল।

নারদ চলছেন। মনে বিদ্ধ রয়েছে বিদ্যুতের অংকুশ। নারদ যেন পথ পেলেন। সম্মুখে লাবণ্যের এক সায়র। সম্মুখে স্বর্গবেশ্যা পঞ্চচূড়া।

নারদ বললেন ঃ কিছু সুধাবার আছে। বলবে কি?

পঞ্চচূড়া বললেন ঃ যদি শোনা এবং বলার মত হয় তাহলে অবশ্যই বলব।

ঃ যা বলার মত নয় তেমন কথা বলতে কখনো বলি না। নারীর স্বভাব সম্পর্কে [illegible] কিছু জানতে চাই। এ কথা নিশ্চয় কহতব্য?

ঃ তবে শুনতে হবে নিন্দার কথা। কারণ ও ছাড়া কিছু বলার নেই। অথচ আমি নারী। নারী হয়ে নারীর নিন্দার মুখো হব? হয়ত উচিত হবে না। তাছাড়া আপনি তো জানেন। নারীর স্বভাব সম্পর্কে দেবর্ষি নারদ অবহিত নন একথা অবিশ্বাস্য। আমাকে মিছি মিছি বিব্রত করছেন।

ঃ মিথ্যা বললে দোষ। সত্য বলাতে দোষ নেই। তুমি বল। সংশয় কর না কোন।

পঞ্চচূড়া সুন্দর করে একবার হাসলেন। হাসিতে ঝরল সম্মতি।

পঞ্চচূড়া বললেন ঃ জগতে কত পাপ। তাবৎ পাপের মূলে নারী। নারী যেন পাপের এক কুণ্ড। ছুঁয়েছ কি ঝলসেছ। বড় বংশে জন্ম, রূপের ডালি, বিবাহও হয়েছে যোগ্য পুরুষের সঙ্গে। ভাবি এমন মেয়েই সুখী হয়, মন দিয়ে ঘর করে, কুলের মান রাখে। কিন্তু এমন মেয়েও কুলের মুখে কালি দেয়। ... স্বামীর জগৎজোড়া নাম ভাণ্ডারভরা ধন, অঙ্গে অঙ্গে বিগলিত পৌরুষ। ভাবি এমন মেয়েরা পতিকে কি ভালই না বাসে। কিন্তু ছাই, একটু মাত্র ছল পেলেই এমন মেয়েও কুলমজিয়ে সরে পড়ে।

পঞ্চচূড়া ক্ষণকাল থেমে রইলেন। নারদের চোখের তারায় কি ভাষা ফুটে

উঠেছিল কে জানে। পঞ্চচূড়া সোৎসাহে বলতে লাগলেন ঃ ঘোর পাপী। তাতে কি যায় আসে! পুরুষ হলেই হল। লজ্জার মাথা খেয়ে নারীরা ছোটে তারই পিছনে।…পুরুষের মন হয়ত মজেছে। ইঙ্গিতে ডেকেছে কোন নারীকে। কেমন পুরুষ তা জানার দরকার নেই। পুরুষ তো বটে! নারী ছুটে আসে। বারবার আসে। হয়ত বলবেন, এমন নারীও সংসারে আছে যারা পতিব্রতা। আসলে কোন পুরুষ তাকে কোনদিন হয়ত চায়নি, বাড়ির লোকেদের ভয়, কুলের মান—এ সবই তাকে বেঁধে রাখে। নইলে ভেসে যেতে কোন রমণীর তেমন দেরি কখনো হয় না।

পঞ্চচূড়ার উৎসাহ বেড়েই চলল ঃ পুরুষ হলেই হল। দেখতে যা খুশি হোক না কেন। পুরুষ তো বটে। ছোট হোক বড় হোক, মোহে পড়লে স্ত্রীলোক সব ভোলে। নিকট আত্মীয়, নিতান্ত অগম্য—কিন্তু মুগ্ধা স্ত্রীলোককে কোন রকমেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না। হয়ত ঘরের সবাই ভালবাসে, যত্ন করে, মান দেয়—কিন্তু তবু স্ত্রীলোকের মন অন্য পুরুষের জন্য ছুঁকছুঁক করে।…বোবা, কানা, কালা, বেঁটে, কুঁজো, কালো কুৎসিত কোন কিছুই তখন কিছু নয়। পুরুষ যদি নাও জোটে, নিজেদের মধ্যেই ওরা লিপ্ত হয় কামক্রিয়াতে। নিতান্ত যার কপাল মন্দ ঃ কেউ জোটে না, গুরুজনের ভয়, মারের ভয়—এ সবই তাকে সতীলক্ষ্মী করে।…কাঠে অগ্নির আশ মেটে এমন কথা কি কখনো শুনেছেন? নদীতেও সমুদ্রের আশ মেটে না, যমেরও মেটে না প্রাণীতে। স্ত্রীলোকেরও অমনি। পুরুষে ওদের আশ মেটে না।…আরো শুনবেন?

নারদ নীরব হয়ে কি ভাবছেন। উত্তর দিতে বিলম্ব হচ্ছে। সাহস পেয়ে পঞ্চচূড়া বলেই চললেন ঃ সম্মুখে পুরুষ। স্ত্রীলোকের মনে জ্বলে আগুন। অগোচরে ঘটে কামনাক্ষরণ।…একদিকে অযুত সুখ, অমেয় ঐশ্বর্য, রাশি রাশি গয়নাগাঁটি। অন্যদিকে রতিসুখ। স্ত্রীলোক দ্বিতীয় সুখকেই মানে কাম্য বলে। এই জন্যেই বলেছি সব পাপের মূলে ওরা। একদিকে কালান্তক, বাড়বানল, পাতাল, মৃত্যু, ক্ষুরধারা, বিষ, সর্প, অগ্নি আর অন্যদিকে একমাত্র স্ত্রীলোক। সৃষ্টির শুরু হতেই ওদের হাড়ে হাড়ে নষ্টামি।

নারদের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। উনি উঠে দাঁড়ালেন। আপাতত উনি শ্রান্ত হয়েছেন, শান্তিও মেনেছেন।

বেয়াড়া অঙ্কুশে মন বিদ্ধ ছিল। নারদ বুঝলেন সে যন্ত্রণার উপশম হয়েছে॥

অবশেষে মদন লজ্জা পেলেন।

স্বভাবে চরিত্রে প্রভার তুলনা ছিল না। অষ্টাবক্র তাকে জানতেন।

একদা অষ্টাবক্রের মনে হল : বিবাহ করতে হবে। উনি চিন্তা করলেন। বারবার প্রভার কথাই তাঁর মনে হল। অত্যুত্তমা নারী। স্বভাবে সাধ্বী।

প্রভার পিতা ঋষি বদান্য। অষ্টাবক্র বদান্যের কাছে কথাটি পাড়লেন। বললেন : প্রভাকে বিবাহ করতে চাই। অনুমতি কি পাব ?

বদান্য বললেন : পাবে, তবে বিবাহের আগে তোমাকে উত্তর দিকটা একবার দেখে আসতে হবে।

: যাব, কিন্তু কি দেখতে হবে তা তো বললেন না ?

: কুবেরের পুর, তারপর হিমালয়, কৈলাস। এসব পেরিয়ে বিস্তৃত এক বনভূমি। দূর থেকে মনে হবে যেন নীল মেঘ। যেতে হবে সেখানে। সেখানে যাবে। দেখা পাবে এক তপস্বিনীর। সেই তাঁকে পূজা করে ফিরে এলে প্রভার সঙ্গে তোমার বিবাহে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

: তাই যাব।

: বলছ বটে, কিন্তু পারবে কি ?

: শেষ পর্যন্ত না হয় দেখুনই।

অষ্টাবক্র যাত্রা করলেন। ক্রমে হিমালয়ে এসে পৌঁছুলেন। চলতে চলতে অষ্টাবক্র শ্রান্ত হয়েছিলেন। বাহুদা নদী দুবাহু বাড়িয়ে তাঁকে ডেকে নিল। অষ্টাবক্র বাহুদার পুণ্যজলে স্নান করলেন। ধারে কাছে নদীরই তীরে কোথাও শয়ন করলেন। ঘুম ভাঙ্গল একেবারে ভোরে। আবার স্নান করে শরীর জুড়িয়ে অষ্টাবক্র চলতে শুরু করলেন। ক্রমে রুদ্রাণী কূপ। পুণ্যজল। অতএব স্নান। অতঃপর কৈলাসের পথ। চলতে চলতে মন্দাকিনী নদীর কলধ্বনি অষ্টাবক্রকে আকর্ষণ করল। স্নান করে নদীর তীরেই উনি বসলেন।

কুবেরের অনুচর যক্ষরা এসে বলল : আমাদের রাজা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

ঋষি এসেছেন। কুবের যথাবিধি পূজা করলেন। বললেন : আপনি এসেছেন এ আমার পরম ভাগ্য। আমার গৃহে থাকুন। অসুবিধে হবে না কোন।

অষ্টাবক্র প্রীত হলেন। কুবেরের ভবনে উনি আশ্রয় নিলেন। কুবের অতিথির সেবায় ত্রুটি রাখলেন না কোন। পাদ্য এল, অর্ঘ্য এল, আসন এল। অষ্টাবক্র স্বস্তিতে বসলেন। চতুর্দিকে দেবতা ও গন্ধর্বগণ।

কুবের বললেন ঃ নৃত্যে কি আপনার রুচি আছে ?

ঃ কেন থাকবে না ?

নৃত্য শুরু হল। বাদ্য বেজে উঠল। ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্বশী, সুকেশী, সুমুখী, মিশ্রকেশী নাচতে নাচতে এগিয়ে এলেন। আরো এলেন রম্ভা অলম্বুষা, চিত্রা, হাসিনী, রতিপ্রিয়া ও মনোহরা। গন্ধর্বরা তালে তালে বাদ্য করলেন। নৃত্য চলল। অষ্টাবক্র বিমুগ্ধ হলেন।

ওদিকে ওঁরা সব নেচেনেচে ক্লান্ত হয়েছেন। কিন্তু ঋষি কিছু বলছেন না। ক্লান্ত পায়েই ওঁরা নেচে চললেন। যদি ছন্দ কাটে, যদি থেমে যায় পদপতন তাহলে ঋষি কুপিত হতে পারেন। ঋষির কোপ মানেই শাপশাপান্ত। ক্লান্ত পায়েই ওঁরা নেচে চললেন। দেখতে দেখতে কেটে গেল দিব্য এক সংবৎসর।

কুবের সব বুঝতে পারছেন। বলিবলি করেও কিছু বলতে পারছিলেন না। অবশেষে অষ্টাবক্রকে বললেন ঃ এক দিব্য সংবৎসর কেটে গেছে। এবার কি করব আজ্ঞা করুন।

বিমুগ্ধ অষ্টাবক্রের ঘোর কাটল। উনি বললেন ঃ আহা, কি সুন্দর ! খুব যত্ন করলে যাহোক। বড় আনন্দ হল। তোমার কল্যাণ হোক। এবার আমাকে যেতে হয়।

অষ্টাবক্র আরও উত্তরে এগিয়ে চললেন। কৈলাস, মন্দর এবং হিমাচল পেরিয়ে সমতলে নেমে এলেন। সম্মুখেই প্রসারিত সেই বনভূমি। মনে হয় যেন নন্দনের কানন। ছোট ছোট পাহাড়—যেন সোনামোড়া রত্নে ঝলমলানো। সমতলভূমি, মণিরত্ন-ছড়ানো, ঝকমক করছে। কত শত সরোবর। সরোবরের জলে আলো জ্বলছে। দেখতে দেখতে আনন্দে ভরপুর হয়ে অষ্টাবক্র পথ চললেন। এসে দাঁড়ালেন এক প্রাসাদের সামনে। কুবেরের গৃহও এর কাছে কিছু নয়। দূরে দূরে পাহাড়ের কত কত চূড়ো। চূড়োতে চূড়োতে সুন্দর সুন্দর বিমান। বিমানে বিমানে অপ্সরাদের শতেক খুশি। মন্দাকিনী নদী। মন্দার ফুল। তোরণে তোরণে মুক্তোর জাল। এদিকে আরও কতকগুলি পর্বত। পর্বতের উপর সুন্দর সুন্দর গৃহ। অষ্টাবক্র ঘুরে ঘুরে দেখলেন। নয়ন ও মন যেন তাঁর সার্থক হল।

অষ্টাবক্র ভেবে পেলেন না কোথায় তিনি যাবেন। সম্মুখে বিশাল এক প্রাসাদ। অষ্টাবক্র এগিয়ে গেলেন। কাউকেই দেখতে পেলেন না। চিৎকার করে বললেন ঃ কে আছ ? দ্বারে অতিথি। আমি অতিথি এসেছি।

অষ্টাবক্র হঠাৎ চমকে গেলেন। কেউ কোথাও নেই। কিন্তু পলকে সাতটি মেয়ে বেরিয়ে এল। অষ্টাবক্র চোখ তুলে বুঝলেন এদের রূপ বর্ণনার নয়। এদের দেখলে নয়ন জুড়ায়, মন ভরে।

ওরা বলল ঃ আসুন। ভিতরে আসুন।

অষ্টাবক্র কেমন যেন অবাক হলেন। ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

ঘরে রত্নের পালঙ্কে এক কন্যা শুয়ে রয়েছেন। তাঁর পরনে শুচি বস্ত্র, সর্ব অঙ্গে বহু আভরণ। দেখে মনে হয় পরম সাধ্বী। পালঙ্ক ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঋষিকে বললেন ঃ আসুন, আসুন।

ঋষি বললেন ঃ স্বস্তি। স্বস্তি। স্বস্তি।

কন্যা বললেন ঃ বসুন।

অষ্টাবক্র এদিক ওদিক দেখে বুঝলেন কন্যাদের মধ্যে কামের ভাব যেন বড় বেশি। ওটি ওঁর পছন্দ নয়। সোজা বলেও দিলেন ঃ যিনি সর্বদা সৎ আচরণ করেন, সৎ কথা চিন্তা করেন কেবল তিনিই যেন তাঁর দেখা শোনার ভার নেন। অন্যেরা নিজের নিজের ঘরে যেতে পারেন।

অষ্টাবক্র পালঙ্কের উপর বসেছিলেন। একজন সেখানেই রইলেন। তাঁর বয়স একটু বেশি। তিনিই অষ্টাবক্রের সেবার ভার নিলেন।

রাত্রি হল। ঋষি শয়ন করলেন। অন্য শয্যায় রইলেন সেই কন্যা। ঘর অন্ধকার। অষ্টাবক্র ডেকে বললেন ঃ রাত অনেক হল। এবার শোও।

সেই কন্যার শরীর কেঁপে উঠল। শীতের ছল করে অষ্টাবক্রের শয্যায় এসে তিনি উপস্থিত হলেন। দুটি নরম হাতে ঋষিকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন ঃ আজ কি আনন্দ !

অষ্টাবক্র কাঠের মত পড়ে রইলেন। তাঁর শরীর কেঁপে উঠল না, রোমাঞ্চিতও হল না। ইটকাঠের মত তিনি পড়ে রইলেন।

কন্যা বুঝলেন অষ্টাবক্র নিতান্ত শীতল। তাঁর মনে লাগল। বললেন ঃ স্ত্রীলোকের অধীরতা একটু বেশিই। আমি কাতর হয়ে চাইছি। এতে আপনার কোন দোষ হবে না। আপনাকে দেখামাত্র কি ভালই যে আমার লেগেছে !···আপনার কত ভাগ্য। বলতে পারেন তপস্যার ফল। এই সুন্দর বনভূমি। এই প্রাসাদের পর প্রাসাদ—সবই আমার। সেই আমি আপনাকে চাইছি। সেই আমি আপনার একটু ছোঁয়ার কাঙাল হয়েছি। সঁপে দিয়েছি আপনার পায়ে। নিন, তুলে নিন। এমন সুন্দর ফুল ! সৌরভ গ্রহণ করে কি চরিতার্থ করবেন না ?···আজ এখানে। কাল বনে। এইভাবে এই সুন্দর বনভূমিতে আপনার এবং আমার আনন্দ এক হয়ে কেবলই বাতাসে দুলতে থাকবে।···মদনদেব ভর করেছেন। স্বচ্ছন্দে সে ভার নামিয়ে দিতে পারার মত সুখ আর কিছুতে নয়। জীবনে যদি এ সুখ আসে তাহলে কোন কষ্টই আর কষ্ট নয়। আপনি অমন নিশ্চেষ্ট থাকবেন না। মিনতি করছি। দোহাই আপনার।

অষ্টাবক্র বললেন ঃ তুমি পরস্ত্রী। শাস্ত্র বলে পরস্ত্রীর সংসর্গ দোষের।

আমি দোষ চাই না। আমি চাই গৃহস্থ হতে। বিবাহ করব, পুত্র হবে, স্বর্গে যাব। এর বেশি অন্য কিছু আমি বুঝি না। অতএব বিরত হও।

ঃ নারীর জীবনে কামই পরমবস্তু! পিতা নয়, ভ্রাতা নয়, দেবর নয়, পুত্রও নয় —সমস্ত ভেসে যায়। নদীর ধর্ম কূলভাঙ্গা, আমাদের ধর্ম কুলমজানো।

সকাল হল। অষ্টাচক্র সেই কন্যাকে বললেনঃ বস। বল কি করতে হবে আমাকে। শুধু পরদারগমনের অনুরোধটি কর না।

ঃ কিছুদিন এখানে থাকুন। দেখুন। এ দেশ অন্য, কালও অন্য। দেখুন, সব দেখে যা হয় করুন।

ঃ বেশ। যতদিন উৎসাহ থাকে ততদিন না হয় থাকি, দেখি।

অষ্টাবক্র দেখলেন রমণীর শরীরে বয়সের ছাপ পড়েছে। দিনের আলোয় তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে দেখলেন। যেখানেই নজর পড়ে সেখান থেকে তাঁর মন উঠে আসে। অষ্টাবক্র বিষণ্ণ হলেন। ভাবলেনঃ হয়ত কোন শাপের জের। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভাল দেখায় না।

সারাটা দিন বিষণ্ণ আবেশেই অষ্টাবক্রের কেটে গেল।

রমণী বললেনঃ সন্ধ্যা হয়েছে। কিছু কি লাগবে? আনব?

ঃ জল আনো। স্নান করি। উপাসনার সময় হল।

তেল এল, কাপড় এল। অষ্টাবক্রের আপত্তি নেই। রমণী তাঁর সর্বাঙ্গে তেল মর্দন করলেন। তারপর স্নানের ঘর। অষ্টাবক্র বসলেন। রমণী তাঁকে স্নান করিয়ে পরিপাটি করে খেতে দিলেন।

রাত কেটে গেল। কোথা দিয়ে কাটল অষ্টাচক্র বুঝতেও পারলেন না। দিনের আলো ফুটে উঠতে তাঁর হুঁশ হল। সূর্যকে পুজো করে অষ্টাবক্র জিজ্ঞাসা করলেনঃ আর কি করব?

রমণী অষ্টাবক্রের সম্মুখে সুস্বাদু অন্ন ধরে দিলেন। অল্প খেতেই অষ্টাবক্রের মুখ মেরে এল।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। ঘরে দুটি শয্যা। একটি অষ্টাবক্রের, অন্যটি রমণীর।

রমণী বললেনঃ শুয়ে পড়ুন।

অষ্টাবক্র দেখলেন তাঁর শয্যা জোড়া। রমণীটি দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। ঋষি সব বুঝলেন। বললেনঃ পরদারে আমার মন একটুও আসক্ত নয়। তুমি নিজের শয্যায় যাও। ঘুমোও। ভাল হবে।

রমণী বললেনঃ আমি স্বাধীন। ধর্মটর্ম জানিনা। ওসব ছল।

অষ্টাবক্র বললেনঃ স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নেই।

রমণী বললেনঃ আপনার পায়ে মন বিকিয়েছি। মনে কত ইচ্ছা। মনে মনেই তা মাথা খুঁড়ে মরছে। যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছি। তবু আপনি

দেখবেন না ? পরদারগমনে দোষ একথা নয় মানলাম। আমাকে বিবাহ করে গমন করুন। তাতে তো দোষ নেই কোন। তাতেও যদি অধর্ম হয় তবে সে আমাকেই বাজবে। অমন হেলা করে মাড়িয়ে যাবেন না। ওতেই বরং নষ্ট হবে আপনার ধর্ম।

অষ্টাবক্র বললেন ঃ খুশি হল অমনি করলাম—অমন স্বভাব আমার নয়। পরদার গমন আমি করব না। তুমি নিজের শয্যায় যাও।

ঃ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি কেবল আপনাকেই চেয়েছি। দয়া করে একটু মনোযোগ দিন। আমি তো স্বাধীন। আমি চাইছি।

ঃ স্ত্রীলোক আবার স্বাধীন হয় কি করে ?

ঃ ছোট থেকেই আমি ব্রহ্মচারিণী।

ঃ আমিও তাই। কিন্তু আমার ব্যবহার তো তোমার মত নয়। যা ব্রত তা পালন করাই বিধেয়।

অষ্টাবক্রের মনে কেমন সন্দেহ হল। ভাবলেন পরীক্ষা নয়তো ? হয়ত বদান্য তাঁকে যাচাই করছেন। অষ্টাবক্র মুহূর্তের জন্য দুর্বল হলেন। ভাবলেন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে কোনমতেই তিনি পারবেন না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে বল পেলেন। পারবেন। তিনি পারবেন। অবশ্যই পারবেন। পারলে যে অমেয় কল্যাণ। পারতে যে তাই হবেই।

অষ্টাবক্র অকস্মাৎ বিস্ময়ের ঘোরে পড়লেন। এই দেখলেন বসনে ভূষণে সেজে এক দিব্য কন্যা এল, পরমুহূর্তেই সে-ই পরিণত হল বৃদ্ধাতে।

অষ্টাবক্র সোজা জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমনটি যে করলে তার কারণ কি ? খবরদার মিথ্যে বলনা।

রমণী বললেন ঃ আমি উত্তর দিকের দেবতা। তোমাকে কিঞ্চিৎ চাপল্য দেখানো হল। অবশেষে দেখছি তুমি পরম শ্রদ্ধেয়। তোমার এত সংযম। সত্যিই আমি অন্য মুগ্ধ। শুধু আমি কেন সমস্ত দেবতাই তোমার সংযমে প্রীত হয়েছেন। ঋষি বদান্যর ইচ্ছাতেই আমি এ সব করেছি। এবার তুমি দেশে যাও, বিবাহ করে সুখী হও। প্রভাকেই তুমি পাবে। ঋষি বদান্য নানাভাবে আমাকে প্রসন্ন করেছেন। তাই। নইলে এত কথা তোমার সঙ্গে আমি বলতাম না।

অষ্টাবক্র হাত জোড় করে সেই দেবীর কাছে বিদায় চাইলেন।

অষ্টাবক্র দেশে ফিরে এলেন। ঋষি বদান্য বললেন ঃ তোমার মত পাত্র মেলা ভার। এবার তিথি নক্ষত্র দেখে প্রভাকে বিবাহ কর।

অষ্টাবক্র বিবাহ করলেন। বিবাহের রাত্রে কেবলই তাঁর মনে হল যাকে নিলে মনের কালিমা দূর হয় এমন নারী বা পুরুষ দুইই দুর্লভ ॥

৮৯. সতীত্ব

সূর্য, ইন্দ্র এবং অগ্নি। তিন দেবতা। তিনজনেই সহসা একদা মেয়েদের কথায় মেতে উঠলেন। ওঁদের মনে পড়ল অরুন্ধতীর কথা।

সতী শিরোমণি অরুন্ধতী। তিনি বলেছিলেন। তাঁর কথা ফেলার নয়। অনেক সত্য আছে তাঁর কথায়। তিন দেবতা এই নিয়ে বহু বলাবলি করলেন। মেয়েদের নাকি স্বামীই সব। ব্রাহ্মণের কাছে যেমন সূর্য ও অগ্নি, গৃহস্থের কাছে যেমন অতিথি, তেমনি মেয়েদের জীবনে স্বামী। স্বামীই সব। এ জীবনেও, ও জীবনেও। সব পাওয়াই ঐ স্বামী থেকে। এটি চরম সত্য। অথচ খুব কম মেয়েই এটি মানে। বেশির ভাগই ভাবে অন্যরকম, চলেও সেই মত। তাই ওরা মন্দ। মন্দ বলেই এমন সুন্দর কথাও ওদের কাছে আমল পেলনা। ওরা মিথ্যার বশ, অহেতুক সাহসে ভরপুর, মায়া ছড়াতে অতিশয় নিপুণ, নির্বুদ্ধিতাতেও অদ্বিতীয়। শুধু কি এই?

অরুন্ধতী নাকি আরও তিনটি দোষের কথা বলেছিলেন ঃ ওদের লোভের শেষ নেই, শুচিতার কথা বললে ওদের চক্ষু চড়ক গাছ হয়, আর দয়া ? ওদের কাছে দয়া মস্ত এক বালাই।

সূর্য, অগ্নি ও ইন্দ্র এসব কথা বলাবলি করলেন ঃ ফেলার কথা নয় বাপু। যার তার কথা এ নয়। অরুন্ধতী, ভুবনজোড়া তাঁর নাম। এসব কথা সেই তাঁর। অগ্নি সপ্তর্ষির পত্নীদের দেখে একবার কান্ডজ্ঞান খুইয়ে বসলেন। সেবারে কি কাণ্ডই না হল। সে সব তো ভোলার নয়। ভাবো না একবার। ভাবলেই বুঝবে ঃ অরুন্ধতীর মহিমা যেমন-তেমন নয়।

সূর্য বললেন ঃ স্বাহা দেবী পরম সতী। স্বামীর কাণ্ড দেখে উনি আর থাকতে পারলেন না। নিজেই সাত ঋষির সাত পত্নীর সাজ করে অগ্নিকে ভোলাবেন ঠিক করলেন। ছজনের সাজ করলেনও। কিন্তু পারলেন না কেবল অরুন্ধতী সাজতে। স্বাহা দেবী শেষ পর্যন্ত অরুন্ধতীকে স্তব করে বলেও ছিলেন ঃ পতির প্রতি আমার নিষ্ঠা কম নয়। কিন্তু আমিও আপনার কাছে দাঁড়াতে পারি না। অন্যের কথা ছেড়েই দিন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ওঁরা আবার বললেন ঃ যে ভাল সেই ভাল-র মর্ম ভাল বোঝে। স্বাহাদেবী বুঝেছিলেন। তাই অরুন্ধতীকে অমন কথা বলেছিলেন। আমাদের যদি কিছু জানতেই হয় তাহলে যাওয়া উচিত সেই অরুন্ধতীর কাছে। সতীত্ব সম্বন্ধে সারকথা শোনাতে পারেন কেবল তিনিই।

তিন দেবতা এসে দাঁড়ালেন বশিষ্ঠের আশ্রমের দুয়ারে। ওঁরা দেখলেন ঃ কাঁধে কলসী নিয়ে অরুন্ধতী বের হচ্ছেন।

সূর্য অগ্নি ও ইন্দ্র খুব খুশি হলেন। অরুন্ধতী দেখলেন সামনেই তিন দেবতা। উনি ওঁদের প্রণাম করলেন, প্রদক্ষিণ করলেন। বললেনঃ কেন এসেছেন বলুন।

ওঁরা বললেনঃ সামান্য দুএকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। যদি উত্তর দেন, কৃতার্থ হব।

ঃ আসুন, ভিতরে বসবেন।· যদি অনুমতি করেন তাহলে কলসীটা আগে ভরে নিয়ে আসি। দুদন্ডও লাগবে না। তারপর ধীরে সুস্থে শুনব, যদি পারি বলবও।

ঃ কলসী আমরাই ভরে দিচ্ছি। এক দণ্ডও লাগবে না। আপনি বরং বসুন।

ঃ তাহলে তাই দিন।

ইন্দ্র বললেনঃ তপস্যাব কিংবা ব্রহ্মচর্যের বলে আমাকে কেউ স্বর্গচ্যুত করবে ব্রাহ্মণ থেকে এমন ভয় যদিই আমার না থাকে তাহলে সেই সত্য দ্বাবা এই কলসের সিকিভাগ জলে ভরে উঠুক।

অগ্নি বললেনঃ হব্য কব্য বা হবিষ্য দ্রব্য থেকে যদি আমার তৃপ্তি হয়ে থাকে কিংবা ভোজনে ব্রাহ্মণরা পরিতৃপ্ত হলে যদিই আমি পরিতোষ মেনে থাকি তাহলে সেই সত্য দ্বারা এই কলসের আর এক সিকি জলে ভরে উঠুক।

সূর্য বললেনঃ জল ছড়িযে ব্রাহ্মণরা নিত্য অসুরদের বিনাশ কবেন। তাই অসুরবা আমাকে নিত্য সংগ্রহ করে এবং আমি নিত্য উদিত হই। এই সত্যে আপনাব এই কলসের আর এক সিকি জলময় হোক।

অরুন্ধতী বললেনঃ নির্জন জায়গা পেলেই বিপদ। পুরুষের সঙ্গে পরিপাটি করে আলাপ করার সুযোগ পেলেই বিপদ। মেয়েরা যতক্ষণ এ অবস্থার মধ্যে না পড়ে ততক্ষণই তাদের সতীত্ব। এই সত্যে আমাব কলসেব শেষ সিকিও ভরে উঠুক।

কলস ভবে উঠল কানায় কানায়। তিন দেবতাই অবাক হয়ে অরুন্ধতীর কথা শুনলেন। ঘোর কাটলে সমস্বরে বললেনঃ আমাদের আসা সার্থক।

অরুন্ধতী বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন। কি নাকি সুধাবার ছিল, কি নাকি সুধাবার ছিল—তাঁর বিস্মিত চোখের তলে এই প্রশ্ন।

তিন দেবতার মুখেই প্রসন্নতার আলো। ওঁরা বললেনঃ উত্তর পেয়েছি।

অরুন্ধতী বললেনঃ সবটা হয়ত পাননি। মেয়েরা আসলে তিন রকমেরঃ এক উত্তম, দুই মধ্যম আর তিন অধম। দেবতারা কিন্তু এর সব রকমেই খুশি॥

৯০. লিঙ্গপূজা

জল, জল আর জল। সৃষ্টির গোড়ায় জগৎ ছিল জলময়। এই জল থেকেই উঠে এলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব।

ওঁরা দেখলেন কিছু নেই, শুধু তরলিত প্রবাহ। দেখতে দেখতে বাতাস উঠল। ভয়ানক বাতাসে সাতসাগর শুকিয়ে গেল। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিলুপ্ত হল।

এক সূর্য হলেন বারো সূর্য। পূর্বে দক্ষিণে উত্তরে পশ্চিমে চার, আর উপরে আট। বারো সূর্যের তেজে সব কিছু শুকিয়ে কাঠ হল, সব কিছু পুড়ে ছাই হল। বারো সূর্য -ইনিই কালাগ্নি, রুদ্র। পাতাল থেকে উনি উঠে এলেন! দিকসমূহ ভরল প্রখর তেজে। সব পুড়ল, পুড়ে পুড়ে শূন্যে মিলাল। রুদ্রদেব আবার প্রবিষ্ট হলেন পাতালতলে।

তারপর মেঘেদের উৎসব। জলে জলে ভরল চরাচর। আবার জল, জল, আর জল।

বুকজলে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মহাদেবকে বললেন: এবার সৃষ্টি করুন।

মহাদেব বললেন: করব।

মহাদেব জলের তলে ডুব দিলেন। সহস্র দিব্য বৎসর কেটে গেল। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অস্থির হলেন। কি করব কি করব—ওঁদের মনে এই বেদনা।

বিষ্ণু বললেন: সময় বয়ে যায়। আর নয়। এবার সৃষ্টি করুন। আপনিই এ কর্মের যোগ্য পাত্র। আমিও করব সাধ্যমত।

সৃষ্টির স্রোত বইল। ধীরে ধীরে ভেসে উঠল সৃষ্টির কত কত বুদ্বুদ। দেবাসুরে, গন্ধর্বে ও রাক্ষসে, যক্ষ ও সর্পে জগৎ ভরে উঠল।

এদিকে মহাদেব অতল জল থেকে ভেসে উঠেছেন। এবার তিনি সৃষ্টি করবেন। কিন্তু দেখলেন জগৎ পরিপূর্ণ। তাঁর এতদিনের শক্তি সঞ্চয়! অথচ কাজে আসবে না কোন। মহাদেব রাগে জ্বলে উঠলেন। সৃষ্টি সাঙ্গ। কিন্তু তিনি কি করবেন? মন বলল: ধ্বংস, ধ্বংস। মহাদেবের মুখ থেকে ধক ধক করে আগুন বেরুল। সমস্ত সৃষ্টি পুড়তে থাকল।

ব্রহ্মা ছুটে এলেন। বললেন: করেন কি, করেন কি?

স্তবে স্তুতিতে মহাদেব অবশেষে পরিতুষ্ট হলেন।

বললেন: তোমার এই সৃষ্টি জ্বালিয়ে দেব বলেই প্রচুরতম ও প্রখরতম তেজ আহরণ করেছি। তুমি বলছ, রক্ষা করুন রক্ষা করুন! কিন্তু অত তেজ রাখব কোথায়?

ব্রহ্মা ফাঁপরে পড়লেন। অনেক ভেবেচিন্তে বললেনঃ সূর্যমণ্ডলে নিবেশিত করুন। যখন জগৎ গিয়ে দাঁড়াবে সংহারের উপকূলে তখন আমরা সূর্যমন্ডলে গিয়েই লীন হব। মানুষ তখন তিন সন্ধ্যায় সূর্য বন্দনায় দিশেহারা হবে। সে বন্দনা আমরাই গ্রহণ করব। তারপর আপনিই সূর্যের রূপ নিয়ে সমস্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মহা প্রলয়েব গান গাইবেন।

মহাদেব বললেনঃ ঠিক আছে।

মহাদেব হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেনঃ কিন্তু এ লিঙ্গ নিয়ে কি করব ? মিথ্যে মিথ্যে কেন আর ভার বয়ে মরি !

লিঙ্গ উৎপাটন করে উনি পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেললেন। দেখতে দেখতে সেই লিঙ্গ পৃথিবী ভেদ করে আকাশ ভেদ করে অযুত জ্যোতি ছড়িয়ে ছুটে চলল।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভাবলেনঃ একি ! একি !

বিষ্ণু ছুটলেন নীচে, ব্রহ্মা ছুটলেন উপরে। কিন্তু ছুটে ছুটে ওঁরা ক্লান্তই হলেন। কোথায় এর শুরু কোথাই বা শেষ কোন কিছুই ওঁরা বুঝতে পারলেন না।

অবশেষে অবসন্ন বিষ্ণু ও ব্রহ্মা আকাশ থেকে ভেসে আসা এক বাণী শুনে সচকিত হলেনঃ এই লিঙ্গ পূজো করলেই সব কিছু পাওয়ার আনন্দে সবাই উঠবে ঝলমলিয়ে।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতারা ও গভীর চিত্তে পুজোয় বসলেন॥

৯১. উন পঞ্চাশৎ বায়ু

দেবতা ও দানবের সঙ্গে যুদ্ধ। দানবরা নিহত হল। মাতা দিতির মনে শোক ধকধক করে জ্বলল।

স্বামী কশ্যপ। দিতি এলেন স্বামী সন্নিধানে। এই আরাধনায় সেবায় কশ্যপ খুশি হলেন। বললেনঃ কি চাও ?

দিতি বললেনঃ পুত্র চাই, বলবান এক পুত্র। ইন্দ্রকে নিহত করতে পারবে এমন এক পুত্র আমি চাই।

কশ্যপ বললেনঃ পাবে।

দিতি পরম শুচি হয়ে গর্ভ ধারণ করলেন।

ক্রমে ইন্দ্র সব শুনলেন। দিতি তপস্যা করেছেন, বর পেয়েছেন, এবার নির্ঘাৎ তাঁর মৃত্যু।

ইন্দ্র শত্রুকে অঙ্কুরে নাশ করতে চাইলেন। তক্কে তক্কে রইলেন। কখন আচারে ত্রুটি হয়, কখন নষ্ট হয় দিতির শুচিতা। অতন্দ্র ইন্দ্র সতর্ক হয়ে

রইলেন। সেও যেন এক তপস্যা। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, এক এক করে অনেক বৎসর যায়। ইন্দ্রের অদৃষ্টে নিত্য জোটে হতাশা। দিন দিন বিষণ্ণতা বাড়ে, কিন্তু ছেদ পড়ে না অতন্দ্র সতর্কতায়।

একশো বছর পূরবে পূরবে এমন একদিন ইন্দ্র উল্লাসে নেচে উঠলেন। কিন্তু চঞ্চলতা নয়, এ তার সময় নয়। প্রাণ নিয়ে টানাটানি। অতএব আগে কার্যসিদ্ধি, আগে শত্রুনাশ, পরে উল্লাস।

খুঁত পাওয়া গেল দিতির আচরণে। অতএব এই তো সুযোগ। দিতি পা না ধুয়ে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন। ইন্দ্র বজ্র হাতে দিতির গর্ভে প্রবেশ করলেন। মুহূর্তে সপ্ত খণ্ড ও বিখণ্ডে গর্ভ বিভক্ত হল। বজ্রের আঘাত, বেদনায় বেদনায় গর্ভমধ্যে সেই সন্তান কেঁদে উঠল। ইন্দ্র দেখলেন বিপদ। বললেন ঃ কেঁদোনা।

শত খণ্ডের এক এক খণ্ডকে আবার সাত সাত খণ্ডে কেটে কুচোকুচো করলেন দেবরাজ ইন্দ্র।

যে সে পুত্র নয়, ইন্দ্রকে বধ করবে এমন পুত্র। খণ্ডবিখণ্ড হল। কিন্তু শক্তি নষ্ট হল না। ঊনপঞ্চাশ খণ্ড হল। কিন্তু তীব্র গতিতে আকাশ পরিক্রমা করে ফিরল। দিতির গর্ভ নষ্ট হল। এক সন্তান হল ঊনপঞ্চাশ বায়ু। ইন্দ্রের সহায়। দানবমাতার গর্ভে জন্ম, তবু ওঁরা হলেন দেবতা ॥

৯২. বেণ ও পৃথু

শিরায় শিরায় তাঁর মৃত্যুর রক্ত। মৃত্যুর কন্যা সুনীথা। সুনীথার পুত্র বেণ। রক্তের দোষে বেণ ধর্মের পথ ছেড়ে বিপথে পা দিলেন।

স্বয়ং রাজা ধর্মের ধার ধারেন না। রাজ্য থেকে ধর্মের সমস্ত পাট উঠে গেল। যে কেউ করতে চাইল, পেল রাজদণ্ড।

বেদের মান ধুলোয় মিশল। যজ্ঞের মহিমা শূন্যে মিলাল। বেণ বললেন ঃ ওসব চলবে না, যে বেদ পড়বে, যজ্ঞ করবে, কঠোর দণ্ডে তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।

ঋষিরা বিচলিত হলেন। রাজার মাথায় ভূত ভর করেছে। তাই ওঁর এই দুর্মতি। মরীচি প্রমুখ সব ঋষি ছুটে এলেন। বেণকে বললেন ঃ যা করছ তা ভাল নয়। তুমি প্রজাদের পালক। অথচ রাজ্যময় ছড়িয়ে চলেছ অধর্মের বিষ।

বেণ হেসে বললেন ঃ আমিই সব। আমি যা বলব তাই হবে ধর্ম। ধর্ম যে কি প্রজারা তার ছাইও বোঝে না। আপনারাও যে বোঝেন আপাতত তাও মনে হচ্ছে না। বুঝলে আমাকে অন্তত বুঝতেন। সমস্ত পৃথিবী যে আমার বশবর্তী

তার কারণ আমারই ক্ষমতা। সমুদ্রকে মরুভূমি করতে পারি, মরুভূমিকে পারি সমুদ্রে পরিণত করতে। স্বর্গ ও মর্ত্য—এই দণ্ডে ঘুচিয়ে ফেলতে পারি তাবৎ ভেদ। এ সব যে পারে আপনারা এসেছেন সেই তাকে উপদেশ দিতে! হাসির ব্যাপারই বটে।

মরীচিও অন্যান্য মহামহা ঋষি বুঝলেন: অসাধ্য। বেণকে ভাল পথে আনা সম্ভব নয়।

ওঁরা ক্রুদ্ধ হলেন। ঠিক করলেন উদ্ধত রাজাকে শাসন করতে হবে। 'ঋষিরা সমবেত হলেন। শুরু হল বেণের বাম উরু মর্দন। মর্দন সফল হল। বেরিয়ে এল ঘন কালো রঙের বেঁটে এক পুরুষ। হাত জোড় করে সেই পুরুষ বিহ্বল চোখ মেলে ঋষিদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল'

অত্রিমুনি বললেন: নিষীদ।

ধীরে ধীরে জন্ম নিল ধীবর, পুলিন্দ, তুম্বর, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতি। মর্দনে মর্দনে বেণের পাপ বেরিয়ে এল। পাপ থেকে জন্ম হল এই সব জাতির।

এবার বেণের ডানহাত। মর্দনে মর্দনে অপূর্ব এক জ্যোতি যেন বেরিয়ে এল। মানুষের শরীর ধারণ করে সেই মহা জ্যোতি বিরাজ করলেন। ইনিই বিখ্যাত পৃথু। হাতে আজগব ধনু। ধনুর আদি, ধনুর শ্রেষ্ঠ এই আজগব। সঙ্গে বহু শত দিব্য শর, কবচ ও কুণ্ডল।

অকস্মাৎ যেন পৃথিবী পুলকিত হল। অন্ধকার গেছে, আলো এসেছে।

বেণ পুন্নাম নরকে গিয়ে যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছিলেন। পৃথু জন্ম নিলেন। সৎ পুত্রের জন্ম হল। বেণ পেলেন স্বর্গে ঠাঁই।

পুণ্যবান পৃথুর জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর ভার নেমেছে। এবার পৃথিবী চলবে আলোকিত এক বৃত্তপথে।

সমুদ্ররা এল, নদীরা এল। এল রত্ন নিয়ে, এল জল নিয়ে। ব্রহ্মা এলেন, দেবতারা এলেন। পৃথুর অভিষেক। ছুটে এলেন সবাই।

পৃথিবীর মানুষ বেণের শাসনে জরজর হয়েছিল। এবার পৃথুর শাসন। পৃথু সবার মন পেলেন, মানও পেলেন। গুণ থাকলে রাজাকে প্রজারা মন ও মান দুইই দেয়।

পৃথুর প্রজাঅন্ত প্রাণ, প্রজাদের পৃথুঅন্ত প্রাণ। এমনটি সচরাচর হয় না। তাই পৃথিবীতে ঐ সময়ে এমন বহু ঘটনা ঘটেছিল যা সচরাচর হয় না।

পৃথু চলছেন। সামনে নদী। নদী স্তম্ভিত হত। পথ করে দিত রাজা পৃথুর। পৃথু চলছেন। সামনে পর্বত। পর্বত দুফাঁক হয়ে পথ করে দিত রাজা পৃথুর। চাষ করতে হত না, অথচ ফসল ফলত ভারে ভারে। রান্না করতে হত না, শুধু ভাবনা করলেই এসে যেত সুন্দর সুন্দর সব পাককরা

খাবার। গাভীর বাঁটে হত যত চাই তত দুধ। আর গাছে গাছে পাতায় পাতায় মিলত মধু। পৃথুর রাজত্বে সুখের শেষ ছিল না। সর্বত্র সুখ, সুখের তরঙ্গ।

এই সময়েই ব্রহ্মা যজ্ঞ করলেন। সৌত্য দিবসে সূতীর পুত্র হল। নাম সূত। মাগধও জন্ম নিলেন সমসময়ে। মহামহা ঋষি সূত ও মাগধকে পৃথুর রাজসভায় নিয়ে এলেন। বললেন ঃ রাজা পৃথুর স্তব রচনা কর।

ওঁরা বললেন ঃ স্তব করতে হলে পৃথুকেই করা উচিত। কিন্তু ওঁর গুণপনা আমরা বিশেষ জানিনা। কি করে রচনা করি স্তব?

ঋষিরা বললেন ঃ যা হবে, যা প্রকাশ পাবে ওঁর চরিত্রে তা-ই কীর্তন কর।

রাজসভা স্তবকীর্তনে মুখর হল। পৃথু অত্যন্ত খুশি হলেন। সূতকে দান করলেন অনূপদেশ আর মাগধকে মাগধদেশ।

এমন দানের হাত! রাজার মতন কাজই বটে। ব্রহ্মা মনে মনে প্রশংসা করলেন। প্রজাদের ব্রহ্মা বললেন ঃ রাজা পৃথুই তোমাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করবেন।

দেখতে দেখতে প্রজারা এল ভীড় করে।

ব্রাহ্মণরা বললেন ঃ মহারাজ, আমাদের বৃত্তি দিন।

প্রজাদের পালন করতে হবে। বসে থাকলে চলবে না। পৃথু বেরিয়ে পড়লেন। হাতে ধনু ও শর। উদ্যত হলেন পৃথিবী শাসনে।

ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেন দেবী পৃথিবী। নিস্তার চাই, তাই দেবী পৃথিবী নিলেন গাভীর রূপ। এ লোকে ও লোকে, লোকে লোকে পৃথিবী ছুটতে থাকলেন। কিন্তু ত্রাণ মিলল না। সর্বত্রই দেখেন আজগব হাতে রাজা পৃথু। শেষে পথ না পেয়ে পৃথিবী আত্মসমর্পণ করলেন। করজোড়ে বললেনঃ মারতে হয় মারুন। কিন্তু মারার আগে একবার চিন্তা করবেন। আমি যাব, সেই সঙ্গে যে তাবৎ জীবও যাবে। ঘট ভাঙলে জল কি আর তাতে থাকে? অতএব ক্ষণকাল চিন্তা করে একটা উপায় করুন। আমি মরব, তবু জীবকুল বাঁচে এমন একটা উপায় করুন। কিংবা যদি কুপিত মন আপনার শান্ত মানে তাহলে আপনার অনুকূলেই আমি কাজ করব। কিংবা একান্তই যদি মন বশ না মানে, আমাকে বধ করেনই, তাহলে আপনি হবেন ধর্মছাড়া। কারণ নারী অবধ্য।

ক্রোধের রাশ টেনে পৃথু শান্ত হলেন। বললেন ঃ একের জন্য অনেকের হননে পাপ, কিন্তু অনেকের জন্য একের হনন পাপ নয়। প্রজার কল্যাণের জন্য আমার এই আক্রোশ। সেরকম যদি বোঝই তাহলে প্রজাদের বাঁচবার একটা উপায় কর।

পৃথিবী বললেন ঃ মনোমত একটি বৎস পেলে বিগলিত হয়ে আমি সমস্তই মোচন করব। আমার বুকে এখানে ওখানে সর্বত্র পর্বত। সেগুলি সমতল

করুন। অবাধে চলব, দুগ্ধের স্পর্শে সর্বত্র করে তুলব সজীব।

রাজা পৃথু আজগব ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে পৃথিবী সমতল করলেন। পৃথিবী ছিল বন্ধুর। পৃথিবী ছিল উচ্ছৃঙ্খল। গ্রাম নয় পুর নয়, পশুপালন কৃষি-বাণিজ্য--কিছু নয়। কিছু ছিল না। যে যেখানে হোক গাছের তলায় না পাহাড়ের গুহায় বাস করত। বনের ফলে মূলে জুড়োত পেটের জ্বালা। কিন্তু পৃথু শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। জীবনে এল স্বাচ্ছন্দ্য।

স্বায়ম্ভুব মনু হলেন বৎস। পৃথু দোহন করলেন নিজ হস্তে। পৃথিবী শস্যে শস্যে হল শ্যামল।

এরপর একে একে এলেন ঋষিগণ, দেবগণ, পিতৃগণ। একে একে এল সর্পগণ, অসুরগণ, যক্ষগণ। একে একে এল পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং পর্বত।

ঋষিরা এলেন। সোম হলেন বৎস, ছন্দ হল পাত্র, শাশ্বত তপস্যা হল দোগ্ধা। দেবতারা এলেন। ইন্দ্র হলেন বৎস, সোনার পাত্রে দোহন করলেন স্বয়ং সূর্যদেব। পিতৃগণ এলেন। ময়দানব হলেন বৎস। মহাকাল পৃথিবীকে দোহন করে ভরিয়ে তুললেন রূপোর পাত্র। স্বধা হল দুগ্ধ।

সর্পরাও দুইল। তক্ষক হল বৎস। লাউয়ের খোলে ঐরাবত সর্প দুইল বিষ।

বিরোচনকে বাছুর বানিয়ে মধু নামক অসুর লোহার পাত্র ভরে দোহন করল মায়া। যক্ষরাও এল হাতে আমপাত্র নিয়ে। কুবের বনলেন বৎস। ওরা যা দুইল তার নাম অন্তর্ধান।

পিশাচরা এল সুমালীকে সঙ্গে নিয়ে। রাক্ষসদের অধিপতি রক্ত দুয়ে নিলেন। অপ্সরা ও গন্ধর্বরা এল পদ্মের পাতা নিয়ে। গন্ধর্বদের রাজা চিত্ররথ হলেন বৎস, বররুচি হল দোগ্ধা। তারপর হিমালয় পর্বত পৃথিবীর বৎস হল। সুমেরু পর্বত দোহন করল। বাঁটের পথে দুধ হয়ে রত্ন ও ওষধি এল বেরিয়ে।

পৃথু পালন করলেন। তাই নাম পৃথিবী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য সবাই সর্বকাজে স্মরণ করেন মহামতি পৃথুকে। পৃথুই আদি যোদ্ধা। বলা হয় পৃথুর নাম নিয়ে যুদ্ধে নামলে ঐ নামই হয় রক্ষাকবচ।

পৃথু এক পুণ্য নাম। এ নাম স্মরণে অশেষ পুণ্য।।

৯৩. সংজ্ঞার বিপত্তি

বিবাহ হল। সূর্যের মত স্বামী। কিন্তু সংজ্ঞা সুখী হলেন না।

বরং বিপন্ন হয়ে পালিয়ে ত্রাণ পেলেন।

সূর্য। তেজের আকর। সংজ্ঞার মন চায় স্বামীর সান্নিধ্য। তিনি কাছে যান। কিন্তু ঝলসে যায় অঙ্গ। দুঃসহ বহু সয়েও সংজ্ঞা সূর্যের ঘর করলেন। ধীরে ধীরে জন্ম হল বৈবস্বত মনুর। তারপর যমজ সন্তান: শ্রাদ্ধদেব ও যমনা। বহু সয়েও শেষমেষ সংজ্ঞা আর পারলেন না। স্বামীর ঐ গোল আকার, ঐ দুঃসহ তেজ। ভাবতে সংজ্ঞার অবস্থা হয় মূর্চ্ছা যাবার মত। অগত্যা সংজ্ঞা ত্রাণের উপায় সন্ধান করলেন।

একদা নিজের শরীর থেকে নিজেরই মত আর এক সংজ্ঞাকে সংজ্ঞা তৈরি করলেন। নাম দিলেন ছায়া।

ছায়া সংজ্ঞাকে বললেন: আজ্ঞা করুন।

সংজ্ঞা বললেন: ভাবছি কিছুদিনের জন্য বাবার ওখানে যাব। ছোট ছোট দুটি ছেলে একটি মেয়ে—তুমি ওদের দেখো।

ছায়া বললেন: যথাসাধ্য সইব। দেখব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারেন।

সংজ্ঞা এলেন পিতার কাছে। পিতা সব শুনলেন। সংজ্ঞা স্বামী ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন। পিতা হয়ে ত্বষ্টা একে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তিনি মেয়েকে খুব বকলেন। বললেন: ভুল করেছ। এখন উচিত ফিরে যাওয়া।

সংজ্ঞা নিজ দেহ ছেড়ে ঘোটকীর রূপ ধরলেন। এলেন উত্তর কুরুদেশে। তৃণময় এক সুন্দর বনভূমি। সংজ্ঞা সুখে বিচরণ করতে লাগলেন।

সূর্যের সংসার বেশ চলছিল। সংজ্ঞা নেই একথা কেউই বুঝতে পারেনি। না ছেলেমেয়েরা না সূর্যদেব। ছেলেমেয়েরা ছায়াকেই জানল মা বলে, সূর্য ছায়াকেই জানলেন সংজ্ঞা বলে। সূর্যের সংসর্গে ছায়ার সাবর্ণি মনু নামে একটি পুত্রও জন্মাল।

বেশ চলছিল। কিন্তু গোল বাধল যমকে নিয়ে। ছায়া ছোট ছেলেকেই যেন একটু বেশি টানেন। হাজার হলেও পেটের ছেলে। যমের এটি সহ্য হল না। যম জানেন ইনি তাঁরও মা। ভালবাসা তিনিই বা পাবেন না কেন? মা ছোট ভাইকে গয়নাগাটি পরিয়ে সাজাবেন, অথচ যম যেন কেউ না। যম ছেলেমানুষ। মনে মনে রেগে তাই কাঁই হলেন। একদিন দিশেহারা হয়ে ছায়ার গায়ে তিনি পা তুললেন।

ছায়া যমের স্পর্ধায় অবাক হলেন। রাগে সব অন্ধকার দেখলেন। অভিশাপের আগুন ঝরিয়ে ছায়া শান্ত হলেন।

মায়ের শাপ। যমের প্রাণ কেঁপে উঠল। বিষণ্ণ বদনে পিতার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাত জোড় করে বললেন: মায়ের কাছে সব ছেলেই সমান। কিন্তু আমাদের মা যেন শুধু একজনের। ছোট ভায়েরই কি শুধু ইচ্ছে হয়?

আমাদের হয়না ? ও-ই গয়না পরবে ? আমরা পরতে পাব না ? মা যেন ঐরকমই চান। তাই আমার রাগ হয়েছিল। জ্ঞান হারিয়ে পা তুলে ফেলেছি মায়ের গায়ে। দোষ হয়েছে। ঘাট মানছি। আপনি ক্ষমা করুন। মা শাপ দিয়েছেন পা খসে পড়ুক। কিন্তু আপনি করুণা করুন, শাপ কেটে দিন।

সূর্য বললেন ঃ তোমার মা শাপ দিয়েছেন। তার অন্যথা করি হেন সাধ্য আমার নেই। ও হবেই। তবে মনে হচ্ছে এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে। কারণ তুমি সদা সত্য বল, ধর্ম কর। সেই তুমি রাগে অন্ধ হলে! ব্যাপারটি যেন কেমন কেমন।

সূর্য পত্নীর উপর খুবই অপ্রসন্ন হলেন। ঝাঁঝালো সুরে পত্নীকে বললেন ঃ মায়ের কাছে সব ছেলেই সমান। অথচ তুমি ছোটটিকেই বেশি আদর দাও। এর কারণ কি ?

ছায়া বুঝলেন জল ঘোলা হয়েছে। শেষ তিনি রাখতে পারলেন না। ভালোয় ভালোয় সব খুলে বললেই তাঁর ভাল হবে। ছায়া বললেন যে তিনি সংজ্ঞা নন, ছায়া।

সূর্যের রাগ আরও বাড়ল। উনি আর একমুহূর্তও দেরি করলেন না। সোজা এলেন বিশ্বকর্মার কাছে। রাগে সূর্য তখনও ফুঁসছেন। বিশ্বকর্মা সূর্যকে পরম আদরে আপ্যায়ন করলেন। সব শুনে বললেন ঃ সংজ্ঞা আপনার প্রখর তেজে ঝলসে গেছে। অত দাহ সে সইতে পারেনি। তাই প্রাণের দায়ে পালিয়েছে। এখানে এসেছিল, আমি তাকে খুব বকেও ছিলাম। তারপর সে ঘোটকীর রূপ নিয়ে বনভূমিতে বাস গেড়েছে।

সূর্য একটু নরম হলেন। বিশ্বকর্মা বললেন ঃ যদি বলেন তাহলে আপনার প্রখরতা কমিয়ে কিঞ্চিৎ কমনীয় করে দিতে পারি।

সূর্যের রাগ জল হল। বিশ্বকর্মার প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন।

সূর্য উঠলেন শানযন্ত্রে। সূর্য হলেন মনোহর, মনোরম।

পত্নী হয়েছেন ঘোটকী। সূর্য পত্নীর সঙ্গে মিলতে চাইলেন। যোগবলে তিনি হলেন ঘোটক।

সংজ্ঞা পরপুরুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে সতীত্ব রাখতে ঘোটকী হয়েছেন। ঘোটক এলেন ঘোটকীর স্পর্শ কামনায়। কিন্তু সংজ্ঞা অসম্মত। সূর্যের বলপ্রয়োগ ব্যর্থ হল না। কোনমতে নাসিকার রন্ধ্রপথে সূর্য শুক্র ক্ষেপণ করলেন। জন্ম নিলেন নাসত্য ও দস্র নামে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ দুই অশ্বিনীকুমার।

সূর্যদেব পুত্রদ্বয়কে নিজের মনোহর রূপ দেখালেন। সংজ্ঞা দেখলেন, ইনিই তাঁর পতি, সূর্যদেব। এক নতুন কমনীয় সূর্যকে দেখে সংজ্ঞার মনে সৃষ্টি হল হর্ষের উদ্বেলিত এক সমুদ্র ॥

৯৪. ধুন্ধুমার

এক শো পুত্র। সবাই মহা মহা ধনুর্ধর। রাজার মন ধর্মের দিকে। এতদিন রাজ্য আগলেছেন। এবার ধর্ম করবেন।

রাজা কুবলাশ্ব শত পুত্রকে ডাকলেন। রাজ্যের ভার তাদের উপর দিয়ে এবার তিনি বনে যাবেন। বনে গিয়ে তপস্যায় তপস্যায় প্রশান্তির আলোয় মন জ্বলে উঠবে।

পুত্ররা পিতার ইচ্ছায় বাদ সাধল না। শত পুত্রকে সম্পত্তির ঠিক ঠিক অংশ দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কুবলাশ্ব বনের পথে পা বাড়ালেন।

মাঝপথে বাগড়া দিলেন মুনি উতংক। বললেন ঃ মহারাজ, আপনি গেলে পৃথিবীর রক্ষা থাকবে না। আপনি থাকুন। আপনি রাজা। প্রজা পালনেই আদৎ ধর্ম। বনে গিয়ে শত তপে অঙ্গে কালি পড়িয়েও অমন ধর্ম হবে না। বড় বড় রাজর্ষির কথা ভাবুন, তাঁরা রাজর্ষি হয়েছিলেন প্রজাপালন করেই। এসব না হয় গেল। ওদিকে ধুন্ধু নামে এক মহা দৈত্য শক্তি সঞ্চয় করছে। আপনি গেলে পৃথিবীর আর রক্ষা থাকবে না।

উতংক ধুন্ধুর কথা বিস্তার করে বললেন। যা বললেন তা ভয়েরই কথা। উতংকের আশ্রমের কাছেই মরুর মত বহুদূর প্রসারিত বেলাভূমি। সেখানেই থাকে মধুদৈত্যের পুত্র ধুন্ধু। বালিতে গা ঢেকে সে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। বিশাল এবং ভয়ংকর তার চেহারা। বলে বীর্যেও প্রচন্ড। সে তপস্যা করেছিল। বরও পেয়েছিল। দেবতারাও তাকে মারতে এখন সমর্থ নন। বছরে একবার সে নিশ্বাস ফেলে। সাত দিন ধরে কাঁপতে থাকে পৃথিবী। ধুন্ধু নিশ্বাস ফেলে। বালুর ঝড় উঠে চারিদিক অন্ধকার করে আসে। ধুন্ধু নিশ্বাস ফেলে। নির্গত হয় আগুনের সব ফুলকি। উতংকের আশ্রমের কাছেই থাকে এই সাংঘাতিক দৈত্য। আতংকে সদা কাঁপে উতংকের প্রাণ।

উতংক তাই বললেন ঃ মহারাজ আপনি বনে গেলে কে রাখবে এই পৃথিবী ? ধুন্ধুকে বধ করতে পারেন একমাত্র আপনি। একদা তপস্যা শেষে বিষ্ণু এসেছিলেন আমাকে বর দিতে। তিনি বলেছিলেন তাঁর মহাতেজ আপনার হৃদয়ে সঞ্চারিত হবে, তাঁর মহাবল আপনার বাহুতে নামবে। তাই বলছিলাম ঃ যাবেন না, যাবেন না।

কুবলাশ্ব বীর পুত্রদের আদেশ করলেন ঃ বধ কর ঐ দৈত্যকে।

শত পুত্র এল সমুদ্রের কূলে। রাজা কুবলাশ্বও এলেন। উনি এলেন মুনি উতংকের সঙ্গে।

সমুদ্রকূলে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা কুবলাশ্ব। কি যে হল কেউ জানল না।

কিন্তু ভগবান বিষ্ণু কুবলাশ্বকে ভর করলেন। আকাশে দেবতারা ছুটোছুটি করলেন। বহু মালায় কুবলাশ্ব সংবর্ধিত হলেন।

দৈত্য আছে এই বেলাভূমিতেই। বালুর আবরণে ঢেকে কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে।

শতপুত্র বেলাভূমি খুঁড়ে চললেন। কুবলাশ্বও রইলেন সঙ্গে। খুঁড়তে খুঁড়তে বেলাভূমির রূপ গেল সম্পূর্ণ বদলে। কুবলাশ্ব সদাসতর্ক, সদা প্রস্তুত। কুবলাশ্ব এক নরপতি। কিন্তু আপাতত তিনি নারায়ণ।

অকস্মাৎ সব ত্রস্ত হয়ে উঠল। দেখা গেছে। ধুন্ধুকে দেখা গেছে। ঐ তো পশ্চিম দিকে মুখ করে পড়ে রয়েছে। মুখ থেকে ধকধক করে আগুন বেরুচ্ছে। পৃথিবী বুঝি এবার যায়। শরীর থেকে হু হু করে জল বেরুতে থাকল। মনে হল চাঁদের আকর্ষণে বুঝি সমুদ্র ফেঁপে উঠেছে।

কুবলাশ্বের সাতানব্বইটি পুত্র ধুন্ধুর মুখাগ্নিতে ভস্ম হল। কুবলাশ্বের বাহুতে অদ্য অমিত বল। ওঁর ধনু থেকে ছটল বরুণ বাণ। আগুনের জোয়ার মুহূর্তে কোথায় যে মিলাল! অতঃপর ধুন্ধুর মৃত্যু এল ঘনিয়ে।

উতঙ্কের আতঙ্ক গেল। খুশির জোয়ারে উনি ভাসলেন। বরে বরে কুবলাশ্বকে যেন উনি ভরে তুলতে চাইলেন।

কুবলাশ্বের ললাটে বিন্দু বিন্দু প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি। মুক্তাবিন্দুর মত সৌম্য আলো ঝরিয়ে সেগুলি জ্বলল ॥

৯৫. সত্যব্রত

আসল নাম ভেসে গেল। অন্য এক নাম জেগে উঠল স্রোতের জলে। লোকে সেইটিই মনে রাখল। সত্যব্রত ভেসে গেল। ত্রিশঙ্কু হল ভুবনময়।

মহারাজ ত্রয্যারুণির পরাক্রান্ত পুত্রের নাম সত্যব্রত। একদা বিবাহ সভায় মন্ত্রপাঠ হচ্ছিল। সত্যব্রত বাধা দিলেন মন্ত্রপাঠে। পাঠ সম্পূর্ণ হল না। সত্যব্রতের এ এক অপরাধ।

আবার একদা কার-না-কার এক পত্নীকে হরণ করে বসলেন সত্যব্রত। সংসারের বহুতর অঘটনের জনক কাম। সত্যব্রত পরপত্নীকে হরণ করেই ক্ষান্ত হলেন না। পুরবাসীর এক কন্যাকেও জোর করে চুরি করে নিয়ে এলেন। পরাক্রম হয়ত আছে। কিন্তু পরাক্রম প্রকাশের ক্ষেত্র এ গুলি নয়।

অপকর্মে অপকর্মে বকে যাবে রাজার ছেলে? ত্রয্যারুণি ভাবলেনঃ অমন পুত্রের মুখ দেখাও পাপ।

রাগে ঘেন্নায় উনি বললেনঃ তুই মর, মর।

সত্যব্রত বললেনঃ আমাকে ত্যাগ করছেন করুন। কিন্তু বলে দিন আমি কোথায় যাব?

ত্রয্যারুণি বনে গমন করলেন। সত্যব্রত এক চণ্ডাল পাড়ার ধারেকাছে বানালেন কুটির।

সত্যব্রতের পাপে ইন্দ্রও রেগে বারো বছর ঐ রাজ্যে বৃষ্টি বন্ধ করলেন।

এ সময়ে একদিন এক ঘটনা ঘটল। এক মহিলা ছেলের গলায় দড়ি বেঁধে একশো স্বর্ণমুদ্রায় তাকে বিক্রি করেন। সত্যব্রত বুঝলেন, এই মহিলা আর কেউ নন, বিশ্বামিত্রের স্ত্রী। সত্যব্রত এগিয়ে এলেন। ছেলেটির গলার দড়ি খুলে দিলেন। বললেনঃ আপনারা আমার আশ্রয়েই থাকুন।

বিশ্বামিত্র গেছেন তপস্যায়। পত্নী ও পুত্রদের রেখে গেছেন অসহায় করে। সত্যব্রত বিশ্বামিত্রকে ভক্তি করতেন। সেই বিশ্বামিত্রের পরিবার ডুবছে। সত্যব্রত রক্ষা করলেন।

ত্রয্যারুণির কুল-পুরোহিত হলেন বশিষ্ঠ। রাজপরিবারে উনি অধ্যাপনাও করতেন। সত্যব্রতের স্বভাব তাই হাড়েহাড়েই বশিষ্ঠ জানতেন। পিতা পুত্রকে ত্যাজ্য করলেন। বশিষ্ঠ রইলেন নীরব। জানতেন সত্যব্রত নিতান্তই বকে-যাওয়া ছেলে।

বিবাহের সময় সপ্তপদী গমন শেষ হলেই মন্ত্রসমূহ পায় পূর্ণতা। কিন্তু সত্যব্রত তার অন্যথা করেছিলেন। কাজটা অনুচিত। ভার্গবমুনি তা জানতেনও। কিন্তু মুখ ফুটে সত্যব্রতকে কিছু বলেননি। বশিষ্ঠ সত্যব্রতের উপর গোড়া থেকেই চটে ছিলেন। সত্যব্রতের কল্যাণ হোক—এই চিন্তাই ছিল বশিষ্ঠের রাগের মূলে। সেইজন্যেই ত্রয্যারুণির মৃত্যুর পর সত্যব্রতের অভিষেক হোক এরকম প্রস্তাব বশিষ্ঠের মুখ থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু এই বশিষ্ঠদেব শেষমেষ সত্যব্রতের উদ্দেশ্যে শঙ্কু নিক্ষেপ করেছিলেন।

সত্যব্রত তখন বনে থাকেন। একদিন কোন মাংস জুটল না। পেটের জ্বালা ক্রমশ তাঁকে অস্থির করে তুলল। সামনে ক্ষুধায় কাতর বিশ্বামিত্র-পুত্র। সত্যব্রতের লুব্ধ চোখ বশিষ্ঠের সুরভি গাভীকে লেহন করল। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। সুরভিকে সত্যব্রত হত্যা করলেন। সুরভির মাংসে সত্যব্রত পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

বশিষ্ঠ এবার ক্রোধে অস্থির হলেন। বললেনঃ তৃতীয় এই ভয়ানক শঙ্কু আমি তোর উদ্দেশে নিক্ষেপ করছি। পিতা অপ্রসন্ন হয়েছিলেন, পড়েছিল প্রথম শঙ্কু। আমার গাভী হত্যায় দ্বিতীয় শঙ্কু আর পাপ খাদ্য খাওয়ায় তৃতীয় শঙ্কু। তুই ত্রিশঙ্কু।

ওদিকে বিশ্বামিত্র ফিরে এসেছেন। তিনি ছিলেন না। তাঁর পরিবার ভেসে যেতে বসেছিল। কিন্তু সত্যব্রত রক্ষা করেছেন।

বিশ্বামিত্র বললেন ঃ তোমার পুরস্কার বর। নাও।

রাজ্যে বারো বছর বৃষ্টি হয়নি। রাজ্য যায় যায়। বিশ্বামিত্র সত্যব্রতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। বললেন ঃ যজ্ঞ কর, যজ্ঞ কর।

রাজা সত্যব্রত যজ্ঞ করলেন। বহুতর যজ্ঞ। সত্যব্রতের সাধ হল মরশরীর নিয়েই যাবেন স্বর্গে। দেবতারা সত্যব্রতের প্রতি বিরক্ত। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠও যারপরনাই ক্রুদ্ধ। তথাপি বিশ্বামিত্র সাহস করলেন। নিজ তপস্যার শক্তিতে ত্রিশঙ্কুর ইচ্ছা তিনি পূরণ করলেন ।।

৯৬. বাহু ও সগর

শক্তি ছিল, কিন্তু শক্তির প্রয়োগ করেননি। রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলেন, তবু শান্ত রইলেন। ওদের তাড়িয়ে মিষ্টি কথায় রাজ্য উদ্ধার হবে না। যা করতে হবে তার নাম হিংসা। কিন্তু উনি হিংসা চান না। হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামক দৈত্যরা রাজ্য অধিকার করে নিল। উনি চলে এলেন বনে, ঔর্ব মুনির আশ্রমে। বাহু ছিলেন এমন একজন রাজা।

ঔর্বমুনি রাজা বাহুকে আশ্রয় দিলেন। কালে বাহুর এক পুত্র হল। মাতার গর্ভ থেকে নির্গত হল বিখ্যাত পুত্র সগর। সঙ্গে বেরুল বিষ।

রাজ্যহারা হয়েছেন রাজা বাহু। মনে অশেষ দুঃখ। বনে মুনির আশ্রমে থেকে ধর্মে মন রেখে দিনগুলি ওঁর কেটে যাচ্ছিল। একদিন এল মৃত্যুর পরোয়ানা।

স্বামী মৃত। পত্নী যাদবী স্বামীর সঙ্গে জীবন রাখাই সুখের বলে ভাবলেন। উদ্যতও হলেন। চিতা জ্বলছে। যাদবী চিতার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন।

ঔর্বমুনি বললেন ঃ অমন কর্ম করবেন না।

যাদবী মুনির কথার মান রাখলেন। এর কিছুদিন পরেই জন্ম হল সগরের। সগর জন্ম নিলেন। সঙ্গে বেরুল বিষ।

সতীনের ঈর্ষা বড় বালাই। যাদবীর গর্ভে সন্তান। সতীনের সইল না, দিল বিষ। গর্ভ গেল না, বিষ বিষই রইল। অবশেষে সন্তান বেরুল, বিষও বেরুল।

আশ্রমে আশ্রিতা বিধবা যাদবী। তাঁর পুত্র সগর। ঔর্ব মুনিরই সমস্ত দায়িত্ব। সগরের জাতকর্ম সারা হল। সগর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলেন। বেদবেদাঙ্গ পড়ে হলেন শাস্ত্রজ্ঞ। তারপর পেলেন ভয়ানক সব অস্ত্র। ঔর্বমুনি সগরের হাতে তুলে দিলেন আগ্নেয় অস্ত্র।

সগর শুনেছেন তিনি আশ্রমবালক নন। তিনি রাজপুত্র। পিতার রাজ্য হৈহয়দের কবলে।

দুর্ধর্ষ সগর পিতার মত অমন অহিংস ছিলেন না। তিনি যুদ্ধ করলেন। হৈহয়রা হারল। যবন, শক, কম্বোজ ও পহ্লবগণও শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। ওরা বশিষ্ঠের শরণ নিল। বশিষ্ট সগরকে নিবারণ করলেন। নইলে হয়ত ওরা নিশ্চিহ্ন হত।

বশিষ্ঠ বলছেন, তাঁর কথা ফেলার নয়। সগর শান্ত হলেন। পরাজিতদের দেশান্তরী করলেন আর সাজিয়ে দিলেন লজ্জার সজ্জায়। শকদের আধমাথা কামিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হল দূর সমুদ্র পারে। যবন ও কম্বোজদের সমস্ত মাথা কামিয়ে রেহাই দিলেন। পারদরা দাড়িগোঁফ কামাবার অধিকার থেকে হল বঞ্চিত। বেদে যাগে যজ্ঞে কারোই রইল না কোন অধিকার।

বাল্যে পিতৃহীন। কিন্তু ঔর্বমুনি ছিলেন ওঁর পিতারও অধিক। ঔর্বের বরেই দুই পত্নীতে সগর অতগুলি পুত্রের জনক হতে পেরেছিলেন। ঔর্ব বর দিতে চাইলেন। সগরের এক পত্নী চাইলেন ষাটহাজার পরাক্রান্ত পুত্র, অন্যজন চাইলেন মাত্র একটি। প্রথম জন প্রসব করলেন একটি লাউ। বীজপূর্ণ লাউ, ছোট ছোট সন্তানে পূর্ণ এক অভিনব লাউ। ঘিয়ের কুম্ভে ভিজিয়ে রেখে ষাট-হাজার পুত্রকে ধাত্রীরা বড় করে তুললেন।

সগরের পৃথিবীজয় শেষ হল। এবার তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে মন দিলেন। ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হল। দেবরাজ ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করে লুকিয়ে রাখলেন পাতালে।

রব উঠল ঃ খোঁজ খোঁজ ! সগরের ষাটহাজার পুত্র খুঁজতে খুঁজতে পৃথিবী খুঁড়তে খুঁড়তে এল পাতালে। পাতালে ছিলেন মহর্ষি কপিল। তপে ছিলেন তিনি নিরত। তপোভঙ্গ হল। বিরক্ত চোখে তিনি তাকালেন। চোখ থেকে ঠিকরে বেরুল আগুন। সগরের ষাট হাজার পুত্র পুড়ে ছাই হল। রইল মাত্র চারটি।

সগরকে বিষ্ণু বর দিয়েছিলেন। বংশ, বুদ্ধি, যশ ও সম্পদ ক্রমাগত বেড়ে চলবে আর সাগর হবে পুত্র।

সগর খুঁড়েছিলেন। সমুদ্রের নাম তাই সাগর।

অবশেষে সগর ঘোড়া ফিরে পেলেন। একশো অশ্বমেধ যজ্ঞ করে কুড়োলেন অযুত পুণ্য।।

৯৭. শ্রাদ্ধ

রহস্যের অদ্ভুত এক আবরণে এই জগৎ আবৃত। জগতের মাঝখানে এই জীবন, যেন এক নদী। নদীতে কত কত ঢেউ উঠে পড়ে, স্রোতে জল চলে। ঢেউয়ে বুদ্বুদে যেন ভেঙ্গে পড়ে কত কত হাতছানি। যাঁরা জগৎ ও জীবনের তত্ত্ব নিয়ে অবিরাম জট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে চলেন তাঁদের মনেই গিয়ে পেঁছায় এই ডাক। যুধিষ্ঠির এমন একজন মানুষ যিনি এই ডাক শুনতে পেতেন।

তত্ত্বের জট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ভেসে চলতে চলতে আরোও দুরূহ সব প্রশ্ন মনের কোণে মাথা তোলে। একদা এইভাবে যেতে যেতে অবসন্ন হয়ে কোন কিনারা না পেয়ে যুধিষ্ঠির শরণ নিলেন ভীষ্মের।

পিতামহ ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেনঃ এমন কি কাজ আছে যাতে মানুষের অন্তর পুষ্ট হয়? এমন কি কাজ আছে অবসন্নতায় যাতে ধুঁকতে হয় না?

ভীষ্ম বললেনঃ শ্রাদ্ধ। ওতেই পিতৃগণের প্রীতি। ওঁদের প্রীতিতেই এ জীবনে নামে সুখ, ও জীবনও ভরে ফুলে ফলে।

মনের মধ্যে প্রশ্নরা যেন মুখিয়েই ছিল। একটির উত্তর পাওয়া যায়। শতটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে উঠে।

যুধিষ্ঠির সুধালেনঃ যেমন কর্ম তেমনি ফল। তাই কেউ যান স্বর্গে কেউ নরকে। নরকে গেলেই পুত্রদের ভাবনা। শ্রাদ্ধে বহু দ্রব্য উৎসর্গ করা হয়। নরকে যন্ত্রণা পেতে পেতে পিতারা নাকি সে সব পান। এটি হয়, কিন্তু কেমন করে যে হয় সেটি কিছুতেই বুঝতে পারি না। আপনি বলুন। কারও পিতা হয়ত নরকে, পুত্র চায় পিতার উদ্ধার। কি করবে সে? দেবতারা স্বর্গে থাকেন। তথাপি তাঁরাও নাকি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করেন?

ভীষ্ম বললেনঃ আমার পিতা গত হলেন। পিণ্ডদানের জন্য হাত উঠিয়েছি। চমকে দেখি পৃথিবী ফুঁড়ে উনি হাত বাড়িয়েছেন। পিণ্ড হাতে দিতে নেই। শাস্ত্রের এই নিয়ম। অথচ পিতা হাত বাড়িয়েছেন। কি করব-চিন্তায় আমি তখন দুলছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রের কথা মনে হতেই আমি কুশের মধ্যেই পিণ্ড দিলাম। পিতা খুশিভরা গলায় বললেনঃ ধর্ম জেনেছ, অহরহ ধর্মপথে চলেছ। তাই আমি উদ্ধার পেলাম। বেদে যেমন বলা আছে তাই কর্তব্য। তুমি তাই করেছ। ওতেই বুঝেছি তোমার পিতৃভক্তি অফুরন্ত। আমি প্রসন্ন, আমার প্রসন্নতায় তোমার মৃত্যু হবে তোমারই ইচ্ছামত। বল, অদ্য আমি তোমায় আর এক বর দেব, প্রার্থনা কর।

আমি বললামঃ আপনার মনে সন্তোষের প্রসাদ নেমেছে—ওতেই আমি

কৃতার্থ। যদি কিছু দিতেই চান তাহলে এক প্রশ্নের উত্তর দিন।

উনি বললেন : বল।

জিজ্ঞাসা করলাম : শুনি পিতৃগণ দেবতাদেরও দেবতা। একি সত্য ? শুনি, মরলোকে আমরা শ্রাদ্ধ করি, বহু বহু জিনিস উৎসর্গ করি, ওঁরা পান, তৃপ্ত হন। একি সত্য ?

পিতা বললেন : পিতৃগণ ব্রহ্মার পুত্র। তাই দেবতারাও এঁদের মান দেন, পুজো করেন। শুধু দেবতারা নন, দানবমানব, গন্ধর্ব যক্ষ সবাই পিতৃগণকে পুজো দেয়, শ্রাদ্ধ করে। বেদে ব্রহ্মা বলেছিলেন শ্রাদ্ধের কাজে কখনো আলস্য কর না।···তাই তোমাকেও আমি ঐ পিতৃগণকে পুজার পরামর্শ দিচ্ছি। কর। সব পাবে। এ লোকে তোমরা শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করলে মনে মনে আমরা ভরে উঠি।···আপাতত এই থাক। এরপর বাকিটুকু মার্কণ্ডেয় মুনির কাছ থেকে শুনে নিও। ঠিক ঠিক উত্তর পাবে।

একদা সময় ও সুযোগ হল। মার্কণ্ডেয় মুনিকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলাম। মার্কণ্ডেয় পরম হর্ষভরে বলতে বসলেন :

আমার পিতৃভক্তির অন্ত ছিলনা। পিতৃগণের আশিসেই আমি চিরজীবী। পৃথিবীজোড়া আমার নাম। একবারকার কথা মনে পড়ছে। একটি যুগের শেষাশেষি। শতশত বছর ধরে সুমেরু পর্বতে আমি তখন তপে ডুবে আছি। একদিন দেখলাম আকাশটা যেন জ্বলে উঠল। ভাল করে চেয়ে রইলাম। জ্যোতির অন্তরে দৃষ্টি যেন প্রবেশের পথ পেল। সুমেরুর চূড়া থেকে এক বিশাল দেবযান নেমে আসছে। জ্যোতি ছড়িয়ে মাঝখানে রয়েছে জমাট এক জ্যোতি—দেবযান। তারও মধ্যে আরো উজ্জ্বল আর এক জ্যোতি। সংহত হয়ে এতটুকুটি। ঠিক যেন বুড়ো আঙুলটি। দেবযানে এক অপরূপ পালঙ্ক। তাতে ঐ জ্যোতির্ময় পুরুষটি শুয়ে আছেন। আমার মন রোমাঞ্চিত হল। প্রণাম করে ধীরে ধীরে বললাম : হে প্রভু আপনি কে ?

: তোমার তপস্যা রয়েছে। ঐ দিয়েই আমাকে জানতে পারবে।

আমি তখন ভক্তির সাগরে ভাসছি। বুঝলাম উনি সনৎকুমার। ব্রহ্মার মানসপুত্র। যতিধর্মই ওঁর ধর্ম। তাই উনি কুমার। আত্মাকে দেহের মধ্যে সংযত করে যোগের চরম ফল ওঁতেই বিকশিত।

উনি বললেন : ভক্তির বশে আমার দেখা চেয়েছ। তাই দেখা পেলে। তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করব।

আমি বললাম : আপনি প্রসন্ন। তাই সাহস করছি। জানতে ইচ্ছা হয়। প্রাণ বলছে আপনার মুখ থেকেই শুনি। যদি অপরাধ না নেন তবে বলুন পিতৃগণের আদিসৃষ্টি কি রকম ?

সনৎকুমার আমাকে কৃপা করলেন। বললেন : শোন—

ব্রহ্মা দেবতাদের সৃষ্টি করলেন। বললেন আমাকে ভজনা কর। দেবগণ অবাধ্য হলেন। ফলের আকাঙ্ক্ষায় ওঁদের মনে জন্মাল নিজেদের প্রতি রতি। দেবতারা আত্মাকে পূজা করলেন। ব্রহ্মা মুখ বুঁজে এ অপমান সইলেন না। শাপ দিলেনঃ তোদের চৈতন্য লোপ পাবে। দেবতাদের চৈতন্য গেল। ওঁরা হেঁট হয়ে ব্রহ্মাকে বললেনঃ আমাদের অনুগ্রহ করুন। তখন ব্রহ্মা বললেনঃ দোষ করেছ, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু কিসে হবে উচিত প্রায়শ্চিত্ত ওটি পুত্রদের কাছ থেকে জেনে নিও।

ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে দেবতারা এলেন পিতৃগণের কাছে। ওঁরা বিধান দিলেন। দেবতাদের জ্ঞান হল। পিতৃগণ বললেনঃ বৎস এবার যাও।

দেবতারা পিতৃগণের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। পিতাকে ওরা বলে বৎস! ব্রহ্মাকে গিয়ে দেবতারা অনুযোগ করলেন, অবশেষে কি ওঁদের এই শুনতে হবে?

ব্রহ্মা বললেনঃ ওরা ঠিকই বলেছে। তোমরা কি ব্রহ্মকে জান? ওদের জন্মই দিয়েছ, জ্ঞান কি দিতে পেরেছ? ওদের শরীর উৎপন্ন করেছ তাই তোমরা ওদের পিতা। কিন্তু ওরা তোমাদের জ্ঞান দিয়েছে, তাই ওরা তোমাদের পিতা।

দেবতাদের ক্ষোভ নষ্ট হল। পিতৃগণকে ওঁরা যেন আরও আপন বলে জানলেন। আসলে শ্রাদ্ধে চন্দ্র সন্তুষ্ট হন, জগৎচরাচরে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সন্তোষ। ঠিক তেমনি পিতৃগণও শ্রাদ্ধে তুষ্ট হন। ছড়িয়ে দেন সমৃদ্ধি।

সনৎকুমারের কৃপা যে কত তা আর কি বলব! উনি আরও কত কথা বললেন। পারিপাটি করে চারিয়ে চারিয়ে উনি বললেনঃ পিতৃগণ আছে সাতটি। চারটির শরীর আছে, তিনটির নেই। কব্যবাহ, অনল, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিস্বাত্তা, বর্হিষদ—সাত পিতৃগণ। শেষ তিনটির শরীর নেই, দেবগণও এঁদের পূজায় তদগত হন। অন্য চারটির পূজায় প্রাণ সঁপেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য। অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্তা ও বর্হিষদ যোগের বলে চন্দ্রকে তৃপ্ত করছেন অহরহ। তাই এঁদের শ্রাদ্ধ করা উচিত বিশেষ করে। পিতৃশ্রাদ্ধে বিধেয় রূপোর পাত্র। স্বধামন্ত্র থাকবে শুরুতে। আগে বহ্নির তারপর চন্দ্র ও যমের তৃপ্তির জন্য অনুষ্ঠান করবে। আগুনে হলে ভাল, না হলে জলেই পিতৃগণকে ভক্তিভরে তৃপ্ত করা সকলেরই উচিত। এতেই ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি।

সনৎকুমার বললেনঃ বাপু মার্কণ্ডেয় পিতৃভক্ত বলেই না তুমি জরা ও মরণশূন্য।

মার্কণ্ডেয় এবার ভীষ্মকে বললেনঃ সনৎকুমার আরও কৃপা করলেন। দিব্য দৃষ্টি দান করলেন। সেই থেকে ত্রিকাল আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ছবি হয়ে ফুটে উঠে।

যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বললেনঃ মার্কণ্ডেয় আমাকে এসব বর্ণনা করতে

করতে বারবার যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলেন। উৎসাহ যেন ওঁর আরও বাড়ল। উনি আমাকে এক গল্প বললেন ঃ

কৌশিক মুনির সাতপুত্র। সাতজনই শিষ্য ছিলেন গর্গমুনির। কৌশিক মারা গেলেন। সাতপুত্র রয়ে গেলেন গুরুর বাড়ি।

গর্গমুনির ছিল কপিলা নামে একটি গাভী। সাতভাই রোজ মাঠে যায়। কপিলাকে চরায়। আবার সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনে।

কপিলার তখন বাছুর হয়েছে। প্রচুর দুধে মুনির সংসারে স্বাচ্ছ্য ও শ্রী যেন উপচে পড়ল।

একদিন কপিলা চরছে। মেঠোপথে ঘুরে ঘুরে সাত ভাইয়ের পেটে যেন প্রলয়ের আগুন জলে উঠল। ওরা মনে মনে ঠিক করল কপিলাকে কেটে এ আগুন নেভানো যাক। সাতজনের মধ্যে কপি ও স্বসৃপ বেঁকে বসল। বলল ঃ এ অত্যন্ত পাপের কাজ। কিন্তু বাগ্‌দুষ্ট, ক্রোধন, পিশুন, হিংস্র ওদের আমলই দিল না।

পিতৃবর্তী বলল ঃ যদি করবেই পিতৃগণের উদ্দেশ্য করে কর। তাহলে পাপ লাগবে না।

কপিলা নিহত হল। সবাই পিতৃগণকে উৎসর্গ করে নিশ্চিন্ত মনে সেই গোমাংস ভোজন করল।

ভোজন সারা হল। সবাই পরিতৃপ্ত। কিন্তু সব তৃপ্তি বুঝি বা মাটি হয়। মহা এক ভাবনা উৎপাত হয়ে যেন সমস্ত মন জুড়ে বসল। কি কৈফিয়ৎ ওরা দেবে? যদি জানতে পারেন তাহলে তো সর্বনাশ!

সকলে মিলে যুক্তি করল। একজন বলল ঃ বললেই হবে, গুরুদেব, কপিলাকে বাঘে খেয়েছে। বাছুরটিকে কোনমতে বাঁচিয়েছি। এই নিন।

যুক্তিটি মন্দ নয়। সবাই সায় দিল।

সাতভাই বিষণ্ণবদনে গর্গমুনিকে দুঃসংবাদটি পরিবেশন করল। গর্গ সরলভাবে তাদের কথা বিশ্বাস করলেন।

গুরুর কাছে মিথ্যে বলে ওরা পাপ করেছিল। মৃত্যুর পর ফল পেল একেবারে হাতে হাতে। দশার্ণ দেশের এক ব্যাধ। নাম লুব্ধক। ওরা জন্ম নিল তার পুত্র রূপে। হিংসায় হিংসায় ক্রুর কাজ করে করে ওদের এ জন্ম কেটে গেল।

গোমাংস খেয়েছিল। কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিল। কালঞ্জর পর্বতের মত সুন্দর জায়গায় ওরা মৃগরূপে জন্ম নিল। মৃগজন্ম শেষ হল। এ জন্মের জ্ঞান শেষ হল না। পরজন্মেও জ্ঞান রইল অটুট। ওরা সাতভাই বনবাসী হল। সৎচিন্তা সৎকর্ম করেই এই জীবন তাদের কাটল। গুরুর কাছে জ্ঞান পেয়েছিল, অন্য জন্মেও ওদের মনে সেই জ্ঞান অম্লান রইল। সংসার- ভোগ

এসবে ওদের মন রইল না। ওরা জপ করল, তপ করল। আবার জন্ম হল। এবার হতে হল চক্রবাক পক্ষী। শরদ্বীপে সাতভাই সাত চক্রবাক হয়ে ধর্ম আচরণ করে দিনগত পাপক্ষয় করতে লাগল।

ওরা মিথ্যে বলেছিল। তাই এই খারাপ জন্ম। কিন্তু ওরা পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিল, তাই পূর্বজন্মের জ্ঞানের কথা মন থেকে মুছে যায়নি। সাত চক্রবাক। নাম ঃ সুমনা, সুবাক, শুদ্ধ, পঞ্চাল, ছিদ্রদর্শক, সুনেত্র ও সুতন্ত্র। সাতটি পাখির আচরণে অপূর্ব সংযম। বেদের প্রসাদে ওরা ধর্ম করে।

একদিন শরদ্বীপে রাজা নীপেশ্বর এলেন ভ্রমণে। সঙ্গে রাণী দাসদাসী, আত্মীয় পরিজন, অমাত্য পারিষদ। সুতন্ত্র দেখল। রাজার সুখে সুতন্ত্রের মন ভরে উঠল। বলল ঃ কিছু যদি পুণ্য থাকে তাহলে আমি যেন এমন হই। তপস্যায় তপস্যায় এতদিন কত কষ্ট সয়েছি। এবার হওয়া যেত যদি এমন এক সুখী রাজা!

সঙ্গের দুটি চক্রবাক বলল ঃ আমরা দুজন তোমার মন্ত্রী হব।

সুতন্ত্র বলল ঃ নিশ্চয়ই হবে।

সুবাক বলল ঃ এত যোগ করছ, অথচ যা চাইছ তা তেমন ভাল নয়। তবে তুমি হবে। কাম্পিল্য নগরের রাজাই তুমি হবে। এরাও হবে তোমার প্রধানমন্ত্রী।

অন্য চারজন ওদের এসব কথায় মনে মনে আনন্দিত হল। তাদের চার-জনের হয়ে সুমনা বলল ঃ তোমরা যোগীই হবে আবার। সুতন্ত্র হবে বহুতর ভাষায় অভিজ্ঞ।

ক্রমে চক্রবাক-জন্ম শেষ হল। এবার মানস সরোবর। হংস হয়ে ওরা সাতজন সরোবরের বুকে স্পন্দন তোলে। আহার করে মাত্র বায়ু ও জল।

কিছুদিন পর তিনজনের মৃত্যু হল। তিনজনেই জন্মাল কাম্পিল্যনগরে। সুতন্ত্র হল রাজার পুত্র ব্রহ্মদত্ত। ছিদ্রদর্শক ও সুনেত্র হল শ্রোত্রিয়ের পুত্র। একজন পাঞ্চাল, অন্যজন পুণ্ডরীক। বাকী চারজনও জন্মাল শ্রোত্রিয়ের ঘরে। ধৃতিমান, সুমহাত্মা, তত্ত্বদর্শী ও নিরুৎসুক—চার নামে চার হংস নতুন জন্ম অঙ্গীকার করল।

রাজা ব্রহ্মদত্ত সুখ করেন। এরা বেদ পড়ে, যোগ করে। বিষ্ণুর পায়ে মন রেখে নিত্য পাপক্ষয়ের প্রার্থনা করে।

মার্কণ্ডেয় হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন ঃ শ্রাদ্ধ করেছিল। সেই পুণ্যেই ওরা শেষ পর্যন্ত ধর্মের পথে মতি স্থির রাখতে পেরেছিল। নইলে জন্মের চাকায় ঘুরে ঘুরে কতভাবে যে মরত তা কে জানে।

যুধিষ্ঠিরের মুখে যেন সায়াহ্নের প্রশান্ত আলো। ভীষ্ম কেমন অন্যমনস্ক। যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে চলে এলেন। এখন তিনি বিশ্রাম করবেন।।